যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা অনুষদের অন্তর্গত ইতিহাস বিভাগের ডক্টরেট অফ ফিলজফি (পি এইচ ডি) উপাধির আংশিক শর্ত পূরণে প্রদত্ত গবেষণা সন্দর্ভ

ঔপনিবেশিক পুঁজি ও ছোটনাগপুরের আদিবাসী শ্রমিক জীবন (১৭৯৩-১৯৬৫ খ্রীঃ)

গবেষক

কাবেরী মণ্ডল

ইতিহাস বিভাগ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

রেজিস্ট্রেশন নম্বর: A00HI1501318

রেজিস্ট্রেশন তারিখ: 20/09/2018

তত্ত্বাবধায়ক

ড. সুচেতনা চট্টোপাধ্যায়

প্রফেসর

ইতিহাস বিভাগ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা

কলকাতা ৭০০০৩২, পশ্চিমবঙ্গ

২০২৪

Certified that the Thesis entitled

ঔপনিবেশিক পুঁজি ও ছোটনাগপুরের আদিবাসী শ্রমিক জীবন (১৭৯৩-১৯৬৫ খ্রীঃ) submitted by me for the award of the Degree of Doctor of Philosophy in Arts at Jadavpur University is based upon my work carried out under the Supervision of ***Dr. Suchetana Chattopadhyay, Professor, Department of History, Jadavpur University.*** And that neither this Thesis not any part of it has been submitted before for any degree or diploma anywhere/ elsewhere.

Countersigned by the Supervisor

____

Dr. Suchetana Chattopadhyay
Professor
Department of History
Jadavpur University
Jadavpur, Kolkata- 32.
Dated:

Candidate

____

Kaberi Mondal
Dated:

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

আমার গবেষণা কাজটি উৎসর্গ করলাম, সেইসব সমষ্টি বদ্ধ মানুষেদের জন্য যারা ভারতবর্ষের বৃহৎ গণতান্ত্রিক ধর্ম নিরপেক্ষ দেশে সাম্প্রদায় গতভাবে অবহেলিত, নিপীড়িত আদিবাসী শ্রমিক। দেশের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যাদের ভূমিকা ঔপনিবেশিক সময় থেকে উল্লেখযোগ্য ছিল অথচ তাঁরা ঔপনিবেশিক সময় থেকে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পঙ্গু হয়ে ছিলেন। সেইসব আদিবাসী খনি শ্রমিকরা শুধু বেঁচে থাকার জন্য লড়াই করেছেন। তাদের পরিবার, পরিজন অর্থনৈতিক ভাবে স্বাবলম্বী হওয়ার পাশাপাশি সামাজিক সম্মান আদায়ের অপেক্ষায় রয়েছেন যেখানে তাদের কাজের স্থানে প্রাপ্ত সম্মান দেওয়া হবে অন্যান্য শ্রমিকদের মত। সেই আদিবাসী মানুষদের লড়াইকে আমার গবেষণা কাজটি উৎসর্গ করলাম।

আমি বিশেষ ভাবে কৃতজ্ঞ সেই সব অসংখ্য মানুষদের কাছে, যারা বিনা স্বার্থে আমার সাহায্য করেছেন। তাঁদের অমূল্য সময় আমার জন্য ব্যয় করেছেন। নিজেদের মূল্যবান মতামত আমার সঙ্গে ভাগ করে নিয়েছেন। এই গবেষণা কাজটি করতে যিনি সবথেকে বেশি সাহায্য করেছেন, তিনি আমার তত্ত্বাবধায়ক সুচেতনা চট্টোপাধ্যায় শুধু গবেষণা সম্পূর্ণ করতেই নয়, তিনি কীভাবে আক্যাডেমিক ঘরনায় লিখতে বা ভাবতে হয় তা শিখিয়ে দিয়েছেন। সময়ের ব্যাস্ততার মধ্যে বিন্দুমাত্র বিরক্ত না হয়ে ধৈর্যের সাথে, সুচেতনা ম্যাম আমার প্রতিটি প্রতিটি লেখার ড্রাফট গুলিকে বিশ্লেষণ ও সংশোধন করে দিয়েছেন। উনার কাছে আমি বিশেষ ভাবে কৃতজ্ঞ।

খনি অর্থনীতি নিয়ে কাজ করতে গিয়ে আদিবাসী সমাজের অর্থনৈতিক অবস্থান ও আদিবাসী সমাজকে খুব কাছে থেকে দেখার চেষ্টা করেছি। এই কাজে আদিবাসী শ্রমিকদের অনেক সাহায্য পেয়েছি। ক্ষেত্র সমীক্ষার কাজ করতে গিয়ে খনি অর্থনীতি ও আদিবাসী শ্রমিকদের খনিতে কাজ করার অভিজ্ঞতা সম্পর্কে অবগত হয়ে ঔপনিবেশিক পর্যায় থেকে স্বাধীনতা পরবর্তীকাল পর্যন্ত অবগত হতে বিভিন্ন লেখক ও আদিবাসী শ্রমিক নেতাদের সাহায্য পেয়ে আমি কৃতজ্ঞ। পুঁথিগত তথ্য ও গবেষণার প্রাথমিক উপাদান সংগ্রহ করতে, জাতীয় মহাফেজখানার কর্মীবৃন্দ, রাঁচি মহাফেজখানার কর্মীবৃন্দ, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য মহাফেজখানার

বিশেষভাবে রীনা দি, জাতীয় গ্রন্থাগার ও লাইব্রেরী বিভাগের কর্মীবৃন্দ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরীর কর্মীবৃন্দদের এবং বীরভূম সরকারি লাইব্রেরীর মৌসুমি ম্যাম সাহায্য ছিল গুরুত্বপূর্ণ। তিনি কিছু বিশিষ্ট আদিবাসী সাহিত্যের লেখকদের সাথে সাক্ষাৎকারে সাহায্য করে গবেষণাকে সমৃদ্ধ করতে সাহায্য করেছেন।

আমার বন্ধু ও সহপাঠী রাকিব, সুমিত, সরফরাজ, আত্রেয়ীদি ও শুভানুধ্যায়ী যারা আমাকে বহুবার অনেক রকম ভাবে কাজ করতে ও ভাবতে সাহায্য করেছে তাঁদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। আমার এই গবেষণার জন্য আমি আমার বাবা এবং মা এবং পরিবারের সকল সদস্যদের কাছে কৃতজ্ঞ। তারা আমাকে সব রকম ভাবে উৎসাহ, উদ্দীপনা দিয়ে সাহায্য করেছেন। তাঁদের আশা ভরসার উপর নির্ভর করে কাজটা করা সম্ভব হয়েছে।

সূচিপত্র

কৃতজ্ঞতা স্বীকার i – ii

মানচিত্র iii-iv

চিত্র সূচি v

ভূমিকা **০১ – ৩১**

প্রথম অধ্যায়

জীবন ও জীবিকায় ছোটনাগপুর মালভূমির আদিবাসী সমাজ (১৭৯৩-১৮৮০) **৩২-৯০**

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রভাব এবং ছোটনাগপুর মালভূমির আদিবাসী কৃষক সমাজ ৩২-৫২

ব্রিটিশ বিরোধী উপজাতি কৃষক বিদ্রোহ ও মূল লক্ষ্য ৫২-৭৩

আদিবাসী কৃষকদের শ্রমিকে পরিণত হওয়ার প্রক্রিয়া ৭৩-৯০

দ্বিতীয় অধ্যায়

অর্থনৈতিক জাতীয়তাবাদের উদ্ভব ও আদিবাসী শ্রম অর্থনীতিতে প্রভাব (১৮৮০-১৯৩০) **৯১-১৪৫**

মুনফা কেন্দ্রিক অর্থনীতির জন্ম ও আদিবাসী শ্রমিক শ্রেণির উপর প্রভাব ৯২-১০০

আদিবাসী শ্রমিক জীবনের উপর খনি কোম্পানির প্রভাব ১০১-১৩৪

ঔপনিবেশিক পুঁজির প্রভাব ও তৎকালীন পত্র পত্রিকার প্রতিক্রিয়া ১৩৪-১৪৫

তৃতীয় অধ্যায়

বিবর্তিত আদিবাসী কৃষক সমাজ ও আদিবাসী মহিলাদের শ্রমের বাজার (১৯০০-১৯৪১) **১৪৬-২০৯**

আদিবাসী মহিলাদের অভিপ্রয়ান ও ভারী শিল্পে যোগদান ১৪৬-১৬৬

কয়লা খনিতে আদিবাসী মহিলাদের শ্রমের বাজার গঠন ১৬৬-১৭৬

কয়লা সহ অন্যান্য খনিজ খনিতে শ্রম বিভাজন ও বিভিন্ন শ্রম গঠনের আকৃতি ১৭৬-১৮৬

শ্রম বিন্যাস ব্যবস্থায় আদিবাসী নারী এবং বৈষম্যের পুনরুৎপাদন ১৮৭-২০৯

চতুর্থ অধ্যায়

বীরভূমের আদিবাসী উপজাতি ও পাথর খাদান ক্ষেত্র (১৯৪০-১৯৬০) **২১০-২৫৮**

ঔপনিবেশিক যুগে বীরভূমের অর্থনীতি ও আদিবাসী জনজাতি ২১০-২১৭

স্বাধীনতা পরবর্তী যুগে বীরভুমের পাথর খাদান অর্থনীতিতে আদিবাসী শ্রমিক ২১৭-২৩৮

আদিবাসী শ্রমিক জীবনের উপর পাথর খাদানের প্রভাব ২৩৮-২৫৮

পঞ্চম অধ্যায়

উন্নয়নের প্রেক্ষিতে আদিবাসী ও আদিবাসী শ্রমিক প্রতর্ক (১৯৪৭-১৯৬৫) **২৫৯-৩২২**

স্বাধীনতা পরবর্তী ছোটনাগপুর আদিবাসী শ্রমিক ইতিহাস চর্চা ২৫৯-২৭৪

ট্রেড ইউনিয়ান ও আদিবাসী শ্রমিকদের ইতিহাস ২৭৪-২৯৯

অর্থনৈতিক উন্নয়নের ধারায় স্বাধীনতা পরবর্তী খনি অঞ্চলে আদিবাসী শ্রম সম্পর্কিত পরিবর্তন ২৯৯-৩২২

উপসংহার **৩২৩-৩৩০**

গ্রন্থপুঞ্জি ও সহায়ক তথ্যসমূহ **৩৩১-৩৫১**

পরিশিষ্ট **৩৫২-৩৫৫**

চিত্র ও তথ্য সূচি

- ক্ষেত্র সমীক্ষা ভিত্তিক অঞ্চলের মানচিত্র iii-iv
- ব্রিটিশ ভারতের কয়লা খনিতে বিস্ফোরক ব্যবহারের তথ্য সূচি ১২৪
- পশ্চিমবঙ্গের কয়লা খনিতে পরিযায়ী আদিবাসী পুরুষ ও মহিলাদের সংখ্যা সূচি (১৯২০-১৯৩০) ১৬৬
- বিহারের বিভিন্ন জেলার পরিযায়ী আদিবাসী শ্রমিকদের যোগদানের তথ্য চিত্র (১৯৩০) ১৬৮-১৬৯
- আদিবাসী ভিন্ন অন্যান্য সম্প্রদায়ের মহিলা শ্রমিকদের যোগদান পূর্ব ভারতের কয়লা খনির তথ্য চিত্র ১৬৯-১৭০
- ছোটনাগপুর মালভূমি অঞ্চলের বিভিন্ন খনিজ খনিতে কর্মরত আদিবাসী পুরুষ ও মহিলা শ্রমিকের তথ্য চিত্র (১৯২৯-১৯৩৯) ১৮৮-১৮৯
- ছোটনাগপুর মালভূমি অঞ্চলের আদিবাসী মহিলা শ্রমিকের জীবিকায় অংশগ্রহণ ১৯০
- কয়লা খনিতে আদিবাসী মহিলা শ্রমিকদের স্বাস্থ্য অবনতির তথ্য চিত্র (১৯৩৯) ২০৭
- বীরভূমের পাথর খাদানে বা ক্রাসারে যুক্ত কর্মচারী ও শ্রমিকদের বেতনের তালিকাসূচি (১৯৫৫-১৯৬০) ২৪৪
- বীরভূমের পাথর উত্তোলন কেন্দ্র থেকে ধুলো নির্গতকরণের পরিসংখ্যান চিত্র ২৫২
- বীরভূমের পাথর খাদানে বা ক্রাসারে যুক্ত আদিবাসী কর্মচারীদের মৃত্যুর তালিকা (১৯৫০-৬০) ২৫৬-২৫৭
- ছোটনাগপুর খনি অঞ্চলে স্বীকৃত ইউনিয়নগুলির তালিকা (১৯৪৮-৬৩) ২৯৮-২৯৯
- স্বাধীনতা পূর্ববর্তী থেকে পরবর্তীকাল পর্যন্ত আদিবাসীদের খনিতে অংশগ্রহণের রিপোর্ট (১৯৫৫-১৯৬৫) ২৯৯
- বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা রাজ্যের খনি অঞ্চলের নির্ধারিত প্রাপ্ত মজুরী হ্রাস ও বৃদ্ধির তথ্য সূচি ৩১৫

মানচিত্র

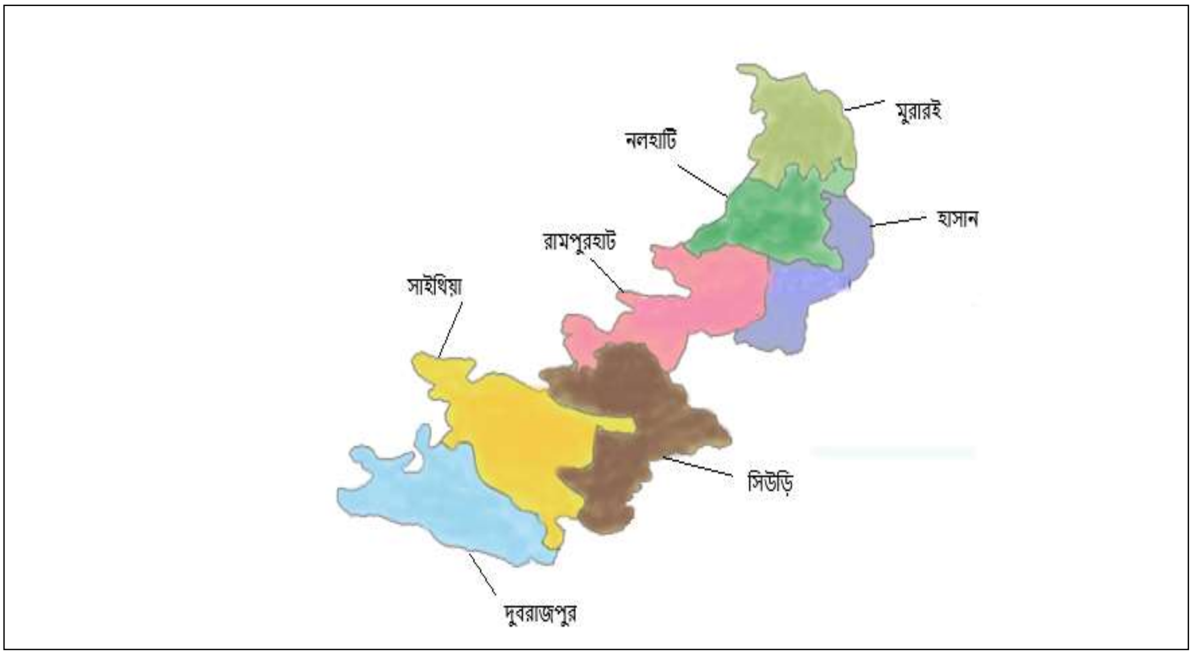

বীরভূমের পাথর খাদান অঞ্চল

ভূমিকা

অর্থনৈতিক ভাবে উন্নত সমাজ যেমন প্রত্যেকের প্রত্যাশাযুক্ত ঠিক তেমনই উন্নয়নের ভাগিদার সমাজের প্রত্যেক মানুষই। যখন এই উন্নয়নের ভাগিদার সকলে হতে পারে না তখনই শুরু হয় অন্তর্দ্বন্দ্ব, অনাচার, অসাম্য, শোষণ ও বিদ্রোহ। ঔপনিবেশিক পর্যায়ের ভারতবর্ষে এই পরিস্থিতিতে শোষণ নিপীড়নের মধ্য দিয়ে শুরু হয়েছিল ছোটনাগপুর মালভূমির অন্তর্গত আদিবাসী জনজাতিদের ইতিহাস। ছোটনাগপুর মালভূমি ঔপনিবেশিক পূর্ব ভারতের বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা ও ছত্রিশগড়ের বেশ কিছু অংশ নিয়ে অবস্থিত। প্রকৃতিগত অবস্থানে এই মালভূমি শুষ্ক ঘন জঙ্গলের অন্তর্গত ছিল। শুষ্ক ঘন জঙ্গল ছাড়াও এই মালভূমির অন্তরগর্ভে নানা ধরনের খনিজ পদার্থের সমাবেশ যা ছোটনাগপুর মালভূমিকে অর্থনৈতিক ভাবে প্রসিদ্ধ করেছিল। কয়লা, চুনাপাথর, বক্সাইট, তামা, ম্যাঙ্গানিজের খনি অঞ্চল ছিল বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই মালভূমি অঞ্চলকে কেন্দ্র করে আদিবাসীদের বাসস্থান ঔপনিবেশিক আমল থেকেই গড়ে উঠেছিল।[1] ঔপনিবেশিক পর্যায়ের পূর্বে অরণ্যের উপর নির্ভরশীল থাকা ছোটনাগপুর মালভূমি সংলগ্ন আদিবাসী জনগোষ্ঠীদের, অর্থনীতির সাথে সম্পর্ক কৃষি জমির মাধ্যমে শুরু হলেও পরবর্তীকালে খনি অঞ্চলের মধ্য দিয়ে এই সম্পর্ক নিবিড় হয়েছিল। কৃষি জমি থেকে খনিজ সম্পদে পরিপূর্ণ খনি অঞ্চলে আদিবাসীদের সাথে অর্থনীতির সম্পর্ক পারস্পরিক হয়ে উঠলে আদিবাসী জনজাতি গোষ্ঠীর সামাজিক থেকে অর্থনৈতিক জীবনধারাকে পরিবর্তিত করে তুলেছিল। এই পরিবর্তন আদিবাসী জনজাতির মধ্যে ইতিবাচক না নেতিবাচক ভূমিকা পালন করেছিল সেই আলোচনা এই অভিসন্দর্ভের গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

আদিবাসী জনজাতিদের নিয়ে পূর্বে স্থান-কাল ভেদে বহু গবেষণা হয়েছে। অধিকাংশ ঐতিহাসিকেদের গবেষণা পাঠ ও বিশ্লেষণের দ্বারা একটি সাধারণ তথ্য উঠে এসেছে যে, আদিবাসী সম্প্রদায় অর্থাৎ সাঁওতাল, হো, মুণ্ডা, কোলসহ সকল আদিবাসী জনগোষ্ঠী সর্ব ক্ষেত্রেই ছিল প্রান্তিক, নিপীড়িত ও অত্যাচারিত- এই শব্দবন্ধগুলি আদিবাসীদের ক্ষেত্রে যুক্ত

---

1. Mopherson. H, *Report of the Survey and settlement operations,* Santal Paragana, Calcutta, Bengal secretariat book depot, 1909, Pp. 143-150.

হতে শুরু করেছিল ঔপনিবেশিক অর্থনীতির সাথে। ছোটনাগপুর মালভূমি অঞ্চলে ঔপনিবেশিক অর্থনীতির সাথে যুক্ত হয়ে গ্রামীণ আদিবাসী কৃষকেরা একের পর এক সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিল। কৃষি জমির ক্ষেত্র থেকে উদ্ভুত সমস্যাগুলি আদিবাসী জনগোষ্ঠীকে মূল সমাজ থেকে বিছিন্ন করে ফেলেছিল। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে তাদের বিবর্তন ঘটতে দেখা যায় ছোটনাগপুর মালভূমি অঞ্চলের খনি ও খাদান ক্ষেত্রে। অর্থনৈতিক কর্মক্ষেত্রে আদিবাসী সমাজের এই বিবর্তনে সামাজিক এবং রাজনৈতিক পরিস্থিতি ছিল একপ্রকার দায়ী। সমাজের একাংশ থেকে ব্রাত্য হয়ে অর্থনৈতিক শিল্প উৎপাদন ব্যবস্থায় তারা কৃষক থেকে মজুর ও শ্রমিক শ্রেণিতে পরিণত হয়েছিল। আদিবাসী জনগোষ্ঠীর মধ্যে পুরুষদের পাশাপাশি মহিলারা ছিল বিশেষ ভাবে গুরুত্বপূর্ণ। আদিবাসী জনগোষ্ঠী কঠোর পরিশ্রমী হওয়ার ফলে, খনি থেকে খাদান ক্ষেত্রে আদিবাসী মহিলাদের নিয়ে অবৈধ শ্রমের বাজার তৈরি করা সহজ হয়ে উঠেছিল। কয়লা হোক বা পাথর খাদান সব ক্ষেত্রেই আদিবাসী মহিলা শ্রমিকদের নিপীড়িত ও অত্যাচারের প্রেক্ষাপট তৈরি হয়েছিল। এই ইতিহাসে ঔপনিবেশিক শক্তি থেকে স্থানীয় পুঁজিপতি শ্রেণির অবদমনে খনি ও খাদান ক্ষেত্রে আদিবাসী শ্রমিক শোষণ দীর্ঘস্থায়ী হয়েছিল। খনি ও খাদান ক্ষেত্রে আদিবাসী শ্রমিকদের শোষণের পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে ছোটনাগপুর মালভূমির অর্থনৈতিক ইতিহাস মুনাফা কেন্দ্রিক অর্থনৈতিক ইতিহাসের প্রেক্ষাপট তৈরি হয়েছিল যা এই ক্ষেত্রকে "Nation of Proletariat" নামে পরিচিত করে তুলেছিল। আদিবাসী কৃষক থেকে শ্রমিক শ্রেণিতে পরিণত হওয়ার পশ্চাতে অর্থনৈতিক দুটি ক্ষেত্র যেমন কৃষি ও খনি শিল্পের প্রতিটি পর্যায়ে শোষণ লক্ষনীয় হয়ে উঠেছিল। অর্থনীতির পাশাপাশি সামাজিক অস্পৃশ্যতা, অশিক্ষা, শোষণ ও নিপীড়নের একটি বিশেষ কারণ হয়ে উঠেছিল। আদিবাসী জনজাতির শোষিত ইতিহাস রচনার প্রেক্ষাপটে যেসমস্ত ঘটনা প্রস্ফুটিত হয়েছে তা প্রাথমিক, গৌন ও মৌখিক উপাদানের মধ্য দিয়ে এই গবেষণায় ভূমিকা রাখবে।

ছোটনাগপুর মালভূমির আর্থ-সামাজিক এই প্রেক্ষাপটে উল্লেখ করা যায় বিনয় ভূষণ চৌধুরির লেখা 'Economic History of Eighteenth to Twentieth Century'[2] এবং

---

2. Chaudhuri. Binay Bhushan (Ed.), *Economic History of India from Eighteenth to Twentieth Century (Vol. VIII, Part- 3),* New Delhi, Centre for studies in Civilizations, 2005. Pp. 213-236.

'বাংলার কৃষি সমাজের গড়ন'[3] গ্রন্থে তিনি বাংলা ও বিহারের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রের বিবরণ দিয়েছেন। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে গ্রামীণ আদিবাসী কৃষকদের ঋন নেওয়ার কথা তিনি উল্লেখ করেছেন। ঋন নেওয়ার মধ্য দিয়েই পাওনাদারদের সাথে গ্রামের আদিবাসী কৃষকদের সম্পর্ক কেমন ছিল তা তিনি স্পষ্ট করে তুলে ধরেছিলেন। গ্রামীণ আদিবাসী কৃষকদের ঋন প্রদানের উদ্দেশ্য ও ঋন প্রদান নিয়ন্ত্রণে রাষ্ট্রের ভূমিকাকে যেমন তিনি একদিকে স্বীকার করেছেন, তেমনি অন্যদিকে আদিবাসী কৃষকদের জীবিকা নির্বাহের অর্থনীতিতে ওয়েডার অর্থনীতির প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছেন। তিনি ধনী কৃষকদের উত্থানের পাশপাশি ছোট কৃষক ও ভাগচাষীদের কথা উল্লেখ করে, তাদের সাথে পার্থক্যের চিহ্ন অর্থাৎ কৃষি ক্ষেত্রে বৈষম্য বজায় থাকার কথাকে পরিস্ফুট করেছিলেন। স্বতন্ত্র অর্থনৈতিক শ্রেণি হিসাবে বিত্তশালী কৃষকদের আবির্ভাবের পাশাপাশি আদিবাসী কৃষকদের জমি থেকে বিচ্যুত হওয়ার পর্যায় যে ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ শক্তির সমকালে উদ্ভুত হয়েছিল - তা তিনি উল্লেখ করেছিলেন।

হরশঙ্কর ভট্টাচার্যের Zamindars and Patnidars'[4] নামক গ্রন্থ থেকে বাংলা ও বিহারের কৃষি জমি থেকে আদিবাসী কৃষক উৎখাতের ইতিহাস চিত্রিত হয়েছে। জোতদার ও বর্গাদারদের সাথে উৎপাদন ব্যবস্থার সম্পর্ক গভীর হওয়ার ফলে গ্রামবাংলায় ক্ষমতা কাঠামোর বিবর্তন লক্ষ করা যায়। জমিদারের পাশাপাশি জোতদারদের ভূমিকা কৃষির মত উৎপাদন সম্পর্কের সাথে সরাসরি যুক্ত হওয়ার ফলে, জমির সাথে আদিবাসী কৃষকদের সম্পর্ক বিরুপ হয়ে উঠেছিল। স্থানীয় ক্ষমতাশালী সরকারের নির্দেশে গ্রাম থেকে আদিবাসী প্রজাদের পালিয়ে যাওয়া রোধ করা হয়েছিল, যাতে রাজস্ব সংগ্রহ হ্রাস না পায়। জমিদারদের জমিদারিত্ব ও কৃষি ব্যবস্থার সুবন্দোবস্তের জন্য ১৭৯৩ সালে ঔপনিবেশিক সরকার প্রবর্তিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রচলন হওয়ার পর থেকে জমিদারদের সাথে আদিবাসী কৃষকদের সম্পর্ক একরকম জবরদস্তিমূলক হয়ে উঠেছিল তা লক্ষ করা যায়।

---

3. চৌধুরী. বিনয় ভূষণ, রজতকান্ত রায়, রত্নলেখা রায়, চিত্তব্রত পালিত (সম্পা.), *বাংলার কৃষি সমাজের গড়ন (ভলিউম - ২),* কলকাতা, কে পি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানি, ১৯৯৪, পৃ. ৭৪- ৯০

4. Bhattacharyya. Harasankar, *Zamindars and Patnidars,* Burdwan, The University of Burdwan, 1985, Pp. 35-45.

'Accounts Respecting the Territorial Revenues and Disbursements' নামক ১৮৩০ সালের বিহারের সরকারি রিপোর্ট,[5] রণজিৎ গুহের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সূত্রপাত[6] ও ডবলু ডবলু হান্টার রচিত 'অ্যানালস অফ রুরাল বেঙ্গল'[7] সহ ঐতিহাসিক প্রাথমিক ও গৌণ ঐতিহাসিক উপাদান থেকে তৎকালীন সময়ের আদিবাসী কৃষকদের উপর হয়ে চলা নিপীড়ন ও শোষণের বিস্তর এক ইতিহাস চিত্রিত হয়েছে। ঐতিহাসিক রণজিৎ গুহ[8] দেখান যে, চিরস্থায়ী ব্যবস্থার ফলে কৃষকদের জমিতে কাজ করাটা জমিদারের ইচ্ছাশক্তির উপরে নির্ভর হয়ে উঠেছিল। এই পরিস্থিতিতে কৃষকদের করুন অবস্থা ও দুর্ভিক্ষ নিত্যসঙ্গী হয়ে উঠেছিল। চিরস্থায়ী বন্দোস্তের ফলে জমিদারেরা স্থায়ীভাবে জমির মালিকানা ভোগ করার অধিকার পেয়েছিল। হোমস এই চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রয়োগকে দুঃখজনক ভ্রান্তি বলে গণ্য করেছিলেন। সিরাজুল ইসলাম এই ব্যবস্থাকে ভারতের প্রথম কালাকানুন বলে উল্লেখ করেছেন।[9] 'হিন্দু প্যাট্রিয়ট' পত্রিকা, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কুফলের জন্য ভূমিহীন আদিবাসী ক্ষেত মজুরদের পাশে সহযোগিতা প্রদর্শন করেছিল। 'সোমপ্রকাশ' পত্রিকায়[10] লক্ষ করা যায়, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তকে উচ্চ-হিন্দুবর্গ সমর্থন জানিয়েছিল। এই বন্দোবস্ত গ্রাম বাংলায় আদিবাসী কৃষকদের জীবনে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে পরিবর্তন ঘটিয়েছিল।

ঔপনিবেশিক পর্যায়ে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে স্থায়ী রাজস্বের পরিমাণ নির্ধারিত হয়েছিল। বিহারের ও উড়িষ্যার অর্থনৈতিক ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে জ্ঞান প্রকাশের গবেষণা -

---

5. *Report of the Accounts Respecting the Territorial Revenues and Disbursements*, Santal Pargana, Government of India, 1830, 24-27.

6. গুহ. রণজিৎ, *চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সূত্রপাত*, কলকাতা, তালপাতা প্রকাশনী, ২০১০, পৃ. ৫৫-৭৮

7. Hunter, W. W. Annals of Rural Bengal, New York: Leypoldt and Holt, 1868, Pp. 217-224.

8. Guha. Ranajit, *Elementary Aspects of Peasant Insurgency in colonial India, Foreword by James Scott*, Delhi, Oxford University press, August 1999, Pp. 1-18.

9. Islam. Sirajul, *The Permanent Settlement in Bengal a study of its operation 1790-1819*, Dhaka, Bangla Academy, 1979, P. 110-134.

10. বিদ্যাভূষণ. দ্বারকানাথ(সম্পা), *সোমপ্রকাশ* (সাপ্তাহিক পত্রিকা), কলকাতা, ১৫ ই জুলাই, ১৮৭৮, পৃ. ৭

'Bonded Histories'[11] নামক গ্রন্থের মধ্য দিয়ে অবগত হওয়া যায় যে, এই ইতিহাস হল জমির 'মালিক' শ্রেণির নিয়ন্ত্রণ থেকে 'কামিয়া'[12] নামক আদিবাসী কৃষক শ্রেণির চুক্তিবদ্ধ দাসত্ব ও সেই পরিস্থিতিতে থেকে মুক্ত হওয়ার ইতিহাস। তুলনামুলকভাবে বাংলার পাশাপাশি বিহারের মত অঞ্চল ঔপনিবেশিক পর্যায়ে কৃষিগতভাবে ছিল পশ্চাদপদ ও স্থবির। এছাড়াও তৎকালীন সময়ে বিহারে সামাজিকভাবে জাতিগত বৈষম্য ও শ্রেণি শোষণ ছিল চিরায়ত। ছোটনাগপুরের অন্তর্গত বিহারে আদিবাসী কৃষকদের মুক্তভাবে বেঁচে থাকার অধিকার ছিল না। জমির বন্ধনে আদিবাসী কৃষকদের বেঁধে দেওয়া হয়েছিল। এই দাসত্বকে কেন্দ্র করে আদিবাসী কৃষকদের দ্বারা জমির সাথে কাজের সম্পর্ক বেঁধে দেওয়ার চিত্র লক্ষ করা যায়।

বিনয় ভূষণ চৌধুরির সম্পাদিত "History of Science, Philosophy and Culture in Indian Civilization"[13] গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন তাদের আধিপত্য স্থাপন করে ছোটনাগপুরের আদিবাসী মুণ্ডা কৃষকদের জমিতে যৌথ মালিকানা প্রথা অর্থাৎ 'খুঁৎকাঠি' প্রথা বাতিল করেছিল এবং আদিবাসী গ্রাম সংগঠনকে বিঘ্নিত করেছিল। জমির মত উৎপাদন ব্যবস্থায় চিরাচরিত খুঁৎকাঠি প্রথার ভাঙ্গন ধরিয়ে ব্যক্তি মালিকানার অধিকার প্রতিষ্ঠিত করেছিল। যৌথ প্রথার ভাঙ্গন হলে জমির সাথে মুণ্ডা আদিবাসীদের সম্পর্ক বিছিন্ন হওয়ার পরিচয় 'H. W. C. Cornduff এর The Chotonagpur Landlord'[14] এবং ১৮৮০ সালের সাঁওতাল পরগণা অনুসন্ধান সরকারি রিপোর্ট থেকে জানা যায়।[15] ঠিক একইভাবে সাঁওতাল, কোল, পাহাড়িয়া, মুণ্ডা আদিবাসীদের উপর জমিদার ও ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির অত্যাচারের ইতিহাস, ১৮৭৭ সালের ডবলু ডবলু হান্টার রচিত 'A Statistical account of

11. Prakash. Gyan, *Bonded Histories: Genealogies of Labour Servitude in Colonial India*, Cambridge, Cambridge University Press, 1990, Pp. 1-5.

12. তদেব।

13. Choudhuri. Binay Bhushan, (Ed.), *History of science, philosophy and culture in Indian civilization,* Pearson Education, New Delhi, Centre for studies in civilization, 2008, Pp. 512-524.

14. Cornduff. H. W. C, *The Chotonagpur Landlord and Tenant Procedure act with notes*, Calcutta, Bengal Secretariat press, 1908, P. 25-50.

15. Mopherson. H, *Report of the Survey and settlement operations,* Santal Paragana, Calcutta, Bengal secretariat book depot, 1909, Pp. 33-42.

Bengal and Santal Paragana’[16], ‘পশ্চিমবঙ্গ সাঁওতাল বিদ্রোহ সংখ্যা’,[17] তারাশঙ্কর বন্দোপাধ্যায়ের ‘অরণ্যবহ্নি’ উপন্যাস,[18] মহাশ্বেতা[19] দেবীর ‘সিধু কানুর ডাকে’[20] লেখা থেকে তৎকালীন অবস্থা প্রতিভাত হয়। মহাশ্বেতা দেবী, ‘হাজার চুরাশির মা’, ‘রুদালি’, ‘অরণ্যের অধিকারের’ মত উপন্যাস সমূহে মহাজন ও দুর্নীতিগ্রস্থ সরকারি আধিকারিকদের হাতে আদিবাসী ও অস্পৃশ্য সমাজের অকথ্য নির্যাতনের চিত্র অঙ্কন করেছিলেন।

ছোটনাগপুর মালভূমির এই বিস্তীর্ণ শ্রেণির জমিদারেরা অতিরিক্ত রাজস্ব লাভের আশায় ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ শক্তির হাত ধরে আদিবাসী কৃষকদের উপর অত্যাচারের পাশাপাশি জমি থেকে উচ্ছেদ করে ভূমিহীন করে তোলার যে প্রয়াস শুরু হয়েছিল, তা ১৯০৯ সালের সাঁওতাল পরগণা ও বিহার কেন্দ্রিক সরকারি অনুসন্ধান রিপোর্টের মাধ্যমে স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল।[21] এই রিপোর্টের মাধ্যমে জানা যায় জমিদার ও ব্রিটিশ কোম্পানির সম্পর্কে আদিবাসী কৃষকদের ধারণাগুলি পরিবর্তিত হয়েছিল। সংশ্লিষ্ট বাসস্থান থেকে উচ্ছেদ, বনভূমির উপর ঔপনিবেশিক নিয়ন্ত্রণ, ভূমি থেকে বিছিন্নতা, জমিদারদের অতিরিক্ত পরিমানে কর আদায়ের জন্য আদিবাসী মহিলাদের উপর যৌন নির্যাতন[22] আদিবাসী জনগোষ্ঠীর সহনশীলতাকে অতিক্রম করেছিল।

ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ শক্তি, অর্থনীতির পাশাপাশি ধর্মকে কেন্দ্র করে ও অশিক্ষার সুযোগ নিয়ে সরল আদিবাসী জনগোষ্ঠীদের দুর্বলতাকে ভারী শ্রমের কাজে ব্যবহার করেছিল। পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত করার সুযোগে আদিবাসীদের খ্রিস্টান ধর্মে ধর্মান্তরিত করার মিশনারি

---

16. Hunter. W. W, *A statistical account of Bengal,* Vol-17, London, Trubner & co, 1877, P. 273-323.

17. মিত্র. গৌরিহর, *পশ্চিমবঙ্গ সাঁওতাল বিদ্রোহ সংখ্যা,* পশ্চিমবঙ্গ, তথ্য সংস্কৃতি বিভাগ, ২৫ আগস্ট ১৯৯৫, পৃ. ২৪

18. বন্দ্যোপাধ্যায়. তারাশঙ্কর, *অরণ্যবহ্নি,* কলিকাতা, মাটিগন্ধা পাবলিকেশন, ১৯৬৬, পৃ. ২০- ২৫

19.মহাশ্বেতা দেবী আদিবাসীদের অধিকার ও ক্ষমতায়নের জন্য কাজ করেছিলেন। তিনি নিজেও আদিবাসীদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছিলেন।

20. দেবী. মহাশ্বেতা, *সিধু কানুর ডাকে,* কলকাতা, করুণা প্রকাশনী, ১৯৮৫, পৃ. ২০-৩০

21. Mopherson. H, *Report of the Survey and settlement operations,* Santal Paragana, Calcutta, Bengal secretariat book depot, 1909, Pp. 25-35.

22. Hunter. W. W, *A Statistical account of Bengal (Bhagalpur District and Santal Paraganas),* Vol-xiv, London, Trubner & Co., 1877, Pp. 213-289.

তৎপরতার কথা সকলেরই জানা। একই ভাবে তারাশঙ্করের ‘অরণ্যবহ্নি’ উপন্যাস[23] পাঠের মধ্য দিয়ে জানা যায় যে, পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত করা ও অর্থনৈতিক কর্মক্ষেত্রে যুক্ত করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে মুণ্ডা নামক আদিবাসীদের খ্রিস্টান ধর্মে ধর্মান্তর করার প্রয়াস করা হয়েছিল। খ্রিস্টান ধর্মে রূপান্তরিত হওয়ার ফলে মুণ্ডাদের নিজস্ব সংস্কৃতি নিশ্চিহ্ন হওয়ার কথা অনুভব করতেই আদিবাসীদের মধ্যে প্রথম ব্রিটিশ বিরোধী বীরসা মুণ্ডার তীব্র প্রতিবাদ ধ্বনিত হওয়ার ঘটনা লক্ষ্য করা যায়। এই পর্যায়ে একদিক থেকে আদিবাসী কৃষকদের মনে হয়েছিল হিন্দু জমিদাররাই একমাত্র তাদের বিরোধী কিন্তু এই সমগ্র ঘটনার পশ্চাতে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শক্তির যে ভূমিকা ছিল তা আদিবাসী জনগোষ্ঠীদের মধ্যে একাংশের বিশ্বাস না করার চিত্র উঠে এসেছিল। এই ঘটনার মধ্য দিয়ে হিন্দু, খ্রিস্টান এবং আদিবাসীদের মধ্যে ধর্মীয় ভিন্ন সংঘাতের সূচনা হয়েছিল।

কৃষি ও ধর্মকে কেন্দ্র করে আদিবাসীদের উপর শোষণের ফলাফল ছিল কৃষক বিদ্রোহ যা হিন্দু প্যাট্রিয়ট,[24] ফ্রেন্ডস অব ইন্ডিয়া[25] নামক পত্রিকা এবং সুপ্রকাশ রায় এর লেখা ‘ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম’,[26] তারাপদ রায়ের সাঁওতাল বিদ্রোহের রোজনামচা,[27] বিহার হেরেল্ড[28], সমাচার দর্পণ পত্রিকা[29], ১৮৫৬ সালের ‘Aborginal Movement’ নামক সরকারী রিপোর্টের মত ঐতিহাসিক তথ্যসূচি থেকে আদিবাসীদের সশস্ত্র ভাবে বিদ্রোহী হয়ে উঠার প্রসঙ্গ উঠে এসেছিল। ঐতিহাসিক সুপ্রকাশ রায় এর লেখায় স্পষ্ট হয়েছিল কৃষিকে ভিত্তি করে শোষক ও শোষিতের সম্পর্ক গড়ে উঠা ও মানব সমাজ শ্রেণি

---

23. বন্দ্যোপাধ্যায়. তারাশঙ্কর, *অরন্যবহ্নি,* মাটিগন্ধা পাবলিকেশন, ১৯৬৬ কলিকাতা, পৃ. - ২৫।

24. ঘোষ. গিরিশচন্দ্র (সম্পা.), *হিন্দু প্যাট্রিয়ট,* (ইংরেজি সাপ্তাহিক পত্রিকা), কলকাতা, কলাকার প্রেস, ১৮৫৩। পৃ. ৭

25 মার্সম্যান. ক্লার্ক(সম্পা.), *ফ্রেন্ডস অব ইন্ডিয়া,* (ইংরেজি সাপ্তাহিক পত্রিকা), কলিকাতা, শ্রীরামপুর মিশন, ১৮২১, পৃ. - ১২

26. রায়. সুপ্রকাশ, *ভারতের কৃষক- বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম,* কলকাতা, র‍্যাডিক্যাল প্রকাশন, প্রথম প্রকাশ জুলাই, ১৯৬৬, পৃ. ২০-৩৫, ৩১০- ৩১৯

27. রায়. তারাপদ, *সাঁওতাল বিদ্রোহের রোজনামচা,* কলকাতা, দেজ পাবলিশিং, চতুর্থ সংস্করণ মাঘ ১৪২৩, জানুয়ারি ২০১৭, পৃ. ২৫-৩৫

28. *বিহার হেরাল্ড,* (সাপ্তাহিক ইংরেজি পত্রিকা), পাটনা, প্রথম পাবলিকেশন ১৮৭৪, পৃ. ৫

29. মার্সম্যান. ক্লার্ক (সম্পা.), *সমাচার দর্পণ,* (প্রথম বাংলা সাপ্তাহিক পত্রিকা), কলিকাতা, ১৮১৮, পৃ. ৩

বিভক্ত হওয়ার কথা। আদিবাসী শ্রেণি সংগ্রামের বিস্তারিত আলোচনায় সেই সংগ্রামকে আড়াল করার যে প্রয়াস হয়েছিল তাও তিনি উল্লেখ করেছিলেন। সাম্রাজ্যবাদী ঐতিহাসিকগণ শাসন ও শোষণকে একটি ভিত্তির উপর স্থাপন করার জন্য ভারতবর্ষের জনসাধারণের ইতিহাসকে গুরুত্ব না দেওয়ার উপর জোর দিয়েছিলেন। এই সংগ্রাম প্রসঙ্গে, ইতিহাস রচয়িতাগণের লেখায় আদিবাসীদের 'দাঙ্গাকারী জনতা', 'ইতর', 'ডাকাত' বলে উল্লেখ করা হয়েছিল। তাতে আদিবাসীদের সামাজিক অবস্থানের দিকটি অনুধাবন করা গিয়েছিল। ছোটনাগপুর মালভূমি অঞ্চলে গ্রাম সমাজের অচলায়তন ভেঙ্গে আদিবাসী কৃষকদের দীর্ঘদিনের পুঞ্জিভূত ক্ষোভ বহিঃপ্রকাশিত হতে দেখা যায় বিদ্রোহের মধ্য দিয়ে। উনবিংশ শতাব্দি থেকে বাংলা, বিহার, উড়িষ্যায় আদিবাসী কৃষক বিদ্রোহের সংখ্যা বৃদ্ধি কৃষক বিদ্রোহের ইতিহাস 'ঐতিহাসিক গণবিদ্রোহ' নামে পরিচিত হতে থাকে।[30] অমল কুমার দাস তার 'আদিবাসী সংগ্রামী মন ও সংগ্রামের দর্শন' গ্রন্থে আদিবাসী কৃষকদের সংগ্রামী মনোভাব পরিণত হওয়ার কারনগুলিকে ব্যাখা করেন। আদিবাসীরা যে একপ্রকার বাধ্য হয়ে এই বিদ্রোহের পথ অবলম্বন করেছিল তা তিনি স্পষ্ট করে ব্যাখা করেন।[31] ঐতিহাসিক প্রমান হিসাবে তৎকালীন ভাগলপুর, বিহার ও বাংলায় থাকা গভর্নর জেনারেলকে লেখা সরকারি চিঠি,[32] সাঁওতাল অথ বিদ্রোহীদের কবিতা ও সংবাদ প্রভাকর[33] পত্রিকা থেকে ছোটনাগপুর মালভূমির আদিবাসী কৃষকদের জমিদার বিরোধী বিদ্রোহ সংগঠিত হওয়ার কথা জানা যায়। এছাড়াও জানা যায় জমির সাথে বিছিন্ন হয়ে আদিবাসী কৃষকেরা বেকার ও ভবঘুরে হয়ে জীবিকা নির্বাহের উপায় সন্ধান করার কথা। এই পর্যায়ে আদিবাসী জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থান প্রান্তিক হয়ে উঠার চিত্র পরিলক্ষিত হয়।

---

30. রায়. সুপ্রকাশ, *ভারতের কৃষক- বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম,* কলকাতা, র‍্যাডিক্যাল প্রকাশন, প্রথম প্রকাশ জুলাই, ১৯৬৬, পৃ. ২৫-২৭

31. দাস. অমল কুমার (সম্পা.), *আদিবাসী সংগ্রামী মন ও সংগ্রামের দর্শন,* পশ্চিমবঙ্গ আদিবাসী আন্দোলন, কলকাতা, ১৯৭৭, পৃ. ২৫-৩০

32. Sinha. Dr S.P, *Paper- Relating to Santal Hul (insurrection),* (Bihar tribal welfare research institute, Ranchi), Ranchi, Varma union press, 1855-56, P. 24.

33. গুপ্ত. ঈশ্বরচন্দ্র(সম্পা), *সংবাদ প্রভাকর পত্রিকা,* (দৈনিক বাংলা পত্রিকা), কলিকাতা, প্রথম প্রকাশ ২৮ সে জানুয়ারি, ১৮৩১, পৃ. ১২

কৃষি ও সামাজিক ক্ষেত্রে শোষণ ব্যতীত খনি ও খাদান শিল্পক্ষেত্রে আদিবাসী জনগোষ্ঠী শোষণের বিস্তর তথ্য পরিলক্ষিত হয়। ঔপনিবেশিক শক্তি ১৮৫৪ সালে রেল লাইনের লুপ তৈরির কাজে আদিবাসীদের ব্যবহারের মধ্য দিয়ে জমি থেকে উৎখাত ও শিল্পক্ষেত্রে প্রবেশ এবং শোষণের অন্যতম পথ উন্মোচিত হওয়ার কথা[34] জানা যায়। তারা যে শুধু রেল লাইনে লুপ তৈরিতে শোষিত হয়েছিল তা নয় বরং রেল লাইনের লুপ তৈরির সাথে সাথে অন্যান্য খনিজ খনিতেও শোষিত হতে শুরু করেছিল। List of Mines other than Coal Mines ১৯০১ সালের সরকারি রিপোর্ট[35] ও বাংলা, বিহার উড়িষ্যার বিভিন্ন জেলার সরকারী সেন্সাস[36] এর রিপোর্ট থেকে ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ শক্তির তত্ত্বাবধানে গড়ে উঠা কয়লা ভিন্ন অন্যান্য খনিজ পদার্থের খনি আবিষ্কারের তথ্য উঠে এসেছিল। বাংলা, বিহার এবং উড়িষ্যার শ্রম বিভাগের সরকারি ও বেসরকারি রিপোর্ট[37] থেকে আদিবাসী শ্রমিকদের অতিরিক্ত পরিমাণ খনিতে যুক্ত হওয়ার প্রবণতা বৃদ্ধি পাওয়ার কথা পরিস্ফুট হয়েছিল।

হরপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের লেখা পরিযায়ী ইতিহাস[38] ও বাংলা, বিহার এবং উড়িষ্যার শ্রমিক কর্মক্ষেত্র বিভাগের সরকারি ও বেসরকারি রিপোর্ট[39] থেকে বেকার আদিবাসী পুরুষ ও মহিলাদের মাত্রাতিরিক্ত অভিবাসন হওয়ার তথ্যসূচি জানা যায়। আদিবাসী জনগোষ্ঠীর এক অংশ জমি ছেড়ে জীবিকা নির্বাহের জন্য খনিতে যোগদানের তথ্য উল্লেখিত হয়েছিল। খনি আবিষ্কারের পরেই আদিবাসীদের কৃষি ভিন্ন অন্য জীবিকার পথ উন্মোচিত হয়েছিল। হরপ্রসাদ

---

34. Malley. L.S.S.O, *Bengal District Gazetteers Santal Paraganas,* Vol-1, Calcutta, Bengal Secretariat Book Depot, 1910, P. 198-207.

35. *List of Mines other than Coal Mines worked under the Indian Mines act (1901),* British India, 1915, G.P.622.34(54) L696, P. 35-65

36. Malley. L.S.S. O, *Birbhum Gazetteers,* Calcutta, Bengal Secretariat Book Depot, 1910, P. 68-78.

37*. Report of the Bihar and Orissa Labour enquiry Committee (1931),* Orissa, Ministry of Labour and employment, 1940, P. 10-15.

38. Chattopadhyaya. Haraprasad, *Internal Migration in India (A case study of Bengal),* Calcutta, K.P. Bagchi & company, First Published- 1987, P. 286-290.

39. *Report of the Bihar and Orissa Labour enquiry Committee (1931),* Ministry of Labour and employment, Orissa, Government of India, 1940, P. 25.

চট্টোপাধ্যায় আদিবাসী জনগোষ্ঠীর সাথে জড়িত থাকা অভিপ্রয়ানকে ব্যাখা করেছেন। একই জেলা, রাজ্য ও রাজ্যের বাইরে আদিবাসীদের অভিবাসনের চিত্রকে আর্থ- সামাজিক ঘটনার পর্যায়ক্রম বলে তিনি উল্লেখ করেছেন। এই শতাব্দীতে আর্থ- সামাজিক ভাবে পিছিয়ে পড়া আদিবাসী শ্রমিকদের অভিবাসনকে তিনি উল্লেখ করেছিলেন। যদিও তা ছিল খনি অর্থনীতিতে বিনিয়োগ করা একটি অনিবার্য পর্যায়ক্রম।

ছোটনাগপুর মালভূমি অঞ্চলে ১৯০০ সাল থেকে ১৯২৮ ও তার পরবর্তী দশ বছরে জনসংখ্যার বিচারে কর্মক্ষেত্রে[40] আদিবাসী বেকার মহিলা ও পুরুষদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি ও আন্তঃজেলা পরিযায়ী হওয়ার পরিসংখ্যান বৃদ্ধি দেখে আদিবাসী কৃষকদের শ্রমিক হওয়ার চিত্র স্পষ্ট হয়েছে। বাংলার 'Unemployment among Women in West Bengal',[41] বিহার, উড়িষ্যার সরকারি তৎকালীন Report of the Bihar and Orissa Labour Enquiry Committee[42] রিপোর্ট থেকে আদিবাসী কৃষকদের পরিযায়ী হওয়ার এবং খনি ক্ষেত্রে যোগদানের তথ্য স্পষ্ট হয়েছে।

সুভাষ রঞ্জন চক্রবর্তীর[43] একটি প্রবন্ধে লক্ষ করা যায় বিভিন্ন ধরনের শ্রমের চাহিদা শহরে অভিবাসনকে বৃদ্ধি করেছিল। ঔপনিবেশিক সময়ের প্রথম দিকে তিনি সামাজিক স্থানচ্যুতি প্রত্যক্ষ করার কথা উল্লেখ করেছিলেন। হাজার হাজার আদিবাসী জনগণ ঔপনিবেশিক অর্থনৈতিক কাঠামোতে জোরপূর্বক অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পাশাপাশি তাদের মৃত্যুর তথ্যও পরিলক্ষিত হয়েছিল। ব্রিটিশ শোষণের বৈশিষ্ট্য ছিল চুক্তিবদ্ধ শ্রম ব্যবস্থা। তারা দেশ থেকে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে জীবিকার জন্য নৈমিত্তিক, বিরতিহীন, ন্যূনতম বেতনের পরিবর্তে অবাধ ও অবৈধ শ্রমের সাথে তারা জড়িয়ে পড়েছিল। ছোটনাগপুর মালভূমি ক্রমেই বাণিজ্যিক

---

40. *Unemployment among Women in West Bengal,* Calcutta, Government of west Bengal Labour Department, Nov 1928, P. 15-27.

41. তদেব। পৃ. ১৫-২৭

42. *Report of the Bihar and Orissa Labour Enquiry Committee 1931,* Orissa, Ministry of Labour and employment, 1920-40, P. 21

43. Chakraborty. Subhas Ranjan, *Colonialism, resource crisis and Forced Migration,* http://www.mcrg.ac.in., Dated on 10/02/2023.

ও পুঁজিবাদী ব্যবস্থার অংশ হয়ে উঠলেও ক্রমবর্ধমান দারিদ্র্যতা বৃদ্ধি পেয়েছিল তা আদিবাসী শ্রমিকদের জীবনযাত্রায় লক্ষ করা যায়। খনি অঞ্চলগুলিকে কেন্দ্র করে এক ধরনের অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের সূচনা হয়েছিল। আদিবাসী জীবনযাত্রা সম্পর্কিত বিস্তারিত তথ্য লক্ষ করলেই তা পরিলক্ষিত হয়। ঠিক তার বিপরীতে খনি অঞ্চলকে কেন্দ্র করে শহরের সূচনা, আদিবাসী শ্রমিকদের সম্পদের সমান অধিকার ও তাদের নিজস্ব আবাসস্থল থেকে উচ্ছেদ ঘটানো এবং জীবিকার নতুন উৎস সন্ধানের জন্য 'অভিবাসন' একটি প্রশ্নে পরিণত হয়েছিল।

১৮৮০ থেকে ১৯৪০ সাল পর্যন্ত খনি অঞ্চলে শ্রমিকদের পরিযায়ী হওয়ার সাথে সাথে স্থানীয় পুঁজিপতিদের উত্থানের কথা অমিয় কুমার বাগচির 'Private Investment in India 1900- 1939',[44] এবং 'Colonialism and Indian Economy'[45] লেখা গ্রন্থ থেকে অবগত হওয়া যায়। খনি ক্ষেত্রে যোগদানের জন্য আদিবাসী শ্রমিকদের অভিবাসন ও অন্যদিকে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যায় একের পর এক পুঁজিপতি শ্রেণির উত্থান প্রশ্নের সম্মুখীন করে তোলে। অতিরিক্ত মুনফা লাভের আশায় ঔপনিবেশিক সরকারের বাণিজ্য নীতি অনুসরনে মত্ত হয়ে উঠেছিল। স্থানীয় পুঁজিপতি শ্রেণি জাতীয় অর্থনীতির উন্নয়নের নাম করে খনি অঞ্চল আবিষ্কারে আগ্রহী হয়ে উঠেছিল।

সুনীতি কুমার ঘোষের লেখা 'The Indian Big Bourgeoisie',[46] গ্রন্থে তিনি ঔপনিবেশিক যুগে ভারতীয় পুঁজিপতি শ্রেণি ও বিদেশি পুঁজিপতিদের মধ্যে দ্বন্দ্ব থাকার কথা উল্লেখ করেছিলেন কিন্তু এই ধরনের বিরোধিতা মেট্রোপলিটন অর্থাৎ নগরকেন্দ্রিক পরিবেশকে আবির্ভূত করেছিল। আসলে ভারতীয় পুঁজিপতিদের সাথে সাম্রাজ্যবাদীদের বৃহৎ পুঁজির স্বার্থের সম্পর্ক এক সরলরেখায় মিলিত হয়েছিল। এই লেখায় ভারতীয় পুঁজিপতিদের দ্বৈত চরিত্র লক্ষ্য করা গিয়েছিল যেখানে একদিকে ছিল ব্রিটিশ সরকারের পুঁজির প্রতি লোভ ও অন্যদিকে

---

44. Bagchi. Amiya Kumar, *Private Investment in India 1900-1939,* vol-5, Cambridge University press, 3rd December 2007, P. 300-357.

'45. Bagchi. Amiya Kumar, *Colonialism and Indian Economy,* New Delhi, Oxford collected Essays, First published 2010, P. 234-256.

46. Ghosh. Suniti Kumar, *The Indian Big Bourgeoisie,* Calcutta, Subarnarekha Publication, 1985, P. 32-48.

অতিরিক্ত মুনফা লাভের চাহিদা। রজনি পাম দত্ত[47] এ প্রসঙ্গে বলেছেন ভারতীয় পুঁজিপতিরা আদিবাসী শ্রমিকদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিলেন। তিনি পুঁজিপতিদের বুর্জোয়া বলে উল্লেখ করেছিলেন। ছোটনাগপুর মালভূমির স্থানীয় বুর্জোয়াদের দল কেবল পুঁজিবাদী নয় শ্রমিক শোষণের প্রাক পুঁজিবাদী পদ্ধতি ব্যবহার করে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিকে সমর্থন করেছিল। এই সমর্থন স্বাধীনতা পরবর্তীকাল থেকে আরো জোরদার হয়ে উঠার প্রবনতা দেখা দিয়েছিল। পল বারান মনে করেছিলেন, ঔপনিবেশিক বুর্জোয়াদের দল তিনটি শ্রেনি নিয়ে গঠিত ছিল ১. ধনী কম্প্রাডার, ২. দেশীয় শিল্পের একচেটিয়াবাদীরা ৩. উন্নত বুর্জোয়া গোষ্ঠী। একইসাথে বলা যায় যে, কৃষ্ণা কৃপালনীর 'দ্বারকানাথ ঠাকুর বিস্মিত পথিকৃৎ'[48]গ্রন্থে, জমিদারের সাথে খনি কোম্পানির কর্মচারীদের যে সু-সম্পর্ক বজায় ছিল না সেই চিত্র তিনি তুলে ধরেছিলেন। বাংলায় দ্বারকানাথের মত বিহার ও উড়িষ্যায় পুঁজিপতিদের কাছে জমিদারির পাশাপাশি খনি কেন্দ্রিক ব্যবসা অভিপ্রায় হয়ে উঠেছিল। জমিদারীকে এই সমস্ত পুঁজিপতিরা পরহস্তব্রতী বলে মনে করতেন না। এদিকে পৌত্র রবীন্দ্রনাথের 'ছিন্ন পত্রাবলী'র অন্তর্গত চিঠিতে তাঁর কৃষক প্রজা থেকে খনি শ্রমিকদের মঙ্গলের জন্য গভীরভাবে আকুতি পার্থনা লক্ষ্য করা গিয়েছিল। এই প্রেক্ষাপটের চিত্রের মধ্যে স্থানীয় বাঙালি, মারোয়ারি, জৈন, উড়িয়া পুঁজিপতিদের উদ্ভবের ফলে খনিতে কর্মরত আদিবাসী শ্রমিকদের জীবন অতিস্ট হয়ে উঠেছিল যা সরকারি রিপোর্ট 'Report on an enquiry into the living conditions of workers employed' দ্বারা স্পষ্ট হয়েছিল।[49]

---

47. Dutta. R. P. *The agrarian crisis in India before Independence: Towards its solution*, Gambol book publication, 2009, P. 76-85.

48. কৃপালনী. কৃষ্ণা, ক্ষিতীশ রায়(অনু), *দ্বারকানাথ ঠাকুর বিস্মৃত পথিকৃৎ*, দিল্লী, ন্যাশানাল বুক ট্রাস্ট ইন্ডিয়া, ১৯৮৪, পৃ.- ৭২-৭৫

49. Basu. R. N, *Government of West Bengal Labour Directorate Report on an enquiry into the living conditions of workers employed in the Factories at Ranigunj- Asansol* area, IAS Labour Commissioner, Calcutta, government of west Bengal, 1955, P. 20-25.

চিরশ্রী দাসগুপ্তার "State and Capital in Independent India: from dirigisme to Neoliberalism"[50] গ্রন্থে ভারতীয় রাষ্ট্রের সাথে পুঁজির সম্পর্ক পরীক্ষা করলে জানা যায় যে, রাষ্ট্রের নেতৃত্বে পুঁজি আরোহনের কৌশলের নাটকীয় তথ্যের কথা। এই পর্যায় থেকেই আদিবাসী কৃষকেরা শ্রমিক হওয়ার প্রক্রিয়ায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল এবং শোষণ ও অত্যাচারের দীর্ঘকালীন চিত্র ফুটে উঠেছিল। এ প্রসঙ্গে একটি কথা উল্লেখ করা যায় যে, পার্থ চট্টোপ্যাধ্যায়[51] সামাজিক ক্ষমতার এক বিন্যাস ও প্রক্রিয়ার মধ্যে শ্রমিকশ্রেণির শোষণের কথা স্বীকার করেছিলেন।

পুঁজিপতি শ্রেণির উত্থানে খনি অঞ্চলে আদিবাসী শ্রমিকদের অভিবাসন ও আদিবাসী জনগোষ্ঠীর প্রতি নির্মম অত্যাচারের পাশাপাশি মৃত্যুর কাহিনি উল্লেখিত হয়েছিল। সামাজিক ভাবে আদিবাসী শ্রমিককে অস্পৃশ্য করে রাখার প্রবনতাও লক্ষ্য করা যায়। অমল দাসগুপ্তের লেখা 'কারানগরীতে'[52] দীর্ঘ ষোলো বছর খনি শিল্পাঞ্চলে কাটানোর অভিজ্ঞতায় মুক্তির স্বাদ অনুভব করার কথা বলেছিলেন। অমল দাসগুপ্ত এই গ্রন্থে, বাবুপাড়া ও মজদুরপাড়া নামক ভিন্ন দুই শ্রেণি পাড়ার কথা উল্লেখ করেছেন। আদিবাসী সাঁওতাল মহিলা শ্রমিকদের উপর ঠিকাদার আর চিফ ইঞ্জিনিয়ারদের কুনজরের কথা ও পালটা সাঁওতালদের বিষ মাখানো তীর দিয়ে বাবুদের আক্রমণের কথাও উঠে এসেছিল ভিন্নভাবে। যে ভিটেমাটিতে সাঁওতাল মহিলা ও পুরুষরা একদিন অজান্তে মাটি কাটার কাজ করেছিল সেই ভীতের উপর কংক্রিটের ও ইস্পাতের কাঠামো তৈরি হবে বলে যান্ত্রিক শক্তির সহায়তায় আদিবাসী শ্রমিকদের বাড়ি ঘর নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার তথ্যের উল্লেখ পাওয়া যায়।[53] খনি এলাকায় শুধু আদিবাসী মহিলা বা পুরুষ সকলের উপর অত্যাচার যথেষ্ট ছিল না বরং অতিরিক্ত মুনফার লোভে কয়লা সহ পাথর খাদানে আদিবাসী শ্রমিকদের স্বাস্থ্য মৃত্যুর সম্মুখীন হয়ে উঠার কথা স্পষ্ট হয়েছিল। Report of

---

50. Dasgupta. Chirashree. *State and capital in Independent India: Institution and Accumulation,* London, Cambridge University Press, 2017, P. 44-50.

51. চট্টোপাধ্যায়. পার্থ, *প্রজা ও তন্ত্র,* কলকাতা, অনুস্টুপ প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ ২০০৫, পৃ. ৫৩

52. দাসগুপ্ত. অমল, *কারা নগরী,* কলকাতা, পপুলার লাইব্রেরী, ৫ই ফেব্রুয়ারি ১৯৫১, পৃ.- ৩৫-৫০

53. তদেব। পৃ. ২৩

the Coal Dust Committee[54] ১৯২৩ এই রিপোর্ট ঠিক একই ভাবে কয়লার মত A Preliminary Work on Assessment of Dust Hazard in Indian Mines,[55] Environment Pollution in Mines and Mining Area,[56]এর সরকারি খনি রিপোর্ট থেকে সকল তথ্য স্পষ্ট হয়েছিল। এই রিপোর্ট গুলি থেকে খনি ও খাদান অঞ্চলে শ্রমিকদের শারীরিক অবস্থার পাশাপাশি এই অঞ্চল থেকে উদ্ভুত ধুলো শ্রমিকদের শারীরিক ক্ষতির সূচনা করেছিল তা স্পষ্ট নির্ধারণ করা যায়।

শৈলজানন্দ ছাড়াও ঘনশ্যাম চৌধুরি[57] 'খাদান সমগ্র' নামক গ্রন্থের মধ্য দিয়ে রাজনীতি, সমাজ, অর্থনীতি সম্পৃক্ত শোষিত, বঞ্চিত অভাগা মানুষের জীবনস্রোতে বিষাদ সহ নানা তথ্য তুলে ধরেছেন তা নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই তবে কয়লা খনির ইতিবৃত্ত ছাড়াও পাথরের মত খনিজ খনির শ্রমিকদের জীবনের রুঢ়সত্য সমাজের মূল অংশ থেকে অজ্ঞাত রাখা হয়েছিল বলে মনে করা হয়েছে। তাঁর লেখনির বাইরেও রাঢ় অঞ্চলের অন্যান্য খনি, খাদানের ইতিহাস আলোচনায় সমগ্র আদিবাসী সম্প্রদায়কে সাধারনীকরন করা হয়েছিল। সুনীল কুমার বসু উপজাতিদের অর্থনীতির উপর একটি ছবি দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। আদিবাসী অর্থনীতির বৈশিষ্ট্যকে তিনি শুধু কৃষি ক্ষেত্র দ্বারা বিচার না করে বরং খাদান অর্থনীতির মধ্য দিয়ে শ্রমিক হিসাবেও বিবেচনা করার কথা ব্যক্ত করেছিলেন। তাঁর মতে আদিবাসী অর্থনীতি উন্নয়নের জন্য নতুন কৌশল বৃদ্ধি পেয়েছিল। তবে এই সার্বিক উন্নয়নকে সম্ভবপর করে তোলার চেষ্টা করেছেন অর্থনৈতিক ব্যাধি দূর করার মধ্য দিয়ে।[58]

---

54. *First Report of the Coal Dust Committee,* Government of India, 1923, P. 2-10.

55. *A preliminary work on assessment of dust hazard in Indian mines,* Dhanbad, Central mining research station, Nov, 1961, P. 7-10.

56. Singh. Dr. B, *Environment pollution in Mines and Mining Area,* Bihar, Government of India, Bihar, 1986, P. 3-7.

57. চৌধুরি. ঘনশ্যাম, *খাদান সমগ্র,* কলকাতা, দেজ পাবলিকেশন, ২০১৯, পৃ.- ১০-৩৫

58. Basu. K. *Indebtedness among the Tribals of West Bengal,* special series no. 16 Bulletin of the cultural research Institute, scheduled castes and tribes welfare department, Calcutta, Government of west Bengal, 1974, P. 10-14.

ছোটনাগপুর মালভূমিতে কয়লা ভিন্ন পাথর খাদানের অর্থনীতিতে আদিবাসী শ্রমিকদের অবস্থান ছিল গুরুত্বপূর্ণ। ও ম্যালির বীরভুম গেজেটিয়ার[59] ও বীরভূমের শ্রমিক সংক্রান্ত সরকারি রিপোর্ট Labour Matters /Unrest/ Santhal Activist in Birbhum,[60] থেকে আদিবাসী শ্রমিকদের কয়লা ভিন্ন পাথর খাদানে যোগদান ও শোষণের চিত্র পরিলক্ষিত হয়েছিল। এছাড়াও বীরভূমে জল দূষণ[61] ও শ্রমিকদের স্বাস্থ্যের অবনতির চিত্র Environment pollution in mines and mining area নামক রিপোর্ট থেকে চিত্রিত হয়। বীরভূমের পাথর খাদান ক্ষেত্রে আদিবাসী শ্রমিকদের অবস্থা কয়লা খনির মত ছিল। Report of an enquiry into the living conditions of the workers employed in the Factory of stone industry[62] নামক সরকারি রিপোর্ট থেকে তাদের প্র্যাতহিক নিম্নমানের জীবনযাত্রা, সিলিকোসিস রোগের সাথে পরিচিত হওয়া এবং স্বাধীনতা পরবর্তী পাথর খাদানের শ্রমিকদের মজুরি হ্রাস পাওয়ার চিত্র সরকারি Report of the minimum wages committee for the stone breaking or stone crushing,[63] রিপোর্টের মাধ্যমে চিত্রিত হয়েছিল।

ঔপনিবেশিক পর্যায়ে সরকারি কর্মক্ষেত্রের পরিসংখ্যানে, খনি ভিন্ন আদিবাসী মহিলাদের অংশগ্রহণের পরিমাণ হ্রাস প্রশ্নের সম্মুখীন করে তুলেছিল। আদিবাসী জনগোষ্ঠীর শোষণ ও নিপীড়নের ইতিহাসে, খনির মত কর্মক্ষেত্রে আদিবাসী মহিলাদের অধিক যোগদান ছিল গুরুত্বপূর্ণ। খনি ক্ষেত্রগুলিতে আদিবাসী মহিলা শ্রমিকদের বৃদ্ধি, সস্তা শ্রমের বাজার তৈরির উপকরণে সাহায্য করেছিল। অন্যদিকে সাহিত্য থেকে ভিন্ন ভিন্ন প্রবন্ধ ও ঐতিহাসিক তথ্যে খনি অর্থনীতির সাথে জড়িত জাতি, বর্ণ, লিঙ্গগত বৈষম্য আদিবাসী মহিলাদের উপর বারংবার

---

59. Malley. L.S.S. O, *Birbhum Gazetteers,* Calcutta, Bengal Secretariat Book Depot, Calcutta, 1933, P. 68-78.

60. *Labour Matters / Unrest/ Santhal Activist in Birbhum,* (weekly confidential report) Birbhum District, 1946, P. 7-10.

61. R*eport of the Ground water pollution studies,* West Bengal, India, May 1980, P. 1-7.

62. *Report of an enquiry into the living conditions of the workers employed in the Factory of Stone industry,* Dhanbad, Government of India, 1955, P. 23-25.

63. *Report of the minimum wages Committee for the Stone breaking or Stone Crushing, Government of West Bengal, 1964.* P. 10-24.

প্রতিফলিত হয়েছিল। এ প্রসঙ্গে বলা যায় যে, রাখী রায়চৌধুরির 'Gender and Labour in India (১৯০০-১৯৪০)'[64] সালের গ্রন্থ ও কুন্তলা লাহিড়ীর লেখা কয়লা খনির ইতিহাসে[65] ঔপনিবেশিক পর্যায়ে আদিবাসী মহিলা শ্রমিকদের প্রতি বৈষম্যতা প্রদর্শন, লিঙ্গ নির্বিশেষে শ্রম ও মজুরি বৈষম্যতার মত চিত্র পরিলক্ষিত হয়েছিল। ১৯৪৮ ও ১৯৫৮ সালের খনির মজুরী সংক্রান্ত আইন প্রনয়ণের পরও সরকারি রিপোর্টে এই বৈষম্যতা প্রসঙ্গটি বারংবার প্রতিফলিত হয়েছিল। ঔপনিবেশিক পর্যায় থেকে স্বাধীনতা পরবর্তীকালে কয়লা ভিন্ন বীরভূমের পাথর খাদানের ইতিহাসেও একই চিত্র লক্ষ করা যায়। শাহু চতুর্ভুজের লেখা "The Santhal woman a social profile"[66] গ্রন্থে সামাজিক বিবরনের মাধ্যমে চিত্রিত হয় আদিবাসী সমাজ 'Egalitarian'[67] অর্থাৎ সাম্যবাদী। আদিবাসী সম্প্রদায়ের মধ্যে সাধারণত মেয়েদের অর্থনৈতিক মূল্যের কারণে তাদের বোঝা হিসাবে বিবেচনা করা হত না। তবে ধীরেন্দ্রনাথ বাস্কে উল্লেখ করেছেন[68] যে, ঐতিহ্যগতভাবে পারিবারিক বিষয়ে, আদিবাসী মহিলাদের সিধান্ত নেওয়ার অত্যাবশ্যক অধিকার ছিল না এবং তার পারিবারিক আয়ের অংশ থেকে বঞ্চিত করা হত। প্রথমা ব্যানার্জীর "Writing the Adivasi some Historiographical Note"[69] গ্রন্থে আদিবাসী মেয়েদের মধ্যেই প্রথম অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পুরুষদের পাশাপাশি কাজ করার স্বাধীনতা প্রকাশ করলেও তা সমাজে প্রশংসা প্রাপ্য ছিল না। স্বাভাবিকভাবেই খনি অঞ্চলে শ্রম

---

64. Roychouwdhury. Rakhi, *Gender and Labour in India (The Kamins of Eastern Coalmines 1900-1940)*, Calcutta, Minerva Associates Publications PVT. LTD, First Published 1996, P. 20-35.

65. Dutta. Kuntala Lahiri, *Roles and status of women in extractive Industries in India: Making a place for a gender- sensitive mining development,* Vol. 37 No-4. December 2007, P. 38-49.

66. Sahu. Chaturbhuj, *The santhal woman: a social profile*, New Delhi, Sarup and Sons, 1996, P. 36-45.

67. চক্রবর্তী. দীপঙ্কর (সম্পা.), নারী সমস্যা নারী মুক্তি, *অনিক পত্রিকা*, কলকাতা, অক্টোবর ২০১৩, পৃ.-৮৮।

68. বাস্কে. ধীরেন্দ্রনাথ, *সাঁওতাল গন সংগ্রামে নারী সমাজের ভুমিকা*, কলিকাতা, বাস্কে পাবলিকেশন, জুন ২০০৬, পৃ.-১০-১৫

69. Banerjee. Prathama, *Writing the Adibasi: some historiographical notes,* (53, 1), Delhi, The Indian Economic and social history review, 2016, P. 1-23.

ব্যবহারে বৈষম্য নারী ও পুরুষদের মধ্যে বিভাজনকে স্বাভাবিক করে তোলা হয়েছিল ক্ষমতার স্বার্থে। প্রথমা ব্যানার্জী একইভাবে, ঔপনিবেশিক পর্যায়ে খনি ক্ষেত্রে আদিবাসী মহিলাদের শ্রম ব্যবহারে অবৈধতার প্রসঙ্গ তুলে নিয়ে এসেছিলেন। সম্পত্তি হিসাবে পুরুষের মালিকানা নারীর দেহ ও জীবন, বিশেষ করে তার উর্বরতা ও যৌনতা পর্যন্ত বিস্তৃত আর্থ- সামাজিক অবস্থার উপর বসতি স্থাপন করা সম্পত্তির ব্যক্তিগত মালিকানার প্রভাবের মধ্য দিয়ে যা বহুবার উচ্চারিত হয়েছিল। ঠিক একইভাবেই বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার **১৯৪০,**[70] **১৯৫৩**[71] **১৯৬১**[72] সালে খনিতে মাতৃত্বকালীন সুবিধা আইনের সরকারি রিপোর্ট থেকে স্বভাবতই আদিবাসী মহিলা শ্রমিকদের খনি ক্ষেত্রে সুযোগ সুবিধা না থাকার প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়েছিল অনেকগুলি প্রশ্নকে কেন্দ্র করে। ঔপনিবেশিকতার সামগ্রিক প্রভাব আদিবাসী শ্রমিকদের ক্ষেত্রে প্রকৃতপক্ষে নেতিবাচক ছিল। মাথাপিছু আয় ও উন্নত জীবনযাত্রার বৃদ্ধি না হয়ে বরং কৃষি উৎপাদনশীলতা হ্রাস পেয়েছিল এবং কৃষিতে যুক্ত আদিবাসী কৃষক থেকে শ্রমিকদের জীবনের অবনতি লক্ষ করা যায়।

স্বাধীনতা পরবর্তী ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শক্তি ও স্থানীয় পুঁজিপতি শক্তির সম্মিলিত প্রয়াসে ছোটনাগপুরের খনি অঞ্চলে অর্থনৈতিক পরিবর্তন দেখা দিলেও পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় 'উন্নয়ন' শব্দটির উপর বিশেষভাবে জোর দেওয়া হয়েছিল। 'উন্নয়নের' ব্যবহার প্রসঙ্গে সমাজের প্রতিটি স্তরে এর বহিঃপ্রকাশ সমানভাবে দেখা যায়নি। এ প্রসঙ্গে অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেনের ব্যাখায় লক্ষ করা যায়, "উন্নয়ন হল রক্ত, ঘর্ম, কান্না উভয়ের সম্বলিত একটি ভয়ঙ্কর প্রণালী যেখানে বুদ্ধির সাথে দৃঢ়তা প্রয়োজন"।[73] উন্নয়নের সংজ্ঞাকে সঠিক বলে প্রমাণ করতে হলে স্বাধীনতা পরবর্তী সামাজিক স্তরে **১৯৫০** থেকে **১৯৬৫** সালে রক্ত, ঘর্ম, কান্না আসলে ক্রমাগত

70. *Government of West Bengal Department of Commerce and Labour, the Bengal Maternity Benefit Rules 1940,* Alipore, West Bengal Press, P. 30-35.

71. *Annual report on the Administration of Orissa,* The maternity Benefit act (1953), Orissa, 1962, P. 10-15.

72. *Department of Commerce and Labour,* The Bengal Maternity Benefit Rules (1961), New Delhi. Government of India Press, 1965, P. 5-9.

73. সেন. অমর্ত্য, *উন্নয়ন ও স্ব- ক্ষমতা,* অনুবাদ অরবিন্দ রায়, কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স, মার্চ ২০১৯। পৃ.- 88

প্রবাহিত কারা করেছিল বা করে চলেছে সেই দিক থেকে প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়েছিল। উন্নয়নের সংজ্ঞাকে সার্থক করতে গিয়ে শ্রম মজুর সমন্বিত প্রান্তীয় সমাজকে পঙ্গুত্বের দিকে ঠেলে দিচ্ছে বলে একাধিক মন্তব্য উঠে এসেছিল বর্তমান নিম্নবর্গের ঐতিহাসিকদের লেখায়। ডাফনে গ্রিনহুড এবং রিচারড হল্ট দাবি করেছিলেন যে, জাতিভেদ প্রথা বাদ দিয়ে জীবন যাপনের মানকে উচ্চতর ও স্থায়ী করে তোলা অর্থনৈতিক উন্নয়নের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। আদিবাসী শ্রমিকদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে জাতিভেদ প্রথা বড় রকমের বাঁধা হয়েছিল। এছাড়াও উন্নয়ন ও আইনশৃঙ্খলার নামে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল আদিবাসী অর্থনীতি বলে মন্তব্য করেছেন দেবশ্রী দে তার গ্রন্থে।[74] অমর্ত্য সেনের মতে, "উন্নয়নের লক্ষ্য স্বাধীনতা হীনতার প্রধান উৎসগুলিকে নির্মূল করা"।[75] অর্থনৈতিক দুর্বলতার ফলে নিয়মিত ভাবে সামাজিক স্তরের বঞ্চনা,[76] আদিবাসী জনসাধারণের কল্যাণের উপেক্ষা, অসহিষ্ণুতা বা রাষ্ট্রের উদ্ধত কার্যকলাপ ছোটনাগপুর মালভূমিকে "Nation of Proletariat" নামকরণের যথার্থতা প্রদান করেছিল। খনি শিল্পাঞ্চলে আদিবাসী শ্রমিকদের এই সাধারণীকরণের ইতিহাস পরিবর্তিত করতে ট্রেড ইউনিয়ানের ভূমিকা ছিল বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। উড়িষ্যায় ১৯২৬ সালের ট্রেড ইউনিয়ান আইন রিপোর্ট,[77] ১৯৪৮[78] ও ১৯৬২ সালে বাংলা ও বিহারে ট্রেড ইউনিয়ান আইনের রিপোর্ট,[79] ১৯৫৭ থেকে ১৯৬৭ সালের বিভিন্ন বাংলা শ্রমিক শ্রম সম্পর্কিত পত্রিকা,[80] ১৯৫২ সালে

---

74. দে. দেবশ্রী, *পূর্ব ভারতের আদিবাসী বৃত্তান্ত (১৯৪৭-২০১০),* কলকাতা, সেতু পাবলিকশন, প্রথম সংস্করণ ২০১২, পৃ. ৭২-৭৪

75. সেন. অমর্ত্য, *উন্নয়ন ও স্ব- ক্ষমতা,* অনুবাদ অরবিন্দ রায়, কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স, মার্চ ২০১৯, পৃ. ৫২

76. Simeon. Dilip, *Work and resistance in the Jharia coalfield,* Vol- 33, Issue 1-2, Contribution to Indian Sociology, 1999, P. 35-42.

77. *Annual Report on The working of the Indian trade unions act,* 1926 for the year 1965, Labour employment & Housing department, Government of Orissa.

78. Ministry of Labour, *Employment and Rehabilitation, Coal mine Bonus scheme and Sister Schemes (1948),* Delhi, Publication Government of India, Delhi, 1970, P. 7-8.

79. *Annual Report on The working of the Indian trade unions act,* Labour employment & Housing department, Government of Orissa, 1960, P. 10-15.

80. *West Bengal Labour Gazettee,* vol-1 No-3, Department of Labour Government of West Bengal, June 1957, P.100-112.

পুনরায় ফ্যাক্টারি নিয়ম প্রচলিত হওয়ার তথ্য থেকে খনিক্ষেত্রে আদিবাসীদের দুর্বল অর্থনৈতিক অবস্থা থেকে মুক্তি পেতে ট্রেড ইউনিয়ানের গঠন যে প্রয়োজনীয় ছিল তা সহজেই প্রতিভাত হয়। সময়ের প্রবাহমানতার সাথে খনি ক্ষেত্রের আদিবাসী শ্রমিকদের যুক্ত হওয়া এবং একে পর এক খনি আইন প্রচলন আদিবাসী জনগোষ্ঠীকে কঠোর সংগ্রামের সম্মুখীন করেছিল তা তৎকালীন বিভিন্ন বামপন্থি পত্র পত্রিকা ও সংগ্রামী পার্টির চিঠি থেকে জানা যায়। ধূমকেতু[81], বিহার বন্ধু[82], উড়িষ্যা প্যাট্রিয়ট[83], বিহার হেরেল্ড[84], গণদাবী[85] পত্রিকার মধ্য দিয়ে আদিবাসী শ্রমিকদের সংগ্রামের ইতিহাস চিত্রিত হয়। শিল্প শ্রমিকদের উন্নয়ন প্রসঙ্গে রাষ্ট্রীয় নেতাদের মন্তব্য ছিল গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু সেই মন্তব্যে আদিবাসী শ্রমিকদের কথা বিশেষভাবে গুরুত্ব পায়নি। আদিবাসী শ্রমিকদের খনি ও খাদান ক্ষেত্রে শোষণের পাশাপাশি ধর্মঘট ও আন্দোলনের মধ্য দিয়ে শ্রমিক ব্যবস্থার ও অবস্থার কতটা পরিবর্তন ঘটিয়েছিল তা এই মন্তব্যগুলি থেকে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছিল।

ব্রিটিশ ভারত থেকে আধুনিক ভারতের প্রগতিশীল অর্থনীতি ও বর্ণময় রাজনীতির পশ্চাতে ছোটনাগপুর মালভূমির খনি ও খাদান অঞ্চলকে কেন্দ্র করে থাকা প্রান্তীয় আদিবাসী জনগোষ্ঠী বিলুপ্তির অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিল এবং প্রতিনিয়ত তারা চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়েছিল। জীবিকা নির্বাহের জন্য অর্থনৈতিক ক্ষেত্রের নতুন দিক উন্মোচিত হলেও তা আদিবাসী শ্রমিকদের জন্য বিশেষ উপযোগী ছিল না। দীর্ঘদিন খনি ক্ষেত্রে কাজ করার ফলে তাদের সামাজিক পরিচয়ের সাথে নিজস্ব জীবনযাপন, ধর্ম ও সংস্কৃতি পরিবর্তিত হওয়ার কথা উল্লেখিত হয়েছে একাধিকবার মহাশ্বেতা দেবী ও সুপর্ণা লাহিড়ী বড়ুয়ার লেখায়।[86] এছাড়াও

---

81. ইসলাম. কাজী নজরুল(সম্পা.), *ধূমকেতু,* (বাংলা দ্বি-সাপ্তাহিক পত্রিকা), প্রথম প্রকাশ ১৯২২সাল ১১ই আগস্ট, পৃ. ৫

82. ভট্ট. কেশব রাম(সম্পা.), *বিহার বন্ধু,* (হিন্দি পত্রিকা), প্রথম প্রকাশ পাটনা, বিহার, ১৮৭৪, পৃ. ১২

83. ব্যানার্জী. কালিপদ(সম্পা.), *উড়িষ্যা প্রাট্রিয়ট,* (ইংরেজি সাপ্তাহিক পত্রিকা), কটক, উড়িষ্যা, ১৮৬৮। পৃ. ৭

84. *বিহার হেরাল্ড,* (সাপ্তাহিক ইংরেজি পত্রিকা), প্রথম পাবলিকেশন পাটনা, বিহার, ১৮৭৪, পৃ. ১০

85. ব্যানারজি. সুবোধ (সম্পা), *গণদাবী,* সোশ্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া, (বাংলা সাপ্তাহিক পত্রিকা), কলকাতা, ১লা ডিসেম্বর, ১৯৪৮, পৃ. ২

86. বড়ুয়া. সুপর্ণা লাহিড়ী, *বিহার নারী সমাজ সংগ্রাম,* র‍্যাডিক্যাল কলকাতা, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি, ২০০৮। পৃ. ৯৪-৯৬

ঔপনিবেশিক পর্যায়ে সরকারি রিপোর্ট 'Tribal identity a language and communication perspective',[87] Lachman M. এর 'Tribal language'[88] এ আদিবাসীদের ভাষা বিবর্তিত হওয়ার চিত্রও লক্ষ করা যায়।[89] ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শক্তি দ্বারা আদিবাসীদের অর্থনীতি ও সংস্কৃতি নিয়ে অস্তিত্বের সংকট দেখা দিয়েছিল যা সুচিব্রত সেনের 'The Santals crisis of Identity and Integration [৯০] গ্রন্থে উল্লেখিত হয়েছে। দক্ষতাপূর্ণ এই তথ্যগুলি থেকে সহজেই উপলব্ধি করা যায় ঔপনিবেশিকতার সাথে সাথে আধিপত্যকারী ও উচ্চবর্ণের শ্রেণিগুলির আধিপত্য যা আদিবাসীদের সামাজিক অবস্থানগুলিকে অবহেলাপূর্ণ করে রেখেছিল। আদিবাসীদের স্থান যেমন সাহিত্যে ব্রাত্য ছিল ঠিক একই ভাবে ঐতিহাসিক রচনায় প্রথমদিকে সমাজের বহির্ভূত অংশ হিসাবে পরিচয় দেওয়া হয়েছিল।[91] সুবোধ দেবসেনের মতে, আদিবাসীরা কখনোই সমাজের মূল শাখার ইতিহাসের সাথে অন্তর্ভুক্ত হতে পারেনি। আদিবাসী শ্রমিকদের এই চিত্র যে শুধু ঔপনিবেশিক ভারতেই সীমাবদ্ধ ছিল তা নয় বরং ভারত ভিন্ন আমেরিকা ও আফ্রিকার খনির অতীত ইতিহাস থেকে জানা যায় আদিবাসীদের খনি শ্রমে অংশগ্রহণে, শ্বেতাঙ্গ বর্ণের কৃষ্ণাঙ্গদের উপর আধিপত্যবাদের কাহিনি।[92] উপরিক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে দুর্নীতির প্রজনন ক্ষেত্র ছোটনাগপুরের খনি অর্থনীতিকে কেন্দ্র করে আদিবাসী কৃষক থেকে শ্রমিক শ্রেণিতে পরিণত হওয়ার কারণ ও প্রশ্নগুলির উত্তর বিস্তারিত ভাবে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে এই গবেষণার মধ্য দিয়ে।

---

87. *Report of the Tribal identity a language and communication perspective,* Calcutta, Government of India, 1955, P. 34.

88. Khubchandani. Lachman M, *Tribal identity a language and communication perspective,* Indian institute of advanced study, New Delhi, Indus publishing company, 1992, P. 12-24

89. দেবী. মহাশ্বেতা, *অরন্যার অধিকার,* কলকাতা, করুনা পাবলিকেশন, জানুয়ারি ২০০১, পৃ. ১৫-২০

90. Sen. Suchibrata, *The Santals crisis of Identity and Integration,* Kolkata, Ratna Prakashan, First Publication 1997, P. 95-100.

91. দেবসেন. সুবোধ, *বাংলা উপন্যাসে আদিবাসী সমাজ,* কলিকাতা, পুস্তক বিপনী, ২০১০, জানুয়ারি, পৃ. ৬১-৬৯

92. Rosenberg. David, *African mine labour in southern Rhodesia (1900-1933),* London, Pluto press, 1976, Pp. 106-120.

গবেষণার উদ্দেশ্য

বর্তমান গবেষণায় নিম্নলিখিত উদ্দেশ্যগুলি এখানে উল্লেখ করা জরুরি—

- ঔপনিবেশিক পর্যায় থেকে ঔপনিবেশিক পরবর্তী আধুনিক পর্যায়ে আদিবাসী কৃষকদের জমি থেকে অপসারণের কারন ও খনিজ শিল্পে শ্রমিক হিসাবে যোগদানের পর্যায়গুলি অনুসন্ধান করা।
- এই গবেষণায় ছোটনাগপুর মালভূমিতে 'আদিবাসী' শব্দটি বারংবার ব্যবহৃত হয়েছে কিন্তু আদিবাসী বলতে গিয়ে কোন কোন আদিবাসীদের যোগদান শিল্পাঞ্চলে অধিক ছিল তা অবগত হওয়া।
- আদিবাসী পুরুষদের পাশাপাশি আদিবাসী নারী শ্রমিক শ্রেণির উত্থান কীভাবে হয়েছিল তার বিস্তারিত তথ্য বিশ্লেষণ করার প্রয়াস।
- ঔপনিবেশিক পর্যায় থেকে স্বাধীনতা পরবর্তীকাল পর্যন্ত আন্দোলন ও ধর্মঘটে আদিবাসী শ্রেণির যোগদানের ধারাগুলি কি একই ছিল অর্থাৎ কোনো সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায় কিনা তা বিশ্লেষণ করা।
- ঔপনিবেশিক পুঁজির সাথে সাথে স্থানীয় বা জাতীয় অর্থনীতিতে প্রিন্স দ্বারকানাথ ছাড়া অন্যান্য পুঁজিপতি থেকে শিল্পপতিদের অবস্থান ও ভূমিকা কি ছিল তার অনুসন্ধান প্রয়োজনীয়।
- এছাড়াও বলা যায় ঔপনিবেশিক পর্যায় থেকে স্বাধীনতা পরবর্তীকাল পর্যন্ত একটি দীর্ঘ সময় ধরে আদিবাসীদের যোগদান খনি শিল্পে থাকার ফলে খনি অর্থনীতিতে শ্রমিকদের জন্য কি কি পরিবর্তন বা সুবিধা দেখা দিয়েছিল তা বিশেষ ভাবে অবলোকন করা।

ঔপনিবেশিক পর্যায় থেকে স্বাধীনতা পরবর্তী ১৯৬৫ সাল পর্যন্ত আদিবাসী গোষ্ঠীর কৃষক থেকে শ্রমিক শ্রেণিতে পরিণত হওয়ার পশ্চাতে বর্তমান গবেষণায় নিম্নলিখিত যুক্তিগুলি উপস্থাপনা করা হয়েছে।

ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ যুগে ছোটনাগপুর মালভূমি অঞ্চলে আদিবাসী জনগোষ্ঠী সংক্রান্ত আলোচনার প্রথম স্তরে তৎকালীন সামাজিক অবস্থা, গবেষণায় যেভাবে পরিস্ফুট হয়েছে তাতে আদিবাসী জনগোষ্ঠীকে প্রান্তিক করে রাখার বিষয়টি বিশেষভাবে উল্লেখিত হয়েছে। ঐতিহাসিক

চিত্রপটে আদিবাসী সম্পর্কিত যে প্রসঙ্গটি বারংবার উঠে এসেছে তা হল আদিবাসী জনগোষ্ঠীর ব্রাত্য থাকার কথা। এ প্রসঙ্গে যুক্তিগত ভাবে বলা যায় সামাজিক ভাবে প্রান্তিক হওয়ার সাথে অর্থনৈতিক দুর্বলতার সম্পর্ক ছিল। অর্থনৈতিক ভাবে পঙ্গু করার পরিস্থিতি তৈরি করা হয়েছিল। সমাজের একটি গোষ্ঠীকে অর্থনৈতিক ভাবে দুর্বল করে তাদের পরিচয় ও স্বাতন্ত্র্যতাকে নিশ্চিহ্ন করে ফেলা হয়েছিল। তার পাশাপাশি শিক্ষা, সংস্কৃতি, রাজনীতির প্রতিটি স্তরে অধিকার বোধ সম্পর্কে যথেষ্ট জ্ঞান না থাকার ফলে অতিরিক্ত শ্রম সাধ্য কাজে ব্যবহার করা সহজসাধ্য হবে বলে ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ শক্তির ধারণা তৈরি হয়েছিল। এই পরিস্থিতি তৈরি করতে ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ শক্তি, জমিদার গোষ্ঠীকে আদিবাসীদের কৃষকদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করেছিল।

কৃষি ক্ষেত্র থেকে আদিবাসীদের বিচ্যুতি ও কৃষক বিদ্রোহগুলি সংগঠিত হওয়ার পশ্চাতে ছিল ঔপনিবেশিক আধিপত্যবাদ। কৃষি থেকে শিল্পে এই আধিপত্যবাদের প্রভাব বৃদ্ধি করার জন্য পুঁজিবাদকে ব্যবহার করা হয়েছিল এবং তার ভিন্ন ভিন্ন যুক্তি উপস্থাপিত হয়েছিল। ঔপনিবেশিক শক্তি মুনফা লাভের জন্য কৃষি ক্ষেত্র থেকেই ক্ষমতার প্রয়োগ করেছিল কিন্তু কৃষি ক্ষেত্র থেকে খনি শিল্পে ক্ষমতার স্থায়িত্বকরণ বজায় রাখার কথা উল্লেখিত হয় স্থানীয় পুঁজিপতিদের উত্থানে। আদিবাসীদের সামাজিক পরিচয় বিলুপ্তি থেকে অর্থনৈতিক দুর্বলতার প্রসঙ্গটিতে 'ক্ষমতা' শব্দটির বিশেষ ভূমিকার পাশাপাশি পুঁজিবাদ প্রসারিত হয়েছিল। ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ শক্তির সহায়তায় ভারতীয় পুঁজিপতিদের চিন্তা ভাবনায় আধিপত্যবাদের মধ্যে পুঁজিবাদী বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়। এই ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখার জন্য ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ শক্তি ধীরে ধীরে স্থানীয় পুঁজিবাদী গোষ্ঠীর জন্ম দিয়েছিল। অর্থনৈতিক আধিপত্য প্রসারে দেশীয় পুঁজিপতিদের প্রলোভন ধীরে ধীরে স্পষ্ট হয়ে উঠার লক্ষণ দেখা যায়।

আদিবাসী জনগোষ্ঠীকে শ্রমিক শ্রেণিতে পরিণত করা বা অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল করার পশ্চাতে রাষ্ট্রের অর্থনীতি উন্নত হওয়ার একটি যুক্তি পাওয়া যায়। জাতির উন্নয়নের নামে মুনফা উৎপাদন করা ছিল তৎকালীন রাষ্ট্র ব্যবস্থার অন্যতম প্রয়াস। আদিবাসীদের দারিদ্র্যতা দূরীকরণে ঔপনিবেশিক পর্যায় থেকে ঔপনিবেশিক পরবর্তী যুগে রাষ্ট্র সেই প্রয়াস করেনি। রাষ্ট্রের প্রয়াস যদি সঠিক ভাবে পরিচালিত হত তাহলে আদিবাসীদের বাজার অর্থনীতিতে প্রবেশ করার পর

মজুরি হার বারংবার হ্রাস পেত না এমনকি তাদের সামাজিক জীবন সবচ্ছল ভাবে চলার উদাহরন লক্ষ করা যেত। এইরকম প্রত্যাশা করাই ছিল বৃথা কারণ আদিবাসী গোষ্ঠীকে ঔপনিবেশিক শক্তি প্রথম থেকেই শোষণে নিমজ্জিত করে রেখেছিল অন্যদিকে ঔপনিবেশিক শাসনের প্রভাব জাতীয় অর্থনীতি প্রভাবিত হলে উন্নয়নের নামে দেশের কোষাগারে অবৈধ ভাবে পুঁজি ও আদিবাসী শ্রমের ব্যবহার বৃদ্ধি পেয়েছিল। ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষে স্বাধীনতার পরবর্তীকালে শিল্প উন্নয়নের বিভাগে যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় করা হয়েছিল তাতে শিল্প শ্রমিকদের উন্নয়নের পর্যায় লক্ষ করা যায়নি। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় প্রান্তিক গোষ্ঠীদের উন্নয়নের কথা উল্লেখ করা হলেও সেইসব আদিবাসী শ্রমিকদের প্রতি সচেতনতা দেখানো হয়নি।

অতিরিক্ত মুনফা উৎপাদন প্রক্রিয়ার পাশাপাশি খনি অঞ্চল গঠন হওয়ার পর আদিবাসী জনগোষ্ঠী, হিন্দু জমিদার ও আদিবাসীদের মধ্যে তিন ধরনের সংঘাত তৈরি হওয়ার পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল। আদিবাসী জনগোষ্ঠীর বিশ্বাসকে খন্ডিত করা হয়েছিল খনি থেকে খাদান অঞ্চলে অর্থনৈতিক পরিবর্তন থেকে শ্রম ব্যবস্থার পরিবর্তনের ফলে শ্রম সংগঠন তৈরি প্রয়োজনীয় ছিল। এই সংগঠন তৈরি ও আদিবাসী সমস্যার সমাধানে ট্রেড ইউনিয়ানের উত্থানের ইতিহাস ছিল উল্লেখযোগ্য। ট্রেড ইউনিয়ানের গঠনের পর থেকেই আদিবাসী শ্রমিকদের চাহিদাকে প্রাধান্য দেওয়া শুরু হয়েছিল।

ঔপনিবেশিক পুঁজির নিয়ন্ত্রনে আদিবাসী কৃষকদের শ্রমিকে পরিণত হওয়ার এই বিষয়ে গবেষণা করতে গিয়ে দেখা যায় খনি বা খাদান ক্ষেত্রের মত উৎপাদন ক্ষেত্র শুধু আদিবাসী জনগোষ্ঠীর জীবনধারাকে পরিবর্তিত করেনি বরং খনি অঞ্চলে কর্মরত শ্রমিকদের অবস্থা মৃত্যুর সম্মুখীন হয়ে উঠেছিল। খাদান তৎসংলগ্ন অঞ্চলের প্রাকৃতিক পরিবেশকে ক্ষতিগ্রস্থ করেছিল এবং খাদান সংলগ্ন এলাকায় জমির উর্বরতা হ্রাস পেয়েছিল।

গবেষণাধর্মী প্রশ্নাবলী

- বর্তমান গবেষণায় ছোটনাগপুরের আদিবাসী জনগণের বেশ কয়েকটি সমস্যা চিহ্নিত করা হয়েছে। ঔপনিবেশিক আমলে ব্রিটিশ রাজের ভূমি বন্দোবস্ত ছোটনাগপুর মালভূমি অঞ্চলে ঔপনিবেশিক শাসন পর্যায়ের শুরুতে রাজস্ব ব্যবস্থা কীভাবে গ্রাম সমাজের বিদ্যমান আর্থ সামাজিক ব্যবস্থাকে পরিবর্তন করেছিল শহুরে যান্ত্রিক অর্থনীতিতে তা

প্রশ্নসুচক ছিল। বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার আদিবাসীদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতিকে প্রভাবিত করে অধিকার হারানোর পাশপাশি বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার ব্রিটিশ ভূমি ব্যবস্থার বিবর্তনের পশ্চাতে এবং আর্থ- সামাজিক পরিবেশগত প্রভাবের পশ্চাতে কী প্রেরণা ছিল সেদিকে নজর দেওয়া তাৎপর্যপূর্ণ।

- এই গবেষণায় দ্বিতীয় ভাগে তথ্য অন্বেষণ করে দেখা গিয়েছে যে, ১৮৬৫ সালে ব্রিটিশ সরকার তাদের নিজস্ব সুবিধার জন্য বন সংরক্ষণ নীতি প্রয়োগ করে ঔপনিবেশিক ছোটনাগপুর মালভূমির আদিবাসীদের সাথে বনভূমির সম্পর্ক ছিন্ন করে জীবন-জীবিকার অনুশীলনকে পরিবর্তন করেছিল। বনভূমি থেকে আদিবাসীদের অধিকার হরণ করে ও ভূমি থেকে আদিবাসীদের উচ্ছেদ করে জীবিকা নির্বাহের পদ্ধতিগুলো পরিবর্তিত হয়েছিল। অর্থনৈতিক জীবন পদ্ধতি ব্যতীত তাঁদের জীবনশৈলিতে কি কি পরিবর্তন হয়েছিল তা উল্লেখযোগ্য ছিল। এই পরিবর্তন ঔপনিবেশিক আমলে বাংলার ছোটনাগপুর মালভূমি অঞ্চলের আদিবাসীদের ক্ষেত্রে কি পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছিল এবং কতটা প্রভাব ফেলেছিল তা প্রশ্নের সম্মুখীন করে তুলেছিল।
- রেলপথ প্রসারিত হওয়ার পর থেকে আদিবাসীরা কৃষি জীবিকা থেকে বাস্তুচ্যুত হয়েছিল। বাস্তুচ্যুত হওয়ার পরিমাণ দ্রুত ঔপনিবেশিক পর্যায়ে বৃদ্ধি পেতে থাকলে স্বাভাবিকভাবে প্রশ্নের সম্মুখীন করে তোলে আদিবাসীদের বাস্তুচ্যুত হওয়ার অন্যতম কারণগুলি কি ছিল তা অন্বেষণ করা প্রয়োজন ছিল।
- ঔপনিবেশিক আমলে আদিবাসীদেরকে খনি সমৃদ্ধ অঞ্চলে শ্রমিক শ্রেণিতে পরিণত করার এই পুরো পদ্ধতিতে ঔপনিবেশিক পুঁজির পাশাপাশি আর কাদের নিয়ন্ত্রণ ছিল তা প্রশ্নের সম্মুখীন করে তোলে। একইসাথে দুই- তিন শতাব্দী ধরে চলা এই পরিবর্তনে আদিবাসী জাতির মেরুদন্ডটা ভেঙ্গে দেওয়ার পরিকল্পনাকে স্বার্থক করতে দেশের জাতীয়তাবাদী নেতাদের ভূমিকা কি ছিল তা অনুসন্ধান করা উল্লেখযোগ্য ছিল।
- এই গবেষণায় প্রকৃতভাবে আলোচনা করার সময় যে প্রশ্নগুলি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ছিল তা হল ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ পর্যায়ে আদিবাসী বিদ্রোহ থেকে ঔপনিবেশিক পরবর্তী পর্যায়ে আদিবাসী শ্রমিক ধর্মঘটের বৃদ্ধি উন্নয়নের প্রসঙ্গকে প্রাসঙ্গিক করে প্রশ্নের সম্মুখীন করে তোলে। স্বাধীনতা পূর্ব থেকে পরবর্তীকাল পর্যন্ত সামাজিক, আর্থিক,

রাজনৈতিক পরিস্থিতি পরিবর্তন হলেও আদিবাসী শ্রমিকদের উন্নয়ন সম্পর্কে ধারণা কতটা পরিবর্তিত হয়েছে বা তারা কতটা এই পরিবর্তনকে উপলব্দধি করেছিল তা নিয়ে বিস্তৃত প্রশ্নের সম্মুখীন হয়ে এই গবেষণা করা প্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছিল।

- এই গবেষণায় বিশেষভাবে প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছিল জাতি, লিঙ্গ, বর্ণ নির্বিশেষে আদিবাসী শ্রমিকদের অবস্থার পরিবর্তন কতটা হয়েছিল।

গবেষণা পদ্ধতি

এই গবেষণায় ঐতিহাসিক ও নৃতাত্ত্বিক পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। গুণগত ক্ষেত্র সমীক্ষা নির্ভর গবেষণাকে সমাজের সম্মিলিত সাধারণ ধারনার প্রেক্ষাপটে বিশ্লেষণ করা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। উক্ত প্রথা অনুসরণ করে আমি আমার ক্ষেত্র সমীক্ষাকে অনুষঙ্গ করে আমার গবেষণা আলোচনা করেছি। এই গবেষণা কাজটি মূলত প্রাথমিক ও গৌন ঐতিহাসিক সুত্রের ভিত্তিতে সম্পূর্ণ করা হয়েছে। বিভিন্ন মহাফেজখানায় সরকারী রিপোর্ট, ইম্পেরিয়াল গেজেট, পত্র এবং পত্রিকার মত প্রাথমিক তথ্য সুত্র থেকে সংগৃহীত তথ্য ও তৎকালীন সমসাময়িক ভ্রমন কাহিনি একটি বৃহৎ অংশের উপর এই গবেষণা করার পর প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধ্যায় আলোচনা বা ব্যাখা করা হয়েছে। চতুর্থ অধ্যায়ে প্রাথমিক তথ্য সূত্রের পাশাপাশি ক্ষেত্র সমীক্ষা থেকে প্রাপ্ত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে। শেষ অর্থাৎ পঞ্চম অধ্যায় বিভিন্ন গেজেট, বামপন্থী ও কমিউনিস্ট সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্র, পত্রিকার মত প্রাথমিক এবং গৌণ উভয় ঐতিহাসিক পর্যাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে গবেষণাটিকে বিশ্লেষণ করে সমৃদ্ধ করা হয়েছে।

এই পর্যায়ে বীরভূম ও ঝাড়খণ্ড জেলার অন্তর্গত গ্রন্থাগার থেকে সাঁওতাল আদিবাসী শ্রমিক সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্য অবগত হওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। ক্ষেত্র সমীক্ষার দ্বিতীয় পর্যায়ে আদিবাসী শ্রমিকরা বর্তমান সমাজে তারা কীভাবে জীবন ধারন করে চলেছে এবং তাদের পূর্বপুরুষরা এই পেশার সাথে যুক্ত থেকে কি কি সমস্যায় সম্মুখীন হয়েছে এ সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্য জানতে বীরভূমের কয়েকটি পাথর খাদানে আদিবাসী শ্রমিকদের সাথে সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছে। বলে রাখা দরকার যে, এই পর্যায়ের মধ্য দিয়ে আদিবাসী সাঁওতাল জনগোষ্ঠীর খাদানের মত জীবিকার উপর নির্ভরশীলতার উপলব্দধি করা যায়। এছাড়াও এই খাদান ক্ষেত্রে আদিবাসী মহিলা শ্রমিকদের চাহিদা ও প্রয়োজনীয়তার বক্তব্য উঠে এসেছে যা বর্তমান

গবেষণায় তুলনামূলক ভাবে বিশ্লেষণ করতে সুবিধা হয়েছিল। ক্ষেত্র সমীক্ষায় মূলত ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারকে কিছুটা প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। ক্ষেত্র সমীক্ষার মাধ্যমে আদিবাসী শ্রমিকদের সাথে সাক্ষাৎকারে মালিক ও শ্রমিকের সম্পর্কের বহিঃপ্রকাশ উপলব্দধি করার চেষ্টা করা হয়েছে। বিভিন্ন রিপোর্ট ও সাক্ষাৎকার সংগ্রহের জন্য ঝাড়খণ্ড ও বীরভুমের গ্রন্থাগারের অধিকর্তাদের সাহায্য ও জেলার বিভিন্ন আদিবাসী উন্নয়ন বিভাগের রিপোর্ট পেয়ে গবেষণাকে তথ্য সমৃদ্ধ করে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে। সবশেষে একটা কথা না বললেই না যে আমার গবেষণার মূল থিসিস লিখনে বিভিন্ন প্রথিতযশা লেখকদের লিখিত গ্রন্থ, প্রবন্ধ, গ্রন্থের রিভিউ সংক্রান্ত আলোচনা বিশেষভাবে সাহায্য করেছে।

অধ্যায় বিভাজন

ভূমিকার অংশ এই বিষয়ের সমগ্র থিম গণনা করে, এটি গবেষণার কাজের ইতিহাস রচনা নিয়ে আলোচনা করে। অধ্যায়গুলি আদিবাসী কৃষক থেকে শ্রমিক শ্রেণিতে পরিণত হওয়ার কথা নির্দিষ্ট অঞ্চল জুড়ে দৃষ্টি নিবন্ধ করা হয়েছে। এই অধ্যায়গুলির মধ্য দিয়ে আলোচনা করা যায় যে, কীভাবে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ছোটনাগপুর মালভূমি অঞ্চলের আদিবাসী শ্রেনীর আর্থ-সামাজিক ইতিহাসকে অবদমিত করে রেখেছিল। খনি সংলগ্ন এলাকাগুলির শ্রমিকদের অর্থনৈতিক উন্নয়ন দেখলে প্রতিভাত হবে যে, প্রতি নিয়ত যে অর্থনৈতিক উন্নয়ন নিয়ে বিতর্ক শুরু হয়েছে, সেই পর্যায় থেকে তারা অনেক পিছিয়ে রয়েছে। সেক্ষেত্রে খনি সংলগ্ন এলাকায় একটি শ্রমিকের ও মালিকের অবস্থানের মধ্যে বিস্তর ফারাক লক্ষ করা গেছে। এই পার্থক্যের মাত্রা দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছিল, তার সমাধান প্রয়োজন ছিল স্থায়ীকরন উন্নয়নের। সেই উন্নয়নের পর্যালোচনায় এই দৃষ্টিভঙ্গির বিশেষ আলোচনা উপস্থাপন করা হয়েছে। মূলত এই গবেষণায় অর্থনৈতিক উন্নয়নকে বিশ্লেষণ করে প্রতিটি অধ্যায়কে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এই গবেষণায় মূলত পাঁচটি অধ্যায় রয়েছে ভূমিকা ও উপসংহার ব্যতীত।

প্রথম অধ্যায়: জীবন ও জীবিকায় ছোটনাগপুর মালভূমির আদিবাসী সমাজ (১৭৯৩-১৮৮০)।

দ্বিতীয় অধ্যায়: অর্থনৈতিক জাতীয়তাবাদের উদ্ভব ও আদিবাসী শ্রম অর্থনীতিতে প্রভাব (১৮৮০-১৯৩০)।

তৃতীয় অধ্যায়: বিবর্তিত আদিবাসী কৃষক সমাজ ও আদিবাসী মহিলা শ্রেণির শ্রমের বাজার (১৯০০-১৯৪০)।

চতুর্থ অধ্যায়: বীরভূমের আদিবাসী শ্রমিক ও পাথর খাদান ক্ষেত্র (১৯৪০-১৯৬৫)।

পঞ্চম অধ্যায়: উন্নয়নের প্রেক্ষিতে আদিবাসী ও আদিবাসী শ্রমিক প্রতর্ক (১৯৪৭-১৯৬৫)।

প্রথম অধ্যায়

আলোচনার প্রথম ভাগে, ঔপনিবেশিক যুগে আদিবাসী কৃষকরা তাদের অবস্থান থেকে কীভাবে বিবর্তিত হয়ে শ্রমিক ও শিল্পাঞ্চলের মজুরে পরিণত হল তার ব্যাখ্যা করা হয়েছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর ভারতীয় অর্থনৈতিক ইতিহাসে কৃষিকাজ আদিবাসীদের জীবনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। কৃষিই ছিল একমাত্র জীবিকার অবলম্বন ও রাজস্ব সংগ্রহ করার উপায়। কৃষির কাজে হিন্দু, মুসলিম, আদিবাসী কৃষকরা যুক্ত থাকলেও আদিবাসীদের জমিতে চাষ করা ভিন্ন অন্য জীবিকা সংস্থানের উপায় ছিল না। আদিবাসী কৃষকরা যুক্ত থাকলেও রাজস্ব সংগ্রহের জন্য অষ্টাদশ শতকের ঔপনিবেশিক পর্যায়ে ব্রিটিশ সরকার নির্ধারিত ভূমি বন্দোবস্ত আইনের প্রভাব আদিবাসী কৃষকদের জমি ও জীবিকা থেকে ধীরে ধীরে উচ্ছেদ করেছিল। জমি থেকে উচ্ছেদ হওয়ার পর আদিবাসী কৃষকেরা ভূমিহীন কৃষকে রূপান্তরিত হতে থাকে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ও উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে যন্ত্র শিল্প ও খনি এলাকা গড়ে উঠতে থাকলে কৃষি থেকে উচ্ছেদিত ভূমিহীন কৃষকেরা শ্রমিক হিসাবে যোগ দিতে থাকলে জীবন ও জীবিকায় আমূল পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। এই অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে পূর্ব ভারতে চিরস্থায়ী নামক ভূমি বন্দোবস্তের ফলাফল যা আদিবাসীদের জীবন ও জীবিকাকে প্রভাবিত করেছিল বা বলা যেতে পারে পরিবর্তিত করেছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীতে কৃষক সংগ্রামে বিভিন্ন জাতির কৃষকের গণসংগ্রাম থাকলেও শ্রমিক আন্দোলনে বরাবর আদিবাসী শ্রেণির আত্মপ্রকাশের কথা এই অধ্যায়ে বিশ্লেষিত হয়েছে। তারা জমি ও জীবিকা থেকে উচ্ছেদিত হয়ে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের পথে অগ্রসর হয়েছিল। এই অধ্যায়ে মূলত আদিবাসী কৃষকদের জমি থেকে উচ্ছেদ করে শ্রমিক শ্রেণিতে রূপান্তরিত হওয়ার কথা আলোচনা করা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

আদিবাসী জনজাতির কৃষক থেকে শ্রমিক শ্রেণিতে হওয়ার প্রক্রিয়ায় মধ্যে ব্রিটিশ শক্তির হস্তক্ষেপের পাশাপাশি জাতীয় অর্থনীতির ভূমিকা ছিল বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। জাতীয় অর্থনীতির সাথে আদিবাসীদের ভাগ্য যেমন জর্জরিত ছিল ঠিক তেমনি দেশীয় অর্থনীতিকে কেন্দ্র করে খনি অর্থনীতিতে দেশীয় পুঁজিবাদী গোষ্ঠীর উদ্ভব হয়েছিল। বাঙালি থেকে বিহারি, উড়িয়া ও মারোয়ারি বানিজ্যগোষ্ঠীর আবির্ভাব হয়েছিল। দেশীয় পুঁজিপতি শক্তির উদ্ভবের পশ্চাতে ব্রিটিশ শক্তির প্ররোচনার মধ্য দিয়ে খনি অর্থনীতিকে মজবুত করে আদিবাসী শ্রমকে ব্যবহার করা হয়েছিল। একইভাবে খনি ও খাদানে দেশীয় পুঁজিপতি ও ব্যবসায়ী গোষ্ঠী আদিবাসী শ্রমিকদের উপর শোষণ করত। পাশ্চাত্য ধাচে দেশীয় জনগণকে উদ্বুদ্ধ করে উদ্বৃত্ত শ্রম ব্যবহার ও আদিবাসীদের শ্রমিকদের সাথে দেশীয় শ্রমিকদের মধ্যে দূরত্ব তৈরি করেছিল। একই স্থানে কাজ করে আদিবাসী ও অ- আদিবাসী গোষ্ঠীদের মধ্যে গোষ্ঠী বিভাজনের দূরত্ব বৃদ্ধি পেতে থাকে। তার প্রভাব আদিবাসী শ্রমিকদের উপর কি কি পড়েছিল তা এই অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচিত হয়েছে। এই অধ্যায় আলোচনার মূল লক্ষ্য হল একদিকে যেমন আদিবাসী শ্রমিকদের জন্ম খনি শিল্প গঠনের মাধ্যমে হয়েছিল ঠিক তেমনই খনি শিল্পাঞ্চলের মধ্য দিয়েই অর্থনৈতিক দুর্বলতা ছড়িয়ে পড়েছিল। ঠিক একইভাবেই বিদেশী পুঁজি ও দেশীয় পুঁজির বিনিয়োগের পরিমাণ খনির মত অর্থনৈতিক ক্ষেত্রগুলিতে বিনিয়োগ বৃদ্ধি করে জাতীয় অর্থনীতির ধারাকে পরিবর্তিত করেছিল। এই পরিবর্তনের ধারার উন্নয়ন মূলক প্রকল্পে কখনোই যে আদিবাসী শ্রমিক শ্রেণি মূল সমাজের অভ্যন্তরে অধিষ্ঠিত হতে পারেনি তার বিস্তারিত বিবরণ এই অধ্যায়ে করা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে ছোটনাগপুর মালভূমি অঞ্চলে ভারী শিল্প গড়ে উঠলে জমির সাথে যুক্ত আদিবাসী মহিলা কৃষকরাই মজুরির বিনিময়ে কারখানায় শ্রম বিক্রীত করে শ্রমিক শ্রেণিরূপে আবির্ভূত হতে থাকে। খনির কাজে জড়িয়ে ছিল হাজার হাজার আদিবাসী পুরুষদের পাশপাশি মহিলা শ্রমিকদের জীবন। তারা পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, ঝাড়খন্ড, উড়িষ্যা থেকে কাজের সন্ধানে খনি ও খাদানে অংশগ্রহন করতে থাকে। এই অর্থনৈতিক পরিবেশে তাঁদের সামাজিক

ও অর্থনৈতিক অবস্থান কেমন ছিল এবং তারা এই কাজে কেন অংশগ্রহণ করেছিল তা আলোচনা করা হয়েছে। খনির কাজে যুক্ত মহিলাদের মধ্যে আদিবাসী প্রজাতির মহিলাদের ইতিহাস যে ভিন্নতর হয়ে আবদ্ধ হয়ে আছে তাঁর বিক্ষিপ্ত ইতিহাস আলোচনা করা হয়েছে এই অধ্যায়ে। ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষের ছোটনাগপুর মালভূমি অঞ্চলে সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তনে এবং বিবর্তনীয় দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমে “সামাজিক শ্রমের” অস্তিত্বের প্রক্রিয়াটি স্পস্টতই সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। খনিগুলিতে আদিবাসী পুরুষদের পাশাপাশি মহিলাদের ভিড় ক্রমশ বৃদ্ধি পাওয়ার সাথে সাথে শ্রম বিভাজনে তারতম্য দেখা যায়। আদিবাসী মহিলারা ভারী কাজের জন্য প্রসিদ্ধ হতে থাকে। সামাজিক দিক থেকে অর্থনৈতিক স্তরে আদিবাসী মহিলাদের ‘নিম্নবর্গীয়’ নারী, ‘দলিত’ নারী এই শব্দগুলি অঙ্গাঙ্গিকভাবে ভাবে জড়িয়ে ছিল। তাছাড়াও লিঙ্গ বিচারে আদিবাসী মহিলাদের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে সমাজের অভ্যন্তরে কোন দৃষ্টিভঙ্গি ছড়িয়ে রয়েছে তা নিয়েও গবেষণায় আলোচনা করা হয়েছে। ছোটনাগপুর মালভূমি সংক্রান্ত পশ্চিমবঙ্গ, ঝাড়খণ্ড, উড়িষ্যা রাজ্যের খনি ও খাদানে মহিলা শ্রমিকের মূল্যহীন শ্রমের ইতিহাসে আদিবাসী মহিলা শ্রমিক শ্রেণি বাজারের উত্থান আলোচিত হয়েছে এই অধ্যায়ে।

চতুর্থ অধ্যায়

একটি দেশের উন্নয়নের গতিপ্রকৃতি বা বেকারত্বের হারের ওপরও শ্রম নীতি নির্ধারণের বিষয়টা অনেকটা নির্ভর করে তার একটি প্রমাণ এই অধ্যায় বিশ্লেষণের মধ্যে আলোচিত হয়েছে। স্বাধীনতার পূর্বে আদিবাসী শ্রমিকদের সংগ্রামের কথা বারংবার আলোচিত হলেও তাদের বেশিরভাগ ছিল কয়লা খাদান বা খনির সাথে যুক্ত আদিবাসী শ্রমিক। স্বাধীনতার পূর্বে শুরু হলেও পরবর্তী কালে পশ্চিমবঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যার একাধিক স্থানে পাথরের খাদান বা ক্রাসারে উৎপাদন শুরু হয়। পাথর উৎপাদনে এই সমস্ত এলাকা ছিল বিশেষ ভাবে গুরুত্বপূর্ণ। বীরভূমের পাথর সারা দেশে রপ্তানি হত এবং রপ্তানির পরিমাণ বৃদ্ধি পেতে থাকলে সেই সমস্ত পাথর খাদান এলাকায় শ্রমিকের চাহিদা বৃদ্ধি পেতে থাকে। সেই কাজের যোগান দিতে সেখানকার আদিবাসী শ্রমিকদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পেয়েছিল। আসলে অতিরিক্ত পরিমানে ভারী শ্রমের যোগান মেটাতে খাদান ও ক্রাসারের মালিকরা স্থানীয় আদিবাসী শ্রমিকদের শ্রমকে ব্যবহার করেছিল। শিল্পায়নের একেবারে প্রাথমিক পর্বে দাড়িয়ে থাকা একটি দেশে বিশেষত,

যেখানে আদিবাসী জনসংখ্যার একটা বড় অংশই খনি ও খাদানের কর্মসংস্থানে যোগ দিলেও তা লাভজনক ছিল না। স্বাধীনতা পরবর্তীকালে দ্রুততার সাথে পাথর খাদান ও ক্রাসারের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে শ্রমিকদের চাহিদা বৃদ্ধি পেতে শুরু করেছিল। আদিবাসী শ্রমিকদের মধ্যে নারী ও পুরুষ উভয়েই কাজ করত। আদিবাসী শ্রমিকদের পরিমাণ ধীরে ধীরে এই ক্ষেত্রে বৃদ্ধি পেলে শ্রমিক শোষণ শুরু হয়েছিল। এই খাদানগুলির উৎপত্তি থেকে গঠন হওয়া এবং শ্রমিকদের অবস্থান ক্রমশ ভয়াবহ পরিস্থিতি তৈরি করেছিল। পাথর খাদান ও ক্রাশারে অতিরিক্ত শ্রম প্রদানের পাশাপাশি জীবন মৃত্যুর সম্মুখীন হয়ে পড়েছিল। এই অধ্যায়ে মূলত ছোটনাগপুর অঞ্চলের বীরভূম ও ঝাড়খণ্ডের বিস্তর পাথর খাদানের সাথে আদিবাসী শ্রমিকদের শ্রমের ইতিহাস নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। মূলত বলা যায় যে, ছোটনাগপুর মালভূমি এলাকার বীরভূম জেলার পাথর খাদান ক্ষেত্র নিয়ে একটি বিশেষ ক্ষেত্র গবেষণা করা হয়েছে এই অধ্যায়ে। আদিবাসী শ্রমিক শোষণের পাশপাশি পাথর খাদানের প্রভাব তৎসংলগ্ন পরিবেশে ক্ষতির পরিমাণ বৃদ্ধি করে চলেছিল তা তথ্য সমৃদ্ধ ভাবে বিস্তারিত আলোচনা এই অধ্যায়ে করা হয়েছে। একই সাথে উন্নয়নের সাথে ব্যক্তির নিজস্ব স্বাধীনতা সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক সুযোগ সুবিধার অস্তিত্বের দ্বারা নিয়োজিত এবং তাদের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিল। যে পরিমন্ডল দ্বারা পরিবেশ তৈরি হয়েছিল সেই পরিমন্ডল খনি ও খাদান বৃদ্ধির প্রভাবে দূষিত হয়ে উঠেছিল। স্থানীয় পুঁজিপতিদের অতিরিক্ত প্রভাবে প্রাকৃতিক পরিবেশের ক্ষতি, জলবায়ু পরিবর্তন, সম্পদের ক্ষয় ও অবনয়ন আর উন্নয়নে অসাম্যের মত সমস্যার প্রকোপ বৃদ্ধি পেয়েছিল। অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রক্রিয়া ও আদিবাসী শ্রমিকদের অবৈধ শ্রমের ব্যবহারে বীরভূমের পাথর খাদান ছিল গুরুত্বপূর্ণ।

পঞ্চম অধ্যায়

এই অধ্যায়ে স্বাধীনতা পরবর্তীকাল থেকে ১৯৬৫ সাল পর্যন্ত ইতিহাসের বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। স্বাধীনতা পরবর্তীকালে 'উন্নয়নের' কথা বারংবার উচ্চারিত হলেও উন্নয়নের নাম করে সাধারণ আদিবাসীদের শ্রমকে অবৈধ ভাবে ব্যবহার করে অনায়াসে দ্রব্য উৎপাদিত হয়ে চলেছিল। এই গবেষণায় অর্থনৈতিক উন্নয়নে আঞ্চলিক খনি এলাকার সমস্যা তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে পাশপাশি অর্থনৈতিক উন্নয়েনের নামে সমাজকে অবক্ষয়ের দিকে ঠেলে দেওয়া

হচ্ছে কিনা খতিয়ে দেখা এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নে আদিবাসী উপজাতির কি ভূমিকা ছিল তা বিস্তারিত ভাবে খতিয়ে দেখার চেষ্টা করা হয়েছে। স্বাধীনতা পরবর্তী সময় থেকে ১৯৬৫ সাল পর্যন্ত ভারতীয় অর্থনীতিতে সংস্কার সাধনের অনেক কথা বলা হয়েছিল। এই অর্থনৈতিক পরিকল্পনায় নাগরিকদের জীবনযাত্রার মান উন্নত করার কথা বলা হয়েছিল। অর্থনৈতিক পরিকল্পনাতে শিল্পের মত ক্ষেত্রে বিনিয়োগ ও উন্নয়নের কথা বলা হয়েছিল। সেক্ষেত্রে প্রথম তিনটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় যে পরিবর্তনগুলি হয়েছিল খনি শিল্প শ্রমিকদের ক্ষেত্রে তা এই অভিসন্দর্ভে দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে। ১৯৬৫ সাল থেকেই উচ্চ মুদ্রাস্ফীতি ভারতের অর্থনৈতিক অবস্থাকে জটিল পরিস্থিতির মধ্যে এনে ফেলেছিল। অর্থনৈতিক উন্নয়নে পরিবর্তন দেখা দিয়েছিল। স্বাধীনতা পূর্ব ঔপনিবেশিক পর্বে আদিবাসী সমাজে কৃষক থেকে শ্রমিক জীবনে রুপান্তর তাদের কঠোর সংগ্রামের দিকে ঠেলে দিয়েছিল। সেই সংগ্রামে কতটা পরিবর্তন হয়েছিল তা দেখার জন্য ১৯৬৫ সাল পর্যন্ত অর্থনৈতিক সংস্কারের সময়কালকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল। স্বাধীনতা পূর্ববর্তী দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতিতে আদিবাসী শ্রমিকদের যে অবস্থান তৈরি হয়েছিল তাতে কোনো উন্নয়ন লক্ষ করা যায়নি। জীবিকা নির্বাহের পথে ছিল জাত-পাত, বর্ণ, লিঙ্গ ও অর্থনৈতিক বৈষম্যের মত নানান বাঁধা। অর্থনৈতিক বৈষম্যকে কেন্দ্র করে আদিবাসী শ্রমিকদের অর্থনৈতিক জীবন বিপর্যস্ত হয়েছিল। উপরিক্ত অধ্যায়গুলি বিশ্লেষণের মাধ্যমে স্বাধীনতা পরবর্তী পর্যায়ে আদিবাসী শ্রমিক ইতিহাস ও ট্রেড ইউনিয়ানের ভূমিকা এই অধ্যায় আলোচিত হয়েছে। ঐতিহাসিক তথ্যের ভিত্তিতে ভিন্ন ভিন্ন মতামতের প্রেক্ষিত গুলি আলোচিত হয়েছে এই অধ্যায়ের প্রথম ভাগে। এই অধ্যায়ের দ্বিতীয় ভাগে উল্লেখ করা হয়েছে যে, স্বাধীনতা পরবর্তীকাল থেকে ১৯৬৫ সাল পর্যন্ত উন্নয়নের যে স্টার্ট আপ শুরু হয়েছিল তাতে আদিবাসী শ্রমিকদের উন্নয়ন নিয়ে ঐতিহাসিক থেকে রাজনৈতিক ব্যক্তিদের কি প্রতিক্রিয়া ছিল তা এই অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা আলোচিত হয়েছে। স্বাধীনতা পরবর্তীকাল থেকে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মধ্যে খনি শ্রমিকদের জীবনে বিভিন্ন পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। স্বাধীনতা পরবর্তীকালে খনিতে বিভিন্ন পরিবর্তন অর্থাৎ শ্রমিকদের জন্য নিয়ম নীতিতে পরিবর্তন সংযোজিত হয়েছিল। সেই পরিবর্তন আদিবাসী শ্রমিকদের জীবনকে কতটা পরিবর্তিত করেছিল তা উন্নয়নের প্রেক্ষিতে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করা হয়েছে এই অধ্যায়ে। ছোটনাগপুরের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অসমতার অবস্থানে যে

সমস্ত আন্দোলন হয়েছে তার কিছুটা অংশ ছোটনাগপুরের আদিবাসী শ্রমিকদের উন্নয়ন নিয়ে কি কি পরিবর্তন লক্ষ করা গেছে তা এই অধ্যায়ের তৃতীয় ভাগে আলোচনা করা হয়েছে।

বিভিন্ন ঐতিহাসিক তথ্য সূত্রের ভিত্তিতে অবগত হওয়া যায় যে, ছোটনাগপুর মালভূমির অর্থনৈতিক উন্নয়নের ইতিহাসে আদিবাসী জনগোষ্ঠীর ইতিহাস ছিল বিশেষভাবে আকৃষ্টপূর্ণ। ছোটনাগপুর মালভূমির খনি অঞ্চলকে কেন্দ্র করে সারা ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক চিত্র পরিবর্তিত হয়েছিল অথচ আদিবাসী শ্রমিক শ্রেণির ইতিহাস ঐতিহাসিক শ্রম সংগ্রামের ইতিহাস গুরুত্বহীন হয়ে পড়েছিল। তাদের সংগ্রামের ইতিহাসকে প্রান্তীয় করে রাখা হয়েছিল পুঁজিপতিদের স্বার্থে। জাতি, বর্ণ, লিঙ্গ নির্বিশেষে আদিবাসী জনগোষ্ঠীকে নিপীড়িত করে রাখা হয়েছিল কারণ তাদের শ্রমকে অবৈধ ভাবে ব্যবহার করার সুযোগ দ্বিতীয় কোথাও উপলব্দধ ছিল না। আদিবাসী গোষ্ঠীর কৃষক থেকে শ্রমিক শ্রেণিতে পরিণত হওয়ার মধ্যে আদিবাসী মহিলা শ্রমিকদের শ্রম বাজার গঠনের পশ্চাতে কয়েকটি স্তর ছিল। সেই প্রতিটি স্তরে রাষ্ট্র থেকে স্থানীয় সরকার ও স্থানীয় পুঁজিপতিদের আগ্রাসন পরিস্ফুট হয়ে উঠেছিল। তাদের জীবনে সামাজিক থেকে অর্থনৈতিক নিপীড়নের ইতিহাস অকস্মাৎ দেখা দেয়নি বরং বলা যায় এই শোষণের ইতিহাস তৈরি হয়েছিল ঔপনিবেশিক সরকারের সাথে স্থানীয় পুঁজিপতিদের সহমত ও ক্ষমতা প্রদর্শনের মধ্য দিয়ে। তারা যেভাবে অবহেলিত এবং শোষিত হয়ে চলেছিল সেই ইতিহাসের একটি সামগ্রিক চিত্র ধরাই ছিল এই গবেষণার উদ্দেশ্য। ক্ষমতা, শোষণ এই শব্দগুলি ঔপনিবেশিকদের সাথে পরিচিত হলেও আধিপত্যবাদের মধ্য দিয়ে এই শব্দগুলির ব্যবহার দীর্ঘস্থায়ী হতে শুরু করেছিল যা নির্মূল করা সত্যিই কঠিন ছিল। এছাড়াও তারা যেভাবে সামাজিক শোষণের শিকার হয়ে উঠেছিল তার একটি চিত্র পরিস্ফুট করা এই গবেষণার অন্যতম উদ্দেশ্য।

উপরিক্ত ঘটনার বিবরণের পরও অর্থনৈতিক মুনফা জনিত কাজে সমাজের উচ্চবর্ণের প্রাধান্য এবং খনির মত শ্রমসাধ্য কাজে বর্তমানেও আদিবাসীদের আগমন অধিক পরিমানে লক্ষ করা যায়। উন্নয়নশীল দেশে আদিবাসী জনজাতির কৃষক ও শ্রমিকদের সংগ্রামের ইতিহাসকে ব্রাত্য করে রেখে উন্নয়নের ইতিহাস লেখা সম্ভব নয় তা না হলে শোষণের জন্য শুধুমাত্র এই জাতিগোষ্ঠীগুলি পিছিয়ে যাবে অথবা ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হয়ে যাবে। ইতিহাস প্রবাহমান।

ঔপনিবেশিক পুঁজির হাত ধরে যে বৈষম্যের সূচনা হয়েছিল তার শেষ কিভাবে হবে তা নিপীড়িত জনগণের ভবিষ্যৎ সংগ্রাম নির্ধারণ করবে।

প্রথম অধ্যায়

জীবন ও জীবিকায় ছোটনাগপুর মালভূমির আদিবাসী কৃষক সমাজ (১৭৯৩-১৮৮০)

অষ্টাদশ শতাব্দীর ভারতীয় অর্থনৈতিক ইতিহাসে কৃষিকাজ জনসাধারণের জীবনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। কৃষিই ছিল একমাত্র জীবিকার অবলম্বন ও রাজস্ব সংগ্রহ করার উপায়। একইভাবে ভারতের ছোটনাগপুর মালভূমি অঞ্চলে কৃষির কাজে যুক্ত ছিল হিন্দু, মুসলিম, আদিবাসী জনগণরা। ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের জনগণ কৃষিতে যুক্ত থাকলেও আদিবাসীদের জমিতে চাষ করা ভিন্ন অন্য জীবিকা সংস্থানের উপায় ছিল না। অষ্টাদশ শতকের ঔপনিবেশিক শাসনকালে কৃষি থেকে রাজস্ব সংগ্রহের জন্য ব্রিটিশ সরকার নির্ধারিত ভূমি বন্দোবস্ত আইনের প্রভাব ছোটনাগপুর মালভূমি অঞ্চলে আদিবাসীদের জমির মত জীবিকা থেকে ধীরে ধীরে উচ্ছেদ করেছিল। জমি থেকে উচ্ছেদ হওয়ার পর আদিবাসী কৃষকেরা ভূমিহীন কৃষকে রূপান্তরিত হতে থাকে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ থেকে কৃষি থেকে উচ্ছেদিত ভূমিহীন কৃষকেরা জীবিকার তাড়নায় ও একের পর এক কৃষক আন্দোলন সংগঠিত করতে থাকে বেকারত্বের তাড়নায়। ঠিক এই সন্ধিক্ষণে কৃষি ভিন্ন অন্যান্য জীবিকার সন্ধানে আদিবাসী কৃষকরা ছোটনাগপুর মালভূমি অঞ্চলে যন্ত্র শিল্প ও খনি এলাকায় যোগ দিতে শুরু করেছিল তাদের জীবন পরিবর্তিত হবে এই ভেবে। পূর্ব ভারতের গ্রামীণ অর্থনীতির বৈশিষ্ট্যে আদিবাসী কৃষকেদের জীবন ও জীবিকায় এই পরিবর্তনের ধারা বা প্রক্রিয়াটি দীর্ঘদিন ধরে প্রবাহিত হয়েছিল। এই পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে সুবিধাভোগী শ্রেণির পাশাপাশি আদিবাসী শ্রমিক শ্রেণির জন্ম কীভাবে হয়েছিল তা এই অধ্যায়ে বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করা হয়েছে। এই অধ্যায়ে আদিবাসী কৃষক থেকে শ্রমিক শ্রেণিতে পরিণত হওয়ার সেই প্রক্রিয়াকরণ মূলত আলোচনা করা হয়েছে তিনটি ভাগে। প্রথমত এই অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে ছোটনাগপুর মালভূমি অঞ্চলে চিরস্থায়ী নামক ভূমি বন্দোবস্তের ফলাফল। দ্বিতীয়ত অত্যাধিক হারে রাজস্ব সংগ্রহ ও কৃষির মত জীবিকা থেকে উচ্ছেদ ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের পথে আদিবাসীদের অগ্রসর হওয়ার কারন এবং তৃতীয়ত বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ, আদিবাসী কৃষকদের জমি থেকে উচ্ছেদ করে শ্রমিক শ্রেণিতে রূপান্তরিত হওয়ার প্রক্রিয়াকরণ।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রভাব এবং ছোটনাগপুরের আদিবাসী কৃষক সমাজ

ছোটনাগপুর মালভূমি হল দাক্ষিণাত্য মালভূমি থেকে বিচ্ছিন্ন একটি মালভূমি যা পূর্ব ভারতের ৪ টি রাজ্য জুড়ে অবস্থিত। এই মালভূমি অঞ্চলের অংশ বিহার, পশ্চিমবঙ্গের অধিকাংশ স্থান অন্তর্ভুক্ত হলেও উড়িষ্যা ও ছত্রিশগড়ের কিছু অংশ যুক্ত রয়েছে। বাংলা, বিহারের অধিকাংশ ক্ষেত্র ছোটনাগপুর মালভূমির অন্তর্ভুক্ত হলেও উড়িষ্যা রাজ্যের কিছু অংশ ও ছত্রিশগড়ের

সারগুজা জেলা শুধুমাত্রও ছোটনাগপুর মালভূমির উপরাজ্য হিসাবে অন্তর্ভুক্ত ছিল।[1] এই জেলাটি উড়িষ্যা ও বিহার রাজ্যের প্রান্তভাগে অবস্থিত। ছোটনাগপুর মালভূমি জুড়ে আদিবাসীদের বসবাস ছিল অধিক। আদিবাসী অর্থে শুধুই সাঁওতাল জনজাতির প্রতি একরাশ ধারণা সমষ্টিবদ্ধ করা সঠিক ছিল না। 'আদিবাসী' শব্দটি উপজাতিদের মধ্যে বৃহৎ অর্থে ব্যবহার করা হয়। সমস্ত উপজাতি গোষ্ঠী 'আদিবাসী'[2] সম্প্রদায়ের মধ্যেই অন্তর্গত। ছোটনাগপুর মালভূমির বিহার ও বাংলা জুড়ে সাঁওতাল, কোরাস, কোল, ওঁরাও, মুণ্ডা, থারু, হো, তেলি, কুরমি, কোরয়ারা নামক আদিবাসীদের বাসস্থান ছিল।[3] তৎকালীন সময়ে উড়িষ্যা রাজ্যে ৩৪২ এর সংবিধানের আওতায় ৪২ টি উপজাতি গোষ্ঠী থাকলেও তার মধ্যে ছোটনাগপুর সীমানার মধ্যে অন্তর্গত ছিল তারা হল ১. বৈগা ২. ভুঁইয়া ৩. বিরহর ৪. বন্দ প্রজা ৫. ঘড়া ৬. গোন্দ ৭. হো ৮. কাওয়ার ৯. খরিয়া ১০. খোন্দ ১১. কোলহা ১২. কুলিস ১৩. মুণ্ডা ১৪. ওঁরাও ১৫. সাঁওতাল ১৬. থারু ১৭. সাহারা সম্প্রদায়ের জনগণ।[4] ছত্রিশগড় রাজ্যে পান্ড ও কোরয়া[5] আদিবাসীদের বসতি ছিল অধিক তাছাড়াও ভুঁইয়া, মুণ্ডা, চেরো, কানয়ার ও সাঁওতাল নামক আদিবাসীদেরও অস্তিত্ব লক্ষ করা গিয়েছিল। সামাজিক পরিচিতিতে তারা 'আদিম', 'বোকা', 'সহজ', 'সরল'[6] বলে বর্ণিত বা পরিচিত অন্যদিকে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে তাঁদের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ ছিল। 'আদিম' হিসাবে পরিগণিত ও অন্য সম্প্রদায়ের নিকট চরম ঘৃণ্য হলেও আদিবাসীরা নিজ সমাজের মধ্যে স্বাধীন ছিল। ঔপনিবেশিক যুগের পূর্বে ছোটনাগপুর মালভূমি অঞ্চলে বসবাসকারী আদিবাসীদের অর্থনৈতিক কর্মক্ষেত্র বনভুমিকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হত। আদিবাসীদের জীবিকা প্রকৃত অর্থে নিত্য নৈমিত্তিক জীবন যাপনে প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল ছিল। সামাজিক নিয়ন্ত্রনাধীন ভাবে

---

1. ১৮২৬ সালে তিনি মহারাজা উপাধি পেয়ে অমর সিং এই জেলার রাজা হয়েছিলেন। ১৮৮২ তে সরগুজা রাজ্যের কর্তৃত্ব হাতে তুলে নেন রঘুনাথ সরণ সিং। ১৯৫১ সালে যা মধ্যপ্রদেশের সাথে যুক্ত হয়েছিল।

5. আদিবাসী শব্দটি জাতি অর্থে ব্যবহার করা হয়।

3. Mopherson. H, *Report of the Survey and settlement operations (1998-1907), Santal Paragana,* Calcutta, Bengal secretariat book depot, 1909, P. 12-14.

3. *Feudatory states of Bihar and Orissa (ruling chiefs and Leading Personages),* Calcutta, Government of India, Central Publication Branch, 1929, pp. 18-19.

4. Gait. E. A. *Census of India* (*1901*), vol-1, Calcutta, Superintendent of Governmment Printing, 1903, P. 23-35.

6. দাস. অমল কুমার (সম্পা.), ডঃ শংকরানন্দ মুখোপাধ্যায়, *আদিবাসী সংগ্রামী মন ও সংগ্রামের দর্শন,* পশ্চিমবঙ্গ, ১৯৭৭, পৃ. ২৩

আদিবাসীরা তাদের খাদ্য ও জীবিকার প্রয়োজন মেটাত গভীর অরণ্যকে কেন্দ্র করে। মূলত প্রকৃতি থেকে আদিবাসীরা খাদ্য, কাঠ, ফল ও মধু বিক্রির মাধ্যমে নিজেদের জীবিকা নির্বাহ করত। তারা স্বাধীন ভাবে শিকার ও বনজ সম্পদ আরোহন[7] করার মাধ্যমে তারা তাদের নিত্য খাদ্যের যোগান মেটাত। ১৭৮৯ সালে লর্ড কর্নওয়ালিসের তথ্যে কোম্পানি বাংলার এক-তৃতীয়াংশ অঞ্চলকে 'বন্যজন্তু আকীর্ণ জঙ্গল'[8] বলে আখ্যা দিলে জঙ্গলাকীর্ণ অঞ্চলে আদিবাসীদের 'শিকার' ও 'বনজ সম্পদ' আরোহণ বাধাপ্রাপ্ত হতে থাকে। অরণ্য থেকে প্রাপ্ত জ্বালানি, খাদ্য সংগ্রহ করা ও অরণ্যের প্রতি অধিকার থেকে ধীরে ধীরে আদিবাসীদের সম্পূর্ণ অধিকার বিলুপ্ত হতে শুরু করেছিল। অরণ্য থেকে অধিকার বিলুপ্ত হলে জমিকে কেন্দ্র করে জীবিকা নির্বাহের পথে আদিবাসীরা সরাসরি এগিয়ে এসেছিল এবং কৃষি অর্থনীতির উপর নির্ভরশীল হয়ে উঠতে শুরু করেছিল।

ঔপনিবেশিক শাসন পর্যায়ের প্রথমদিকে আদিবাসীরা কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে বনভূমি পরিষ্কার করে জমিকে বসবাসের যোগ্য করে তুলেছিল। এছাড়াও আদিবাসীদের বীজ বপন, শস্য কাটা, জ্বালানি সংগ্রহ, গৃহস্থালি, শিশু পালন, উর্বর নয় এমন পতিত জমি উদ্ধার করে স্থানে স্থানে ঝুম চাষ করার সাথে যুক্ত হয়ে পড়েছিল। সমগ্র সামাজিক ও অর্থনৈতিক কাজে[9] লিঙ্গ বৈষম্যহীনভাবে যোগদান করত আদিবাসী সাঁওতাল নারী ও পুরুষগণ। ছোটনাগপুর মালভূমি অঞ্চলে আদিবাসী ভিন্ন ভিন্ন গোষ্ঠীর বাসস্থান থাকলেও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সাঁওতাল সহ মুণ্ডা, থারু, হো, কোল, কোরাস, খরিয়াদের অংশগ্রহণ ছিল সক্রিয় ও নিবিড়। কৃষিকাজ ছাড়াও তারা অন্যান্য কাজে যেমন গভীর জঙ্গলে গিয়ে জ্বালানি কাঠ সংগ্রহ, দূর থেকে পানীয় জলের ব্যবস্থা করা থেকে মাটি কাটার সময় আদিবাসী পুরুষ ও নারীর একসাথে কাজ করার

7. *Royal Report of the Accounts Resprcting the Territorial Revenues and Disbursements*, Government of India, 1770, P. 20-25.

8. হান্টার. ডবলু ডবলু, অসীম চট্টোপাধ্যায় (অনু), *গ্রাম বাংলার ইতিকথা,* কলকাতা, সুবর্ণরেখা পাবলিকশন, প্রথম প্রকাশ ১৯৮৪, পৃ. ১৬৫-১৬৮

9. Sahu. Chaturbhuj, *The Santhal Woman a Social Profile,* New Delhi, Sarup and Sons, First published 1996, P. 69.

সামাজিক চিত্র পরিলক্ষিত হয়েছিল। আদিবাসী মেয়েরা গৃহে থাকলেও, ক্ষেতের কাজ করতে পুরুষদের পাশাপাশি মেয়েরাও সমকক্ষ ছিল।[10]

গ্রামীণ অর্থনীতির অন্যতম বৈশিষ্ট্যে ঔপনিবেশিক পর্যায় কাল থেকে আদিবাসীদের অর্থনৈতিক কর্মক্ষেত্র বনভূমির উপর নিয়ন্ত্রন শুরু হলে কৃষিকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হওয়া শুরু হয়েছিল। ঔপনিবেশিক শাসন পূর্ব আদিবাসীরা সাধারণত মালভূমি এলাকায় যে পরিমানে বসতি গড়ে তুলেছিল তা বিশেষ ভাবে চাষের উপযোগী ছিল না।[11] উর্বর সমতল জমির পাশাপাশি বসতি গড়ে তোলার জন্য ভূমির খনন শুরু করা হয়েছিল। উর্বর ভূমিতে নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার অন্তিম প্রচেষ্টায় বর্ণহিন্দুদের অত্যাচারে, বিহারে আদিবাসীরা সমতল ভূমি ছেড়ে বীরভূমের পার্বত্য অঞ্চল, দুমকা, বিহারের রাজমহল[12] পাহাড়ে বসতি তৈরি করা শুরু করেছিল। তথাকথিত ভাবে বলা যায় যে, প্রকৃতি নির্ভর আদিবাসীরা জমি কেন্দ্রিক জীবিকায় আসতে একপ্রকার বাধ্য হয়েছিল। যার পরিনাম ভবিষ্যতে আদিবাসীদের জীবন ও জীবিকাতে গভীর প্রভাব লক্ষ করা যায়। কৃষি কাঠামোর সাথে যুক্ত ছিল কৃষক কেন্দ্রিক খামার অর্থনীতি। ব্যক্তি মালিকাধীন জমিতে আদিবাসী কৃষকরা চাষাবাদের কাজে যুক্ত থাকত রাখত ছোট জমিদাররা। জমির পরিমাণ সীমিত থাকলেও জমি কর্ষণের ক্ষেত্রে আদিবাসীদের কৃষকের শ্রমশক্তিকে জমিতে ব্যবহার করা হয়েছিল।[13] কৃষককে তাঁর উদ্বৃত্ত শ্রম প্রয়োগ করতে বাধ্য করা হত অতিরিক্ত মূলধন লাভের জন্য। অতিরিক্ত মূলধন লাভকে কেন্দ্র করে জমির উপর বন্দোবস্তগুলি বিশেষভাবে আদিবাসীদের জীবিকা ও জীবন যাপনকে নিয়ন্ত্রণ করতে শুরু করেছিল। যার পরিনাম ভবিষ্যতে আদিবাসীদের জীবন ও জীবিকাতে গভীর প্রভাব লক্ষ করা যায় এবং আদিবাসী কৃষকদের জীবিকা হারানোর পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল।

ব্রিটিশ শক্তি অর্থাৎ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ভারতীয় ব্যাবসা বানিজ্যে যোগদানের পর থেকেই ভূমি কেন্দ্রিক অর্থনৈতিক ইতিহাসে বড় পরিবর্তন দেখা দিয়েছিল। এই অর্থনৈতিক

---

10. বাস্কে. ধীরেন্দ্রনাথ, *সাঁওতাল গণসংগ্রামের ইতিহাস*, বিজয়ন প্রকাশনী, কলিকাতা ফেব্রুয়ারি ১৯৭৬, পৃ.-৩৮।

11. Mopherson. H, *Report of the Survey and settlement operations (1998-1907), Santal Paragana,* Calcutta, Bengal secretariat book depot, 1909, P. 15-22.

12. ধীরেন্দ্রনাথ বাস্কে, *সাঁওতাল গণসংগ্রামের ইতিহাস*, বিজয়ন প্রকাশনী, কলিকাতা ফেব্রুয়ারি ১৯৭৬, পৃ.-৩৮।

13. তদেব। পৃ. -৪৫

প্রভাব শুরু হয়েছিল ১৭৬৫ সালের পূর্ব ভারতের বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার দেওয়ানি লাভের মত মুনফা লাভের মধ্য দিয়ে। অধিক মুনফা লাভের জন্য ভূমি কেন্দ্রিক অর্থনীতিকে খুব অল্প সময়ের মধ্যে ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ শক্তি হাতিয়ার করে ফেলেছিল কেননা ভারতবাসীর প্রধান আয়ের উৎস ছিল জমি অর্থাৎ অর্থনীতি ছিল ভূমি কেন্দ্রিক।[14] জমিকে কেন্দ্র করে রাজস্ব সংগ্রহের জন্য একশালা, পাঁচশালা, দশশালা ভূমি বন্দোবস্ত প্রথার মাধ্যমে রাজস্ব আদায়ে পুনরায় অনিশ্চয়তা দেখা গিয়েছিল। যদিও এই বন্দোবস্তগুলি থেকেই সঠিক ভাবে রাজস্ব আদায় করা ছিল ব্রিটিশ কোম্পানির উদ্দেশ্য তাই ১৭৭৭ সাল শেষ হওয়ার পর রাজস্ব আদায়ের সর্বোত্তম পদ্ধতি কি হবে তাই নিয়ে বিচার- বিবেচনা শুরু হয় কোম্পানি ও জমিদারদের মধ্যে। ব্রিটিশ সরকার অত্যধিক আত্মবিশ্বাস ও দৃঢ়তার সাথে ভূমি বন্দোবস্ত নির্ধারণের জন্য বোঝাপড়া করেছিলেন জমিদারদের সাথে। জমিদারগণ ও রাজস্ব বোর্ড[15] বার্ষিক ভিত্তিতে রাষ্ট্রের রাজস্ব সঠিক ভাবে নির্ধারণের জন্য ১৭৭৭ সালে জমিদারের সাথে পুনরায় ভূমি বন্দোবস্তের সিধান্ত স্থির করেছিলেন। ১৭৮৮ সালে জানুয়ারি মাসে আদিবাসী কৃষকেরা সমগ্র ভাবে জমায়েত হলে ইজারাদারদের সঙ্গে আপস মীমাংসা না হওয়া পর্যন্ত খাজনা আদায় চলতে থাকে আদিবাসী কৃষকদের নিকট। ১৭৮৮ সালে ২১সে মের প্রস্তাবে আদিবাসী সহ সমস্ত রায়তরা জমায়েত হয়ে কালেক্টরের কাছে তাদের ক্ষোভ প্রকাশ করলে জমি থেকে কৃষকেরা তাদের সম্পূর্ণ অধিকার হারিয়ে ফেলেছিল। ব্রিটিশ কাউন্সিলের সদস্য ফিলিপ ফ্রান্সিস এক তত্ত্ব দ্বারা 'চিরস্থায়ী ভূমি রাজস্ব পরিকল্পনার' উপস্থাপন করেছিলেন। ফিলিপ ফ্রান্সিসের মতে জমিদারই ছিল জমির মালিক অতএব জমিদারদের চিরস্থায়ীভাবে জমির বন্দোবস্ত দেওয়া বাঞ্ছনীয় বলে তিনি মনে করেন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত সম্পাদনের জন্য স্পষ্ট নির্দেশ দান করা হয়েছিল। অবশেষে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ লর্ড কর্নওয়ালিস জমিদারদের সাথে জমিদারী বন্দোবস্ত করার জন্য ১৭৯৩ সালের ২২ সে মার্চ পূর্ব ভারতে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত নামক ভূমি ব্যবস্থার প্রবর্তন করেছিলেন[16]। এই ভূমি ব্যবস্থায় বার্ষিক রাজস্ব জমা দেওয়ার নিয়ম ছিল যে নির্দিষ্ট দিনে সূর্যাস্তের পূর্বে জমিদারকে নির্দিষ্ট পরিমাণ রাজস্ব কর হস্তান্তরিত

---

14. *Royal Report of the Accounts Resprcting the Territorial Revenues and Disbursements*, Government of India, 1770, P. 34-45.

15. রাজস্ব বোর্ড, যার দায়িত্ব হল রাজস্ব- সংক্রান্ত বিষয়াবলীর সাধারণ বা সার্বিক নিয়ন্ত্রণ।

16. মুখোপাধ্যায়. সুবোধ কুমার, *বাংলার আর্থিক ইতিহাস,* কলকাতা, কে পি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানি, ১৯৮৫, পৃ. ৩৭

করতে হবে[17] উক্ত ইতিহাস সকলের কাছে পরিচিত হলেও বলা প্রয়োজন যে, এই ভূমি বন্দোবস্তের মাধ্যমে যেমন জমিদারদের জমিদারি হারানোর ভয় ছিল ঠিক তেমনই জমির সাথে যুক্ত কৃষকদের জীবিকা বিছিন্ন হয়ে যাওয়ার পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে আদিবাসী কৃষকদের অবস্থান যে সঙ্গিন হয়ে উঠেছিল তা ছিল চোখে পড়ার মত। আসলে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পূর্ববর্তী ভূমি বন্দোবস্তগুলি থেকেই আদিবাসীদের জীবনে প্রভাব পড়তে শুরু করেছিল যা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মধ্য দিয়ে জোরদার হয়েছিল। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রভাব, ছোটনাগপুর মালভূমির আদিবাসীদের সাথে অর্থনীতির সম্পর্ক বিধস্ত করার প্রথম ধাপ ছিল।

ব্রিটিশ শাসনের সুত্রপাতে ও চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রভাবে ছোটনাগপুর মালভূমির অন্তর্গত বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার আদিবাসী কৃষকদের করুন পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছিল। এই করুন পরিস্থিতি সাহিত্য রচনা থেকে সংবাদ প্রভাকরের মত পত্রিকায় গভীর সম্বেদনা ফুটে উঠলেও জমিদারদের পক্ষপাতী অনেকেই ছিলেন। ১২৫৯ সালের সম্পাদকীয় প্রবন্ধে কৃষকদের দুর্দশা বিশ্লেষণ করতে গিয়ে জমিদারদের দায়বদ্ধতাকে অস্বীকার করা হয়েছিল কারন চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে জমিদারী প্রথা বিলোপের প্রসঙ্গেও নানান মন্তব্য উঠে এসেছিল। ধনী মালিকদের পৃষ্ঠপোষকতায় দেশের জমিদারদের স্বার্থে দু'চার কথা রচনায় প্রকাশ হলেও তা মূল বক্তব্যের কাছে আদৌও পৌঁছায়নি। টানা এক দশক ধরে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত চলার পর জোতদারদের ক্ষমতা বৃদ্ধি হলে আদিবাসী কৃষকদের আর্থিক ক্ষমতা হ্রাস পেতে থাকে। এ প্রসঙ্গে ভবতোস দত্ত জানিয়েছেন যে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সবচেয়ে বড় ত্রুটি ছিল মধ্যস্বত্বভোগীর আবির্ভাব।[18] জমি ও বাসস্থান থেকে আদিবাসীদের উচ্ছেদ করার পর সমাজের অর্থনৈতিক স্তর বিন্যাস যেমন বিভক্ত হয় ঠিক তেমনি গ্রামীণ অর্থনীতিতে জটিলতা তৈরি হতে থাকে। এ প্রসঙ্গ ব্রিটিশ শাসনকালে গ্রামের শ্রেণি- কাঠামো, শ্রেণি- গঠন প্রক্রিয়াকে জমি-মালিকানার কেন্দ্রীভবনের তত্ত্ব দ্বারা অনুধাবন করা যায়। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মাধ্যমে ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র উদ্বৃত্ত আত্মসাৎকারী শক্তি হিসাবে কৃষক এবং জমিদারদের মাঝখানে

17. দাস. অমল কুমার (সম্পা.), ডঃ শংকরানন্দ মুখোপাধ্যায়, *আদিবাসী সংগ্রামী মন ও সংগ্রামের দর্শন,* পশ্চিমবঙ্গ, ১৯৭৭।

18. মুখোপাধ্যায়. সুবোধ কুমার, *বাংলার আর্থিক ইতিহাস,* কলকাতা, কে পি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানি, ১৯৮৫, পৃ. ৩৮

নিজেকে আড়াল করে রেখেছিল।[19] চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তিত হওয়ার পর বাংলা, বিহার উড়িষ্যার নানা প্রান্তে অর্থনৈতিক থেকে সামাজিক পরিস্থিতি বিঘ্নিত হয়েছিল।

প্রসঙ্গ: বিহার

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে আদিবাসী চাষিদের অবস্থার করুন রূপ পরিলক্ষিত হয় বাংলা ও বিহারের নানা প্রান্তে। ব্রিটিশ সরকারের ভূমি- রাজস্ব আইন ও জমিদার শ্রেণির জন্য ছোটনাগপুর মালভূমির কৃষক শ্রেণির চরম দুরাবস্থা তৈরি হয়েছিল।[20] ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের পর থেকে বিহারের জমিগুলি খাসে পরিণত হলে আদিবাসী কৃষকদের দুর্দশা বৃদ্ধি পায়।[21] বাংলা ও বিহারের ঔপনিবেশিক কৃষি অর্থনীতি ব্যবস্থায় আদিবাসী কৃষকদের ভূমি রাজস্ব কর জমা দিতে হত। ভূমি রাজস্বকর সংগ্রহের ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব শঠতা, প্রবঞ্চনা ও বিশ্বাসঘাতকতার সম্মুখীন হতে হয়েছিল আদিবাসী জনজাতিদের। এছাড়াও বস্তুগত ও মানবিক সম্পদের বহির্গমনের এক ধ্বংসীয় প্রক্রিয়ার মধ্যে বাংলা ও বিহারের ঔপনিবেশিক কৃষি অর্থনীতি ও সামগ্রিক জনজীবন ব্যহত হতে শুরু করেছিল। ১৮২৮ সালের বিহারের আদিবাসী চাষিরা প্রায় ভুলেই গিয়েছিল যে, জমির উপর তাদের অধিকার ছিল। জমিদারদের নতুন আইনে অনুমোদিত ক্ষমতা ও তীব্র অর্থনৈতিক সংকটের মধ্যে যে পারস্পারিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল তা আদিবাসী চাষিরা সহজেই বুঝতে সক্ষম হয়েছিল।[22] তৎকালীন বিহারের অর্থনৈতিক অবস্থার বর্ণনার তথ্য রাজা সীতাব রায়ের প্রদেশ পরিদর্শনের মন্তব্যে উঠে এসেছিল। সেই মন্তব্যে লক্ষ করা যায়, "পাটনা নগরীর দেশের অভ্যন্তরের অবস্থা ছিল শোচনীয়। সীতাব রায় প্রতিদিন কোম্পানির খরচে ৫০ টাকার চাল জনসাধারণের মধ্যে বিতরণ করতেন। রাজস্ব কর ভারে জর্জরিত মানুষের সংখ্যা ও তাঁর পাশাপাশি দুর্ভিক্ষ কবলিত জনসাধারণের সংখ্যাও অধিক[23] ছিল"। এই সব জেলায় আদিবাসী

---

19. দে. অমলেন্দু, *চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও বাঙ্গালি বুদ্ধিজীবী,* কলকাতা, রত্না প্রকাশন, ১৯৮১, পৃ. ৩৫-৪৫
20. দাস. অমল কুমার (সম্পা.), ডঃ শংকরানন্দ মুখোপাধ্যায়, *আদিবাসী সংগ্রামী মন ও সংগ্রামের দর্শন,* পশ্চিমবঙ্গ, ১৯৭৭, পৃ. ২০-২৫
21. Mopherson. H, *Report of the Survey and settlement operations (1998-1907), Santal Paragana,* Calcutta, Bengal secretariat book depot, 1909, P. 28-30.
22. Guha. Ranajit, *A Rule of property for Bengal: an essay on the idea of permanent settlement,* Dhurham, Duke U Press, 1996, P. 11-25.
23. Mopherson. H, *Report of the Survey and settlement operations (1998-1907), Santal Paragana,* Calcutta, Bengal secretariat book depot, 1909, P. 144-146.

সাঁওতালরাই ক্ষেতমজুরের কাজ করত। চিরায়ত খামার নির্ভর উৎপাদনের মাধ্যমে গৃহস্থালী আদিবাসী কৃষকরা ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র, জমিদার, মহাজনের চাহিদা মেটাতে হত। এই ঘটনার পাশপাশি জমি পুনোরোদ্ধারের ঘটনাও লক্ষ করা যায়। বিহারের কয়েকটি জেলায় পতিত জমি উদ্ধারের বিশেষ ব্যবস্থা ছিল না, অন্যদিকে জনসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি হয়ে চলেছিল। তাই বেশিরভাগ অঞ্চলে মঙ্গোলীয় যাযাবর[24] আদিবাসীকে ক্ষেতমজুর গোষ্ঠী দ্বারা পাথুরে জমি উদ্ধারের কাজে ব্যবহার করা হয়েছিল। ছোটনাগপুর মালভূমি অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত বিহারের স্থানে স্থানে পাথুরে জমি থাকার জন্য চাষের বিশেষ প্রসার হয়নি। 'থারু'[25] নামে এক আদিবাসী সম্প্রদায় প্রথম পাথরের ভেতর থেকে মাটি খুঁড়ে জমি খোঁজার কাজ শুরু করেছিল। পাথরের ভেতর থেকে জমি উত্তোলনের মত শ্রমসাধ্য কাজের জন্য আদিবাসী কৃষকদের নিয়োগ করা হতে থাকে। মূলত জমিহারা আদিবাসীরা অল্প মজুরির বিনিময়ে এই ধরনের কাজে অংশগ্রহণ করতে থাকে। কোল ব্রুকের মতে (১৭৯৫)[26]বিহারের পুরনিয়া জেলায় আদিবাসী চাষিদের ক্ষেত মজুরের সমতুল্য বলে মনে করা হত। জমিদাররা অধিকাংশ সময় আদিবাসী মণ্ডলকে (যে এইসব জায়গায় চাষ দেখত) সরিয়ে তাঁর জায়গায় নিজের পছন্দমত নিজেদের মন্ডল এনে বসাতেন[27] যার ফলস্বরূপ, বিহারের যেসব জেলায় চাষ হত সেই সব স্থানে জমিদারেরা সাচ্ছন্দে নিজেদের ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারত। সামাজিক ও অর্থনৈতিক এই চিত্র বিহারের পুরনিয়া, গোড্ডা, জামতারা, বাখরগঞ্জ, দুমকা, সাঁওতাল পরগণায় লক্ষ করা যায়। নিরাপত্তা ও ভূমিহীন আদিবাসী চাষিদের অভিবাসন, বিহার ও পশ্চিমবঙ্গের কয়েকটি নির্দিষ্ট জেলার মধ্যেই অধিক পরিলক্ষিত হতে দেখা যায়।[28]

প্রসঙ্গ: চম্পারন

---

24. *Report of the Accounts Resprcting the Territorial Revenues and Disbursements,* Government of India, P. 100-122.
25. Mopherson. H, *Report of the Survey and settlement operations (1998-1907), Santal Paragana,* Calcutta, Bengal secretariat book depot, 1909, P. 175-176.
26. চৌধুরী. বিনয় ভূষণ (সম্পা), রজতকান্ত রায়, রত্নলেখা রায়, চিত্তব্রত পালিত, *বাংলার কৃষি সমাজের গড়ন* ভলিউম-২, কলকাতা, কে পি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানি, ১৯৯৪, পৃ. ৪৪-৪৬
27. Mopherson. H, *Report of the Survey and settlement operations (1998-1907), Santal Paragana,* Calcutta, Bengal secretariat book depot, 1909, P. 94-97.
28. Palit. Chittabrata, Tensions in Bengal Rural Society: Landlords, Planters and Colonial Rule (1830-1860), Calcutta, Orient Longman, 1975, P. 8-15.

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলাফল, বিহারের চম্পারন জেলার সেটেলমেন্ট[29] অফিসারের দেওয়া তথ্য থেকে জনসংখ্যা হ্রাস ও কৃষি মজুরদের মৃত্যুর ঘটনার চিত্র পরিলক্ষিত হয়। যা ছিল তৎকালীন সময়ে অন্যতম উল্লেখযোগ্য ঘটনা। দুর্ভিক্ষের কারণে আদিবাসী চাষিদের সর্বনাশ ও জমিদারদের ক্ষতি হয়েছিল তথা, কৃষিতে জমিদারদের বিনিয়োগের পরিমাণ হ্রাস পেতে থাকে। এই পরিস্থিতিতে জমিদাররা চাষিদের অগ্রিম নগদ টাকা দেওয়া বন্ধ করে দিলে নগদ টাকার বিনিময়ে অধিকাংশ আদিবাসী গরীব কৃষকের জমিতে কাজ করার যে সম্ভাবনা বা সুযোগটুকু ছিল তা ক্রমশ হারিয়ে ফেলেছিল। জমিতে আদিবাসীদের দিয়ে জোরপূর্বক চাষ করানো হত ও রাজস্বকর আদায় করা হত। মজুরির পরিমাণ কাজের বিনিময়ে ছিল যৎসামান্য যা, তাদের নিত্য প্রয়োজনের চাহিদার নিবৃত্তি হত না। জমি নিড়ানোর কাজে যে পরিমাণ কৃষকের প্রয়োজন হয়েছিল তা আদিবাসী কৃষকদের অভিবাসনের মধ্যেই পূর্ণতা পেয়েছিল। পার্শ্ববর্তী রাজ্য ও পশ্চিমবঙ্গ থেকে সস্তা ও অল্প মজুরির বিনিময়ে আদিবাসী কৃষকদের চম্পারনে ভিড় বৃদ্ধি পেয়েছিল।

প্রসঙ্গ: সাঁওতাল পরগণা

আদিবাসী জনগণ সমতল ভূমি ত্যাগ করে যখন পর্বত- অরন্যাঞ্চলে আশ্রয় নিয়েছিল তখন বহিঃবিশ্ব থেকে আদিবাসী সাঁওতালদের বিছিন্ন করে দেওয়া হয়েছিল। আদিবাসী সাঁওতাল চাষিদের কোনো রকম অধিকার দেওয়া হয়নি দামিন- ই কোহতে স্থায়ীকরনের পূর্বে। ১৮৭২ সালের ৩ নং প্রতিবিধান দ্বারা বন্দোবস্ত করা জমির সাথে সাঁওতাল আদিবাসীদের বিছিন্নতা দেখা দিয়েছিল সাঁওতাল পরগণা জেলায়।[30] এই বিছিন্নতা বাংলা ও শাহাদাবাদের মহাজনদের কাছে পরিচর্যাকারী সাঁওতাল সম্প্রদায়ের জন্য বিশেষ সুখকর ছিল না।[31] সাঁওতাল পরগণায় এ প্রসঙ্গে কয়েকটি ঐতিহাসিক ও আর্থ- সামাজিক অনুষঙ্গ স্মরণ করা প্রয়োজনীয় ছিল। জনসাধারণের মূল ধারা থেকে বিছিন্ন হয়ে লোকালয় থেকে দূরে বসতি স্থাপন করেছিল

---

29. Mopherson. H, *Report of the Survey and settlement operations (1998-1907), Santal Paragana,* Calcutta, Bengal secretariat book depot, 1909, P. 191-193.

30. তদেব। পৃ. ১৯১-১৯৩

31. Sinha. N. K, *The Economic History of Bengal,* VOL-I, Calcutta, Cambridge University Press, 1965, p. 10-25.

সাঁওতাল আদিবাসীরা। এই পরিস্থিতিতে সাঁওতাল পরগণার তৎকালীন সেটেলমেন্ট অফিসার মিঃ পটেন্ট সাঁওতাল আদিবাসীদের তিনি রক্ষা করতে চেয়েছিলেন কিন্তু তাঁর আইনি ক্ষমতা প্রয়োগ করেও সাঁওতাল আদিবাসীদের পুরোপুরি ভাবে রক্ষা করতে পারেননি।[32] এই সময় খাজনার পরিমাণ প্রতি বছরে দ্রুত হারে বৃদ্ধি পেয়ে চলেছিল। ১৮৩৬-৩৭ সালে ২,৬১১ টাকা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ধীরে ধীরে ১৮৩৭-১৮৩৮ সালে ৬,৪০২ টাকা ও ১৮৪৫-৪৬ সালে ৩২,৪৩০ টাকা এবং ১৮৪৯-৫০ সালে ৪৩,৭২৪ টাকা বৃদ্ধি পেয়েছিল, যা মিঃ পটেন্টের লেখা ২৮সে মের চিঠির উল্লেখ[33] থেকে জানা যায়। সাঁওতাল কৃষকদের পরিমাণ চাষের কাজে বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছিল ১,৬২,৫৬০ জন।[34] কৃষিকাজে আদিবাসীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেলেও সুদ প্রদানকারীদের অত্যাচার সাঁওতাল আদিবাসীদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনের অগ্রগতির পথে বাঁধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। আদিবাসী সমাজে 'বিনিময় প্রথা' প্রচলিত থাকার ফলে 'অশিক্ষিত'[35] সাঁওতালরা জমির ফসল বিক্রি করত অর্ধেক[36] দামের পরিবর্তে। আদিবাসীদের ঠকিয়ে অল্প দামে শস্য ক্রয় করত স্থানীয় জমিদার ও জোতদাররা। সাঁওতাল পরগণায় নতুন কৃষি আইন[37] চালু হলে অধিকার জনিত বিচার গ্রামীণ সম্প্রদায়ের মামলায় বাতিলযোগ্য ও অকার্যকর ছিল। অন্যদিকে ডেপুটি কমিশনার এবং সরকারি কর্মকর্তারা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের অভিভাবক হিসাবে কাজ করেছিল তাদের দায়িত্বে থাকা অঞ্চলগুলিতে। কমিশনারদের নজরে আসা অনুমোদিত সমস্ত বিচ্ছিন্নতায় হস্তক্ষেপ করা ও গ্রামের অর্থনীতির ব্যাপারে জমিদারের হস্তক্ষেপ করার প্ররোচনার সাহায্য করেছিল এই কোম্পানির কর্মকর্তারা। গ্রাম প্রধান ও আদিবাসীদের মধ্যে যোগাযোগের বিস্তর পার্থক্য তৈরি হওয়ায় বিভিন্ন অভাব, অভিযোগ

---

32. Mopherson. H, *Report of the Survey and settlement operations (1998-1907), Santal Paragana,* Calcutta, Bengal secretariat book depot, 1909, P. 35-39.

33. তদেব। পৃ. ৭২-৭৫

34. তদেব। পৃ. ৭২-৭৫

35. পুঁথিগত শিক্ষা না থাকার অর্থে অশিক্ষিত কথাটি ব্যবহার কর হয়েছে।

36. রায়. তারাপদ, *সাঁওতাল বিদ্রোহের রোজনামচা,* কলকাতা, দেজ পাবলিশিং, চতুর্থ সংস্করণ জানুয়ারি ২০১৭, পৃ. ৪৫-৫৫

37. মিত্র. গৌরিহর, *পশ্চিমবঙ্গ সাঁওতাল বিদ্রোহ সংখ্যা,* পশ্চিমবঙ্গ, তথ্য সংস্কৃতি বিভাগ, ২৫ আগস্ট ১৯৯৫ পৃ. ২৩-২৫।

আদিবাসী কৃষকরা, গ্রাম প্রধানের কাছে খুব একটা ব্যক্ত করতে পারত না।[38] গ্রামপ্রধান আসলে একজন ভাড়া গ্রহণকারীর ভূমিকায় গুরুত্বপূর্ণ ছিল[39]। গ্রামের প্রধানের সাথে আদিবাসী কৃষকরা শুধুমাত্র বিশেষ প্রয়োজনে লেনদেন করতে পারত। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলাফল ও ব্রিটিশ শাসকের আগ্রাসি কৃষি অর্থনীতি ব্যবস্থা ভারতীয় গ্রামীণ সমাজ ব্যবস্থা ও কৃষি ব্যবস্থাকে ধীরে ধীরে ধ্বংস করেছিল।

প্রসঙ্গ: দুমকা

ঔপনিবেশিক যুগে বাংলা ও বিহারে গ্রামের জমিদারের হাতে জমির মালিকানা থাকলেও আসিবাদী কৃষকদের মধ্যে যৌথ মালিকানা ছিল। পাকুড়, জামতারা, দেওঘর, দুমকা মিলিয়ে ৯,২২২ গ্রামে মুণ্ডা আদিবাসীদের মধ্যে খুঁৎকাঠি[40] প্রথার প্রচলন ছিল। এইসব অঞ্চলে খুঁৎকাঠি প্রথায় রাজস্ব আদায় প্রচলন ছিল।[41] ছোটনাগপুর অঞ্চল ও সাঁওতাল পরগণায় খুঁৎকাঠি প্রথার বহুল প্রচলন দেখা যায়। এই প্রথা জমি ব্যতীত বনভূমির উপর প্রয়োগ করা হয়েছিল ফলত বনভূমিগুলি একে একে কোম্পানির হস্তান্তরিত হতে থাকে।[42] আদিবাসীদের মধ্যে মুণ্ডা নামক আদিবাসীরা দীর্ঘদিন ধরে জমির উপর যৌথ মালিকানা ভোগ করত কিন্তু চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রভাবে মুণ্ডাদের মধ্যে যৌথ মালিকানা প্রথা বাতিল হয়েছিল। যৌথ মালিকানা বাতিল হলে রাজস্বকর দেওয়ার ভার চাষির একার উপর পড়েছিল অন্যদিকে অতিরিক্ত রাজস্বকর দেওয়া তাদের পক্ষে দেওয়া সম্ভব ছিল না। অতিরিক্ত রাজস্বকরের ভারে মুণ্ডা আদিবাসীরা এই ব্যাক্তিগত মালিকানার ভার সহ্য করতে না পেরে জমি ছাড়তে বাধ্য হয়েছিল ফলত জমিগুলি মুণ্ডাদের ব্যাক্তিগত মালিকানাধীন থেকে জমিদারদের নিয়ন্ত্রনে চলে যায় এবং কৃষকরা জমিহীন হয়ে পড়েছিল। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে মুণ্ডা আদিবাসীদের পুরাতন ভূমি ব্যবস্থার অবসান

---

38. *Report of the Commissioners appointed to enquire into the famine in Bengal and Orissa,* Calcutta, Supriendent of Government, 1866, P. 39-47.

39. Mopherson. H, *Report of the Survey and settlement operations (1998-1907), Santal Paragana,* Calcutta, Bengal secretariat book depot, 1909, P. 94-95.

40. খুঁৎকাঠি হল জমির যৌথ মালিকানা।

41. Mopherson. H, *Report of the Survey and settlement operations (1998-1907), Santal Paragana,* Calcutta, Bengal secretariat book depot, 1909, P. 42-43.

42. তদেব। পৃ. ৪৩-৪৫

ঘটে এবং সেখানে জমি জরিপের ভিত্তিতে ব্যক্তিগত মালিকানার আবির্ভাব ঘটেছিল। ১৮৯৮ সালের এক তথ্য থেকে জানা যায় যে, খুঁৎকাঠি প্রথার অন্তর্গত ভূমির উপরে বসবাস করার জন্য আদিবাসীদের থেকে ১ আনা করে কর জমা দিতে হত।[43] পরবর্তীকালে ব্যক্তিগত জমির বন্টননামায় অসমতা দেখা দিলে জমিদারদের সাথে মুণ্ডা চাষিদের অন্তরদ্বন্দ্ব দেখা যায়। অবশেষে এই প্রথা, গোড্ডার মুণ্ডা কৃষকরা মেনে নিতে রাজী হয়নি। এই প্রথা অবরোধের জন্য গ্রাম পঞ্চায়েত বিশেষ কোনো উদ্যোগ নেননি। যৌথ মালিকানা ভেঙ্গে যাওয়ার পর কৃষি প্রধান গ্রামাঞ্চলে জমি পুনরুদ্ধারের কাজে মূলত আদিবাসীদের ব্যবহার করা হত। এদিকে মুণ্ডা আদিবাসী চাষিরা সুদূর উত্তরে পাড়ি জমিয়েছিল জমি পুনোরদ্ধারের জন্য। জমি পুনোরোদ্ধারের কাজ অন্য স্থান থেকে ভিন্ন ছিল। সাঁওতাল চাষিদের অভিবাসন এই কয়েকটি জেলা ছাড়াও উত্তর বাংলার বারিন্দ অঞ্চল,[44] যা কিনা দক্ষিণ দিনাজপুরের একাংশ, মালদার পূর্ব দিকের একাংশ, পশ্চিম বগুড়ার কিছু অঞ্চল ও রাজশাহী জেলার উত্তরাঞ্চলে অধিক দেখতে পাওয়া যায়। ১৮৭২-৭৩ সালে সাব ডিভিশন ডেপুটি কমিশনার জন বক্স্রয়েল[45] দুমকা জেলার দায়িত্বে থাকাকালীন আদিবাসী কৃষক সম্পর্কিত কিছু তথ্যের পরিচয় পাওয়া যায়। যদিও তিনি আদিবাসীদের জীবনশৈলী খুব একটা পরিবর্তন করতে পারেননি বলে হতাশা প্রকাশ করেছিলেন।[46] তৎকালীন পরিস্থিতিতে তিনি আদিবাসীদের জন্য সাহায্যের হাত প্রসারিত করতে চেয়েছিলেন। এই পরিস্থিতিতে ১৮৭৩-৭৪ সালে গোড্ডা সহ দেওঘর, ঘাঁটি, নারিনপুর এলাকাগুলির উন্নতিসাধনের চেষ্টা করেছিলেন।

প্রসঙ্গ: বাংলা

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পূর্বে দুর্ভিক্ষ জনিত কারণে বাংলা সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিল। এই পরিস্থিতিতে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বাংলায় সন্তোষজনক ছিল না। বাংলার কৃষি অর্থনীতিতে

---

43. *Report of the Accounts Respecting the Territorial Revenues and Disbursements*, Santal Pargana, India, P. 63.

44. Mopherson. H, *Report of the Survey and settlement operations (1998-1907), Santal Paragana,* Calcutta, Bengal secretariat book depot, 1909, P. 42-43.

45. তদেব। পৃ. ৮৯-৯১

46. চৌধুরী. বিনয় ভূষণ(সম্পা), রজতকান্ত রায়, রত্নলেখা রায়, চিত্তব্রত পালিত, *বাংলার কৃষি সমাজের গড়ন (ভলিউম – ২),* কলকাতা, কে পি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানি, ১৯৯৪, পৃ. ২৪

'ঔপনিবেশিক পুঁজি' ও এদেশের 'কৃষক শ্রমকে'[47] বাণিজ্যিক ভাবে ব্যবহারে করে পণ্য উৎপাদন শুরু হয়েছিল। ব্রিটিশ সরকার, ভারতীয় সমাজের উপর একটি স্বাধীন রাজনৈতিক শক্তিকে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন গ্রামীণ অর্থনীতির মধ্য দিয়ে। ১৮১৩ খ্রিস্টাব্দে পর্যন্ত ভারতবর্ষ ছিল রপ্তানিকারী দেশ, যার ফলস্বরূপ প্রথমে বাংলা ও বিহার এবং উড়িষ্যায় ধীরে ধীরে সমগ্র ভারতের কৃষি ভিত্তিক অর্থনীতি সম্পূর্ণ বিধস্ত হয়েছিল। তার প্রভাব সরাসরি কৃষির সাথে যুক্ত আদিবাসি কৃষক সম্প্রদায়ের উপর প্রত্যক্ষ ভাবে পরিলক্ষিত হয়েছিল।[48] জমির জন্য অতিরিক্ত খাজনা আদায়, মহাজনী ঋন বন্ধকী ব্যবসা, ঋনগ্রস্থ আদিবাসী কৃষকদের ধীরে ধীরে দিন মজুরে রূপান্তরিত হওয়ার পথ প্রশস্ত হয়েছিল।[49] এই কাজে নির্দিষ্ট সময় নির্ধারিত না থাকার অপেক্ষা মুনফা উৎপাদনের প্রতিযোগিতা জমিদারদের মধ্যে ছিল না। ঔপনিবেশিক সরকার শুধুমাত্র উৎপাদনের মধ্যে কৃষক সম্প্রদায়ের উদ্বৃত্ত শ্রমদানকে মুনফা হিসাবে আত্মসাৎ করেছিল।[50] চিরস্থায়ী ব্যবস্থার ফলশ্রুতি, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের অন্যতম সহায়ক হিসাবে জমিদার শ্রেণী সমর্থনকারীতে পরিণত হয়েছিল। একদিকে ভূ-সম্পত্তিতে জমিদারদের অধিকার স্বীকৃত হয় অন্যদিকে বিহারের সারন, মজফরপুর ও দ্বারভাঙ্গা জেলার পাশাপাশি সমস্ত বাংলাতেও তৎকালীন আদিবাসীদের অবস্থা শোচনীয় হয়ে উঠেছিল। ১৭৯৩ এর চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে বাংলায় জন্ম হয়েছিল এক জোতদার শ্রেণির[51]। জমিদারদের ক্ষমতার পাশাপাশি জোতদারদের ক্ষমতা দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছিল। দখলীস্বত্ব সহ অন্যান্য অস্থাবর সম্পত্তির হস্তান্তরযোগ্য করার ক্ষমতা জোতদারদের ছিল। জোতদাররা জমির সাথে যুক্ত আদিবাসী গরীব প্রজাদের উপর ক্রমশঃ নিজেদের প্রভাব বিস্তার করেছিল। বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন অনুসারে প্রজা ছিল মূলত মধ্যস্বত্ব[52] বা নিম্ন মধ্যস্বত্বাধিকারী[53] প্রজা রায়ত এবং অধস্তন রায়ত।[54] অধস্তন রায়তরা

---

47. Robertson. P M, *Report of the Survey and settlement operations (1909-1914), Birbhum,* Calcutta, Bengal secretariat book depot, 1915, P. 15-25.

48. *Report of the Commissioners Appointed to Enquire into the famine in Bengal and Orissa,* Calcutta, Supriendent of India Government, 1866, P. 42-49.

49. হান্টার. ডবলু ডবলু, অসীম চট্টোপাধ্যায় (অনু), *গ্রাম বাংলার ইতিকথা,* কলকাতা, সুবর্ণরেখা পাবলিকশন, প্রথম প্রকাশ ১৯৮৪, পৃ.- ৪১।

50. তদেব। পৃ.- ৭৮

51. জোতদার হল জমিদার ও রায়তদের মধ্যকালীন এক ক্ষমতাবান শ্রেণি।

52. মধ্যস্বত্বাধিকারী বলা হয় তাদের যারা খাজনা অথবা প্রজা বসিয়ে জমি চাষ করার উদ্দেশ্যে অন্যের কাজ থেকে জমি গ্রহণ করেন।

চিরাচরিত ভাবে দুটি শ্রেনীতে বিভক্ত ছিল, ১) খুদ কাস্তা[55] এবং ২) পায় কাস্তা[56]। অধস্তন রায়তরা জমির কোন ক্ষতি না করে বংশানুক্রমিকভাবে ইচ্ছামত জমি ব্যবহার করা ও কৃষকদের মধ্যে সর্বোচ্চ মর্যাদা ভোগ করত। এই রায়তদের মধ্যে আদিবাসী সম্প্রদায় গোষ্ঠীর কোন স্থান ছিল না বা বলা যেতে পারে আদিবাসী সম্প্রদায় অন্তর্ভুক্ত ছিল না। জমিতে আদিবাসীদের অবস্থান ছিল শুধুমাত্র চুক্তিপত্রে সই করে জমিদারদের জমিতে ক্রীতদাস হয়ে কাজ করা।[57] এই ঘটনার মধ্য দিয়ে আদিবাসীদের জীবন অভিশাপের মত অবস্থায় জর্জরিত হয়ে পড়েছিল। জমিতে ক্রীতদাস হয়ে কাজ করার সাথে সাথে জোরপূর্বক আদিবাসী চাষিদের নিকট থেকে রাজস্ব কর আদায় করা হত। সাঁওতাল আদিবাসী চাষিদের থেকে প্রাপ্ত রাজস্বকর সংগ্রহ করত সাঁওতাল মাঝি[58] এবং পৌঁছে দিত জমিদারকে।[59] আদিবাসী চাষ্দিের জমির উপর দখলিস্বত্ব না থাকায় তারা ঋন নিতে বাধ্য হত জমিদারদের কাছে। নিত্য জীবন ধারণের ক্ষেত্রে ঋণের বোঝা অতিরিক্ত হলে তারা পরিশোধ করতে বাধ্য হত ঘরের কাজ ও ক্ষেতের কাজ করার মধ্য দিয়ে। এই ঋন মূলত পরিশোধ করত আদিবাসী কৃষকদের মেয়ে, বউ ও শিশুরা।[60] ঋন পরিশোধ না হলে সাঁওতাল নারীদের উপর শারীরিক ও মানসিক অত্যাচার করা হত[61]।

---

53. দখলীস্বত্বভোগী প্রজা বা মধ্যস্বত্ব উত্তরাধিকারসূত্রে ভোগ করা চলে এবং হস্তান্তরযোগ্য। বিশেষ কোন কারন ভিন্ন মধ্যস্বত্বের কারন ভিন্ন মধ্যস্বত্বের খাজনা বৃদ্ধি চলে না।

54. তৃতীয় ছিল কোর্ফা প্রজা বা অধস্তন রায়ত, যিনি নিজে অথবা নিজের পরিজনবর্গ অন্য কারো সাথে যুক্তভাবে জমি চাষ করার উদ্দেশ্যে জমি ভোগ করেন।

55. খুদ কাস্তা রায়তরা ছিলেন গ্রামের দীর্ঘদিনের বাসিন্দা। এদের মধ্যে অনেকেই আবার নির্দিষ্ট কর এর বিনিময়ে জমির ভোগদখলের অধিকারী ছিলেন। এরা অন্যদিকে মুকারারি নামে পরিচিত ছিলেন। আবার মিরাসি রায়ত ও বলা হত।

56. পায় কাস্তা রায়তরা ছিলেন কৃষকদের একটি উপগোষ্ঠী যারা যে এলাকায় বাস করত সেখান থেকে তারা দূরে জমি চাষ করত।

57. Ray. Ratnalekha, *Change in Bengal* Society: *A Study of Select Districts 1760-1850,* New Delhi, Manohar Publication 1979, P. 70-80.

58. আদিবাসীদের মধ্যে যিনি মুখ্য ছিলেন অর্থাৎ গ্রাম প্রধান।

59. Mopherson. H, *Report of the Survey and settlement operations (1998-1907), Santal Paragana,* Calcutta, Bengal secretariat book depot, 1909, P. 42-43.

60. বাস্কে. ধীরেন্দ্রনাথ, *সাঁওতাল গণসংগ্রামের ইতিহাস,* কলিকাতা, বিজয়ন প্রকাশনী, কলিকাতা ফেব্রুয়ারি ১৯৭৬, পৃ.-৩৮।

61. মিত্র. গৌরিহর,*পশ্চিমবঙ্গ সাঁওতাল বিদ্রোহ সংখ্যা,* পশ্চিমবঙ্গ, তথ্য সংস্কৃতি বিভাগ, ২৫ আগস্ট ১৯৯৫, পৃ. -২৪।

অতিরিক্ত ঋনের বোঝা ও জমির প্রতি অধিকার হ্রাস পেতে থাকলে একসময় অধিকাংশ আদিবাসী জমিহারা বা ভূমিহীন কৃষক শ্রেণিতে রূপান্তরিত হতে থাকে। এই পরিস্থিতিতে আদিবাসী কৃষকরা স্থানীয় জোতদারদের উপর নির্ভর হয়ে পড়লে আদিবাসীদের উপর আধিপত্য বিস্তারে সক্ষম হয়েছিল। এই ঘটনার সত্যতা তৎকালীন ছোটনাগপুরের উপস্থিত রেসিডেন্ট রিচারড এর লেখা তথ্য[62] থেকে জানা যায়।

প্রসঙ্গ: বীরভুম

ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের পশ্চাদপটে উপর্যুপরি তিন বছরের তীব্রতম খরার কারণে রাঢ় বাংলায় বীরভূমের অর্থনীতি ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিল এবং সাধারন মানুষের জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠেছিল। ৬০০০ গ্রামের মধ্যে ১৫০০ টি গ্রাম নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।[63] গ্রামের পর গ্রাম জনমানব শূন্য হয়ে পড়েছিল ও হাজার হাজার স্থানীয় মানুষের মৃত্যু হয়েছিল। এদিকে স্থানীয় মানুষের মৃত্যুর পর জমিগুলি রায়ত শূন্য হয়ে পড়েছিল ও পতিত পড়ে থাকে হাজার হাজার বিঘা জমি। বীরভুমের কৃষি বিপর্যস্ত হলে প্রশাসনিক ক্ষেত্রে অনিশ্চতয়তা দেখা দেয়, এই সুযোগে ভূমি রাজস্ব বৃদ্ধির ব্যাপারে কোম্পানির তৎপরতা বৃদ্ধি পায়। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে বিশেষভাবে পীড়িত জেলাগুলি যেমন বিহারের পুরনিয়া, রাজমহল ছাড়াও বাংলার বীরভূমের একাংশে আদিবাসী চাষিদের অভাব ও দুর্দশা দেখা দিয়েছিল।[64] ব্রিটিশ সরকারের অব্যবহিত আগে বীরভূম ছিল রাজনগরের প্রবল প্রতাপান্বিত এক পাঠান জমিদার বংশের অধীন ও তদানীন্তন বাংলার বৃহত্তম জমিদারি। বীরভূম আয়তনে সুবা বাংলায় চতুর্থ ছিল।[65] আলিবর্দির শাসন কাল থেকেই বাংলার সম্পদ ও সমৃদ্ধির লোভে আগত মারাঠা বর্গিদের উপর্যুপরি হানাদারি, লুণ্ঠন ও অত্যাচারের অন্যতম লক্ষ্যবস্তু ছিল চাকলা বীরভূম। বীরভূমের জমিদার আসাদুল্লা খাঁ পরগনার শাসক

---

62. Robertson. P M, *Report of the Survey and settlement operations (1909-1914), Birbhum,* Calcutta, Bengal secretariat book depot, 1915, P. 37-42.

63. *Report of the Survey and Settlement Operations (1909-1914),* Birbhum, Calcutta, Bengal secretariat book depot, 1915, pp. 5-12.

64. মুখোপাধ্যায়. অনিমা, *আঠেরো শতকের বাংলা পুঁথিতে ইতিহাস প্রসঙ্গ,* কলিকাতা, সাহিত্যলোক পাবলিকেশন, প্রথম প্রকাশ ১৯৮৭ আগস্ট, পৃ. – ৮৫

65. *পশ্চিমবঙ্গ সংখ্যা,* কলকাতা, তথ্য সংস্কৃতি বিভাগ, পৃ. ২৩-৫৫

কুলিয়ান সিংকে পরাস্ত করে এই পরগণা দখলে এনেছিলেন। পূর্ব ছোটনাগপুরের মহারাজাদের অনুসরণে স্থানীয় রাজাদের বেশিরভাগই অ-উপজাতীয় বংশোদ্ভূত এবং কৃষকদের কাছ থেকে সরাসরি খাজনা আদায়ের জন্য 'রাজা' কর্তৃক ঠিকাদার নিযুক্ত করা হয়েছিল।[66] আদিবাসী অর্থনীতির উপর মহাজনদের পীড়ন আদিবাসীদের পীড়িত করে তুলেছিল। বীরভূম জেলার জমিদারি প্রথা ছিল শতাব্দী প্রাচীন এবং বীরভুম জেলায় সাঁওতাল আদিবাসীদের সংখ্যা অধিক হওয়ার কারণে কৃষকদের উপর অত্যাচার প্রথম থেকেই ছিল।

১৭৯৩ সালের ২২ সে মার্চ চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তিত হলে, তৎকালীন বীরভূমের জমিদারগণ সরকারকে নির্দিষ্ট পরিমাণ বার্ষিক করদানের বিনিময়ে জমির মালিক হিসাবে মেনে নিতে স্বীকৃত হন। সাঁওতাল অধ্যুষিত অঞ্চলগুলিতে বর্ধমান, বীরভূম, শাহবাদ ও চাপড়ার সাঁওতাল এলাকায় ব্যবসায়ীদের ক্রমাগত যাতায়েত ব্যবস্থা ছিল।[67] মূলত সাঁওতালদের দ্বারা পরিষ্কার করা জমিগুলির নিয়ন্ত্রণ লাভ করা এবং মালিকানার মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করা ছিল ব্যবসায়ীদের লক্ষ্য। আদিবাসী সাঁওতালদের সেখানে বসতি স্থাপন করার মধ্য দিয়ে পাহাড়িয়া আদিবাসীদের দখলিকৃত অঞ্চলে তাদের নিয়ন্ত্রণ বৃদ্ধি পেয়েছিল। সাঁওতালদের বসতি স্থায়ীভাবে এই জেলায় শুরু হয় ১৭৯৩ সালের চিরস্থায়ী ভূমি বন্দোবস্ত আইন প্রনয়নের পর।[68] ১৭৯৩ সালে চিরস্থায়ী ভূমি বন্দোবস্ত আইনের নিয়ম অনুযায়ী জমিদারেরা নিজেরা জমি চাষ করতেন না, আদিবাসী কৃষকদের দ্বারা এই জমিগুলি চাষ করানো হত।[69] এই শাসন ব্যবস্থার মাধ্যমে জমিদারদের আয় যথেষ্ট পরিমানে হ্রাস পেয়েছিল। প্রকৃত চাষির শ্রম জমির মত উৎপাদন ক্ষেত্রে সুবিধা ভোগীদের মত একটি সম্পূর্ণ গোষ্ঠীর বোঝা বহন করতে হয়েছিল। ক্ষুদে জোত মালিক ও মহাজনদের কাছে জমি বন্ধক দিয়ে ঋন এবং ঋন পরিশোধের দায়ে জমি হারিয়ে

---

66. Khan. Abdul Majed Reza, *The Transition in Bengal, 1756-75: A study of Saiyid Muhammad Reza Khan,* Cambridge University Press, October 1969, P. 218.

67. গুপ্ত. রঞ্জন, *রাঢ়ের সমাজ ও অর্থনীতি ও গনবিদ্রোহ বীরভূম (১৭৪০-১৮৭১),* কলকাতা, সুবর্ণরেখা পাবলিকেশন, ২০০১, পৃ.- ১০২-১২৮

68. *Report of the Survey and Settlement Operations (1909-1914),* Birbhum, Calcutta, Bengal secretariat book depot, 1915, pp. 30-35.

69. Report of the Survey and Settlement Operations, Birbhum, (1909-1914), Calcutta, Bengal secretariat book depot, 1915, p. 40-47.

নিঃস্ব হয়ে যাওয়ার ঘটনা বাংলার আদিবাসী কৃষকদের মধ্যে লক্ষ করা যায়।[70] এই পরিস্থিতিতে পর্যায়ক্রমে সাঁওতাল আদিবাসী চাষিদের উপর চরম নির্যাতন চলতে থাকে। সাঁওতাল অধ্যুষিত অঞ্চলে লাভজনক মহাজনী সুদের কারবারের পাশাপাশি কামিওতি প্রথার[71] প্রচলন ছিল। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রচলনের সূত্রে প্রকৃত কৃষকের হাত থেকে জমি কেড়ে নিয়ে পত্তনিদারদের হাতে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শক্তি কৃষির মালিকানা তুলে দিয়েছিল।[72]

কৃষিকাজের মধ্য দিয়ে সাঁওতাল আদিবাসী কৃষকদের অর্থনৈতিক জীবনচিত্র পরিবর্তিত হতে শুরু করেছিল। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলাফল ও বীরভূমে আদিবাসীদের অবস্থা সম্পর্কে "শোচনীয় অবস্থা ছিল প্রায় বর্ণনাতীত" যা বিনয় ভূষণ চৌধুরী প্রকাশ করেছেন। বীরভূম অঞ্চলে আদিবাসীদের মধ্যে সাঁওতালদের বসতি অধিকাংশ ছিল। ইংরেজ বনিকদের আগ্রাসনে গ্রামবাংলার চাষিদের জীবিকাতে পরিবর্তন দেখা যায়। আদিবাসী চাষিরা যে উপায়ে জীবিকা অর্জন করেছিল, তা পুরনো গ্রামসমাজের সাথে বিলুপ্ত হয়ে যায়। দিশেহারা আদিবাসী কৃষক মজুররা বাঁচার তাগিদে অসঙ্গত জীবনে প্রবেশ করতে এক প্রকার বাধ্য হয়েছিল। কৃষকদের কাছে এই অবস্থায় ভূমি বন্দোবস্ত স্বীকার করে নেওয়া ছাড়া কোন উপায় ছিল না। ঔপনিবেশিক শাসনাধীনে বীরভূমের চতুর্দিকে ভূমি- বন্দোবস্তের ফলে আদিবাসী কৃষকেরা গ্রাম ত্যাগ করে নগরে পলায়ন করেছিল। কোম্পানির কর্মচারীর দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে[73] জানা যায়, ১৮০৩ সালে বীরভূমের আদিবাসী চাষিরা মরীয়া হয়ে ক্ষেতের কাজ ছেড়ে দেওয়ার অন্যতম কারণ হল জোরপূর্বক আদিবাসীদের জমি অধিগ্রহণ। বকেয়া খাজনার দায়ে ও ভূমিরাজস্ব জমা দিতে অসামর্থ্য হলে আদিবাসীদের নির্দয় ভাবে কয়েদ করা হত।[74] ঔপনিবেশিক শাসনের প্রথমদিকে বাংলায় রাজস্বহানি পরিলক্ষিত না হলেও, আদিবাসীরা কোনদিনই ব্রিটিশ সরকারের পূর্ণ দাবি মেটাতে সক্ষম ছিল না। এই অঞ্চলে কৃষকদের রাজস্ব

---

70. তদেব। পৃ. ৪০-৪৭

71. সাঁওতালদের ফসল, গবাদি পশু, এমনকি নিজেদের পরিবারশুদ্ধ খাজনার দায়ে বিকিয়ে যেত।

72. সুর. অতুল, *আঠেরো শতকের বাংলা ও বাঙালি, সাঁওতাল গণ সংগ্রামের ইতিহাস,* কলকাতা, সাহিত্যলোক পাবলিশার্স, ১৯৮৫, পৃ. ৭৬-৭৯

73. Guha. Ranajit, *Elementary Aspects of Peasent Insurgency in Colonial India,* Foreword by James Scott, Oxford, Oxford University press, August 1999, p. 33.

74. Chaudhuri. Binay Bhushan, *Peasant History of Colonial India: Peasant history of the Late Precolonial and colonial India,* India, Pearson Education, 1 December 2008, P. 50-52.

জমা দেওয়ার জন্য জমির ফসল কাটার উপর নির্ভর করতে হত। জমিদারদের থেকে প্রত্যাশিত ব্যবহার আদিবাসীদের মনে ক্ষোভের সঞ্চার করেছিল। 'জাত' ব্যবস্থার অন্তরদ্বন্দ্বে হিন্দু ও আদিবাসী চাষিদের সমান ব্যবহার ও সুযোগ প্রাপ্য ছিল না। এই তথ্যের বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, পেশার ভিত্তিতে আদিবাসী ও হিন্দুদের মধ্যে শ্রেণি বিভাজন ও আয় বন্টনে অসমতা বীরভূমে বিশেষভাবে লক্ষ করা গিয়েছিল। ১৮০২ থেকে ১৮৫২ সালের মধ্যে কৃষিজমির বিস্তার ঘটে উনপঞ্চাশ শতাংশ।[75] চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কবলে কৃষির উন্নতির বদলে আদিবাসী কৃষকরা জীবিকা সমস্যার সম্মুখীন হয়ে পড়েছিল। প্রথম দিকে কৃষি শ্রমিকের দুস্প্রাপ্যতা দেখা দিলেও কৃষি শ্রমিকের অভাব দূর হয়েছিল সাঁওতাল আদিবাসী ও পার্শ্ববর্তী জেলাগুলি থেকে আগত সাঁওতাল আদিবাসী রায়তদের আগমনে। সামাজিক ক্ষেত্রে তারা 'অচ্ছুৎ' ও 'নিচু' সম্প্রদায় হওয়ার কারণে আদিবাসী সাঁওতাল কৃষকদের কাজের সুযোগের সীমাবদ্ধতা ছিল। জমিতে বীজ বপন করা থেকে ফসল তোলা পর্যন্ত সমস্ত কাজ অল্প মজুরির বিনিময়ে আদিবাসী সাঁওতাল কৃষকদের দিয়ে করানো হত। জমি থেকে উচ্ছেদিত কৃষকদের অন্য কোথাও কাজের সুযোগ না থাকায়, তারা 'ভাগচাষীতে পরিণত হয়। চুক্তিভিত্তিক ক্ষেতের কাজে বিহার, উত্তরপ্রদেশে আদিবাসী সাঁওতালদের মজুর হিসাবে চাহিদা বৃদ্ধি পেয়েছিল। বীরভূমের বাইরে থেকে আসা ক্ষেত মজুর ভাড়াটেদের সংখ্যাও কম ছিল না। মরসুমের সময়ে জেলায় জেলায় ভাড়াটে আদিবাসী চাষিদের আগমন বীরভূমে বৃদ্ধির হার অধিক ছিল।[76] জমির উপর ব্যাক্তিগত মালিকানা থাকার ফলে অধিকাংশ জমিদাররা আদিবাসী সাঁওতালদের ১২ ঘন্টার[77] অধিক সময় কাজে যুক্ত করে রাখলেও কৃষকরা প্রতিবাদ করতে পারত না। এই ক্ষেত্রে মূলত আদিবাসী সর্দার বা মাঝিরা এই চাষাবাদের পরিচালনা করত। জীবিকার অভাবে জমি হারিয়েও তাদের মাটি আঁকড়ে বেঁচে থাকতে চেয়েছিল। দরিদ্র ও ভূমিহীন বীরভূমের সাঁওতাল কৃষকদের যেহেতু কৃষিখাত ছাড়া বেঁচে থাকার ভিন্ন পথ ছিল না তাই তারা জোতদারদের চরম বৈষম্যমূলক শর্তেই জমি চাষে বাধ্য হয়েছিল। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত পদ্ধতি দীর্ঘদিন স্থায়ী থাকার ফলে ভবিষ্যতে জমির মূল্য বৃদ্ধির সাথে রাজস্ব বৃদ্ধি করবার পথ প্রসারিত হয়েছিল। কৃষির প্রতি

---

75. Bhattacharya. Satyabrata, *Saumendranath Tagore and the present movements of Birbhum,* Viswa Bharati (PHD Scolar), may 2016, pp. 54-60.

76. *Report of the Survey and Settlement Operations (1909-1914),* Birbhum, Calcutta, Bengal secretariat book depot, 1915, pp. 53-65.

77. তদেব।

দারিদ্র্য ও অশিক্ষিত আদিবাসী কৃষকেরা দায়বদ্ধ থেকে বিঘা প্রতি নির্দিষ্ট হারে খাজনা দিতে বাধ্য হত। চাষ করা জমির প্রতি আদিবাসী চাষিদের যে অধিকার খর্ব হয়েছিল, তা তৎকালীন স্বনামখ্যাত প্রতিবেদন "সংবাদ প্রভাকর"[78] পত্রিকা পাঠ করলে উপলব্ধি করা যায়। এরিক উলফের উধৃতি দিয়ে স্কট বলেছেন[79] যে, উদ্বৃত্ত শাসক শ্রেণির কাছে জমি হস্তান্তরের বিনিময়ে ন্যূনতম নিরাপত্তা লাভের উপর আদিবাসী কৃষক বর্গের সামাজিক ভারসাম্য টিকে ছিল। প্রত্যক্ষ ব্রিটিশ শাসনের সূচনার কিছু কাল পর থেকে সামাজিক ভাবে আদিবাসীদের অর্থনীতিতে বাংলায় এই চিত্র পরিলক্ষিত হতে থাকে।

প্রসঙ্গ: উড়িষ্যা

১৮১৮ সালে, সম্বলপুর রাজ্যের নাগপুর রেসিডেন্সিতে মাধবজি ভোঁসলে এর সাথে অস্থায়ী চুক্তির অধীনে ব্রিটিশদের কাছে পদানত হয়েছিলেন। ১৮৬০ সালে সম্বলপুরের স্থানগুলি রাঁচি থেকে দক্ষিণ পশ্চিম সীমান্তের গভর্নর জেনারেলের দূত দ্বারা পরিচালিত হয়েছিল।[80] ছোটনাগপুর মালভূমি অঞ্চলের বাংলা ও বিহারে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রভাব অধিক পরিমানে দেখা দিলেও উড়িষ্যা রাজ্যে জমিদারী ও রাজস্ব প্রথা প্রচলিত ছিল।[81]

প্রসঙ্গ: ময়ূরভঞ্জ

ময়ূরভঞ্জ রাজ্য, রাজা জয় সিংহ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এই রাজ্যকে তিনি বিয়েতে পণ হিসাবে পেয়েছিলেন বলেন বলে জানা যায়। এই রাজ্যে সমস্ত জমিদারীত্ব ছিল ক্ষত্রিয় সম্প্রদায়ের। ১৮০৩ সালে উড়িষ্যা ব্রিটিশদের নিয়ন্ত্রনাধীনে থাকার পর উড়িষ্যা রাজ্যের ইতিহাসে এক নতুন যুগের সূচনা হয়েছিল। উড়িষ্যার যেটুকু অংশ বাংলা প্রেসিডেন্সি ও ছোটনাগপুর মালভূমির অংশ ছিল সেখানে, খুরদার রাজাদের সাথে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি জমিদারদের মত আচরণ

---

78. গুপ্ত. ঈশ্বর চন্দ্র (সম্পা.), *সংবাদ প্রভাকর, দৈনিক* পত্রিকা, সিউড়ি, (২রা আশ্বিন ১২৬২), পৃ.- ১০
79. Guha. Ranajit, *Elementary Aspects of Peasent Insurgency in Colonial India,* Foreword by James Scott, Delhi, Oxford University press, University press, August 1999, p. 67.
80. Hunter. W.W, *A statistical account of Bihar,* Vol-17, London, Trubner & co., 1877, p. 111-123.
81. *Report of the commissioners appointed to enquire into the famine in Bengal and Orissa,* Calcutta, Supriendent of Government, 1866, P. 40-47.

করেছিল। ১৮০৪ সালে তৎকালীন রাজাদের বিদ্রোহের কারণে তার সম্পত্তি সরকারী সম্পত্তিতে রূপান্তরিত হয়। ১৮০৪ সালে আদিবাসী কৃষকদের অর্থ প্রদানে অক্ষমতা থাকলে ব্রিটিশ সরকার তা মকুব করার ও রাজস্ব হ্রাস করার অনুমতি দেননি। এমনকি খরা, দুর্ভিক্ষ দেখা দিলেও বেঙ্গলের রেগুলেশন অনুযায়ী রাজস্ব গ্রহণ অব্যাহত ছিল। মাঠ জরিপ করে তাতে ভাড়াটিয়া বসানোর মধ্যে দীর্ঘমেয়াদী বন্দোবস্ত প্রচলিত হয়েছিল। ১৮১১ ও ১৮১২ সালে উড়িষ্যাকে দস্যুকৃত এবং বিজিত অঞ্চলে'[82] স্থায়ী বন্দোবস্তের প্রবর্তনকে অস্বীকৃতি জানানো হয়েছিল। স্বল্পমেয়াদী বন্দোবস্তগুলি উড়িষ্যার প্রজা ও জমিদার উভয়ের জন্যই অলাভজনক হয়ে পড়েছিল। এই স্বল্পমেয়াদী বন্দোবস্তগুলি ১৮৩৭ সাল পর্যন্ত প্রচলিত ছিল। জমির মালিকদের ঘন ঘন পরিবর্তন করা হয়েছিল ফলে কৃষকদের অধিকার রক্ষা হয়নি। জমিদাররা কর্তৃক প্রজাদের নির্যাতন করার কথা উঠে এসেছিল যদিও কৃষক প্রজারা এখানে 'বেথি- বেগার'[83] হয়ে শ্রম দান করত। কৃষকদের অজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে আইনের চেয়েও বেশি রাজস্ব আদায় করা হত।[84] অতিরিক্ত রাজস্ব কর ভারে জর্জরিত হয়ে পড়লে এবং রাজস্ব বকেয়া থাকলে উড়িষ্যার জমিদারদের সম্পত্তি হস্তান্তর হয়, যা বাঙালী ফাটকাবাজরা সেই সুযোগ অধিগ্রহণ করেছিল। কৃষকদের অজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে বেশি রাজস্ব আদায় করা হত।[85] এস এল ম্যাডাক্সের মতে, উড়িষ্যার প্রথম দিকের ভূমি রাজস্ব বন্দোবস্তগুলি অপর্যাপ্ত অনুসন্ধানের উপর তৈরি হয়েছিল।

ইংরেজ শাসক লর্ড কর্ণওয়ালিশের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তনের ফলে পল্লীপ্রান বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার সামাজিক ও অর্থনৈতিক কাঠামো পরিবর্তিত হয়েছিল। এই বন্দোবস্তের প্রভাব আদিবাসী সম্প্রদায়ের উপর বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যায় যেভাবে লক্ষ করা গিয়েছিল সেই একইভাবে ছত্রিশগড়ে লক্ষ্য করা যায়নি। চিরস্থায়ী নামক ভূমি বন্দোবস্তের ফলে একের পর এক সমস্যা আদিবাসীদের সম্মুখীন করতে হয়েছিল। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলাফলে কৃষকরা

---

82. *Feudatory states of Bihar and Orissa (ruling chiefs and Leading Personages),* Calcutta, Government of India, Central Publication Branch 1929, pp. 18-19.

83. তদেব। পৃ. ২০

84. তদেব। পৃ. ৩০-৪৫

85. তদেব।

স্ব- নির্বাচিত পেশা থেকে উচ্ছেদিত হলে কৃষক সমাজের মধ্যে অরাজগতা দেখা যায়।[86] তাই তারা জমিদার ও কোম্পানির তীব্র অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে বিদ্রোহের পথে আশ্রয় নিতে থাকে। ১৭৯৯ ও ১৮১২ খ্রিস্টাব্দে সরকার সমর্থিত দমনমূলক আইন প্রবর্তন ও জমিদাররা তাদের নবলব্ধ ক্ষমতার অপব্যবহার করার ফলে পুরোনো জমিদার ও জমিহীন আদিবাসী কৃষকদের মধ্যে দ্বন্দ্ব দেখা যায়। ব্রিটিশ প্রশাসক ও জমিদার বিরোধী বিদ্রোহের দামামা চতুর্দিকে বেজে উঠেছিল। আর্থ- সামাজিক পরিস্থিতি এতটাই বিশৃঙ্খল হয়ে উঠেছিল তাতে আদিবাসীরা বাধ্য হয়ে বিদ্রোহের পথে অবতীর্ণ হয়েছিল।

ব্রিটিশ বিরোধী উপজাতি কৃষক বিদ্রোহ ও মূল লক্ষ্য

ঔপনিবেশিক শাসনকালে ছোটনাগপুর মালভূমি অঞ্চলের আর্থ- সামাজিক কাঠামোর পরিবর্তিত রূপে, ছোটনাগপুর মালভূমির অধিকাংশ ক্ষেত্র জুড়ে যে আদিবাসী কৃষক বিদ্রোহ দেখা দিয়েছিল তা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলাফল ছিল। অধিকাংশ কৃষক বিদ্রোহ জমিদার ও ব্রিটিশদের প্রতি পুঞ্জিভুত ক্ষোভ থেকে আদিবাসী কৃষকরা একপ্রকার বাধ্য হয়েই তারা এই পথ অবলম্বন করেছিল। আদিবাসী বিদ্রোহগুলির সংগঠিত হওয়ার পশ্চাতে ব্রিটিশ সরকারের জোর করে চাপানো ভূমি বন্দোবস্ত নিয়ম নীতি ও জমিদারদের অত্যাচারের ইতিহাস জড়িত ছিল বলে একাধিক ঐতিহাসিক স্বীকার করেন। ভূমিরাজস্ব বৃদ্ধি ছাড়া ব্রিটিশ সরকার রচিত আইন ও বিচার ব্যবস্থা, জমিদারদের তীব্র অত্যাচার, খ্যাদাভাব, কুটির শিল্পের ধ্বংস অর্থাৎ তৎকালীন সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতি আদিবাসীদের বিদ্রোহ সংগঠিত করতে বাধ্য করেছিল। এ প্রসঙ্গে সুরেশ কুমার সিংহ মনে করেন, আদিবাসী বিদ্রোহগুলির তিনটি পর্যায় লক্ষ করা যায়। ১৭৯০ থেকে ১৮৬০ সালের পর্যায়ে আদিবাসী বিদ্রোহগুলি সংগঠিত হয়েছিল তা মূলত ছিল 'অধিকার আদায়ের আন্দোলন'।[87]

বিদেশী শাসন ও সামন্তবাদের বিরুদ্ধে আদিবাসী জনগণের ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম জাতীয়তাবাদের ভিত্তিকে দৃঢ় ও ব্যাপক করে তুলেছিল। বাংলা, বিহারকে কেন্দ্র করে আদিবাসী

---

86. রহমান. আশহাবুর, *বাংলাদেশের কৃষি কাঠামো কৃষক সমাজ ও উন্নয়ন,* বাংলাদেশের কৃষি কাঠামো কৃষক সমাজ ও উন্নয়ন, ঢাকা, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, প্রথম প্রকাশ, জুলাই ১৯৮৬, পৃ. ১০০-১২০।

87. Chaudhuri. Binay Bhushan, *Peasant History of Colonial India: Peasant history of the Late Precolonial and colonial India,* India, Pearson Education, 1 December 2008, P. 55.

মুণ্ডা, ভূমিজ, কোল, তিলকা মাঝি, হো, চের, সাঁওতাল, সর্দারি বিদ্রোহ[88] দেখা দিয়েছিল। ঔপনিবেশিক শাসন ছোটনাগপুর মালভূমির গ্রাম সমাজের অচলায়তন ভেঙ্গে আদিবাসী কৃষকদের শোষণ উৎপীড়নের শিকারে পরিণত করেছিল। আদিবাসীরা প্রথমে দিশেহারা হয়ে বিক্ষিপ্তভাবে সংগ্রাম আরম্ভ করলেও পরবর্তীকালে সংগঠিত ও সংঘবদ্ধ রূপ গ্রহণ করে বিস্তীর্ণ অঞ্চলে বিস্তারলাভ করেছিল। বিদেশী শাসকদের বিরুদ্ধে সামগ্রিক সংগ্রামের একেবারে প্রথমের সারিতে আদিবাসীদের সর্বাধিক আত্মত্যাগের পরিচয় পাওয়া যায় বিদ্রোহগুলি থেকে।[89] এ জাতীয় বিদ্রোহগুলির নীতি লক্ষ্যহীন[90] ছিল বলে ইতিহাসের মূল্যায়নে প্রতিভাত হয়েছিল যদিও তা নিয়ে যদিও একাধিক প্রমানের অভাব রয়েছে। আদিবাসী কৃষক বিদ্রোহের লক্ষ্য কি ছিল, তা নিয়ে বিতর্ক তৈরি হয়েছিল কৃষক বিদ্রোহের ইতিহাসে। ঐতিহাসিক সুপ্রকাশ রায়ের মতে ব্রিটিশ বিরোধী অবস্থান এই আন্দোলনগুলির মূল লক্ষ্য ছিল না বরং "জমিদার শ্রেণির হাত থেকে ভূমিস্বত্বের পুনরুদ্ধার"[91] ছিল সকল কৃষক বিদ্রোহের মূল লক্ষ্য। প্রতিটি আদিবাসী বিদ্রোহ ভিন্ন ভিন্ন বৈশিষ্ট্য নিয়ে সংগঠিত হয়েছিল। এই বিদ্রোহগুলি কখনো 'কৃষক বিদ্রোহ' বা নিজ রাজ্য প্রতিষ্ঠা করা বা ব্রিটিশ শক্তি ও জমিদার বিরোধী উদ্দেশ্য ছিল বলে সমালোচিত হয়েছিল। আর্থ- সামাজিক এই পটভূমিতে আদিবাসীদের বিদ্রোহগুলিকে বর্তমানে 'উপজাতি' বিদ্রোহ নামে পরিচিত করা হয়[92] আদিবাসী বিদ্রোহগুলি একে অপরের সাথে সম্পৃক্ত না থাকলেও একে অপরের থেকে অনুপ্রাণিত হয়েছিল। প্রতিটি বিদ্রোহ পূর্ববর্তী বিদ্রোহ থেকে বৃহৎ আকারে বিস্তার লাভ করেছিল। কৃষকদের মধ্যে অরাজগতা বৃদ্ধি পেলেও রাজনৈতিক জ্ঞান বিশেষভাবে সাঁওতাল আদিবাসীদের মধ্যে ছিল না বলে অনেক ঐতিহাসিক মনে করেন। সেই কথার প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, রাজনৈতিক জ্ঞান অবর্তমান থাকা স্বত্বেও আদিবাসী কৃষকরা

---

88. Mishra. K Kamal(Ed), *Tribal Movements in India*, vol-2, Delhi, Manohar Publication, First Published 1983, P. 1-17.

89 বাস্কে. ধীরেন্দ্রনাথ, *সাঁওতাল গণ সংগ্রামের ইতিহাস,* কলিকাতা, পাল পাবলিশার্স, ফেব্রুয়ারি ১৯৬০, পৃ.-১-১০

90. রায়. সিদ্ধার্থ গুহ, *আধুনিক ভারতের ইতিহাস,* কলিকাতা, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, প্রথম প্রকাশ ১৯৯৬, পৃ.-৫৫।

91. রায়. সুপ্রকাশ, *ভারতের কৃষক- বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম,* কলকাতা, র‍্যাডিক্যাল প্রকাশন, প্রথম প্রকাশ জুলাই, ১৯৬৬, পৃ. ২০-২৫।

92. Bardhan. A. B, *The Unsolved Tribal Problem,* New Delhi, Communist Party of India, 1973, p. 5.

নিজেদের অধিকারের দাবিতে বিদ্রোহের পথে একে একে তরান্বিত হতে থাকে। আদিবাসী কৃষকেরা তাদের নিজেদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠেছিল তা বিদ্রোহগুলি সংগঠনের মধ্য দিয়ে পরিলক্ষিত হয়েছিল। অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম হবসবমের[93] গ্রন্থে বিদ্রোহীদের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনার পূর্বাভাস লক্ষ্য করেছেন, যা রণজিৎ গুহ স্বীকার করেননি। বরং রণজিৎ গুহ মনে করেন "গ্রামীণ মানুষের সশস্ত্র বিদ্রোহে এমন কোন উপাদান ছিল না, যা রাজনৈতিক"[94] বলা যেতে পারে। রণজিৎ গুহর মতামতকে তৎকালীন পর্যায়ে স্বীকার করে নিলেও ঔপনিবেশিক পরবর্তীকালে রাজনৈতিক বিছিন্নতাকে কেন্দ্র করে আদিবাসীদের রাজনৈতিক জ্ঞান নিয়ে প্রশ্ন উঠেছিল। এই বিদ্রোহগুলি পরবর্তীকালে ঝাড়খণ্ড রাজ্য গঠন আন্দোলনে সহায়তা করেছিল। পূর্ব ভারতের ছোটনাগপুরে আদিবাসীদের অস্তিত্বের যে সংকট দেখা গিয়েছিল তা শুচিব্রত সেন স্বীকার করেছেন। তিনি মনে করেন আদিবাসীদের লড়তে হয়েছিল দুই শক্তির বিরুদ্ধে এক ছিল পাশ্চাত্য ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শক্তি অন্যটি হল বর্ণ হিন্দু আধিপত্যবাদী শক্তি।[95] অন্যদিকে বলা যেতে পারে যে ঔপনিবেশিক পর্যায়ে আদিবাসীদের বিদ্রোহের লক্ষ্যগুলির মধ্যে অন্যতম লক্ষ্য ছিল, 'জাতীয় স্বার্থের' নামে প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহার থেকে আদিবাসীদের অধিকার হ্রাস করা। এই সমস্ত কারণে, নিত্যদিন খেটে খাওয়া মেহনতি আদিবাসী কৃষকেরা প্রতিবাদের জন্য অন্য কোনও ভাষা না পেয়ে অস্ত্র তুলে নিয়েছিল।

আদিবাসী কৃষক সম্প্রদায় সমাজের সুগঠিত শ্রেণি হওয়ার ফলে ১৯ শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত বাংলা ও বিহার ছাড়াও থানে, আসাম, পাঞ্জাব, কেরল, ত্রিপুরায় কৃষক বিদ্রোহ[96] স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে প্রসারিত হয়েছিল। জমিতে বাঁধা শ্রমিকের দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে নানা সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছিল কৃষকদের। গণমুক্তি পরিষদ ও কৃষক সভা শুরু থেকেই স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করে শ্রেণি চেতনায় সচেতন করার কাজে ব্রতী হয়েছিল বলেই আদিবাসী এবং

---

93. Raghaviah. V, Tribal Revolts, Nellor, Andhra Rashtra Adimajati Sevak Sangh, 1971, P. 13.

94. রায়. সিদ্ধার্থ গুহ, *আধুনিক ভারতের ইতিহাস,* কলিকাতা, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, প্রথম প্রকাশ ১৯৯৬, পৃ. ৫৫।

95. Sen. Suchibrata, *The Santals crisis of Identity and Integration,* Ratna Prakashan, First Publication 1997, P. 1-7.

96. সুরজিত. হরিকিশেন সিং, গোদাবরী পারুলেকর, ভি এস অচ্যুতানন্দন, বীরেশ মিশ্র, অচিন্ত্য ভট্টাচার্য, *কৃষক আন্দোলনের সংগ্রামী অধ্যায়,* কলকাতা, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, প্রথম প্রকাশ ১৯৮৬, পৃ. ৫৫, ১৩৫

আদিবাসী ভিন্ন কৃষকদের মধ্যে শ্রেণিগত ঐক্য সম্ভব হয়েছিল।[97] উনবিংশ শতাব্দীতে সৃষ্ট বাংলা সাহিত্যের মধ্যে বঙ্গদেশ ও বিহারব্যাপী কৃষক- বিদ্রোহের বিকৃতি স্পষ্ট হয়েছিল। এই বিদ্রোহগুলিতে বারংবার উপজাতি শব্দটি ব্যবহার করার ফলে আদিবাসী কৃষকদের সাথে অন্যান্য সম্প্রদায়ভুক্ত কৃষকদের লক্ষ্য ভিন্ন করে দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছিল। উপজাতি বিদ্রোহকে আদিবাসী কৃষক বিদ্রোহ বলাই যুক্তিসঙ্গত ছিল কারণ আঠেরো ও উনবিংশ শতকের অধিকাংশ আদিবাসী কৃষক বিদ্রোহ গুলিতে বাঙালি কৃষকদের সাথে আদিবাসী কৃষক গোষ্ঠীর মধ্যে দৃঢ় ঐক্য লক্ষ্য করা যায়নি।

বীরভূম ও বাঁকুড়ার পাহাড়িয়ার আদিবাসী কৃষক বিদ্রোহ

বীরভূমের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি সম্পূর্ণরূপে কৃষির উপর নির্ভরশীল থাকায়, এই স্থানের জনসংখ্যা বৃদ্ধি সরাসরি অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটিয়েছিল। একগুচ্ছ গ্রাম নিয়ে গড়ে উঠেছিল স্বয়ংসম্পূর্ণ বীরভূমের গ্রাম সমাজ ও কৃষির সাথে তৎকালীন মানুষের পারস্পারিক সহযোগি সম্পর্ক যা গভীর ভাবে সম্পর্কিত ছিল। এই সম্পর্কের ঘনত্ব তৈরি হয়েছিল জমির সাথে যুক্ত রায়ত অর্থাৎ আদিবাসী সাঁওতালদের সাথে। বীরভূমে সাঁওতাল কৃষকদের পাশপাশি জঙ্গল ছেড়ে গ্রামীণ জনপদগুলিতে পাহাড়িয়া নামক আরেক আদিবাসী সম্প্রদায়ের বাস লক্ষ করা যায়। ব্রিটিশ শাসনের সূচনার পর বন্য পশুর আক্রমণ ও জমিদারদের উপদ্রব পাহাড়িয়া নামক আদিবাসীদের নিত্য নৈমিত্তিক জীবনে পরিবর্তন এনেছিল। বীরভূম ও সন্নিহিত অঞ্চলগুলিতে পাহাড়িয়া নামক আদিবাসীদের বিদ্রোহ দেখা দিয়েছিল। ব্রিটিশ শাসনের অধীনে পাহাড়িয়াদের আভ্যন্তরীণ সংগ্রামকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়নি। ক্যাপ্টেন শেরয়িল এর দেওয়া তথ্য থেকে ৯২১ টি গ্রামে ৩৩, ৭৮০ জন পাহাড়িয়া আদিবাসীদের বাস[98] সম্পর্কে জানা যায়। ১৮৭২ সালের আদমসুমারি অনুযায়ী তাদের সংখ্যা দ্বিগুণ বৃদ্ধি পেয়ে ৬৮,৩৩৬ এ পরিণত হয় এবং দামিন- ই- কোহ এর অন্তর্ভুক্ত হয়।[99] বীরভূমের পাহাড়ি অঞ্চলের জনগণের উৎপত্তি, ভাষা, ধর্ম সবটাই ছিল ভিন্ন এবং 'মান্ধাতা' আমলের বলে বর্ণনায় উল্লেখ পাওয়া যায়। ১৭৭০

---

97. *Labour Matters / Unrest/ Santhal Activist in Birbhum, 1946*, Birbhum District, West Bengal, P. 25-36.

98. Mopherson. H, *Report of the Survey and settlement operations,* Santal Paragana, Calcutta, Bengal secretariat book depot, 1909, Pp. 161-163.

99. Hunter. W. W., A *Statistical account of Bengal (Bhagalpur District and Santal Paraganas),* VOL-XIV, London, Trubner & Co., 1877, p. 288.

সালের দুর্ভিক্ষের পর বছরগুলিতে পাহাড়িয়াদের আক্রমণগুলি নিচু দেশের উপর ছিল নিয়মতান্ত্রিক। নিঃসন্দেহে লুঠ ছিল তাদের কাছে প্রধান। চাষাবাদের প্রতি ছিল তাদের অরুচি। এই লুঠের প্রতিশোধে ব্রিটিশদের সাথে তাদের দ্বন্দ্ব শুরু হয়েছিল।[100] পাহাড়িয়ারা লুঠ ও ডাকাতির মাধ্যমে তাদের জীবিকা নির্বাহ করত। পাহাড়িয়াদের উপর ব্রিটিশদের অত্যাচার অন্যদিকে বন্য পশুর ক্রমবর্ধমান অত্যাচার লক্ষ করা যায়। তবে পাহাড়িয়াদের নির্মূলকরণ কালেক্টেরদের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ ছিল। তৎকালীন পর্যায় থেকে পাহাড়িয়া আদিবাসীদের সাথে ইংরেজদের সংঘর্ষ শুরু হয়েছিল। পাহাড়িয়াদের পুরোপুরি নিষ্পেষণের জন্য প্রায়ই ব্রিটিশ সৈনরা কোম্পানির উর্দি পরিধান করে চলাচলের পথে বিশৃঙ্খল আচরন ও প্রতারনা করত[101] ফলস্বরূপ রাশি কৃত কঠোর অনুশাসন চলতে থাকে পাহাড়িয়া আদিবাসীদের উপর।

জমির মালিকদের বারংবার জঙ্গল সাফ করবার জন্যে ব্রিটিশদের আদেশ নির্ধারিত হয়েছিল। বীরভূমের মধ্য দিয়ে নতুন সড়ক তৈরী করার জন্য লর্ড কর্নওয়ালিস সরকারি অনুমোদনে বাধ্য হয়েছিল।[102] সড়ক তৈরিতে পাহাড়িয়াদের ব্যবহৃত ভূমি জোরপূর্বক ভাবে ব্যবহার করা হয়। অরণ্য বা জঙ্গলের পণ্য সামগ্রি পাহাড়িয়ারা ব্যবহার করতে পারত না। সেই পণ্য শুধুমাত্র কোম্পানির ব্যবসার কাজে ব্যবহার করা হত তাই এই ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল।[103] ভূমিরাজস্বের মত একটা স্থায়ী ব্যবস্থা পাহাড়িয়াদের উপর চালু করার জন্য প্রয়োজনীয় প্রক্রিয়া শুরু করা হয়েছিল। ভূমি রাজস্ব বাকি পড়ার দায়ে তৎসংলগ্ন এলাকায় পাহাড়িয়া অধিবাসীরা ডাকাতির মত কাজে লিপ্ত হতে থাকে। এ কথা প্রসঙ্গে বলা যায় খাজনা বাকি পড়ার দায়ে ভাগলপুর ও রাজমহলের পাহাড়িয়া আদিবাসীরা অভাবের তাড়নায় পাহাড়ি অঞ্চলে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল। সরকারি রেকর্ডে প্রায় বন্যজন্তু লুঠ হওয়ার মত পাহাড়িয়াদের মৃত্যুর উল্লেখ পাওয়া যায়। বীরভূমের অঞ্চলবাসীদের বর্ণনা ও জনৈক নির্ভরযোগ্য পুরাতত্ত্ববিদদের বক্তব্য থেকে জানা যায় যে, সমতলে হানাদার, দুর্দমনীয় চোর, খুনির দল পাহাড়িয়াদের গুলি করে হত্যা করা হত।[104] ঔপনিবেশিক পর্যায়ে পাহাড়িয়ারা ছিল সন্নিহিত জেলাগুলির পক্ষে ক্রমাগত যন্ত্রণা ও

---

100. তদেব। পৃ. ৩১০-৩৩৬

101. হান্টার. ডবলু ডবলু, অসীম চট্টোপাধ্যায় (অনু.), *গ্রাম বাংলার ইতিকথা,* কলকাতা, সুবর্ণরেখা পাবলিকেশন, প্রথম প্রকাশ ১৯৮৪, পৃ. ৯১-১১০

102. তদেব। পৃ. ১৩৮-১৪৮

103. তদেব। পৃ. ১৩৮-১৪৮

104. তদেব। পৃ. ১৩৮-১৪৮

আতঙ্কের হেতু। তীর ধনুক ছিল তাদের সব সময়ের সঙ্গি। বীরভূম ও বাঁকুড়া জেলাও ৪০০০ শক্তিশালী সাঁওতাল আদিবাসী অস্থিরতার সম্মুখীন হয়েছিল।[105] তারা গেরিলা পদ্ধতির সাহায্য নিয়ে বিদ্রোহ করেছিল বলে ব্রিটিশদের পক্ষে এই বিদ্রোহে সাফাল্য লাভ অসুবিধাজনক ছিল। ১৮১৩ সালে বীরভূমের জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের চিঠিতে জানা যায় দীর্ঘকাল ধরে জেলার দক্ষিণ পশ্চিম ও উত্তর পশ্চিমের এক অংশে জমিদাররা, পার্বত্য ও অরণ্যঘাটে ঘাটোয়ালদের নিযুক্ত করেছিলেন[106] 'পাহাড়িয়া', 'চুয়াড়' প্রভৃতি আদিবাসীদের আক্রমণ প্রতিরোধ করতে। ১৮০১ সালে জানুয়ারি মাসে সারহুত দেওঘর পরগণায় ঘাটোয়াল বিদ্রোহ শুরু হয় দীর্ঘদিন ধরে অর্থাৎ ১৮১৪ সাল পর্যন্ত চলতে থাকে।[107] বিদ্রোহ পরবর্তী পাহাড়িয়া আদিবাসীদের, সমাজে প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হয় এবং বাধ্য হয়ে তারা বন্য জঙ্গলে ফিরতে বাধ্য হয়।[108] ১৮২৩ সালের আদেশের ভিত্তিতে ব্যক্ত হয়েছিল যে, যেহেতু পাহাড়িয়ারা রাজস্ব প্রদান করেনি তাই তাদের জমির উপর কোনও অধিকার থাকবে না। কালেক্টারের প্রধান সহযোগী, এই রাজ্যের আদিবাসীরা সরকারের বিরোধী হয়ে পাহাড়িয়াদের সাথে ঐক্যবদ্ধ হয়ে বিদ্রোহের জন্য প্রস্তুত হয়। রাজস্ব সংক্রান্ত আইন সমূহের প্রতিটি জেলায় কৃষি- অর্থনীতির প্রতিটি দিক খুঁটিনাটি ভাবে খতিয়ে দেখা হতে থাকে। এককথায় বাংলার আদিবাসী গ্রামীণ জীবন ও হরেক রকমের অত্যাচারের চুলচেরা বিচার উৎঘাটিত হয়েছিল। বীরভূম ও সন্নিহিত পশ্চিম সীমান্তব্যাপী এই বিশৃঙ্খলা প্রায় দীর্ঘস্থায়ী গৃহ যুদ্ধের পর্যায়ে পৌছেছিল। এই বিদ্রোহের ফলস্বরূপ, প্রশাসনিক কাঠামোতে পরিবর্তনের সিধান্ত নেওয়া হয়েছিল।

প্রসঙ্গ: ঘরুই বিদ্রোহ

ঘরুই বিদ্রোহ ছিল ঔপনিবেশিক পর্যায়ে ছোটনাগপুর মালভূমি অঞ্চলের অন্যতম বৃহৎ কৃষক বিদ্রোহ। বলরামপুর জমিদারীর অন্তর্গত কেদারকুন্ডু পরগণার ঘরুই নামক আদিবাসীদের বাস ছিল। মেদিনিপুর, বাঁকুড়া, সিংভুম, ধলভুম, মানভুমের স্থানীয় অধিবাসী অর্থাৎ ঘরুই নামক

---

105. *বাংলার কথা,* (দৈনিক পত্রিকা), কলিকাতা, ১৭ই অগ্রহায়ন ১৩৩৫, (৩রা ডিসেম্বর, ১৯২৮), পৃ. ৭

106. হান্টার. ডবলু ডবলু, অসীম চট্টোপাধ্যায় (অনু), *গ্রাম বাংলার ইতিকথা,* কলকাতা, সুবর্ণরেখা পাবলিকশন, প্রথম প্রকাশ ১৯৮৪, পৃ. ১৪১-১৪৮

107. তদেব। পৃ. ১৪১-১৪৮

108. মুখোপাধ্যায়. অনিমা, *আঠেরো শতকের বাংলা পুঁথিতে ইতিহাস প্রসঙ্গ,* কলকাতা, সাহিত্যলোক পাবলিকেশন, প্রথম প্রকাশ ১৯৮৭ আগস্ট, পৃ. – ৭৬।

আদিবাসীরা[109] এই বিদ্রোহে যোগদান করেছিল। অনুন্নত ধরনের চাষবাস ও পশুপালন, জীবিকা নির্বাহের একমাত্র পথ হলেও যুদ্ধ ছিল তাদের প্রধান পেশা। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এই অঞ্চলের জমির উপর চড়া হারে ভূমি রাজস্ব ধার্য হলে তারা বিরোধিতা করতে শুরু করেছিল। এই বিদ্রোহ বাংলা ও বর্তমান ঝাড়খণ্ডের নানা অংশ জুড়ে বিক্ষিপ্ত ভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল। বিদ্রোহীদের নৃশংসভাবে গাছের সাথে বেঁধে ফাসি[110] দেওয়ার কথা এই বিদ্রোহের তথ্যে উঠে এসেছিল। এই বিদ্রোহ ব্যাপক আকারে ধারন করতে থাকলে কোম্পানি, নির্মম অত্যাচারের মাধ্যমে এই বিদ্রোহকে দমন করতে চেয়েছিল। পরবর্তীকালে এইসব অঞ্চল ইংরেজদের দখলে এলে ঘরুই নামক আদিবাসী কৃষকরা দ্বিতীয় বার বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিল নরহর চৌধুরীর জমিদারীর সমকালীন। এ প্রসঙ্গে বলা যায় যে, জমিদারের অত্যাচারে বারংবার ঘরুই সমাবেশের উপর অতর্কিত আক্রমণ করে জমিদার ৭০০ ঘরুইদিকে হত্যা করেছিল।

প্রসঙ্গ: মুণ্ডা আদিবাসী বিদ্রোহ

ছোটনাগপুর মালভূমিতে মুণ্ডা নামক আদিবাসী বিদ্রোহ শুরু হয়েছিল ১৭৮৯ খ্রিস্টাব্দে কিন্তু ১৮২২ খ্রিস্টাব্দে মুণ্ডা বিদ্রোহ চরম পর্যায়ে প্রসারিত হয়েছিল। জমি থেকে আদিবাসী কৃষকদের উচ্ছেদ শুধু নয় বরং খ্রীস্টান ধর্মে ধরমান্তকরনের মধ্য দিয়ে মুণ্ডা বিদ্রোহের সূচনা হয়েছিল। এই বিদ্রোহে মুণ্ডাদের পাশাপাশি যোগ দেয় ওঁরাও[111] নামক আদিবাসীরা। এই বিদ্রোহের উৎসাহদাতা ছিলেন ছোটনাগপুরের জমিদার গোবিন্দ শাহী। এই বিদ্রোহ ছিল মূলত মুণ্ডাদের নিজস্ব 'পরিচিতি বা অস্তিত্ব রক্ষার' বিদ্রোহ। বিরসা মুণ্ডা যে বিদ্রোহে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তাতে সাঁওতাল আদিবাসী বিদ্রোহের আদর্শগত প্রভাব কম থাকলেও খ্রিস্টীয় ধর্মের আত্মসমালোচনা ও সংশোধনবাদ এবং মিশনারি সেবাবৃত্তি বিরসাকে প্রভাবিত করেছিল।[112] এই প্রভাব স্বশাসিত

---

109. রায়. সুপ্রকাশ, *ভারতের কৃষক- বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম,* কলকাতা, র‍্যাডিক্যাল প্রকাশন, প্রথম প্রকাশ জুলাই, ১৯৬৬, পৃ. ৫৪

110. তদেব। পৃ. ৫৫

111. Ghosh. Sisir kumar, *A story of Patriotism in Bengal,* Kolkata, Sahitya Akademi, p. 391

112. Mopherson. H, *Report of the Survey and settlement operations,* Santal Paragana, Calcutta, Bengal secretariat book depot, 1909, Pp. 48-52.

ও স্বয়ংসম্ভার মুণ্ডা আদিবাসী সমাজকে বন্দী করে তাদের স্বাতন্ত্র্যবোধ ও পরিচিতিকে ধ্বংস করে ভারতে সাম্রাজ্যবাদের ভিত্তিকে সুপরিকল্পিত আর দৃঢ় ভাবে প্রসারিত করতে চেয়েছিল ব্রিটিশ শক্তি। গোঁড়া থেকেই ব্রিটিশরা 'মুণ্ডা' আদিবাসীদের ইংরেজি ভাষায় শিক্ষিত করার নামে আদিবাসী পরিচিতি ধ্বংস করতে চেয়েছিল। এই উপলব্ধি হওয়া মাত্র বিরসা মুণ্ডা পাদরীদের খ্রিস্টান মিশনারী স্কুল ছেড়ে দিয়ে নিজ দেশ তামারে ফিরে আসেন। দেশে ফিরে এসে বিরসা বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষিত হন এবং[113] এই বিদ্রোহের পথে প্রসারিত হয়েছিলেন। ছোটনাগপুরে বিরসার এই বিদ্রোহের পর ভক্তিবাদ ও সমাজ সংস্কারে সংশোধন চেতনা আদিবাসীদের মনে নেতৃত্বের কাজ করেছিল। এই অঞ্চলে কোম্পানির সরকার বিরোধী সশস্ত্রও সংগ্রাম চুয়াড় বিদ্রোহের সময় থেকে শুরু হয়েছিল। বিরসার পরিচালিত আদর্শ সাঁওতাল নেতৃত্ব সিধু, কানুর তুলনায় ভিন্ন ছিল। ধর্মকে হাতিয়ার করে রাজনৈতিক ভাবে আদিবাসীদের উপর প্রভাব বিস্তার করার চেষ্টা করা হয়েছিল। ধর্ম ও রাজনীতির সম্পর্কে একটি ভেদাভেদ লক্ষ করা গিয়েছিল। বিরসা মুণ্ডা ধর্ম পরিবর্তনের মধ্যে রাজনৈতিক প্রভাবের সন্ধান পেয়েছিলেন বলেই এই বিদ্রোহ সংগঠিত করেছিলেন। মুণ্ডা বিদ্রোহে বার বার ধর্ম ও রাজনীতির "অবিচ্ছেদ্য যোগের" কথা প্রসঙ্গে ঐতিহাসিক গৌতম ভদ্র বলেন যে, "স্বল্প সময়ের মধ্যে বীরসার ধর্মীয় আন্দোলন যে রাজনৈতিক আন্দোলনে রুপান্তরিত হওয়ার প্রধান কারন ছিল বীরসার ঘোষিত ধর্ম"।[114] যে ধর্ম প্রচলিত অর্থে কোন বিশেষ ধর্ম ছিল না। আন্দোলনের রাজনৈতিক প্রভাবে বিরসা মুণ্ডা ধীরে ধীরে প্রতিবাদী নেতা হয়ে উঠেছিল। বীরসার পরিচিতি রাজনৈতিক নেতা থেকে ধর্মীয় নেতার হবার প্রেক্ষাপটে পূর্ব ভারতের রাজনৈতিক কৃষক আন্দোলনে ধর্মীয় প্রভাব লক্ষ্য করা গিয়েছিল। সাম্রাজ্যবাদী শক্তির প্রতিষ্ঠা ব্রিটিশরা শুধু অর্থনীতির মাধ্যমেই নয় ধর্মের মধ্য দিয়েও নিজেদের আধিপত্যকে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিল তা এই বিদ্রোহের চরিত্র দেখলে স্পষ্ট রুপ ফুটে উঠে। অর্থনৈতিক শোষণ ও বঞ্চনা বিদ্রোহের কারন হিসাবে স্বীকার করে নিলেও আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের দাবি ও সংস্কৃতি রক্ষার তাগিদ ছিল এই বিদ্রোহের মুখ্য উদ্দেশ্য।

প্রসঙ্গ: হো আদিবাসী বিদ্রোহ

---

113. মিত্র. গৌরিহর, *পশ্চিমবঙ্গ সাঁওতাল বিদ্রোহ সংখ্যা,* পশ্চিমবঙ্গ, তথ্য সংস্কৃতি বিভাগ, ২৫ আগস্ট ১৯৯৫, পৃ. – ২৩-২৫।

114. ভদ্র. গৌতম, *ইমান ও নিশান (বাংলার কৃষক চৈতন্যের এক অধ্যায় ১৮০০-১৮৫০),* কলকাতা, সুবর্ণরেখা পাবলিকেশন, ১৯৯৪, পৃ.- ১৬।

হো ছিল মূলত ছোটনাগপুর ও সিংভুম অঞ্চলের বাসিন্দা। ১৮২০ সালে পোড়াহাটের রাজা ব্রিটিশ শাসকদের করদ রাজ্যে পরিণত হয়েছিল। বিপুল পরিমানে করের বোঝা হো আদিবাসীদের জন্য কঠিন হয়ে পড়েছিল এবং কর সঠিক সময়ে পৌছাতে না পারায় এই অঞ্চল ব্রিটিশ রাজের অংশ বলে পরিচিতি পেয়েছিল। ব্রিটিশ শাসকদের দাবি তৎকালীন সময়ের রাজা মেনে নিলে বলপূর্বক উচ্চহারে রাজস্ব আদায়ের চেষ্টা করা হয়। এই সমস্যা থেকে নির্গত হওয়ার জন্য হো সম্প্রদায়ের আদিবাসীরা ক্ষোভে ফেটে পড়েছিল এবং বিদ্রোহ শুরু করেছিল। হো আদিবাসীরা বিদ্রোহ পরবর্তীকালে পোড়াহাটের রাজাকে 'লাঙ্গল কর' দিতে অস্বীকার করেছিল। এই বিদ্রোহ পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে ব্রিটিশ শক্তির প্রতি বিরোধিতার পাশপাশি হিন্দু রাজাদের প্রতি ক্ষোভ বিশেষভাবে লক্ষ করা গিয়েছিল।[115]

প্রসঙ্গ: ভূমিজ আদিবাসী বিদ্রোহ

ভূমিজ বিদ্রোহ, যা গঙ্গা নারাইনের হাঙ্গামা নামেও পরিচিত ছিল। পূর্ববর্তী বঙ্গ রাজ্যের মেদিনিপুর জেলার ধল্ভুম এবং মানভুমে ১৮৩২ সালের নভেম্বর মাসে ভূমিজ নামক আদিবাসীদের বিদ্রোহ দেখা দিয়েছিল। এই বিদ্রোহের নেতা ছিলেন উচ্চ বর্ণের নেতা গঙ্গা নারায়ণ সিং। জমির মালিকানা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির হাতে যাওয়ার পর আদিবাসী ভূমিজদের উপরে চরম বিপর্যয় নেমে এসেছিল। ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ শক্তি রাজস্ব গ্রহণ ব্যতীত জমিতে চাষাবাদ নিষিদ্ধ করে দিয়েছিলেন। সঠিক সময়ে রাজস্ব দিতে না পারলে চক্রবৃদ্ধি হারে রাজস্ব কর বৃদ্ধি পেত।[116] এমনকি আদিবাসী ভূমিজদের উপর নেমে এসেছিল অকথ্য অত্যাচার। এই দুই ঘটনার পরিস্থিতির মধ্যে ভূমিজদের কাছ থেকে বাজেয়াপ্ত করে জমি নিলাম করে দেওয়া হয়েছিল। এই বিদ্রোহের পশ্চাতে ভূমিজ প্রজাদের প্রতিরোধ দেখা গেলেও বিদ্রোহের সময় সীমাকে বৃদ্ধি করতে সাহায্য করেছিল মাধব সিং। ইংরেজদের সাহায্য করেছিল নিজ স্বার্থ পূরণের জন্য অর্থাৎ রাজা হওয়ার স্বপ্ন দেখেছিল। এই বিদ্রোহের তীব্রতা বৃদ্ধি পেলে মেদিনিপুর ও বাঁকুড়া জঙ্গলের আশেপাশে থেকে বিদ্রোহীদের গেপ্তার করা হলে তারা দ্বিগুণ

115. *Ruthless Suppression of the Ho Tribe by British Government 1820-21,* West Singhbhum, Jharkhand, Government of India, 2023, P. 35-67.

116. Jha. Jagadish Chandra, The Bhumij Revolt, Delhi, The Journal of Asian studies, 1967, 630-636.

আগ্রাসী হয়ে উঠেছিল। বিদ্রোহীদের সংখ্যা ছিল ১০,০০০ থেকে ১২,০০০ এর মত।[117] গঙ্গানারায়ণ ভূমিজ বিদ্রোহের একত্রিত করা থেকে বঞ্চনার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে উঠার সাহস যুগিয়েছিলেন। তিনি বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার হাজার হাজার ভূমিজ আদিবাসীর পাশে দাড়িয়েছিলেন। যদিও অনেক ঐতিহাসিক এই বিদ্রোহকে চুয়াড় বিদ্রোহ বলে আখ্যা দিয়েছেন।[118]

প্রসঙ্গ: বীরভূমের আদিবাসী গণবিদ্রোহ

বীরভূমের গণবিদ্রোহ সম্পর্কে ডবলিউ, ডবলিউ, হান্টার 'দ্যা অ্যানালস অফ রুরাল বেঙ্গল' এর গ্রন্থে ব্যাখা করেছেন। বীরভূমের আদিবাসী বিদ্রোহ স্বতঃস্ফূর্ত হলেও সুষ্ঠু পরিকল্পনা, উদ্দেশ্য ও যোগ্য নেতৃত্বের অভাব ছিল বলে মনে করেন হান্টার। বীরভূম জেলার সশস্ত্র গণবিদ্রোহের ধারায় কৃষক সম্প্রদায় ও আদিবাসী সম্প্রদায়ের ভূমিকা বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ ছিল। এই বিদ্রোহকে সাধারণভাবে বিদ্রোহ না বলে তিনি আদিবাসী হত্যাকান্ডের সাথে তুলনা করেছেন।[119] বীরভুমের গণবিদ্রোহ গুলির ব্যাপ্তি ও বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, সাঁওতাল আদিবাসীরা ব্রিটিশ শক্তির নিকট নতি স্বীকার করত না বলেই তীব্র অত্যাচারের সম্মুখীন হতে হয়েছিল। আদিবাসী সাঁওতালদের অভাব অভিযোগ পেশ করার কোন উপায় ছিল না। জমিদার, মহাজন, ব্যবসায়ী, সরকারী অধিকারিদের দৈনন্দিন অত্যাচারের ফলে সাঁওতালদের দুঃখ দুর্দশা প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি পেয়েছিল। বীরভূম বার্তা নামক এক পত্রিকার বিবরণে কৃষক সম্প্রদায়ের দুর্দশার চিহ্ন উঠে এসেছিল। কৃষক সম্প্রদায় অতিরিক্ত কর ভার বহনে দুর্বল হয়ে পড়েছিল। অর্ধাংশ ক্লিষ্ট কৃষক দল পুনরায় দুর্ভিক্ষ, মহামারী, প্লাবন, ঝঞ্ঝাবাত প্রভৃতির উত্তাল তরঙ্গ তাদের জীবনকে চূর্ণ বিচূর্ণ করে দিয়েছিল।[120] তাদের আয়ের অধিকাংশ রাজা, জমিদার, খুদিত আমলা বর্গ, উকিল, মোক্তার, মহাজন, সরকার কর্মচারীকে নানা কারণে অর্পণ করতে বাধ্য হত। অর্থাভাবে সংসার চালানো আদিবাসীদের শোচনীয় হয়ে উঠেছিল। পরিধেয় বস্ত্র থেকে

---

117. *আনন্দবাজার পত্রিকা,* (দৈনিক), ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরে রাইপুর, ২১ সে জানুয়ারি, ২০১৫, পৃ. ৯

118. Bhattacherjee. S. B, *Encyclopaedia of Indian Events & Dates,* VI Edition, New Delhi, Sterling Publishers Pvt. Ltd, 2009.

119. Hunter. W. W., *The Annals of Rural Bengal,* Vol-1, Delhi, Gyan Publishing House, 1st January 2019, Pp. 247-250.

120. বীরভূম বার্তা, বর্ষ-২১, সংখ্যা-৪৬, অগ্রহায়ন ১৩২৩ সাল, সিউড়ি, বীরভূম, ১৯১৭।

রোগের প্রতিকার কিছুই সম্ভব হত না। আদিবাসী কৃষকের অবস্থা এতটা শোচনীয় হয়ে উঠেছিল যে প্রত্যেকে এক মুষ্টি ভাতের সহিত রাশিকৃত সিদ্ধ পাটের পাতা দ্বারা ক্ষুন্নিবৃত্তি করত। এইরুপ প্রতিনিয়ত তারা অভাবের সাথে জীর্ণ শীর্ণ কঙ্কাল সার হয়ে উঠেছিল।[121] কৃষির সাথে আদিবাসীদের এই অবিচ্ছেদ্য বন্ধন পরবর্তীকালে শোষণ ও অত্যাচারে অতিস্ট মানুষ এক দীর্ঘস্থায়ী বিদ্রোহে লিপ্ত হলে ধীরে ধীরে বীরভূমের কৃষি অর্থনীতি বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিল। সরল আদিবাসীরা প্রতিবিধান আশা করলেও কিন্তু তাদের আশা হতাশায় পরিণত হয়েছিল।

জমির ঘাটতি হতে থাকার ফলে অসংখ্য উদ্বাস্তু কৃষকের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে চলেছিল। সরকারি পরিভাষায় আদিবাসী কৃষকদের জমি থেকে উচ্ছেদকরণের প্রক্রিয়ার পথ ধীরে ধীরে প্রসারিত হয়েছিল। সামরিক শাসনের কঠোরতা আদিবাসী প্রজাদের উপর প্রয়োগ করা হয়েছিল কিন্তু বিদ্রোহের স্বরূপ বোঝার পর, স্থানীয় অফিসাররা ইচ্ছাকৃত ভাবে এই বিদ্রোহগুলি বিস্তৃত হতে দিয়েছিল। আসলে এই আন্দোলনে ব্রিটিশ সরকার প্রত্যক্ষ ভাবে সম্মুখে না এসে আদিবাসী বিদ্রোহীরা জমি হারানোর সঙ্গে সঙ্গে কর্জ- দাসে পরিণত হয়েছিল। জমিদারেরা আদিবাসী রমনীদের রক্ষিতা হিসাবে এবং সরকারী, বেসরকারী অতিথিদের 'খিদমত'[122] করার কাজে ব্যবহার করত। এই সমস্যার একমাত্র সমাধান ভূমিদাস প্রথা বাতিল করা হলেও তাতে কোনো লাভ হয়নি। স্বাভাবিকভাবেই, সংস্কারবাদী ও শ্রেণি সমঝোতাবাদী সংগঠন আদিবাসী ভূমিদাসদের আস্থা অর্জন করতে পারেনি। অন্যদিকে আদিবাসীদের সমস্যা সমাধানে আদিবাসী সেবা মন্ডলের কোনো ভূমিকা না থাকায় জমিদাররা যা বলত আদিবাসী মন্ডল সেটাই বাধ্য হয়ে চাষিদের উপর প্রয়োগ করত। আন্দোলনগুলি সংগঠিত হওয়ার ফলে জমিদাররা হতচকিত হয়ে আদিবাসী কৃষকদের মধ্যে জোটবদ্ধতাকে ভেঙ্গে দিতে চেয়েছিল। এ প্রসঙ্গে কৃষ্ণনাথ নন্দী বলেছিলেন "ঔপনিবেশিক শক্তি যতটা না আদিবাসীদের শোষণ করেছে তাঁর তুলনায় বাবু বা হিন্দু জমিদাররা আদিবাসীদের উপর অকথ্য অত্যাচারে সহমত দিয়েছিল।[123] কৃষকদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে অসহায় আদিবাসীদের উপর অত্যাচার করে বিদ্রোহের পথে ত্বরান্বিত

---

121. বীরভূম বার্তা, বর্ষ-১২, সংখ্যা-৪৭ অগ্রহায়ন ১৩২৩ সাল, সিউড়ি, বীরভূম, ১৯১৭।

122. সেবা।

123. দে. দেবশ্রী, *পূর্ব ভারতের আদিবাসী বৃত্তান্ত (১৯৪৭-২০১০),* কলকাতা, সেতু পাব্লিকশন, প্রথম সংস্করণ ২০১২, পৃ. - ১২৮।

করেছিল। জমিদারদের এ ধরনের ষড়যন্ত্র করা স্বত্বেও আদিবাসীদের অধিকারের উপরে যে কোনও ধরনের আঘাতকে প্রতিহত করার সিধান্তে বর্গা প্রথা অটল ছিল।

বীরভূমের আদিবাসী গণবিদ্রোহে হিন্দুদের সাথে আদিবাসীদের জাত-পাতের সংঘাত দেখা গিয়েছিল। সাঁওতাল ও হিন্দুদের মধ্যবর্তী অর্থনৈতিক অধিকার অর্জনের জন্য ও জাত পাত বিভেদে অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে সর্ব স্তরের কৃষকেরা একসাথে জোটবদ্ধ হয়েছিল।[124] হিন্দু ও আদিবাসীদের মধ্যে 'জাতপাতের' দ্বন্দ্বে আগুনে ঘৃতাহুতি দেওয়ার মত কাজ করেছিল ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ শক্তি ও জমিদাররা। এইসব সক্রিয় ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে আগস্ট মাসের মাঝামাঝি নাগাদ বিদ্রোহীরা সমতলভূমি হতে বিতাড়িত হয়েছিল। আদিবাসীরা বিতাড়িত হলে ৩০০ মাইল অতিক্রম করে ৩ হাজার সাঁওতাল আদিবাসীদের এক বাহিনী অন্য এক জেলায় গেরিলা পদ্ধতিতে বিদ্রোহের পথ প্রস্তুত করেছিল। আদিবাসীরা বিদ্রোহে সশস্ত্র গেরিলা পদ্ধতি প্রয়োগ করে সক্রিয় ও নির্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে চলেছিল। গরীব চাষিদের পাশাপাশি স্ত্রী- পুরুষ নির্বিশেষে হাজার হাজার লড়াকু আদিবাসী কৃষকেরা এই সংগ্রামগুলিতে অংশ নিয়েছিল। এই বিদ্রোহে ধনী থেকে আদিবাসী কৃষক শ্রেণির নেতৃত্ব লক্ষ করা গিয়েছিল।[125] যারা নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তাঁদের সঙ্গে সরকার ও জমিদার শ্রেণির বোঝাপড়া হয় ও গ্রামীণ সমাজে এই শ্রেণির প্রভাব বৃদ্ধি পায়। অপরপক্ষে কৃষকশ্রেণি তাঁদের নেতৃত্ব থেকে বঞ্চিত হয়েছিল। ভাগচাষী ও দরিদ্র্য চাষির জমির উপর অধিকারের নিরাপত্তায় কৃষক সভা ও গণমুক্তি পরিষদের স্থানীয় কমিটিগুলি জমির স্বার্থরক্ষার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করেছিল।

নভেম্বরের প্রথমভাগে, পশ্চিমের জেলাগুলির চারমাস দুর্ভোগের পর, ব্রিটিশ সরকার সামরিক আইন জারি করেন। ১৮৩০ সালে বীরভূমের জেলা কালেক্টারের প্রাপ্ত তথ্য থেকে জানা যায় আদিবাসী রায়তরা কমিটি অফ রেভেনিউর[126] কথা এবং সেখানে অতিরিক্ত রাজস্ব কর তাদের পক্ষে দেওয়া সম্ভবপর নয় বলে দাবি জানায়। অতিরিক্ত রাজস্ব দেওয়ার ভার সহ্য করতে না পেরে আদিবাসীরা তাদের জমি ছেড়ে কাজের সন্ধানে ভিন্ন জেলায় পরিযায়ী হওয়ার

124. Hunter. W. W, *The Annals of Rural Bengal*, Vol-1, Delhi, Gyan Publishing House, 1st January 2019, Pp. 77-79.

125. Letter from the collector of Birbhum, 7 July, 1789, P. 10-15.

126. *Report of the Accounts Respecting the Territorial Revenues and Disbursements*, Santal Pargana, Government of India, 1830, p. 44.

ঘটনা লক্ষ্য করা যায়। গ্রামের অন্যান্য চাষিদের সাথে আদিবাসীদের আয়ের বন্টনও সমান ছিল না। একই জমিতে হিন্দু নিচু শ্রেণির কৃষকরা ও আদিবাসী কৃষকদের কাজের ক্ষেত্রে সমান স্বাধীনতা প্রাপ্য ছিল না। দুই ধরনের কৃষকদের মধ্যে বৈষম্যের সূত্রপাত দেখা যায় এবং জাত ভিত্তিক দ্বন্দ্বের সূচনা হয়েছিল এই বিদ্রোহের মধ্য দিয়ে।

প্রসঙ্গ: সাঁওতাল আদিবাসী বিদ্রোহ

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পর থেকেই যেমন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসক তাঁর শাসনের ভীত শক্ত করেছিল অন্যদিকে তেমন আবার জমিদার মহাজন গোষ্ঠী ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থের সাথে নিজেদের ভাগ্যকে জুড়ে দিয়েছিল। পরিবার, সম্প্রদায়, ঐতিহ্য এবং সেই সাথে প্রাক পুঁজিবাদী রক্ষণাবেক্ষণ অর্থনীতির সাথে যোগসূত্র নির্দেশিত সংগ্রামের জন্য অনুপ্রাণিত করেছিল। ইংরেজ শাসন ও জমিদারি মহাজনী শোষণের বিরুদ্ধে সাঁওতাল আদিবাসীদের বিদ্রোহ অন্যতম কারণ ছিল। আদিবাসী সাঁওতাল ও বাঙালি কৃষকদের মধ্যে সংগ্রামী ঐক্যের উদাহরণ যখন প্রায় বিরল ছিল, তখন সাঁওতাল কৃষকেরা গোষ্ঠী প্রভাব ও সঙ্কীর্ণতার উপরে ওঠার নজির সৃষ্টি করেছিল। ঔপনিবেশিক ইংরেজ শাসন প্রত্যক্ষ ভাবে প্রতিষ্ঠিত হবার সাথে সাথেই ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠী এবং জমিদার-মহাজন-ইজারাদারগনের শোষণ উৎপীড়নের জ্বালায় ক্ষিপ্ত হয়ে সাঁওতাল আদিবাসী কৃষকরা এই সংগ্রামে সংঘবদ্ধ হয়েছিল।[127] এই বিদ্রোহ কেন হয়েছিল তা নিয়ে বহু কারণ থাকলেও শাসকগোষ্ঠীর নিকট থেকে অমানুষিক শোষণ উৎপীড়ন আর অবহেলা[128] সাঁওতাল আদিবাসী কৃষকদের এই বিদ্রোহ সংগঠিত করতে বাধ্য করেছিল। এই বিদ্রোহ ছোটনাগপুর মালভূমি এলাকার বাংলা ও বিহারের বিভিন্ন জেলায় বিস্তৃত ভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল। বিহারের রাঁচি, ভাগলপুরে জমিদার ও ইজারাদাররা জমির খাজনা বৃদ্ধি করে পুরাতন ব্যবস্থার বদলে নতুন বন্দোবস্ত প্রয়োগ করেছিল। বিপুল পুঁজি বিনিয়োগের ফলে কৃষিজাত পন্যের চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ার সাথে সাথে, শ্রমের চড়া মজুরির হার ও বৃদ্ধি পেয়েছিল। সামাজিক বিবরণের মধ্যে সাঁওতাল অধ্যুষিত অঞ্চলে শোষণ- উৎপীড়নের বিশেষ পরিচয়

---

127. Mopherson. H, *Report of the Survey and Settlement Operations,* Santal Paragana, Calcutta, Bengal secretariat book depot, 1909, Pp. 36-38.

128. বাস্কে. ধীরেন্দ্রনাথ, *গণ আন্দোলনে সাঁওতাল সমাজ,* কলিকাতা, বাস্কে পাবলিকশন, দ্বিতীয় প্রকাশ ২০১৩, পৃ. ১১- ১৭

পাওয়া যায়। লাভজনক মহাজনী সুদের কারবারের পাশাপাশি কামিওতি প্রথার[129] প্রচলন ছিল। দৃষ্টান্ত স্বরূপ একজন সাঁওতাল আদিবাসীকে টাকা প্রতি ১২ আনা সুদে ২৫ টাকা ঋন গ্রহণ করতে হত।[130] গ্রামের বাসিন্দাদের মধ্যে আদিবাসী কৃষকরা কৃষি ক্ষেত্রে যথেষ্ট শ্রম প্রদান করতে পারেনি কারণ তাদের সাথে ভূমির বিছিন্নতা দেখা দিয়েছিল। পরিশোধযোগ্য পরিমাণ অর্থ- না শোধ করা পর্যন্ত ঋণদাতারা কৌশল করে সময়ের অপেক্ষা করত। আসলে মহাজনরা নিশ্চিত করে জানত যে, আদিবাসী কৃষকরা এই পরিমাণ অর্থ পরিশোধ করতে পারবে না, বরং ঋণ নিষ্পত্তির জন্য আদিবাসীদের সাথে অন্যায় অত্যাচার করে প্রতি বছর মহাজনরা সুবিধা ভোগ করে চলত।

চিরন্তন দায়-দায়িত্ব থেকে উৎখাত হওয়া ও সাঁওতাল মহিলাদের প্রতি কোম্পানির কর্মচারীদের অত্যাচার সাঁওতাল সমাজের স্থিতাবস্থা বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিল। সাঁওতাল নারীদের উপর এই অত্যাচারের পরিমাণ দ্রুতহারে যে বৃদ্ধি পেয়েছিল, তাঁর প্রমাণ সাঁওতাল বিদ্রোহের বিভিন্ন কবিতা, গানে বারংবার উচ্চারিত হয়েছিল।[131] আবার এভাবেও বলা যায় যে, সাঁওতাল কৃষক বিদ্রোহ সংগঠিত হওয়ার পিছনে সাঁওতাল আদিবাসী নারীদের উপর অত্যাচার অন্যতম কারন ছিল। ১৮৫৫ সালে সাঁওতাল বিদ্রোহ শুরু হয়েছিল জমিদার ও ব্রিটিশ কোম্পানির শোষণ ও উৎপীড়ন থেকে মুক্তি লাভ করার পাশাপাশি স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করা ছিল সাঁওতালদের অন্য আর এক উদ্দেশ্য ছিল।[132] উনবিংশ শতাব্দীর বাংলায় কৃষক- বিদ্রোহের বহুমুখী দুর্বলতার গুলির মধ্য দিয়ে স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল দামিন-ই কোহ রাজ্যের প্রতিষ্ঠা। বঙ্গীয় নবজাগরণের আলোয় আলোকিত হয়ে জমিহারা আদিবাসীরা জবরদস্তি জমি দখল নিয়ে আন্দোলনের পথে ধীরে ধীরে অগ্রসর হয়েছিল। হাজার হাজার সাঁওতাল আদিবাসী কৃষকরা এই ব্যাপক আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছিল নিজ সম্প্রদায়ের দুঃখ যন্ত্রণার অবসান ঘটাবার জন্য। খুব অল্প সময়ের মধ্যে এই বিদ্রোহ দ্রুত ছড়িয়ে পড়েছিল বাংলা ও বিহারের নগর,

---

129. সাঁওতালদের ফসল, গবাদি পশু, এমনকি নিজেদের পরিবারশুদ্ধ খাজনার দায়ে বিকিয়ে যেত।

130. Mopherson. H, *Report of the Survey and Settlement Operations,* Santal Paragana, Calcutta, Bengal secretariat book depot, 1909, Pp. 72-75.

131. মোঃ. কুতুবুদ্দিন, *সাঁওতাল বিদ্রোহ ও বাংলা নাটক,* তথ্য সংস্কৃতি বিভাগ, শব্দ শাব্দিক ২৯ বর্ষ, ১৩১০ বৈশাখ ১৪১১, পৃ. ১-৫

132. Sinha. Dr S. P, Paper- Relating to Santal Hul (insurrection), Ranchi, varma union press Ranchi, Bihar tribal welfare research institute, Ranchi, 1855-56 p. 29.

নাঙ্গুলিয়া, ওরঙ্গাবাদ, জঙ্গিপুর, রাজমহল ও মহেশপুরে।[133] সরল আদিবাসীরা কোম্পানির নিকট তাদের প্রতিবিধানের আশা করেছিল কিন্তু তাঁদের আশা হতাশায় পরিণত হয়। জমিদার, মহাজন, ব্যবসায়ী, সরকারী অধিকারিদের দৈনন্দিন অত্যাচারের ফলে সাঁওতালদের দুঃখ দুর্দশা প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি পেয়েছিল। এল নটরাজন[134] স্বীকার করেছিলেন যে, এই বিদ্রোহের মাত্রা ও গতি, ভারতবর্ষের প্রতিবাদী চেতনায় ধীরে ধীরে প্রভাব পড়েছিল। অন্যায় আধিপত্যের বিরুদ্ধে নগ্ন চেহারায় প্রতিবাদ ছিল এই বিদ্রোহের মূল বৈশিষ্ট্য।

প্রসঙ্গ: খোন্দ বিদ্রোহ ১৮৬২-১৮৯৪

উড়িষ্যার খোন্দ নামক আদিবাসী কৃষকরা সমস্ত রাজাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের পতাকা উড্ডীন করেছিল। ১৮৪৫-৪৮ ও ১৮৫০-৫২ এর খোন্দ বিদ্রোহের পর কোরাপুট, কালাহান্দি, ভবানি পাটনা, কন্ধমল প্রভৃতি অঞ্চলের বিদ্রোহের বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। তারা প্রথমে বাউদ রাজ্যের বিরুদ্ধে ১৮৫২ সালে বিদ্রোহ করেছিল। পরবর্তীকালে ১৮৮১-৮২ সালে কালাহান্ডি রাজ্যের খোন্দরা বিতাড়িত হয় এবং অত্যাধিক খাজনার চাপে তারা দলবদ্ধ ও সশস্ত্র হয়ে হিন্দু চাষিদের উপর আক্রমণ করতে থাকে ও বিদ্রোহের পথে এগিয়ে গিয়েছিল এবং বহু হিন্দু কৃষক প্রান হারায়। পতিত জমি পুনরুদ্ধার, কৃষির উন্নতির জন্য অপরিহার্য ছিল কেননা আদিবাসীদের কাছে কৃষির উন্নতি ছাড়া জীবিকা অর্জনের অন্য উপায় ছিল না। অরণ্যবৃত পশ্চিমাঞ্চল ও মধ্যাঞ্চলের কিছু কিছু অংশে কৃষির বিস্তার ঘটেছিল। পরবর্তীকালে এই অঞ্চলের রাজা, বিদ্রোহগুলিকে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শক্তির সাহায্য নিয়ে দমন করার প্রয়াস করেছিলেন।[135] ১৮৯৪ সালে পুনরায় খোন্দরা আক্রমণ করলে জমিদারদের বহু সম্পত্তি নষ্ট হয়ে যায় এবং জমিদাররা এই আদিবাসীদের বিদ্রোহকে নিয়ন্ত্রনে আনার চেষ্টা করেছিল।

প্রসঙ্গ: প্রথম ও দ্বিতীয় কেওঞ্জর বিদ্রোহ

ব্রিটিশ সরকারের সাথে কেওঞ্জরের সম্পর্ক ১৯০৮ সালের এক সনদের শর্তাবলী দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, যা পরবর্তীকালে সংশোধিত হয়েছিল ১৯৯৭ সালে। বাবু বলদেব ভঞ্জ দেও, লক্ষ্মী

133. Malley. L.S.S.O, *Bengal Distric Gazetteers for Santals Paragana*, New Delhi, Logos Press, P. 243-280.

134. Mahananda. Ramakanta, *Tribal Communication Technology: A Case Study of Khondhs of Khandhamal of Odisha,* Orissa Review, 2011, P. 50-59.

135. Singh. K. S, *The Scheduled Tribes,* New Delhi, Oxford University Press, 1994.

নারায়ন ভঞ্জ দেও, শ্রী চরণ মহাপাত্র, পদ্মানাভ পানিগ্রাহী নামক জমিদার কেওঞ্জরের জমিদারীত্বের ভার নিয়েছিলেন।[136] ১৮৬৮ সালে উড়িষ্যার দেশীয় রাজার মৃত্যু হলে নতুন রাজার সিংহাসন গ্রহণকে কেন্দ্র করে রাজ্যের ভুঁইয়া আদিবাসী কৃষকরা বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিল। রাজার মৃত্যু হলে তার অত্যাচারী পুত্র রাজ্যের সিংহাসন দখল করার পাশাপাশি মৃত রাজার এক পুত্রহীনা রানিও রাজ্যের সিংহাসনের দাবি জানান। আদিবাসী কৃষকরা অত্যাচারী নতুন রাজার বিরুদ্ধে রানীর দাবি সমর্থন করে সশস্ত্র বিদ্রোহ আরম্ভ করেছিল। রাজ্যের অন্যান্য আদিবাসী কৃষকরা ভুঁইয়া আদিবাসীদের সাথে যোগ দিয়েছিল। আদিবাসী কৃষকদের এই মিলিত বাহিনী রাজ্যের রাজধানীতে প্রবেশ করেছিল এবং প্রধান দপ্তর আক্রমণ করেছিল। তারা শাসন দপ্তর লুঠ করে রাজ্যের দেওয়ান সহ রাজার ৫০ জন সমর্থক কর্মচারীকে জামিন স্বরূপ বন্দী করে রাখার আদেশ দেওয়া হয়েছিল। এই ঘটনার পর বিদ্রোহীরা একের পর এক গ্রামে আক্রমন করেছিল। মহাজন গোষ্ঠী এবং ব্রিটিশরা মিলিতভাবে সৈন্য নিয়ে বিদ্রোহীদের উপর পালটা আক্রমণ করেছিল। বহু খণ্ডযুদ্ধের পর বিদ্রোহীরা সুশিক্ষিত ও আগ্নেয়অস্ত্র সজ্জিত সেনাবাহিনীর কাছে পরাজিত হয়ে ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। রাজার অমানুষিক শোষণ পীড়নে অস্থির হয়ে ভুঁইয়া আদিবাসীদের দ্বিতীয়বার বিদ্রোহে কেউওঞ্জর রাজ্যের রাজধানী আক্রমণ ও ধ্বংস হলে বিদ্রোহ পরিস্থিতি স্থগিত হয়েছিল।

প্রসঙ্গ: ডুবিয়া গোঁসাইন আন্দোলন

ডুবিয়া গোসাইন নামে কৃষক আন্দোলন শুরু হয় ১৮৮০ সালে জামতারাতে ডুবিয়া নামক এক আদিবাসীদের অনুপ্রেরণায়। খেরয়ার সংস্থা অনুগামীদের সম্মান এবং তাদের নীতির শক্তি উভয় ক্ষেত্রেই এই বিদ্রোহ কৃতজ্ঞতা অর্জন করেছিল। আন্দোলনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল বিপজ্জনক, অবজ্ঞাজনক ব্রিটিশ সরকারের বিরোধিতা করা। বিহারের পাকুড় জেলার লেখক লাখনের তথ্যে ডুবিয়া গোসাইন আন্দোলনের কিছু চিত্র ধরা পড়েছিল। এই আন্দোলন খুব একটা জনপ্রিয়তা পায়নি। ডুবিয়া গোসাইন ছিল এই আন্দোলনের প্রধান নেতৃত্ব। ডুবিয়া

136. *Feudatory states of Bihar and Orissa (ruling chiefs and Leading Personages),* Calcutta, Central Publication Branch, Government of India, 1929, P. 36-46.

গোসাইদের[137] কথা সাঁওতালদের বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল। তাদের ক্ষোভের বহিঃ প্রকাশের অভিযোগ তাঁদের দাবির মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। স্থানীয় বিষয়গুলি যেমন রাজস্বের হার বৃদ্ধি, জমির চৌকিদারি[138] প্রদানের মত কারণের ফলে এই বিদ্রোহ সংগঠিত হয়েছিল। ছোটনাগপুরের হাজারিবাগ জেলার জাগেসারিনে নতুন জমির উপর ৮০% রাজস্ব কর স্থাপন করা হলে ডুবিয়া জাতিগোষ্ঠী আন্দোলনের সম্মুখীন হয়ে উঠেছিল। এই আন্দোলনে গোসাইনরা, সাঁওতালদের অবস্থানকারী বেশ কয়েকটি জেলার মধ্যে ভ্রমন করে ধর্মকে কেন্দ্র করে তপস্যার[139] মাধ্যমে আদিবাসী জনগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সফল হয়েছিলেন। মশীহ ডুবিয়া গোসাইনের চরিত্র এই বিদ্রোহে খেরওয়ার নামক সাঁওতালদের[140] নতুন করে আশা সঞ্চার করেছিল। জামতারা ডিভিশনের গুরুত্বপূর্ণ ঘাটয়াল অঞ্চলের নারিনপুর গ্রামে একটি মিলনের স্থান ছিল যেখানে গোসাইন সহ সাঁওতালরা সপ্তাহের এক নির্দিষ্ট দিনে উপস্থিত হত এবং আসন্ন সমস্যা নিয়ে আলোচনা করতেন। মিশনারি গোষ্ঠীর হাত থেকে মুক্ত হওয়ার সচেতনতা সাঁওতাল আদিবাসী গোষ্ঠীদের মধ্যে উদ্বেগ প্রকাশ করেছিল। জামতারা বিভাগে সাঁওতাল আদিবাসীদের নেতৃত্বের প্রতিরুপ শুরু হয়েছিল ভাগলপুরের ১৫ জন পুলিশ অফিসারের উপর লাঠিচার্জ[141] করা হয়েছিল। সাঁওতাল আদিবাসীরা এই আন্দোলনে অনুপ্রাণিত হয়েছিল গোসাই বাবার হাত ধরে। অর্থনৈতিক পৃথকরনের মধ্য থেকে 'অসমতা' খুব সহজেই প্রতিভাত হয়ে উঠেছিল এই বিদ্রোহের চরিত্রে। ছোটনাগপুরের এই আন্দোলন ব্রিটিশ ও হিন্দু বিরোধী হলেও অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, ও ধর্মীয় কারন ছিল বিশেষভাবে উল্লেখ্য।

প্রসঙ্গ: জমি দখল আন্দোলন

বাংলা ও বিহারের আদিবাসী কৃষকদের জীবনে জমি দখল আন্দোলন ছিল বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। ১৭৭২ সালে, আদিবাসী কৃষকরা বাধ্য হয়ে জমিদারের নিয়ন্ত্রনে কাজ করা বন্ধ

---

137. Malley. L S. S. O., *Bengal District Gazetteers Santal Paraganas,* Vol-1, 1910, p. 147-150.

138. Mopherson. H, *Report of the Survey and Settlement Operations,* Santal Paragana, Calcutta, Bengal secretariat book depot, 1909, Pp. 97-99.

139. তদেব।

140. খেরয়ার বলতে সাঁওতালদের আদি নামকে বোঝানো হত।

141. Dhagamwar. Vasudha, *Role and Image of law in India: The Tribal Experience,* Kolkata, Sage Publishing India, 2006, p. 210.

করে দিয়েছিল তাদের জমি অধিগ্রহণের জন্য। আবাদি জমির সংখ্যা ক্রমাগত হারে বৃদ্ধি পেয়ে চলেছিল অন্যদিকে গ্রাম ও অরণ্য অঞ্চলকে খাস করার অভিযোগে একপ্রকার এই আন্দোলন শুরু হয়েছিল। একে ব্রিটিশ সরকারকে রাজস্ব দেওয়ার উৎপীড়ন অন্যদিকে বৃষ্টিপাতের ঘাটতি থাকায় ১৮৭৩ সালে তিন চতুর্থাংশ ফলন হ্রাস পেয়েছিল। ১৮৭২ সালে তৃতীয় রেগুলেশনের নিয়ম অনুযায়ী কোনো গ্রামকে খাস গ্রামে পরিণত করার নিয়ম ছিল না। ৮৫৩ স্কোয়ার মাইল স্থান জুড়ে বাংলা ও বিহারের ১৪২১ টা[142] গ্রামকে খাস গ্রামে যুক্ত করা হয়, যা থেকে ব্রিটিশ সরকার অধিক পরিমানে রাজস্ব কর আদায় করত। গ্রামগুলি খাস গ্রামে পরিণত হওয়ার ফলে জমির উপর কৃষকদের দখলিস্বত্ব হারিয়ে যায়। মিঃ ক্যারাভেন দুমকা, গোড্ডা, জামতারা, পাকুড়, দেওঘরকে[143] খাস গ্রামের সাথে যুক্ত করেছিলেন। জমি দখল আন্দোলনে শোষণের অন্যতম উদাহরণ ছিল, ১৮৬১ সালে এক একটি অঞ্চলের দাম ১২,০০০ টাকা থেকে ১৪,০০০ টাকা[144] ধীরে ধীরে তিন থেকে চার বছরের মধ্যে তার মূল্য ৬০,০০০ টাকা বৃদ্ধি পেয়েছিল। আম্বর এবং সুলতানাবাদে আদিবাসী সাঁওতালদের মধ্যে আন্দোলন দেখা দিয়েছিল জমি নিস্পত্তিকে কেন্দ্র করে। জমি আন্দোলনের উপর নির্ভর করে সাঁওতালদের দাবি অগ্রহণযোগ্য হয়েছিল। মিঃ কক্রেল তার রিপোর্টে বিহারে ১৮৬৬ সালের দুর্ভিক্ষের কথা বলতে গিয়ে, অন্যান্য জেলাগুলিতে প্রাপ্ত উচ্চ স্তরের দাম ও শস্য রপ্তানিকে প্ররোচিত করার কথা উল্লেখ করেছিলেন। ১৮৬৬ সাল থেকে ১৮৭৪ সাল পর্যন্ত ছোটনাগপুর মালভূমি অঞ্চলের কৃষি উৎপাদনের বাজার মূল্য হ্রাস পেয়েছিল। ১৮৭৩-৭৪ সালে সাঁওতাল পরগণায় এ পি ম্যাকডোনেলের বাংলা ও বিহারের খাদ্যশস্য সরবরাহের প্রতিবেদন থেকে এই তথ্য উঠে এসেছিল। কৃষি উৎপাদনের বাজার মূল্য পুনরায় বৃদ্ধি পেলেও ১৮৬৬ সালে সাঁওতাল পরগণা ও বিহারের আদিবাসীরা দুর্ভিক্ষের কারণে কাঁচা ফল ব্যবহার করতে বাধ্য হয়েছিল যার ফলে তারা ১৮৭৪ সালের দিকে তারা মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছিল।[145]

---

142. Mopherson. H, *Report of the Survey and Settlement Operations,* Santal Paragana, Calcutta, Bengal secretariat book depot, 1909, Pp. 26, 149.

143. তদেব। পৃ. ১৯১-১৯২

144. তদেব। পৃ. ১৯১-১৯২

145. Hunter. W. W., *A Statistical account of Bengal (Bhagalpur District and Santal Paraganas),* Vol- XIV, 1877, p. 346-350.

আদিবাসীদের জমিগুলি একে একে হিন্দু জমিদার ও ব্যবসায়ীদের করায়ত্ত হলে জমির উপর একাধারে আধিপত্য হারিয়ে ফেলেছিল আদিবাসী স্থানীয় কৃষকরা। জমিদারদের, জমি কেনার অর্থ ছিল প্রকৃত উৎপাদকদের জমি অধিগ্রহণ করে, উৎপাদনের উপায় থেকে উৎখাত করা। ক্ষুদে জমির মালিকরা এ ধরনের জমি হস্তান্তর ও বিনিয়োগের কাজ করত। ক্রমবর্ধমানশীল পরিবারের আয়তন ও অনিশ্চিত আবহাওয়াতে ক্ষুদে জোতের মালিকরা তাদের খামার থেকে খোরাকের অর্থ জোগাড় করতে ব্যর্থ হয়েছিল। এরকম অবস্থায় বেঁচে থাকার জন্য জমি বিক্রি করা ছাড়া কোনো উপায় ছিল না। বিশেষ করে প্রাকৃতিক দুর্যোগে ফসলহানি ঘটলে রাজস্ব দান থেকে অব্যাহতি পেত না কৃষকরা। এ রকম অবস্থায় হিন্দু ব্যবসায়ীদের আদিবাসীদের জমি করায়ত্ত করতে সুবিধা হয়েছিল। এইসব আন্দোলনগুলি কৃষিকে কেন্দ্র করে শুধু গড়ে উঠেনি, বরং কৃষির প্রতি ভূমি বন্দোবস্ত হওয়ার কারণে আদিবাসীরা জমি, ভিটেবাড়ি ও জীবিকা হারিয়েছিল। জমি দখলই হোক বা জমি থেকে উচ্ছেদ করার পরিকল্পনা হোক এই প্রক্রিয়া উনবিংশ থেকে বিংশ শতাব্দি পর্যন্ত চলেছিল।

উপরিক্ত আন্দোলনগুলি ছাড়াও ছোটনাগপুরে ওঁরাও আদিবাসী গোষ্ঠী, তানা ভগতদের বিদ্রোহ দেখা যায় ১৯১৪ থেকে ১৯২০-২১ সালে। ব্রিটিশ ও জমিদার বিরোধী বিদ্রোহে সচেতন আদিবাসীদের অধিকার সম্পর্কিত দাবিগুলি ছিল গুরুত্বপূর্ণ। জমির উপর অধিকারকে কেন্দ্র করে বাংলা ও বিহারের আদিবাসী কৃষকদের একাধিক বিদ্রোহ পর্যালোচনা করলে দেখা যায় এই বিদ্রোহ ছিল অনেকটা 'উৎপাদকের উপর জবরদস্তি চাপিয়ে দেওয়া এক বাধ্যবাধকতা।[146] যেখানে উৎপাদকের নিজের ইচ্ছার কোনো মূল্য ছিল না। উপরতলার প্রভুর দাবি পূরণ করা ছিল তাঁর দায়িত্ব। কৃষিভূমির উপর বেকার জনসংখ্যার অত্যাধিক চাপে ভারতের কৃষি ব্যবস্থার ধংসাবেশটুকু চূর্ণ- বিচূর্ণ হয়ে গিয়েছিল। এদিকে জমিদাররা কৃষি ব্যবস্থাকে অবহেলা করে বিলাস ব্যাসনে মত্ত থাকত যার ফলস্বরূপ জমিগুলি জমিদারদের হাতছাড়া হয়ে যায়। কোম্পানির হাতে জমি হস্তান্তরিত হলে জমির মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছিল এবং জমির প্রতি কৃষকদের কাজ করার মানসিকতা হ্রাস পেতে থাকে। কৃষি ক্ষেত্র থেকে কোম্পানির মুনফার পরিমাণ হ্রাস পেলে পুঁজি বিনিয়োগও কম হয়। বঙ্গদেশ ও বিহারের কৃষিতে এইভাবে আদিবাসী কৃষক

---

146. হিল্টন. রডলি, *সামন্ততন্ত্র থেকে পুঁজিবাদে উত্তরণ,* কলকাতা, সেতু পাবলিকশন, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০১২, পৃ.- ৫৫

শোষণ ব্যবস্থার জ্বাল বিস্তৃত করেছিল। বিদ্রোহের ফলে আদিবাসীদের সমস্যার সমাধান হয়নি বরং জমির মালিক ও জমিহারা শ্রেণির মধ্যে দূরত্ব তৈরি হয়েছিল। বিদ্রোহের পথ সুগম হওয়ার পরেও জমির প্রতি অধিকারকে কেন্দ্র করে ধীরে ধীরে একটি সমস্যা প্রকট হয়ে উঠেছিল। বাংলা ও বিহারের কৃষক বিদ্রোহগুলিতে আদিবাসীদের যোগদানের ফলে আদিবাসীদের অধিকার প্রতিষ্ঠা হয়েছিল ঠিকই কিন্তু তাদের নিজস্ব জমির পরিমাণ অনেকটা হ্রাস পেয়েছিল। এ প্রসঙ্গে বলা যায় যে, ষাটের দশকে পশ্চিমবঙ্গের সাঁওতালরা গ্রামীণ অর্থনীতির সবচেয়ে পিছিয়ে পড়া অংশ ছিল বলে দাবী করেন দেবশ্রী দে[147] তাঁর পূর্ব ভারতের আদিবাসী নারী বৃত্তান্ত নামক গ্রন্থে।

পূর্ব ভারতের আদিবাসী সংস্কৃতি ভারতের অন্যত্র অঞ্চল থেকে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ভিন্ন ছিল। তাদের স্বতন্ত্রতা, আঞ্চলিক বিদ্রোহের অনুপ্রেরণা ও আদর্শ সম্পর্কে কৌতূহলী হয়ে উঠেছিল। একাধিক ঐতিহাসিক, আদিবাসী কৃষক সংগঠিত বিদ্রোহগুলি বারংবার সমালোচিত করেছিলেন স্বার্থ সম্পন্ন একটি কৃষিজীবী সম্প্রদায়ের দুর্বলতা এবং সন্ত্রাস নামকরণের মধ্য দিয়ে। এই অঞ্চলের আদিবাসীদের প্রতিবাদী আন্দোলনের ধারা ছিল ভিন্নতার পরিচয়বাহী। আদিবাসী কৃষক শোষণের ভিন্নতা ও টিকে থাকার এক অন্তহীন লড়াই নিয়ে চর্চা শুরু হয়েছিল ঐতিহাসিক মহলে। এই আন্দোলনের মধ্য দিয়ে আদিবাসী পরিচয়গুলি তাদের যেমন স্বতন্ত্র করেছিল ঠিক তেমনি তাদের আন্দোলনের মধ্যে তাদের সচেতনতা প্রকাশ পেয়েছিল। এছাড়াও আদিবাসীরা মূল স্রোতের থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল বলে তাঁদের বিদ্রোহের ইতিহাস আঞ্চলিক স্থানের মধ্যে প্রকাশ পেয়েছিল। উনবিংশ শতকে আদিবাসী কৃষক আন্দোলনগুলি উপজাতি হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছিল তবে অষ্টাদশ, উনবিংশ, বিংশ এই তিনটি শতাব্দি ধরে আদিবাসীদের সংগ্রামের পদ্ধতিতে পরিবর্তন এসেছিল। দেবশ্রী দে[148] তাঁর গ্রন্থে, সেই পরিবর্তনের মধ্যে গান্ধীবাদের আদর্শের কথাকে স্বীকার করেছিলেন। তারা ভেবেছিল গান্ধিবাদী স্বরাজ তাদের সমস্ত রকমের শোষণ থেকে মুক্ত করবে। আদিবাসীরা গান্ধীকে ত্রানকর্তা বা একজন সাধু হিসাবে দেখতে শুরু করেছিল। যদিও গান্ধিজি আদিবাসীদের আন্দোলনকে সমর্থন করেছিলেন,

---

147. দে. দেবশ্রী, *পূর্ব ভারতে আদিবাসী বৃত্তান্ত (১৯৪৭-২০১০),* কলকাতা, সেতু পাবলিকশন, প্রথম সংস্করণ ২০১২, পৃ. ১৪-২১

148. De. Debasree, *Gandhi and Adivasis, Tribal Movement in Eastern India, (1914-1948),* London, Routledge Publication, 1st edition 2022, P. 10-20.

জাতীয় আন্দোলনকে গণচরিত্রে রুপ দেওয়ার জন্য। তাদের আন্দোলনের মধ্যে তীব্রতা থাকায় তারা তাৎক্ষনিক আন্দোলনের বিরুদ্ধে লড়াই এর ইতিহাস রচনা করেছিল। আসলে উত্তর ঔপনিবেশিক ভারতে আদিবাসী পরিস্থিতির উপর গান্ধিজির প্রভাবকে তিনি প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন।[149]

ঐতিহাসিক গৌতম ভদ্র এই কৃষক বিদ্রোহগুলি সম্পর্কে মতামত দেন যে, উপরিক্ত কিছু আন্দোলনকে ধর্মীয় আর কিছু আন্দোলনকে রাজনৈতিক বলে ব্যাখ্যা করা হলেও প্রতিবাদী আদিবাসী কৃষকদের রাজনৈতিক চরিত্র ছিল ভিন্ন। আদিবাসী কৃষকদের চৈতন্যে এমন কোনো ধর্মবোধ লক্ষ্য করা যায়নি যা রাজনৈতিক বিবর্জিত ছিল। ঐতিহাসিক গৌতম ভদ্র উল্লেখ করেন রাজনৈতিক চিন্তা ব্যতীত 'নিম্নবর্গের' আন্দোলন সূচিত হয়নি।[150] কৃষিভিত্তিক রাজনীতিকে কেন্দ্র করে আনুষ্ঠানিক ভাবে কৃষক সমিতি, রায়ত সভা ও কৃষক প্রজা সমিতি তৈরী হয়েছিল। কৃষক ও ওয়াকারস পার্টি এবং বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষাণ সভা গঠিত হয়। আসলে রাষ্ট্র কেন্দ্রীকতা অথবা রাজনীতি সম্পর্কের মধ্য দিয়ে আদিবাসী কৃষকেরা তাদের অধিকার আদায় করার চেষ্টা করতে থাকে।

ব্রিটিশ শক্তি উপলব্ধি করেছিল যে, ভারতীয় অগ্রগতির পথে প্রধান প্রতিবন্ধক ছিল 'জাত ব্যবস্থা'। এই ব্যবস্থাকে ভারতীয় সমাজে অধিক প্রাধান্য দেওয়া হয়েছিল বলেই নবজাগরণের আলোকে উন্নত বাঙালি সমাজ একের পর এক সংগঠিত হয়ে চলা কৃষক বিদ্রোহগুলিকে সমর্থন করেননি। পাশ্চাত্যের শিক্ষায় শিক্ষিত ভারতীয়রা এত বড় বড় কৃষক বিদ্রোহ নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেননি। স্বভাবতই সামাজিক প্রেক্ষাপটে শিক্ষিত মানুষ ও আদিবাসী চাষিদের মধ্যে বিস্তর পার্থক্য ব্রিটিশদের চোখের আড়াল হয়নি। সেই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে ব্রিটিশরা তাদের স্বেচ্ছাচার, অত্যাচার, নিপীড়ন ও শোষণ বজায় রাখার স্বার্থে গোটা প্রশাসনিক যন্ত্রকে নিজেদের সেবাদাস হিসাবে কাজে ব্যবহার করেছিল। বাংলা ও বিহারের অর্থনৈতিক ইতিহাসের মুখ্য পর্যায় হিসাবে যখন জমিদারীত্ব ও ঔপনিবেশিক শক্তিকে বিচার করা হয় তখন তার পাশাপাশি শ্রমশক্তির সামাজিক সত্তারূপ বহিঃপ্রকাশিত হয়েছিল। ঔপনিবেশিক উৎপাদন পদ্ধতির এটাই ছিল প্রাথমিক উপাদান। মারক্সীয় সমাজতন্ত্রবাদীরা মনে

149. তদেব। পৃ. ২৫

150. ভদ্র. গৌতম, *ইমান ও নিশান (বাংলা কৃষকের চৈতন্যের এক অধ্যায়),* কলকাতা, সুবর্ণরেখা পাবলিকেশন, ১৯৯৪, পৃ.- ১৭।

করেন, পুঁজিবাদী শাসনব্যবস্থায় নানাপ্রকার সামাজিক জটিল তাত্ত্বিক সমাধানের জন্য বিপ্লবের পথকে সুগম করতে হবে কর্ম প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে। আদিবাসী গোষ্ঠী প্রথম থেকেই নিজেদের অধিকারের জন্য বিপ্লব, বিদ্রোহের সম্মুখীন হয়েছিল কিন্তু পথ সুগম হওয়ার বদলে স্বাধীন মজুরে রূপান্তরিত হওয়ার পথ প্রশস্ত করেছিল।

আদিবাসী কৃষকদের শ্রমিক শ্রেণিতে পরিণত হওয়ার প্রক্রিয়াকরণ

আদিবাসী কৃষক আন্দোলনের মধ্য দিয়ে ছোটনাগপুরের অর্থনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থায় এক আমূল পরিবর্তনের সূচনা হয়েছিল। আদিম উৎপাদনী শক্তি ও চাষের পদ্ধতি, স্থবির কৃষি উৎপাদন, নিশ্চল জমিদার ও কৃষকের সামাজিক সম্পর্ক সমকালীন গ্রামীণ সমীক্ষা থেকে ধীরে ধীরে বাতিল হয়েছিল। জমিদারি প্রথার মত পরাধীনতার এই শেষ নিদর্শনের মধ্য দিয়ে তৎকালীন আদিবাসী চাষিদের জনজীবনে সূচিত হয়েছিল নতুন আর এক অধ্যায়। বিদ্রোহ পরবর্তীকাল থেকেই সামাজিক কাঠামোয় কৃষক থেকে মজুর শ্রমিকে পরিণত হওয়ার ধাপ তৈরি হয়েছিল। উপরিক্ত তথ্যের ভিত্তিতে বলা যায় যে, ঔপনিবেশিক পর্যায়ের পল্লী উন্নয়নের কৃষি কাঠামো পরিবর্তনের বিষয়টি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ছিল। ছোটনাগপুর মালভুমির অধিকাংশ কৃষি ব্যবসায়ীরা সাবেক কালের কৃষক খামার অর্থনীতির ধারণা কাটিয়ে পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থার সাথে জড়িয়ে পড়েছিল। পশ্চিমবঙ্গের গ্রামীণ অর্থনীতির উপরে প্রভাব ফেলতে আধুনিক কৃষি প্রযুক্তির ব্যবহার শুরু হয়েছিল। কৃষির সাধারণ পরিকাঠামোকে উন্নত করে তোলার জন্য বহু কৌশলগত পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছিল। আদিবাসী অধ্যুষিত গ্রাম এই কাঠামোর বাইরে ছিল। ছোটনাগপুর মালভূমি এলাকায় কৃষিপ্রযুক্তি প্রয়োগ করা হলে অর্থনৈতিক অসাম্য চূড়ান্ত বৃদ্ধি পায়।[151] ঔপনিবেশিক পর্যায়ে যেখানে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার আর্থিক সম্পদের প্রধান উৎস ছিল কৃষি সেখানে যুক্ত হল খনিজ শিল্প। খনিজ শিল্পের সাথে ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষের সম্পূর্ণ এবং সক্রিয় নিবিড় প্রযুক্তিটি ছিল শ্রম। কৃষি অর্থনীতি ও খনি শিল্প থেকে মুনফার ধারণা তৈরি হবার মধ্য দিয়েই ধনতান্ত্রিক অর্থনীতি উদ্ভব হওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল।

151 Ray. Ratnalekha, Change in Bengal Agrarian Society 1760-1850, New Delhi, Manohar Publication, 1960, P. 52-56.

আদিবাসীদের এক দশক বসবাসের পর থেকে ব্রিটিশ সামাজ্যের বহুমুখী শাসনের তীব্রতায় তাদের আর্থ- সামাজিক জীবনকে ইচ্ছাকৃত ভাবে দুর্বিষহ করা হয়েছিল। ঔপনিবেশিকদের অধীনে ভারতবর্ষে পুঁজিবাদী শিল্প বৃদ্ধির সূচনা ইউরোপের বেশ কয়েকটি দেশে প্রত্যক্ষ করার বিস্তৃত ধারণা ছিল বলে মনে করেন অর্থনৈতিক ঐতিহাসিকেরা ও সমাজবিজ্ঞানীরা।

ছোটনাগপুর মালভূমি অঞ্চলের খনি অঞ্চলগুলিতে একদিনে শ্রমিক শ্রেণির ইতিহাস গড়ে উঠেনি। বাংলার মজুরশ্রেণির উত্থান সম্পর্কে একদা বিনয় ঘোষ মন্তব্য করেছিলেন যে,[152] ইংরেজদের নতুন জমিদারী ব্যবস্থার ফলে বাংলার কৃষক, কারিগররা ধ্বংস হয়েছিল এবং দস্যু ও লাঠিয়ালদের মাধ্যমে কৃষকদের ঘর, বাড়ি, ক্ষেত খামার জ্বালিয়ে গ্রামছাড়া করেছিল। জমিদাররা কৃষকদের উচ্ছেদ করে শহরের কলকারখানার সর্বস্বান্ত মজুর শ্রেণিতে পরিণত করেছিল। ভবঘুরে চোর, ডাকাতের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছিল একদিকে, অন্যদিকে প্রজা উচ্ছেদ ও লুঠতরাজের মধ্য দিয়ে বাংলার কয়লাখনি ও কলকারখানায় আদিবাসী শ্রমিক শ্রেণির শ্রমের চাহিদা বৃদ্ধি পেতে শুরু করেছিল।[153]

রজনিপাম দত্তের কথায়[154] মহাজনরা কৃষকদেরকে শ্রমিক হিসাবে নিযুক্ত করে ক্রমশ গ্রামের অর্থনীতিতে ক্ষুদ্র মুলধনীর ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। মহাজনের পশ্চাতে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির ভূমিকা ছিল বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। পুঁজি ও মজুরি শ্রমের এই সংযোগ থেকেই শিল্প পুঁজির অভ্যন্তরীণ বাজার তৈরি হওয়ার এক সম্ভাবনা দেখা দিতে থাকে। গভীর এক আন্তঃ সম্পর্ক ছিল কৃষি প্রশ্ন আর শিল্প পুঁজির ভেতর, যা পুঁজিবাদের বৈশিষ্ট্যসূচক কাঠামোগুলোর মধ্যে নির্ধারিত হয়েছিল। বাড়তি রাজস্ব কর উৎপাদকের বোঝাকে বৃদ্ধি করেছিল, যখন তা আক্ষরিক অর্থেই অসহনীয় হয়ে উঠেছিল। কৃষিক্ষেত্রে উৎপাদন সংক্রান্ত বাজারগুলির চাহিদা

---

152. ঘোষ. বিনয়, *বাংলার নবজাগৃতি,* কলকাতা, ওরিয়েন্ট ব্ল্যাক সোয়ান প্রাইভেট লিমিটেড, প্রথম সংস্করণ ১৯৭৯, পৃ. ৫০

152. বন্দোপ্যাধ্যায়. অমৃতাভ, *পাশ্চাত্য রাষ্ট্রচিন্তার এক ইতিহাস,* কলকাতা, সুহৃদ পাবলিকেশন, প্রথম প্রকাশ ১৯৯৬, পৃ.- ২৭৮-২৮৬ ।

153. ঘোষ. বিনয়, *বাংলার নবজাগৃতি,* কলকাতা, ওরিয়েন্ট ব্ল্যাক সোয়ান প্রাইভেট লিমিটেড, প্রথম সংস্করণ ১৯৭৯, পৃ. ৫০-৫২

154. Dutt. R. P., *The Agrarian crisis in India before Independence: Towards its solution,* Delhi, Gambol books publication, 2009, P. 40-56.

হ্রাস পেতে থাকলে শিল্পের যোগান বৃদ্ধি পেয়েছিল ফলত, যে শ্রম শক্তির মাধ্যমে ব্যবস্থার পরিপুষ্টি ঘটেছিল সেই শ্রমশক্তিই একসময় অবসন্ন হয়ে পড়েছিল। উৎপাদনকারী ব্রিটিশ ধনতন্ত্রের কৃষি উপনিবেশে জীবিকাহীন মজুর শ্রেণির চাহিদা বৃদ্ধি পেয়েছিল ভারবাহী কর্মে যা, ঔপনিবেশিক ভারতীয় অর্থনৈতিক ইতিহাসে বিশেষ ভাবে গুরুত্বপূর্ণ ছিল।

কৃষকের সাথে সামাজিক সম্পর্ক ও কৃষি কাঠামোর পরিবর্তিত অবস্থা মজুর শ্রেণির চাহিদাকে বৃদ্ধি করেছিল বলে মার্কস মনে করেন। শিল্পাঞ্চলে বাণিজ্যিক পুঁজির বিকাশ ও মজুর শ্রেণির বৃদ্ধি মার্কস, পুঁজিবাদী উৎপাদন পদ্ধতির অন্যতম পূর্ব শর্ত হিসাবে গণ্য করেছিলেন।[155] এ প্রসঙ্গে লেনিনের মত[156] থেকে জানা যায় সমাজে শ্রম বিভাগের উদ্ভবের সাথে সাথে উৎপাদন ও বাজার আবির্ভূত হয়েছিল যা কৃষকের পারিবারিক খামার নির্ভর কৃষক উৎপাদন পদ্ধতি বা প্রাক ধনতন্ত্রী অর্থনীতির ভাঙ্গনের সূচনা করেছিল। মার্কসের মতে সমাজ উৎপাদনের পর্যায় থেকেই মূলত শোষিত মজুর শ্রেণির জন্ম হয়েছিল।

প্রখ্যাত ইয়ান ব্রেমান[157] বিশ্বের আদিম অধিবাসীদের সাথে ভারতের এই শ্রমিকদের শিকারি- সংগ্রহকারীদের সাথে তুলনা করেছেন। আদিম অধিবাসীরা যেমন খাবারের পিছনে ছুটেছিল ঠিক তেমনই অন্যদিকে এই শ্রমিকরা ছুটেছিল খনির মত ভারবাহী কর্মক্ষেত্রে যেখানে এই রাজ্যের মধ্যে অসম বিকাশ লক্ষ করা যায়।[158] তিনি সমীক্ষায় দেখিয়েছেন যে, চিরায়ত পদ্ধতিতে শোষণ ছিল জটিল, যার লাঘব হত মুরুব্বি সম্পর্কের ফলে। জমিহীন শ্রেণির সম্পর্ক রূপান্তরিত হয়েছিল ঋণের শর্ত ভিত্তিক শ্রমে।

সমাজবিজ্ঞানীদের মতে আদিবাসী কৃষকরা গৃহস্থালী বা পারিবারিক খামার উৎপাদন পদ্ধতির উপর নির্ভর ছিল যা প্রাক ধনতন্ত্রী পদ্ধতির উৎস ছিল। এই ধনতান্ত্রিক পদ্ধতিতে কৃষি অর্থনীতির বদলে খনিজ শিল্প অর্থনীতি ধীরে ধীরে মুনফার সংজ্ঞাটিকে প্রসারিত করে

---

155. হিল্টন. রডলি, *সামন্ততন্ত্র থেকে পুঁজিবাদে উত্তরণ,* কলকাতা, সেতু পাবলিকশন, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০১২, পৃ.- ১৩১।

156. বন্দোপ্যাধ্যায়. অমৃতাভ, *পাশ্চাত্য রাষ্ট্রচিন্তার ইতিহাস,* কলকাতা, সুহৃদ পাবলিকেশন, প্রথম প্রকাশ ১৯৯৬, পৃ.- ২৭৮-২৮৬ ।

157. Breman. Jan, *Capitalism, Inequality and Labour in India,* Delhi, Cambridge University Press, 2019, Pp. 94-98.

158. *শ্রমজীবী ভাষা,* ভলিউম-১২, ইস্যু- ৭-৮, পৃ.- ১৩।

তুলেছিল। অর্থনীতিবিদ জারগেন[159] গুরুত্বপূর্ণ শ্রম বাজার এবং শ্রমের অবস্থার বিশ্লেষণ করার সময়, প্রাথমিকভাবে মুনফাজনিত অর্থনৈতিক দিকগুলির উপর গুরুত্ব আরোপ করার উপর জোর দিয়েছিলেন। কৃষি অর্থনীতির ইতিহাসের সাথে শ্রম ও শ্রমিক শ্রেণির ইতিহাস আন্তঃসম্পর্কিত ছিল যেখানে পূর্ব ভারতের ছোটনাগপুর মালভূমির অর্থনৈতিক ইতিহাসে, শ্রমের মৌলিক রূপগুলি বহিঃপ্রকাশিত হয়েছিল। ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রে বাণিজ্য পুঁজির মাধ্যমে শ্রম নির্ভর অর্থনীতির পাশাপাশি উদ্বৃত্ত অর্থনীতি উৎপাদনের স্থান তৈরি হয়েছিল। ঔপনিবেশিক পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের বিক্রিত সীমাবদ্ধ ভূমিকাকে অন্তর্নিহিত করার প্রবণতা তৈরি হয়েছিল[160] যা দিপেশ চক্রবর্তী স্বীকার করেছেন। ব্রিটিশ শাসকের সর্বগ্রাসী সাম্রাজ্যবাদী অত্যাচার ধীরে ধীরে তীব্র হয়ে উঠেছিল যার ফলস্বরূপ আদিবাসী সমাজকে ক্রমশ এক অনিবার্য অর্থনৈতিক সংকটের রুপান্তরের বৃত্তে নিক্ষেপ করেছিল। দীর্ঘদিনের স্বাবলম্বী গ্রামীণ আদিবাসী কৃষক শ্রেণির অর্থনীতিকে বিভাজিত করেছিল কয়েকটি পর্যায়ের মধ্য দিয়ে।

প্রথমত, কৃষি উৎপাদন যখন পণ্যে পরিণত হয়, তখন তার ব্যবহার মূল্য ও বিনিময় মূল্য[161] যৌথভাবে কৃষির বিভিন্ন ধরনের উৎপাদনের বিনিময়কে সম্ভব করে তুলেছিল। কৃষি থেকে শিল্পজাত পণ্য উৎপাদনকারী একটি শাখা রুপে বাজার ও পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে রূপান্তরিত করেছিল। কৃষিতে ধনতন্ত্রী উৎপাদন পদ্ধতির বিকাশে স্থবিরতা ও মুমূর্ষু কৃষি উৎপাদনকে হ্রাস করেছিল। এই উৎপাদন পদ্ধতি হ্রাস পেলে ধনতান্ত্রিক উৎপাদন পদ্ধতিতে পুঁজি বিকাশের জন্য প্রাকৃতিক সম্পদ উত্তোলন ছিল বিশেষ ভাবে গুরুত্বপূর্ণ। এই উৎপাদন পদ্ধতি থেকে জন্ম হয়েছিল "আদিবাসী কৃষক থেকে শ্রমিক শ্রেণির"।

দ্বিতীয়ত, ষাটের দশকের পর থেকে কৃষি একটি অলাভজনক পেশায় পরিণত হয়েছিল। কৃষিকাজে সরকারী উদাসীনতা ও স্থানীয় মহাজন ও বাবুদের জোট কৃষিজীবী মানুষের

---

159. Breman. Jan, *Outcast Labour in Asia,* Delhi, Oxford University Press, Frist Edition 2010, Pp. 51-59.

160. Gupta. Ranajit Das, *Labour and Working class in Eastern India,* New Delhi, K. P. Bagchi & Company, 1994, Pp. 410.

161. মার্কস. কার্ল, *মজুরী দাম মুনফা,* কলকাতা, ন্যাশানাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, প্রথম সংস্করণ-১৯৫৪, পৃ.- ২৪-২৬।

জমিকে অকৃষিজীবী করে তুলতে বাধ্য করেছিল।[162] ছোটনাগপুরের অন্তর্গত রাঢ় এলাকাগুলি অপর্যাপ্ত বৃষ্টিপাত, সেচের সুবিধার অভাব, লাল মাটি এবং অপ্রচলিত ভূখণ্ডের অবস্থার কারণে কৃষিকাজের উন্নতি অব্যাহত ছিল। চাষের বৃদ্ধি স্পষ্টই একটি অত্যন্ত ধীর প্রক্রিয়া ছিল যার প্রধান বাঁধা ছিল এই অঞ্চলের বাস্তুবিদ্যা। চাষের জন্য জলের অভাব বহু বছর থেকেই ছিল। চাষের একাধিক জমির বড় অংশই সম্পূর্ণভাবে বৃষ্টিপাতের উপর নির্ভরশীল ছিল। তরঙ্গায়িত ঢালু উপত্যাকায় চাষবাসের সীমিত সুযোগ না থাকায় পাথর উত্তোলনের ইতিহাস চমকপ্রদ হয়ে উঠেছিল। চাষিদের কাছে জলের অভাব কাটিয়ে ওঠার থেকে শ্রম দান করাটা অনেক বেশি সজহসাধ্য ছিল। এই পর্যায়ে তাদের কৃষি জমি ছেড়ে অন্য ক্ষেত্রে নৈমিত্তিক শ্রম দান করা প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছিল। অবিভক্ত বাংলার গ্রামীণ এলাকার ৪২টি কেন্দ্র থেকে বছরের প্রতি পাক্ষিক দিনে বেশ কয়েকটি কৃষি শ্রমিক পরিবারের সাক্ষাৎকার, দৈনিক কর্মসংস্থান, মজুরী, পাক্ষিক পারিবারিক বাজেট এবং অন্যান্য বিশদ বিবরণ সংগ্রহ করা হয়েছিল। সেই তথ্যের ভিত্তিতে ছোটনাগপুর মালভূমির অন্তর্গত জেলাগুলিতে, প্রাথমিক পেশা হিসাবে কৃষি শ্রম সহ পরিবারের সহায়ক পেশার পরিবর্তন লক্ষ করা গিয়েছিল। গ্রামীণ এলাকায় মোট জনসংখ্যার পাশাপাশি কৃষি ও শ্রমিকের অনুপাত পশ্চিমবঙ্গের বীরভূমে অধিক ছিল। যার ফলাফল বীরভূমের শিল্পায়নে তাদের অংশগ্রহণ অধিক ছিল বলে মনে করা যায়”।[163] অন্য ক্ষেত্রে লক্ষ করা যায় জীবিকার সন্ধান করতে গিয়ে দারিদ্র্যের তাগিদে জোরপূর্বক খনির কাজ তাদের কাছে নিত্য নৈমিত্তিক হয়ে উঠেছিল।[164]

তৃতীয়ত, অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ও উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে বাংলা, বিহার উড়িষ্যায় জমিদারি ব্যবস্থার পাশাপাশি ‘জমি জোতের মালিকানা’ থাকার ফলে আদিবাসী চাষিদের অর্থনীতি বিভাজিত হয়েছিল। গ্রামের অর্থনৈতিক কাঠামোয় আয়ের একমাত্র

---

162. কর. শমিত কুমার, *সিলিকোসিস মৃত্যুর ঢল,* (চার নং প্ল্যাটফর্ম একটি ব্যাতিক্রমী ওয়েব পত্র), ২০০৪।

163. *Final Report of Enquiry into the Condition of Agricultural Labourers of West Bengal, 1946-47,* Alipore, West Bengal, West Bengal Government Press, 1953, P. 1-5.

164. Mazumdar. Nabendu Datta, *The Santal a study in cultural change*, Calcutta, Department of Anthropology, Published by government of Indian press, 1956.

নির্ধারক ছিল জোতদার শ্রেণি।[165] ধনী জমিদাররা প্রথম দিকে বিপন্ন দরিদ্র কৃষকের জমি কেনা, সুদের ব্যবসা, বন্ধকি, মজুতদারি, ফাটকাবাজিরা প্রভৃতি খাতে উদ্বৃত্ত বিনিয়োগ করেছিল। এসব খাতে বিনিয়োগের থেকে শিল্প উৎপাদন প্রক্রিয়ায় বিনিয়োগের পরিমাণ ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পেয়েছিল। বাংলার গ্রামীণ সমাজে কৃষকদের ব্যাপক ঋন এই প্রক্রিয়াকে স্থায়ী করতে তৎপর হয়ে উঠেছিল। যা থেকে তৈরি হয়েছিল সম্পত্তিবান ও সর্বহারাদের দুটো বৈরী দল বিভক্ত সমাজ।[166] নগদ রাজস্বের তাড়নায় গরীব চাষিরা সুদের জাঁতাকলে উচ্ছেদ হয়েছিল এবং জমির প্রতি অধিকার হারিয়ে ফেলেছিল। কর্ষিত জমিগুলি খনন করে খনিজ আকরিকের জন্য খনি আবিস্কার হয়েছিল। আদিবাসীদের জমিগুলির উপর একরাশ আধিপত্যের ফলে জন্ম নিয়েছিল বাংলা ও বিহারের ব্যবসায়ী শ্রেণির। উৎপাদনভিত্তিক জমিগুলির বানিজ্যিকরণ শুরু হলে চিরাচরিত জোতগুলি ভেঙ্গে কৃষক থেকে মজুরদের মধ্যে সামাজিক স্তরায়নের বিভাজন শুরু হয়েছিল। এই পরিস্থিতিতে বাংলা ও বিহারের জোতদার ও মালিক শ্রেণি অধিক পরিমানে জমি ক্রয় করে শিল্পখাতে বিনিয়োগ করতে শুরু করেছিল। কৃষিক্ষেত্রে কাজ হারিয়ে গ্রামে গ্রামে কর্মরত এক বিরাট সংখ্যক আদিবাসী মহিলা ও পুরুষ আদিবাসী শ্রমজীবী মানুষের ভিড় বৃদ্ধি পেয়েছিল। এই কাজে দৈহিক 'শ্রম' ছিল ভীষণভাবে গুরুত্বপূর্ণ। ঔপনিবেশিক সরকার থেকে বড় বড় জমিদার নিজেদের স্বার্থের জন্য ক্রমান্বয়ে অত্যাচার ও অবিচার করে এই প্রক্রিয়াকে সক্রিয় করে তুলেছিল।

চতুর্থত, আঠারো শতকের শেষ থেকে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে আদিবাসীদের কৃষক থেকে শ্রমিকে সর্বহারা গোষ্ঠীর শ্রমিক শ্রেণিতে রূপান্তরিত হওয়ার প্রক্রিয়াকরণ শুরু হয়েছিল মূলত 'কর্তৃত্ববাদের' মধ্য দিয়ে। সামগ্রিক অর্থনৈতিক বিকাশের পরিবর্তে কৃষি 'অনগ্রসরতার অগ্রসরনের' ফলে ধর্ম, বর্ণ বা সাংস্কৃতিক ভাষা গোষ্ঠীর কেন্দ্রীভুত চেতনা এবং অন্যদিকে নতুন উদীয়মান এবং বিকাশমান শ্রেণি পরিচয়ের ভিত্তিতে শ্রম কাঠামো তৈরি করতে সহায়তা করেছিল। Lord Acton এর মতে, "Power

165. মুখোপাধ্যায়. অনিমা, *আঠেরো শতকের বাংলা পুঁথিতে ইতিহাস প্রসঙ্গ,* কলকাতা, সাহিত্যলোক পাবলিকেশন, প্রথম প্রকাশ ১৯৮৭ আগস্ট, পৃ.- ৮৭।

166. ঘোষ. বিনয়, *বাংলার নবজাগৃতি,* কলকাতা, ওরিয়েন্ট ব্ল্যাক সোয়ান প্রাইভেট লিমিটেড, প্রথম সংস্করণ ১৯৭৯, পৃ. ৫৯-৬২

corrupta, absolute power corrupts absolutely".[167] মূলত কৃষি সম্পদের কেন্দ্রীভনের মধ্য দিয়ে এই বৈষম্যজনিত সমাজ তৈরি হয়েছিল কর্তৃত্ববাদের মধ্য দিয়ে। মার্কসবাদী ও নৈরাস্ট্রবাদীদের মধ্যে শোষক শ্রেণিকে কেন্দ্র করে এই বিতর্ক তৈরি হয়েছিল। মার্কসবাদীরা বৈষম্যের মূলে শোষক শ্রেণি অর্থাৎ পুঁজিবাদী গোষ্ঠীকে[168] দায়ী করেছেন। অন্যদিকে নৈরাস্ট্রবাদীরা[169] যে কোন ধরনের কর্তৃত্বকে বৈষম্য, অসমতা, অনাধিকারের জন্য দায়ী করেছেন। এই পরিস্থিতিতে লক্ষ করা গিয়েছিল কোম্পানির কর্মচারীরা পুনরায় শ্রমিক পরিবারের শ্রমশক্তি শোষণের জন্য শিল্পাঞ্চলে বেশি বেশি করে মজুর নিয়োগ করতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল। ঔপনিবেশিক পর্বে বর্ণকে ভিত্তি করে সমাজের মধ্যে অর্থনীতিতে বিভাজন দেখা দিয়েছিল। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পূর্ব থেকেই গ্রামের অন্যান্য হিন্দু নিম্নবর্গীয় বর্ণের চাষিদের সাথে আদিবাসীদের আয়ের বন্টন অসম থাকায় কর্মক্ষেত্রে সম স্বাধীনতা প্রাপ্য হত না। ইউরোপীয়রা বর্ণবাদী দৃষ্টিভঙ্গি কালো বর্ণের উপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে আদিবাসী শ্রমিকদের জীবনযাপনের অবস্থাকে ধীরে ধীরে সঙ্গিন করে তোলা হয়েছিল। পুঁজিভিত্তিক গোষ্ঠীর আগমনের ফলে গ্রামীণ সমাজে শোষণ ও 'সম্পদের কেন্দ্রীভবন'[170] দেখা যায়। কৃষিখাত থেকে উচ্ছেদিত আদিবাসীরা 'জাত- দ্বন্দ্বের' বেড়াজ্বালে আবদ্ধ হয়ে খনিজ শিল্পাঞ্চলের শ্রমিকে পরিণত হয়েছিল।

পঞ্চমত বলা যায় যে, ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ শক্তি উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম থেকে আদিবাসীদের 'সংখ্যালঘু ও অশিক্ষার' কারণকে কেন্দ্র করে গ্রামীণ অর্থনৈতিক উৎপাদন সম্পর্কের বিস্তৃত পরিবর্তন ঘটেছিল। আদিবাসী জনজাতিরা সংখ্যালঘু ও অশিক্ষিত হওয়ায় মূলত গৃহস্থালি নির্ভর উৎপাদনের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল। দীর্ঘদিন ধরে এই উৎপাদনকে দৃঢ় করা যায়নি কারন জমিদার ও কোম্পানির কাছে আদিবাসী সংখ্যালঘু কৃষকেরা ছিল মুনফা লাভের কারখানা। ভূমিহীন আদিবাসীদের অশিক্ষার

---

167. বন্দোপ্যাধ্যায়. অমৃতাভ, *পাশ্চাত্য রাষ্ট্রচিন্তার ইতিহাস,* কলকাতা, সুহৃদ পাবলিকেশন, প্রথম প্রকাশ ১৯৯৬, পৃ. ২৫৮-২৫৯

168. তদেব। পৃ.- ২৫৬- ২৮০

169. তদেব। পৃ.- ২৯০

170. হাবিব. ইরফান, সৌভিক বন্দ্যোপাধ্যায় (অনু), *মধ্যযুগের ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাস,* কলকাতা, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, জানুয়ারি ২০০৪, পৃ.- ৭-১০

সুযোগ নিয়ে বিভিন্ন আইন প্রবর্তনের মাধ্যমে আদিবাসী শ্রেণির উপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। কৃষি নির্ভর সমাজে শ্রম ও সম্পদ বন্টনের তারতম্য কৃষকদের মাঝে এক ধরনের সামাজিক স্তর বিন্যাস সৃষ্টি করেছিল। অশিক্ষিত আদিবাসী কৃষক সমাজের পুরনো কাঠামো ভেঙ্গে যন্ত্র নির্ভর সমাজের ছাঁচে শ্রমিক শ্রেণিতে গড়ে তুলতে ব্রিটিশদের অধিক বুদ্ধি প্রয়োগ করতে হয়নি। কৃষি থেকে শিল্পে যোগদানের কারন ছিল আদিবাসী কৃষকদের কর্মসংস্থান। সরল জীবন যাপনে অভ্যস্ত আদিবাসী কৃষকদের দুর্বলতার সুযোগ নেওয়া হয়েছিল। শিল্পায়ন করার লক্ষ্যে পূর্ব ভারতের ছোটনাগপুরে ব্যবসায়ী গোষ্ঠী, সনাতন জীবনধারা ও সংস্কৃতির প্রবাহক অশিক্ষিত দুর্বল আদিবাসীকে হাতিয়ার করেছিল। সাধারণ জীবন যাপনে অভ্যস্ত কৃষক সমাজকে ধ্বংস করে পুঁজিবাদী শ্রমিক শ্রেণিতে রূপান্তরের প্রক্রিয়ায় ব্রিটিশ কোম্পানিরা সফল হয়েছিল। কৃষিক্ষেত্রে বিরাজমান প্রাকধনতন্ত্রী উৎপাদন সম্পর্ক ধ্বংস করে ধনতন্ত্রী উৎপাদন বিকশিত হয়েছিল শিল্পাঞ্চল গুলিকে কেন্দ্র করে।

অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীতে একাধারে ইংরেজ বণিকরাজ ধীরে ধীরে ভারতবর্ষের অর্থনীতির ক্ষতিসাধন করে চলছিল, অন্যদিকে গ্রেট ব্রিট্রেনের বিপুল পরিমাণ মুনফা সঞ্চিত হয়ে চলেছিল বাংলা ও বিহারের লুণ্ঠিত ধনসম্পদ থেকে। অর্থনৈতিক বানিজ্যের সমস্ত চরিত্রই ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হতে শুরু করেছিল। উনবিংশ শতকের মধ্যভাগে অর্থনীতি, কৃষি থেকে শিল্প পুঁজিতে স্থানান্তরিত হয়েছিল খনিজ শিল্পের চাহিদার জন্য। ১৮৪০-৬০ সাল এমনই এক যুগ সন্ধিক্ষণ ছিল, যখন ভারতীয় জনসাধারণের অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের বিনিময়ে ক্রমোস্ফিত হয়ে উঠতে শুরু করেছিল ইংল্যান্ডের জাতীয় অর্থনীতি। এই অবস্থায় ভারতবর্ষে প্রবর্তিত হয় "Dual Economy"[171] নামে এক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা।[172] ইংল্যান্ডের জাতীয় অর্থনীতি ক্রমোস্ফিত হওয়ার পশ্চাতে ভারতীয় খনির সূচনা বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য ছিল কেননা গ্রামাঞ্চলের কৃষি খাত থেকে উদ্বৃত্ত মূলধন ও খনি থেকে উদ্ভুত কাঁচামাল ইংল্যান্ডের জাতীয় অর্থনীতিকে পরিপুষ্ট

171. Economic and political weekly, vol-7, Issue-17, 23 April, 1955, P. 490-491.
172. Bardhan. Pranab, *Development Microeconomics,* Oxford academic, May 1999, pp. 196-206.

করেছিল। “Dual Economy”[173] ব্যবস্থার মাধ্যমে ১৮৬০ সালে ইংল্যান্ডের শিল্প বিপ্লবের ফলে ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ অর্থনীতির বিকাশ ঘটেছিল। ইংল্যান্ডে শিল্প বিপ্লব দেখা দিলে অতিরিক্ত পুঁজি ও কাঁচামালের প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল। সেই কাঁচামালের যোগান ছোটনাগপুরের মালভূমির আকরিক খনি অঞ্চলগুলি চাহিদা পূরণ করেছিল। বৃহৎ পরিমানের কাঁচামাল সরবরাহ করা সুবিধাজনক ছিল মালগাড়ির মাধ্যমে। দ্রুত কাঁচামালের যোগানে প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল রেল ব্যবস্থা ও অত্যাধিক শ্রমের। মূলধন বিনিয়োগ করার পাশাপাশি অতিরিক্ত মুনফার আশা একমাত্র নিবৃত্তি করা সম্ভব ছিল শিল্প শ্রমিকের মাধ্যমে। সেই চাহিদাকে মাথায় রেখে অল্প সময়ের মধ্যে ব্রিটিশ সরকার দ্রুত রেল শিল্প প্রসারে হস্তক্ষেপ করেছিল। অধিক মুনফা অর্জনের লোভে অল্প মজুরির ভিত্তিতে অধিক পরিশ্রমে রেল শিল্পাঞ্চল থেকে খনিতে মজুরদের চাহিদাটিও পূরণ করা সম্ভব হয়েছিল আদিবাসী জনগোষ্ঠীদের দ্বারা। এই অবস্থায় আদিবাসী কৃষিজীবীরা কষ্ট করে বেঁচে থাকার উপকরণটুকু মাত্র উপার্জন করতে পেরেছিল। ঔপনিবেশিক শাসন নীতির ফলে গ্রামাঞ্চলের কৃষিব্যবস্থা থেকে উৎখাত হয়ে আদিবাসী কৃষকদের এক বৃহৎ অংশ জীবিকাহীন হয়ে পড়েছিল। আদিবাসী বেকারদের মধ্যে বেকারত্বের অর্থনৈতিক দুর্বলতা দেখা দিতে শুরু করেছিল। ভূমিহীন আদিবাসীরা মজুর হওয়ার নেশায় মত্ত হয়ে পড়েছিল। এই পরিস্থিতিতে আদিবাসীদের কাছে নতুন এক পথ প্রশস্ত হয়েছিল যা শারীরিক শ্রমের উপর নির্ভর ছিল এ কথা হান্টার তাঁর গ্রন্থে স্বীকার করেছেন।[174] শ্রম দিতে বিনা পারিশ্রমিকেরা হাজির হয়েছিল অগণিত আদিবাসী কৃষকরা। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি তাদের কাঁচামালের চাহিদা পূরণের উদ্দেশ্যের কাজে গ্রামীণ আদিবাসী কৃষকদেরকে কায়িক ও দৈহিক পরিশ্রমে ব্যবহার করতে শুরু করেছিল।

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে ‘Dual economy’[175] প্রচলনের কারণে স্থানগুলি ব্যবসা বানিজ্যের জন্য গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হয়ে উঠলে অ-কৃষি ভিত্তিক পেশা আদিবাসীদের নতুন কর্মক্ষেত্র তৈরি করেছিল। ভারতের বৈদেশিক বানিজ্যে কোম্পানিই ধীরে ধীরে আধিপত্য বিস্তার

---

173. ব্রিটিশ ভারত উপনিবেশে দুতলা অর্থনীতির সৃষ্টি হয়। অপরের তলায় ব্যবস্থিত ক্ষেত্র আর নিচের তলায় থাকে প্রাক শিল্প কুটির শিল্পের ধংসাবেশ।

174. Hunter. W. W., *A statistical account of Bengal,* Vol-17, London, Trubner & co., 1877, Pp. 99-103.

175. মিত্র. গৌরিহর,*পশ্চিমবঙ্গ সাঁওতাল বিদ্রোহ সংখ্যা,* পশ্চিমবঙ্গ, তথ্য সংস্কৃতি বিভাগ, ২৫ আগস্ট ১৯৯৫, পৃ. -২৪-২৫

করার পর উদ্বৃত্ত মুনফার প্রতি মনোযোগ দেওয়ার ফলে বিদেশী পুঁজিপতিরা নিজেদের মূলধন বিনিয়োগ করে এদেশের সস্তা কাঁচামাল ও সস্তা শ্রমিকের সাহায্যে যে শিল্প কারখানাগুলি গড়ে তুলেছিল তাঁর মধ্যে বস্ত্র ও পাট শিল্পের পাশাপাশি রেল ও খনি অঞ্চল গুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ছিল। উনিশ শতকের অন্তিম ও বিংশ শতকের প্রারম্ভে প্রাথমিক পণ্য রপ্তানি এবং উপনিবেশে তৈরি পণ্য আমদানির ব্যবসা দ্রুত বৃদ্ধি পায় এবং উদ্বৃত্ত ব্রিটিশ পুঁজির জন্য বিদেশে মূলধন বিনিয়োগের সর্বোত্তম সুযোগ ছিল এই খনি ক্ষেত্রগুলি। আধিপত্যকারী ব্রিটেন ভারতীয় খরচে, রেল পরিবহনের মাধ্যমে এমন একটি ব্যবস্থা তৈরি করতে সক্ষম হয়েছিল যা ঔপনিবেশিক নাগরিকদের পক্ষে বানিজ্যের শর্তাদি পূরণ করা হয়েছিল। শিল্প গঠনই যখন উৎপাদনের ব্যবস্থায় অভিযোজনের একটি বিশেষ প্রক্রিয়া[176] রূপে প্রতিভাত হয়েছিল, তখন লর্ড ডালহৌসি, ১৮৫৩ সালে ভারতের দূরবর্তী ও চাষের অযোগ্য অঞ্চলগুলিতে নির্মাতাদের জন্য রেলওয়ে নির্মাণের মধ্য দিয়ে একটি বিশাল শ্রম বাজারের কল্পনা করার প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন। ১৮৬৫ ও ১৮৭৮ এর অরণ্য আইন[177] পাশ হবার পর অরণ্য সম্পদ, বনবিভাগ, বনজ সম্পদ কোম্পানির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতে শুরু করলে ব্রিটিশদের একচেটিয়া অধিকার প্রতিভাত হয়েছিল। জমির পাশাপাশি রেলপথের সম্পসারনের ফলে বাংলা, বিহার, যুক্তপ্রদেশ ও মধ্যপ্রদেশের জমিদার, মহাজনরা এক একটি অঞ্চল ইজারা নিতে শুরু করেছিল। জমিদাররা পুরাতন ইজারাদারদের বাতিল করে বহিরাগত ইজারাদার নিয়োগ করেছিল। ব্রিটিশ সরকার রেলপথ প্রবর্তনের সিধান্ত নিলে অসংখ্য মজুরের প্রয়োজন হতে থাকে। এদিকে জমিহীন সাঁওতাল আদিবাসীরা কাজের সন্ধানে ব্রিটিশদের রেল লাইনের লুপ তৈরির[178] কাজে আদিবাসী সাঁওতালদের জবরদস্তি এই কাজে নিযুক্ত করা হয়। অর্থনৈতিক শোষণের পরিপ্রেক্ষিতে কিছু আদিবাসী সাঁওতালরা মনে করেছিল, ব্রিটিশ প্রশাসন ততটা প্রত্যক্ষ শোষণের অংশীদার ছিল না যতটা জমিদাররা ছিল। পাঁচ বছরের মধ্যে আদিবাসী সাঁওতাল মজুরদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছিল। সাঁওতাল পুরুষ মজুররা কাজে দলে দলে যোগ দিলেও মহিলাদের সংখ্যা অধিক

---

176. Gupta. Pranab Kumar, *Impact of Industrialisation on a Tribe in South Bihar,* Calcutta, Published by The director Anthropological Survey of India, 1978, P. 25-34.

177. Mopherson. H, *Report of the Survey and settlement operations,* Santal Paragana, Calcutta, Bengal secretariat book depot, 1909, Pp. 90-93.

178. *Report of the Santal Pargana,* Santal paragana, Record room of the deputy commissioner, 1857, P. 23.

পরিমানে ছিল[179] যার ব্যাখা পাওয়া যায় তৎকালীন বিভিন্ন জেল রিপোর্ট, সরকারি প্রতিবেদন, সরকারি পুলিশ রিপোর্ট ও নানা প্রবন্ধে। সামাজিক বিবরণের মধ্যে রেলপথের লুপ তৈরির হাত ধরে আদিবাসী শ্রমিকদের ভারী যন্ত্র সভ্যতায় প্রবেশ শুরু হয়েছিল। পুরুলিয়া ও রাণীগঞ্জের দিকে নিযুক্ত ছিল কোল নামক আদিবাসী শ্রমিকরা। তীব্র অনিচ্ছা স্বত্বেও আদিবাসীরা জোরপূর্বক রেল শিল্প শ্রমিকের পেশায় যোগদান করেছিল।[180] খনি ও ভারী শিল্পের কারখানায় ভূমিহীন আদিবাসী মহিলা ও পুরুষেরা ভিড় করে জীবিকার সন্ধানে এগিয়ে এসেছিল।

এরপর রেল ব্যবস্থার পাশাপাশি গড়ে উঠতে থাকে কয়লা ও লোহা আকরিকের খাদান ক্ষেত্র। ছোটনাগপুর মালভূমিতে মূলত খনিজ সম্পদ কয়লা,[181] লোহা, তামা, অভ্র, পাথর, বক্সাইট খনির সূচনার মধ্য দিয়ে আদিবাসীদের শ্রমিক শ্রেণিতে পরিনত হওয়ার সন্ধান খুঁজে পাওয়া যায়। ১৮৩৩ সালে প্রথম লেফটেন্যান্ট হ্যারিংটন বাংলায় কয়লা খনির সন্ধান করেছিলেন।[182] এছাড়াও তিনি ধলভুমের কাছে রাজধোহাতে তামার খনি প্রচলন করেন। ১৮৬২- ১৮৮০ এর মধ্যবর্তী মিঃ হুগস সম্পূর্ণ ঝড়িয়া অঞ্চল সার্ভে করে সরল আদিবাসী মানুষদের কয়লা উত্তোললের কাজে ব্যবহার করেছিলেন।[183] ১৮৫৪ সালে সিংভূমে তামার খনির সন্ধান পাওয়া যায়। তামার আকরিকগুলি ছোটনাগপুর থেকে ৪০ কিমি দূরে অবস্থিত হওয়ার ফলে শেষ পর্যন্ত মেদিনীপুরের পলিমাটির নিচে অদৃশ্য হয়ে যায় যদিও তামা নিষ্কাশনের খরচ ছিল অনেক কম।[184] একই বছরে ১৮৫৪ সালে খনিঅঞ্চল পরিদর্শন করার পর মিঃ এইচ রিকেটস, সি এস এর পরামর্শ দ্বারা স্বল্প অর্থ ব্যয় করে পুনরায় খনি অঞ্চল পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে পরীক্ষা করার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। ছোটনাগপুর মালভূমি অঞ্চলে কয়লা খনির আধিক্য থাকলেও অন্যান্য বিহারের অন্তর্গত ছোটনাগপুর মালভূমির ভাগলপুরে ২ টি,

---

179. চক্রবর্তী. তাপস, *হুল এক সশস্ত্র প্রতিবাদ,* সাঁওতাল বিদ্রোহ সংখ্যা, কলকাতা, তথ্য সংস্কৃতি বিভাগ, ১৪০২, পৃ. ১৩০

180. Gupta. Ranajit Das, *Labour and Working class in Eastern India,* New Delhi, Ranajit Das Gupta, K. P. Bagchi & Company, 1994, Pp. 10-16.

181. *Friends of India,* Serampore Press, (Weekly Paper), 1858, P. 1859, P 10-12.

182. বড়ুয়া লাহিড়ী. সুপর্ণা, *বিহার নারী সমাজ সংগ্রাম,* র‍্যাডিক্যাল কলকাতা, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি, ২০০৮, পৃ. ২২

183. তদেব। পৃ. ২২

184. Hunter. W. W., *A statistical account of Bengal,* Vol-17, London, Trubner & co., 1877, Pp. 99-103.

সিংভুমে ১৫টি ও মুঙ্গেরে ১টি ও সাঁওতাল পরগনায় ১টি চিনা মাটির কারখানা, ক্লোমাইট খনির কারখানা ৮ টি, তামা খনি ২ টি ছিল। সিংভুমে ৩ টি লৌহ আকরিক কারখানা, বিহারের ফায়ার ক্লে, ২টি স্বর্ণ খনি, হাজারিবাগে ১টি, রাঁচিতে ২ টি, শাহবাদে ৯ টি চুনাপাথর খনি, সিংভুমে ৯ টি, গয়াতে ২০ টি, রাঁচি ও হাজারিবাগের ৩৫ টি অভ্র খনি, শাহবাদ ১ টি, মুঙ্গেরে ২টি বালিপাথর ও শাহবাদে ও মুঙ্গেরে ১ টি করে সাঁওতাল পরগণায় ১৯টি, সিংভুমে ৩ টি গয়ার ৫ টি পাথর খাদান। বাংলার বীরভুমের ২ টি পাথর খাদান, ও উড়িষ্যার সম্বলপুরে ফায়ার ক্লে ১ টি, কোরাপুটের ১ টি ম্যাঙ্গানিজ খনি অঞ্চল গড়ে উঠেছিল।[185] বিহারের সিংভূমে ভৈরবপুর নামক পাথর খাদানের মালিক ছিল জেমস এইচ হারটলি। তার বিখ্যাত এজেন্ট ছিলেন জে ডবলু চাপমান"। শ্রমের যোগান শুধু রেলশিল্পে নয় বরং খনিগুলি ও পুঁজিবাদী উদ্যোগে ভাড়াটে ও চুক্তিবদ্ধ শ্রম দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করা হয়েছিল। জমি হস্তান্তরিতকরণ ও পুরুষ চাষিদের সংখ্যা ক্রমাগত জমি থেকে হ্রাস পেতে থাকলে অ-কৃষি জনিত অসংগঠিত[186] কর্মসংস্থানে আদিবাসী মজুরদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষাংশে ইংরেজগণ কর্তৃক বীরভূমের শাসনভার গ্রহণের সাথে সাথে পাশ্চাত্য বণিক সম্প্রদায় বিভিন্ন প্রদেশ থেকে আগমন করে বিক্ষিপ্তভাবে ছোটনাগপুর মালভূমি অঞ্চলের নানা স্থানে ব্যবসা বাণিজ্যের সূত্রপাত করেছিল। ইংরেজ ও ফরাসি বণিক সমূহ বীরভূমে লোহা, তসর, রেশম, গালা, পাথর ব্যবসায়ে নিজেদেরকে নিয়োজিত করার চিত্র লক্ষ করা যায়। যারা মূলত এদেশে সরাসরি বণিক সম্প্রদায় হিসাবে বাণিজ্য করতে প্রবৃত্ত হয়েছিল তাদের মধ্যে কিছু কুঠি স্থাপন করলেও কিছু পাশ্চাত্য বণিকরা ৭৬৫ টাকা খাজনার পরিবর্তে বীরভূমে ব্যবসা করার অনুমতি পেয়েছিলেন।[187] স্বল্প সংখ্যক জমিদারদের হাতে পর্যাপ্ত অর্থ ছিল। তাদের মধ্যে দু- চারজন শিল্পে বাণিজ্যে অর্থ বিনিয়োগও করেছিলেন। জমিদারদের খনি ব্যবসায় পুঁজি বিনিয়োগ ও আদিবাসী শ্রমিকদের যোগদান ঔপনিবেশিক পর্যায় থেকেই লক্ষ করা যায়। ১৮৫৯ সালের সেপ্টেম্বর থেকে বর্ধমান ও সাঁইথিয়ার মধ্যে রেলগাড়ি চলাচল শুরু হলে বীরভুমের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি হয় ও সাথে সাথে শিল্প প্রসারিত হয়েছিল। ব্যবসার

185. *Report of the List of mines other than coal mines worked under the Indians mines act,* Government of India, 1923, P. 63-111.

186 অসংগঠিত কথার অর্থ হল যে কর্ম ক্ষেত্র গুলিতে নির্দিষ্ট কোনো ব্যবস্থা বা নিয়মশৃঙ্খলা নেই। যেখানে ঐক্যের অভাব রয়েছে।

187. মন্ডল. অজিত(সম্পা), পশ্চিমবঙ্গ সংখ্যা, বীরভূম জেলা, ফেব্রুয়ারি ২০০৬, পৃ.-৩৩

ক্ষেত্রে উদ্যোগ সকলের মধ্যেই লক্ষ করা যায়। ১৮৯০ সালে ভারতে সাম্ভাব্য খনিজ পাথর সম্পর্কে একটি তদন্ত করা হয়েছিল। এই শতাব্দিতেই প্রথম দুবরাজপুরের পশ্চিম প্রান্তে সিউড়ি থেকে প্রায় আট মাইল দূরে কয়লা আবিষ্কৃত হয়েছিল। বীরভূম জেলার প্রবন্ধে প্যাটারসন (১৯১০) সালে, পশ্চিম বীরভূমের বিভিন্ন অংশে লোহা আকরিক, কয়লা, পাথর এবং চিনা মাটির অস্তিত্বের কথা উল্লেখ করেছেন। বেঙ্গল মিস রেকর্ড হান্টার দ্বারা কয়লা ও লৌহ আকরিক ব্যবসার ইতিহাসের একটি প্রামাণিক উৎস ছিল বাংলার বীরভূম।[188] ১৭৭৮ এর দিকে লোহার খনির সন্ধান বীরভূমে পাওয়া যায় এবং ১৭৮৯ সালে বীরভূমের বিভিন্ন স্থান থেকে লোহা ব্যবসার অনুমতি প্রাপ্ত হয়েছিল।[189] তাছাড়া তৎকালীন সময়ে এই খনিজ উৎপাদনগুলি অর্থনীতির জন্য গুরুত্বপূর্ণ হলেও ছোটনাগপুর মালভূমির অর্থনৈতিক পরিস্থিতিকে পরিবর্তন করতে খুব একটা সক্ষম হয়নি।[190] ইন্দ্র নারায়ন শর্মা যখন শিল্প স্থাপনের প্রয়োজনে উন্নত পদ্ধতিতে বীরভূমের খনি সম্পর্কীয় কাজ করার জন্য প্রথম আবেদনটি ১৭৭৪ সালে স্থানীয় ইন্দ্র নারায়ন শর্মা বর্ধমানের কাউওন্সিলের মাধ্যমে সরকারকে শর্ত আরোপ করেছিলেন।[191] তিনি প্রবল উৎসাহে আদিবাসীদের সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং চুয়াড় আদিবাসী যারা দেশত্যাগী হয়েছিলেন তাদের এই খনিজ উৎপাদনের অংশ হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করেন। ১৮৪৫ সালে মিঃ ওয়েলবি জ্যাক্সন বীরভূমের লোহার কাজের একটি সংক্ষিপ্ত হিসাব প্রকাশ করেন যেগুলি স্থানীয়দের দ্বারা প্রচলিত ছিল। ১৮৫৫ সাল নাগাদ কলকাতার "মেসার্স ম্যাকে অ্যান্ড কোম্পানি'[192] নামক একটি লোহার কারখানা প্রতিষ্ঠা করেন ও চুল্লি এবং কারখানা স্থাপিত হয় মহম্মদ বাজারে।[193] ১৮৭৫ সালে জিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া বীরভূমে লোহা

188. তদেব। পৃ. ৩৫

189. Heatly. S.G.T., *Contributions towards a history of the development of the Mineral Resources of India*, Ranchi, Government of India, 1877, P. 34-37.

190. *Economic Development in Different Regions in India,* New Delhi, Government of India Planning Commission, August, 1962.

191. গুপ্ত. রঞ্জন, রাঢ়ের সমাজ অর্থনীতি ও গণবিদ্রোহ, কলকাতা, সুবর্ণরেখা পাবলিকেশন, ২০০১, পৃ.- ২৫৪-২৬০।

192. *Report of the List of mines other than coal mines worked under the Indians mines act,* Government of India, 1951.

193. *Friends of India,* Serampore Press, (Weekly Paper), 1858, P. 1869, P 434.

তৈরির সম্ভবনার বিষয়ে অনুকূলভাবে রিপোর্ট তৈরি হতে থাকে।[194] খনিজ উৎপাদনের কাজ চলত দেশীয় পদ্ধতির বিভিন্ন পর্যায়ে। বীরভূমের অর্থনীতিতে লোহা গলাবার চুল্লিতে লোহা গলাবার কাজে আদিবাসী শ্রমিকদের ব্যবহার করা হয়েছিল। এখানকার স্থানীয় উপাদান থেকে দেশীয় প্রনালীতে লোহা সংগ্রহের জন্য এবং ধাতব লোহাস্তর থেকে লোহা নিষ্কাশনের জন্য শ্রমসাধ্য শ্রমিকের প্রয়োজন ছিল। এ প্রসঙ্গে বলা যায় বীরভূমের অন্যতম 'ঢেকারু'[195] নামক উপজাতি ছিল লোহা নিষ্কাশনের উদ্ভবক বলে জানা যায়। লোহা গলাবার জন্য আদিবাসী শ্রমিকদের অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে এদেশে আনয়ন করা হয়েছিল। বীরভূমের নারায়নপুর, আয়াস, দেহুচা, ডামরা, গনপুর প্রভৃতি অঞ্চলে দেশীয় প্রণালীতে লোহা নিষ্কাশন করার উল্লেখ পাওয়া যায়। লোহার উপাদান প্রস্তরগুলি খন্ড খন্ড করে ভেঙ্গে কাঠ কয়লার সাথে বেঁধে সাজানো হত। কয়লা ও পাথর গুলিকে সাজিয়ে মাটির দ্বারা আবৃত করার পর অগ্নিসংযোগ করে হাপর দ্বারা বায়ু সঞ্চালন করার পদ্ধতি জনপ্রিয় ছিল। এই কাজগুলি ছিল বেশ শ্রমসাধ্য তাই ঘন ঘন শ্রমিক পরিবর্তন করতে হত এবং যথেষ্ট মজুর শ্রেণির প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল। যারা এই কাজের সাথে যুক্ত ছিল তারা মূলত ছিল 'শাশা'[196] ও আগুরিয়া[197] আদিবাসীর একাংশ। যদিও কঠোর পরিশ্রমী তথাকথিত নিম্ন বর্ণের হিন্দুরাও এই উৎপাদনে অংশগ্রহন করেছিল। এই কাজে কিছু মুসলিম কারিগরদেরও লক্ষ করা যায়। নিয়মিত ভাবে সাত থেকে আট হাজার আদিবাসী মজুর এই কাজে জীবিকা নির্বাহ করত। প্রস্তর খণ্ড থেকে লোহা নিষ্কাশন করার জন্য স্থানীয় মজুরদের দৈনিক দেড়- দু আনা প্রাপ্য ছিল। পাথর ভেঙ্গে লোহা গলানোর মত শ্রমসাধ্য কাজ শুধুমাত্র আদিবাসীদের দ্বারা সম্ভব ছিল। এছাড়াও ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ যুগে বীরভূমের কিছু ক্ষেত্রে কয়লা খনির অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায়। ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সর্বাধিক নিয়ন্ত্রণ ছিল ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ সরকারের হাতে। ভারতে ব্রিটিশ শাসন ছোটনাগপুর মালভূমির বীরভূম জেলার পাশপাশি পাকুড় জেলার অধিকাংশ জমির মালিকানায় তাদের এক অতি উচ্চ নিয়ন্ত্রণ ছিল। ১৮৭১ সালে বীরভূমের জেলায় সাঁওতাল আদিবাসীদের সংখ্যা ছিল

---

194. Hunter. W.W., *The imperial Gazetter of India,* VOL-I, London, Trubner & Co., p. 25.

195. *Amrita Bazar Patrika,* (Daily), Friday, March 4, 1945, P. 7.

196. চৌধুরী. কমল(সম্পা), শিব্রতন মিত্র, গৌরিহর মিত্র, মহিমানিরঞ্জন চক্রবর্তী, *বীরভূমের ইতিহাস,* কলকাতা, দেজ পাবলিশিং, জানুয়ারি ২০১৪, পৃ.- ৪০০-৪১২।

197. গুপ্ত. রঞ্জন, *রাঢ়ের সমাজ অর্থনীতি ও গণবিদ্রোহ,* কলকাতা, সুবর্ণরেখা পাবলিকেশন, ২০০১, পৃ.- ২৫৪-২৬০ ।

মাত্র ৬,৯৫৪ জন। ১৮৭২ সালের বেভারলির রিপোর্টটি জাত ও শ্রমের বিস্তারিত তথ্য থেকে জানা যায় 'কোরা' নামক আদিবাসীরা বীরভূম জেলার মোট গ্রামীণ তফসিলি উপজাতির মাত্র ৫.০৫% শতাংশ ছিল অন্যদিকে মাহালিস এবং মালপাহাড়িয়ারা জেলার গ্রামীণ এলাকার মোট তফসিলি উপজাতির মাত্র ০.৮৩ শতাংশ এবং ০.৩৪ শতাংশ ছিল। জেলার মোট গ্রামীণ আদিবাসী জনজাতির মাত্র ০.২৫ শতাংশ ওরাওঁ আদিবাসীরা যুক্ত ছিল।[198] প্রথম দিকে পর্যাপ্ত পরিমানে শ্রমিক না থাকায় খনিগুলিতে কাজের অসুবিধা হলে আদিবাসী পুরুষ ও নারীদের এই কাজে নিযুক্ত করা হয়। মাইলের পর মাইল পথ অতিক্রম করে মহিলা আদিবাসী মহিলাদের অধিকাংশ খনিতে অবস্থান বিশেষভাবে লক্ষ করা যায়। খনিজ উৎপাদনগুলির মধ্যে কয়লা শিল্প ছোটনাগপুরে অধিক পরিমানে প্রসিদ্ধ হয়েছিল।

১৮২০ এর দশক থেকে ব্রিটিশ ভারতীয় শ্রমিকদের বিদেশে পাঠানোর প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল একই সাথে ১৮৩৮ সাল থেকে সাঁওতাল জনসংখ্যা প্রান্তীয় অঞ্চলে ১০,০০০ এর অধিক ছড়িয়ে পড়েছিল। ছোটনাগপুরের বিহার ও বাংলা থেকে অগণিত শ্রমিক বিদেশে পাঠানো হত।[199] আদিবাসীদের মধ্যে প্রথম সাঁওতাল ও কোরাস নামক আদিবাসীদের বাস্তুচ্যুতির ইতিহাস শুরু হয়েছিল ১৮৬০ এ ছোটনাগপুর মালভূমির কৃষিজমি কোম্পানির দখলে চলে যাওয়ার ঘটনাটিকে কেন্দ্র করে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে কাজের সন্ধানের প্রয়োজন পড়েছিল এবং শ্রম সম্পূর্ণরূপে পুঁজি নির্ভরশীল হয়ে উঠেছিল। ব্রিটিশ কোম্পানির সমস্ত চাহিদা পূরণ হয়েছিল ভারতীয় কৃষি, আদিবাসী অর্থনীতি, অবাধ শ্রম ও আদিবাসী মজুরদের কেন্দ্র করে তাই গ্রামীণ শ্রমিকদের একটি বড় সংখ্যা তাদের নিজেদের গ্রামে পর্যাপ্ত কাজ খুঁজে পেতে অক্ষম ছিল এবং পরিযায়ীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিল"।[200] উনিশ শতকের দিকে বীরভূম জেলা থেকে আদিবাসী শ্রমিকরা ব্যবহৃত হয়েছিল অস্থায়ী মজুর হিসাবে। ১৮৮২ সালে দুমকার ডেপুটি কমিশনারের রিপোর্টে,[201] লক্ষ করা যায় দুমকা বাজারের ব্যবসায়ীরা সাঁওতাল

---

198. Mitra. A, *Census 1951 west Bengal (Birbhum),* Kolkata, printed by Sree Saraswati Press Ltd, 1954, P. 113-118.

199. *Report of the Bihar Labour Enquiry Committee*, VOL-I, Bihar, Patna 1940, P. 25.

200. Pandit. Byomkesh, *The story of the Kishan agrarian Labour in Bengal (1885-1952),* Kolkata, Corpus Research, 1st Published Nov 2003, Pp. 114-126.

201. Mitra. A, *Census 1951 west Bengal (Birbhum),* Kolkata, printed by Sree Saraswati Press Ltd, 1954, P. 25.

আদিবাসীদের বসবাসকে মেনে নিলেও ১৮৮৩ সালের একটি আইন দ্বারা সমস্ত রায়তদের অন্য রাজ্যে স্থানান্তরিত করার অধিকারকে বাজেয়াপ্ত করেছিল। আদিবাসী শ্রমিকদের স্থানান্তর হওয়ার নিয়ম নীতির বিরুদ্ধে যাওয়া কঠোর ভাবে নিষিদ্ধ ছিল। এ ক্ষেত্রে বলা যায় যে, কিছু ক্ষেত্রে ডেপুটি কমিশনার নিজেদের প্রয়োজনে আদিবাসী রায়তদের ব্যবহার করেছিলেন।

বাংলা, বিহার ছাড়াও উড়িষ্যার নানা স্থানে খনি তৈরি হওয়ার সাথে সাথে খনিতে বেগার মজুরের চাহিদা বৃদ্ধি পেয়েছিল। খনি মালিকরা, ব্যবস্থাপনা ও সময়ের উপরে নির্ভর করে শ্রমের দাবি আদিবাসী শ্রমিকদের উপর জবরদস্তিমূলক ভাবে চাপিয়ে দিয়েছিল। এই পরিস্থিতিতে খনি ও খাদান ক্ষেত্রের মধ্যে শ্রমের আপেক্ষিক ঘাটতির পরিস্থিতি দেখা দিলে শ্রম পরিহারের কৌশলের সম্মুখীন হতে হত। ঔপনিবেশিক প্রশাসনের দ্বারা সমর্থিত বিভিন্ন শ্রমিকদের নিয়োগকর্তা, ব্যবস্থাপনা ও ঠিকাদারেরা বিভিন্ন ধরনের শ্রমিক নিয়োগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বেছে নিয়েছিল 'বাধ্যতামূলক' ব্যবস্থা। খনি শ্রমিকদের জীবনের একটি অংশ ছিল গোপন জবরদস্তি।

অবাধ শ্রমের আইনি রূপ, যেমন শর্তসাপেক্ষ প্রজাস্বত্ব এবং লিখিত চুক্তিভিত্তিক শ্রম এবং বিভিন্ন ধরনের গোপন জবরদস্তি কৃষক থেকে শ্রমিক হওয়ার বিষয়টিকে চিত্রিত করেছিল। খনি শিল্পাঞ্চল গুলিতে আদিবাসী শ্রমিকদের শ্রমকে ভারবাহী কাজের ভিন্ন ভিন্ন খাতে ব্যবহার করা শুরু হয়েছিল বিশেষভাবে। আসলে এক কথায় বলা যায় অসংগঠিত খাতগুলিকে শ্রমিক সম্পর্কের দ্বারা ভিন্ন ভাবে চিহ্নিত করা হতে থাকে।[202] ঠিকাদাররা, সংগঠিত শ্রম নিবিড় প্রক্রিয়াকে খনি ক্ষেত্রের মত পরিধিতে ঠেলে দিতে সাহায্য করেছিল যাতে আদিবাসীরা অসংগঠিত ক্ষেত্রগুলিতে যুক্ত থাকে। এক্ষেত্রে ঠিকাদাররা, শিল্পাঞ্চলগুলির জন্য বিশেষভাবে সুবিধাজনক হয়ে উঠেছিল। খনির শ্রমের প্রতি বিভাগে খনি মালিক, ব্যাবস্থাপক, ঠিকাদারদের নিয়োগ করা হয় খনি শ্রমিকদের উপর নিবিড় নজরদারি এবং নিয়ন্ত্রণ রাখার জন্য। একটি পূর্ণ সময়ের শ্রমশক্তিতে খনি অঞ্চলে 'প্রলেতারিয়েত' নাম ধারন করে আদিবাসীরা জীবন যাপন করতে শুরু করেছিল।[203] মালিক ও ব্যাবস্থাপকরা ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ

202. Sinha. N. K., *Economic History of Bengal,* V.2, Calcutta, Journal of the Royal Asiatic society, 1956, P. 68.

203. ঘোষ. বিনয়, *বাংলার নবজাগৃতি,* কলকাতা, ওরিয়েন্ট ব্ল্যাক সোয়ান প্রাইভেট লিমিটেড, প্রথম সংস্করণ ১৯৭৯, পৃ. ৪৩

সমর্থনে, জবরদস্তিমূলক এবং বাজারকেন্দ্রিক যন্ত্রপাতির উপর নির্ভর করে শাস্তিমূলক অনুমোদন সহ ইনডেনচারড ব্যবস্থা বা চুক্তিবদ্ধ দাসত্ব ব্যবস্থা প্রচলিত করেছিল। বাংলা ও বিহারের কয়লা খনি গুলিতে নকরানি পদ্ধতি লক্ষ করা গিয়েছিল। কঠোর শ্রম শক্তির পাশাপাশি ঘন ঘন বন পরিষ্কার করা, বৃক্ষ রোপন, আগাছা ছাঁটাই, বাংলো তৈরি করার মধ্য দিয়ে 'বেগার' শ্রমশক্তির ব্যবহার শুরু হয়েছিল। ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষের ছোটনাগপুরে শিল্পক্ষেত্রে বেগার শ্রম প্রজনন বৃদ্ধি পেয়েছিল। খনির বৃহত্তম অংশের শ্রমশক্তি ব্রিটিশ মালিকানাধীন পুঁজিবাদী উদ্যোগে উত্তোলন মূলক রপ্তানি অর্থনীতির সাথে যুক্ত ছিল। পুঁজিবাদের উদ্ভবে কৃষক থেকে শ্রমিক শ্রেণি গঠনের প্রক্রিয়া এইভাবে শুরু হয়েছিল।

পর্যবেক্ষণ

এই অধ্যায় গভীর ভাবে পর্যবেক্ষণ করে বলা যায় যে, ছোটনাগপুর মালভূমির আদিবাসী কৃষক শ্রেণি সম্পর্কিত বিস্তারিত ঘটনাগুলি সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এর মত বৃহত্তর প্রেক্ষাপটে উৎপাদন পরিস্থিতি ও কাঠামোকে পরিবর্তিত করেছিল। ১৭৯৩ সালের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রভাবে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার ঘটনার কার্যক্রমগুলি আদিবাসী জনজাতিদের বিপক্ষে যাওয়ার ফলে শ্রমের এক ভিন্ন ইতিহাস তৈরি হয়েছিল। ভূমি থেকে রাজস্ব সংগ্রহের আইনি ব্যবস্থা আদিবাসীদের পক্ষে বিপজ্জনক হয়ে ওঠায় ঔপনিবেশিক সরকার খুব সহজেই তাঁদের জীবিকা থেকে অধিকারের মূলে আঘাত করেছিল। এ প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে যে, আদিবাসীদের জীবন ও জীবিকাকে পরিবর্তন করার মধ্য দিয়ে ছোটনাগপুর মালভূমির অর্থনৈতিক পরিস্থিতি পরিবর্তিত হয়েছিল ঠিকই কিন্তু আদিবাসী জনগোষ্ঠীর অর্থনীতি পরিবর্তিত হয়নি বরং তারা পুনরায় নতুন একটি সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিল। কৃষিক্ষেত্র থেকে শিল্পক্ষেত্রে শ্রম ও আদিবাসী শ্রমিকের সাথে উৎপাদন পদ্ধতির বাধ্যতামূলক ভাবে এক সম্পর্ক গঠিত হয়েছিল। শিল্প নির্ভর অর্থনীতির প্রসারতার ফলে পুঁজিবাদের অধীনে অবাধ শ্রম বৃদ্ধির প্রবনতা স্পস্ট হয়ে উঠেছিল। এ প্রসঙ্গে বলা যায় যে, মারক্সীয় রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে, দুটি মৌলিক ধারনা অর্থাৎ উৎপাদন শক্তি ও উৎপাদন সম্পর্ক যা শ্রেণি সংগ্রাম ও শ্রেণি চেতনাকে পরিবর্তিত করেছিল। একটি দুর্বল জাতির দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে সামাজিক ভাবে প্রান্তিক করে রাখা হয়েছিল তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ হল এই আদিবাসী শ্রমিক শ্রেণির ইতিহাস। আদিবাসী কৃষক থেকে শ্রমিক শ্রেণিতে পরিনত হওয়ার প্রক্রিয়াকরণ পদ্ধতি শুরু হলে আদিবাসীদের ভারী কাজে ও যন্ত্রপাতির কাজে নির্ভরশীল করে তোলার চেষ্টা করা

হয়েছিল। ১৮৮০ সালের পরে ছোটনাগপুর মালভূমিতে ধীরে ধীরে খনি অঞ্চল বৃদ্ধি পাবার ফলে আদিবাসীদের অংশগ্রহণ অধিক লক্ষ করা যায়। খনি অঞ্চলে অত্যাধিক অংশগ্রহণের কারণ হিসাবে ১৮৮০ সালের পর অর্থনৈতিক জাতীয়তাবাদের ভূমিকা ছিল উল্লেখযোগ্য যা পরবর্তী অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

অর্থনৈতিক জাতীয়তাবাদের উদ্ভব ও প্রভাব আদিবাসী শ্রম অর্থনীতিতে

(১৮৮০-১৯৩০)

পূর্ববর্তী অধ্যায়ে কৃষি কেন্দ্রিক অর্থনীতি যে ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ সরকারের নিকট লাভজনক ছিল না তার একটি পরিস্কার চিত্র লক্ষ্য করা যায়। আদিবাসী কৃষকদের কৃষি থেকে খনিতে প্রবেশ ও কৃষক থেকে শ্রমিক হওয়ার প্রক্রিয়াকরণের পদ্ধতিতে ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ সরকারের ভূমিকা যেমন ছিল উল্লেখযোগ্য ঠিক একইভাবে এই প্রক্রিয়া করণের মধ্যে জাতীয় অর্থনীতির ভূমিকা বিশেষ ভাবে লক্ষ করা যায়। ছোটনাগপুর মালভূমি অঞ্চলের অর্থনীতি জাতীয়তাবাদী অর্থনীতির সাথে যুক্ত হয়ে আদিবাসী খনি শ্রমিকদের অর্থনীতি ও জীবনশৈলীকে পরিবর্তিত করেছিল। এ কথা বলার অর্থ হল যে, জাতীয়তাবাদী অর্থনৈতিক ধারণা তৈরি হওয়া ও আদিবাসী কৃষক থেকে শ্রমিক শ্রেণির অর্থনীতি পরিবর্তনের পশ্চাতে ঔপনিবেশিক ক্ষমতার পাশাপাশি জাতীয়তাবাদী নেতা, দেশীয় বৃহৎ জমিদার ও পুঁজিপতি শ্রেণির সমর্থন তৈরি হয়েছিল। ঔপনিবেশিক শক্তির, মুনফা কেন্দ্রিক পুঁজি তৈরি করতে ভিন্ন ভাবে সাহায্যের প্রয়োজন হয়নি। মুনফা উৎপাদনে ঔপনিবেশিক শক্তি স্থানীয় পুঁজিপতিদের উৎসাহ দিয়েছিল। খনিজ শিল্প উৎপাদনে ও সরবরাহে, খনি শিল্পকে কেন্দ্র করে মুনফা জনিত অর্থনীতির জন্ম হয়েছিল। মুনফা জনিত অর্থ উপার্জনকে কেন্দ্র করে অন্যদিকে জাতীয়তাবাদী অর্থনৈতিক চিন্তাকে অলখ্যে রেখে বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার পুঁজিপতি গোষ্ঠীর খনি অঞ্চলে পুঁজি বিনিয়োগে মদতপুস্ট হতে দেখা যায়। এই অধ্যায়ের প্রথমভাগে ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ শক্তির পুঁজি বিনিয়োগের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছিল একইসাথে স্থানীয় পুঁজিপতি গোষ্ঠীর খনিজ উৎপাদন ও মুনফা উৎপাদনে কি কি ভূমিকা নিয়েছিল তা আলোচনা করা হয়েছে। মুনফা জনিত উৎপাদনের পরিস্থিতিতে খনিতে কর্মরত আদিবাসী শ্রমিক শ্রেণির অবস্থান ও কৃষক অর্থনীতি থেকে আদিবাসী খনি শ্রমিকদের অর্থনীতি ও জীবনশৈলীকে কতটা পরিবর্তন হয়েছিল তা এই অধ্যায়ে বিস্তারিত ভাবে আলোচিত হয়েছে। বিভিন্ন রিপোর্ট, দৈনিক, সাপ্তাহিক ও মাসিক সংবাদ পত্রের মাধ্যমে বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার তৎকালীন অর্থনৈতিক যে পরিস্থিতি উঠে এসেছিল তাতে আদিবাসী কৃষক ও শ্রমিকদের দারিদ্র্য অর্থনৈতিক পরিস্থিতি পরিস্ফুটিত হয়েছিল। সেই দারিদ্র্য পরিস্থিতিতেও খনি শিল্প গঠন নিয়ে জাতীয়তাবাদী নেতাদের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি হয়েছিল সেই সংক্রান্ত তথ্য এই অধ্যায়ের তৃতীয় ভাগে আলোচিত হয়েছে।

মুনফা কেন্দ্রিক অর্থনীতির জন্ম ও আদিবাসী শ্রমিক শ্রেণির উপর প্রভাব

একটি উৎপাদন ক্ষেত্র হিসাবে জমি থেকে শিল্প নামক অন্য একটি উৎপাদন ক্ষেত্রে আদিবাসী শ্রমিক শ্রেণির অভিবাসন ঘটেছিল। এইভাবেই খনি শ্রমিকের সস্তা শ্রম-বাজারের জন্ম হয়। অন্যদিকে এই পরিস্থিতিতে মুনফা কেন্দ্রিক অর্থনীতির উত্থানের পথ সুগম হয়েছিল। ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ পুঁজির সম্প্রসারনের পাশাপাশি অর্থনৈতিক জাতীয়তাবাদের উদ্ভব হয়েছিল। ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ পুঁজিপতিদের সাথে অর্থনৈতিক জাতীয়তাবাদীদের সম্পর্ক মসৃণ ছিল না। ঔপনিবেশিক পুঁজি ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রকে নিয়ন্ত্রণ করত। তাদের একচেটিয়া অগ্রাধিকার জাতিয়বাদী নেতৃবৃন্দ সমালোচনা করেছিলেন। এই প্রসঙ্গে দাদাভাই নৌরজির Poverty and Un- British Rule in India গ্রন্থটি উল্লেখ করা যায়।[1]

ইংল্যান্ডের শিল্প বিপ্লব সংগঠিত হওয়ার পর ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ শক্তির কাছে মূল লক্ষ্য ছিল এদেশ থেকে কাঁচামাল সংগ্রহ করা। শিল্পের জন্য কাঁচামাল সংগ্রহ করতে গিয়ে এদেশের অর্থনীতি ও শ্রমকে নিয়ন্ত্রন করার চেষ্টা শুরু হয়েছিল।[2] ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ শক্তির অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রনের মধ্য দিয়ে ভারতীয় উপনিবেশের মূল অর্থনীতির সাথে যুক্ত আদিবাসী শ্রম অর্থনীতি নিয়ন্ত্রিত হতে শুরু করেছিল| ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ শক্তি প্রণীত বিভিন্ন অর্থনৈতিক নীতির প্রয়োগের ফলে, ভারতীয় অর্থনীতি কালক্রমে ব্রিটিশ অর্থনীতির অধীন হয়ে পড়েছিল। কৃষির সাথে যুক্ত অর্থনীতি যেমন পাট, চা, নীল, কফির মত বাগিচা শিল্পগুলির বাণিজ্যিকরন হওয়া শুরু হলে অধিক মুনফা লাভের তাড়নায় পুনরায় পুঁজি বিনিয়োগ শুরু হতে থাকে ভারী শিল্পে এবং খনিজ শিল্পের মত খনিগুলিতে। ব্রিটিশ অর্থনীতির প্রসারতার ফলে দেশীয় কুটির শিল্প বাণিজ্যের বিলুপ্তি ও কৃষি ব্যবস্থার সাবেক কাঠামো ভেঙ্গে পড়েছিল এবং উনিশ শতকের শেষ দিক থেকে দ্রুত শিল্পায়নের জন্য জাতীয় দাবি উঠতে শুরু করেছিল|[3]

---

[1]. Naoroji. Dadabhai, *Poverty and Un- British Rule in India,* London, Publication Division, Ministry of Information and Broadcasting Government of India, First Published in 1901.

2. Malley. L. S. S. O., *Bengal District Gazetteers Santal Paraganas'*, Delhi, B. R. Publishing Crop, 1910, P. 198-207.

3. চন্দ্র. বিপান, *ভারতে অর্থনৈতিক জাতীয়তাবাদের উদ্ভব ও বিকাশ,* কলকাতা, কে পি বাগচি অ্যান্ড কোম্পানি, ১৯৯৮, পৃ. ২৩।

দেশীয় কুটির শিল্পের বিলুপ্তির পাশাপাশি ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ শক্তির তত্ত্ববধানে লুণ্ঠন ও সম্পদ নির্গমনের তত্ত্ব উঠে আসারও চিত্র লক্ষ্য করা যায়। সম্পদ নিষ্কাশনের সুযোগে ও দেশীয় মূলধনের গঠন ব্যহত হলে বিদেশি শিল্পপতিরা খনিজ শিল্পের উত্তোলন নিয়ে চিন্তিত হয়ে উঠেছিল। ভারী শিল্পের ক্ষেত্রে প্রথম দিকে ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ পুঁজি বিনিয়োগ ভারতবর্ষে শুরু হয়েছিল রেলপথ ও পরে একাধিক খনিজ ক্ষেত্রে। ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ শক্তি পুঁজি বিনিয়োগের মাধ্যমে এদেশে ছোটনাগপুর মালভূমি অঞ্চলের খনি শিল্পাঞ্চলগুলির উপর এক এক করে কর্তৃত্ব স্থাপন করে ফেলেছিল।[4] অর্থনৈতিক পুনর্গঠন ও শিল্প বিকাশের সমস্যা সম্পর্কে ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ পুঁজির ভূমিকা খনি ক্ষেত্রে ছিল অনেকটা লগ্নি কারকের মত। ঔপনিবেশিক শক্তি লগ্নিকৃত পুঁজির লভ্যাংশ থেকেই নতুন পুঁজি সরবরাহ করেছিল ও পাশাপাশি এদেশের চাহিদার ভিত্তিতে খনি ক্ষেত্রে একচেটিয়া বাজার তৈরি করে ফেলেছিল। ব্রিটেনে শিল্প বিপ্লবের প্রয়োজনীয় চাহিদা মেটাতে অতিরিক্ত কাঁচামালের প্রয়োজনের চাহিদা পূরণ করেছিল ভারতবর্ষের ছোটনাগপুর মালভূমির অন্তর্গত খনি ক্ষেত্রগুলি।

ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ পুঁজি বিনিয়োগ নিয়ে রেমন্ড ই ডুমেন্ট ১৮৭০-১৯৪৫ সময়কালের এক তথ্য উল্লেখ করেন যেখানে, ভারতীয় খনির অন্বেষণ, প্রযুক্তিগত উদ্ভাবন, খনির প্রকৌশল, কোম্পানি সংস্থা, ব্যাপক জমি অধিগ্রহণ এবং স্টক মার্কেট অপারেশনের পটভূমিতে ভারতীয় রাজনীতিবিদ ও সরকারের সাথে সম্পর্ক জড়িত ছিল বলে জানা যায়। উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকগুলিতে খনি শিল্প ছোটনাগপুর মালভূমির অর্থনৈতিক ইতিহাসের গতিপথ পরিবর্তন করতে সাহায্য করেছিল। খনি ইতিহাসের একচেটিয়া অনুশীলন তৎকালীন রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে একপাক্ষিক করে তুলেছিল। এই ধরনের অর্থনীতিকে প্রসার করার অর্থ ছিল পুঁজিপতিদের ব্যক্তিগত মুনফা বৃদ্ধি বা লাভের উদ্দেশ্য। তিনি আরো দেখিয়েছিলেন যে, বিশাল অঞ্চলের উপর ব্যক্তিগত রাজনৈতিক ক্ষমতা অর্জন করা ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ শক্তির অন্যতম লক্ষ্য ছিল। এই সময়কালকে ব্যক্তিগত ও জাতীয় সম্পদ আরোহণের জন্য এক অভূতপূর্ব সময়কাল বললে ভুল হবে না কারণ ধনি ও দারিদ্র্যদের মধ্যে

---

4. Sarkar. Suvobrata, *Bengali Entrepreneurs and western Technology in the Nineteenth Century: a social perspective* 48.3, Indian journal of History of Science, (2013), P. 447-475.

ব্যাপক ব্যবধান বৃদ্ধি পেয়েছিল। ভারতীয় অর্থনীতিবিদরা জাতীয় সম্পদের বৃদ্ধিকে স্বতঃসিদ্ধ হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। যৌথ স্টক এক্সচেঞ্জে খনি কোম্পানিগুলির শেয়ার বৃদ্ধি পেয়েছিল এবং জাতীয় অর্থনীতিবিদদের কাছে দ্রুত ধনি হওয়ার মন্ত্র ছিল এই খনি অঞ্চল। ঐতিহাসিক ডেভিস এবং গ্যালম্যান দেখিয়েছেন যে, উনবিংশ শতাব্দীতে ভারতের বাইরে অস্ট্রেলিয়া এবং কানাডার অর্থনৈতিক উন্নয়নে ব্রিটিশ পুঁজি অনেক বেশি আনুপাতিক ভূমিকা পালন করেছিল। খনি কোম্পানিগুলিকে মন্দার সময়কালে মুলধন সংরক্ষণ করার কাজে ব্যবহার করা হয়েছিল।

এই প্রেক্ষিত থেকে বলা যায় যে, ভারতবর্ষের অন্তর্গত ছোটনাগপুর মালভূমির অর্থনৈতিক পরিস্থিতিকে ব্যাখ্যা করতে গেলে তৎকালীন ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক পরিস্থিতির প্রেক্ষাপট তুলে ধরা প্রয়োজন। কেননা এই প্রেক্ষাপটেই জাতীয়তাবাদী চিন্তাধারায় মুনফা কেন্দ্রিক অর্থনীতির জন্ম হয়েছিল। ঔপনিবেশিক পর্যায়ে কৃষি থেকে শিল্পে পুঁজির বিনিয়োগ অনেকটা ছিল দেশীয় পুঁজির পুনঃ ব্যবহারের মত। আঠারো শতকের শেষদিক থেকে নতুন ধরনের বাণিজ্য, ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা ও ক্ষেত খামার সবটাই গড়ে উঠেছিল ভারতে নিযুক্ত ইংরেজ কর্মচারীদের সঞ্চিত অর্থ লগ্নি করতে। লগ্নিকৃত মূলধন ছিল মূলত এদেশেরই রাজস্ব ও লুটের অংশ, তার পুনঃবিনিয়োগ হয়েছিল খনি ক্ষেত্রগুলিতে। এর মধ্যে রপ্তানিকৃত মূলধন ছিল না।[5] ১৮৫০ সালে ঔপনিবেশিকদের প্রথম মালিকানাধীন শিল্প ছিল তুলা ও লৌহ ইস্পাত। উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে ব্যাঙ্ক, পেপার মিল, কটন, বস্ত্র, ম্যানুফ্যাক্টারিং শিল্পে অধিক পুঁজি বিনিয়োগের পাশপাশি খনিজ ক্ষেত্রে অধিক পুঁজি বিনিয়োগ হয়েছিল। ১৮৯০ সালে লৌহ ও ইস্পাত শিল্পে অধিক পুঁজি বিনিয়োগের পাশাপাশি খনিজ ক্ষেত্রেও অধিক বিনিয়োগ হয়েছিল। ১৮৯০ সালে লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের প্রভূত উন্নতি ঘটে এবং ক্রয় ও বিক্রয় বৃদ্ধি পেতে থাকে। দাদাভাই নৌরাজি তাঁর গ্রন্থে ব্যাখা করেছেন যে, ১৮৫৪ থেকে ১৮৫৯ সালের মধ্যে ভারতবর্ষে ব্রিটিশদের পুঁজি বিনিয়োগের পরিমাণ ছিল ১৫ কোটি পাউন্ড।[6] ইকোনোমিস্ট পত্রিকা থেকে উল্লেখ পাওয়া যায় যে, ১৯০৯ সালের মধ্যে খনি শিল্পক্ষেত্রে ৩ কোটি ৬৫ লক্ষ ব্রিটিশ পাউন্ড পুঁজি বিনিয়োগ হয়েছিল। ১৯০৯ সালে ইকোনোমিস্ট পত্রিকা থেকে জানা যায় যে, তখন

---

5. *অমৃত বাজার পত্রিকা,* (দৈনিক), ২৬সে ফেব্রুয়ারি, ১৯৫০, পৃ. ৭

6. Naoroji. Dadabhai, *Poverty and Un- British Rule in India,* London, Publication Division, Ministry of Information and Broadcasting Government of India, First Published in 1901, Pp. 495-499.

এদেশে বিনিময় যুক্ত ব্রিটিশ পুঁজির পরিমাণ ছিল ৪ কোটি ৭০ লক্ষ পাউন্ড।[7] ভারতীয় শিল্পক্ষেত্রে বিনিয়োগ করা ছাড়াও ব্রিটেন তার প্রতিরক্ষার কাজে প্রতিবছর অনেক টাকা ব্যয় করত। স্যার জর্জ পাইমা জয়েন্ট স্টক কোম্পানির রিপোর্ট থেকে ভারতে বিদেশি পুঁজি লগ্নির পরিমাণ ১৯০৯ সালে জানা যায় ৩৫ কোটি ৫০ লক্ষ পাউন্ড।[8] এই ক্রয়নীতির দ্বারা একদিকে ইংল্যান্ডের শিল্পপতিদের প্রতি পক্ষপাতিত্ব দেখানো হয়েছিল, অন্যদিকে দেশীয় শিল্পকে বঞ্চিত করা হয়েছিল বলে বি ডি বসু বিস্তারিত আলোচনা করেছিলেন।[9] এই পর্যায় থেকে দেশীয় শিল্প বঞ্চিত হলেও ঔপনিবেশিক শক্তির ভারতীয় শিল্পক্ষেত্রে পুঁজি বিনিয়োগ ও মুনফা লাভের পরিমাণ দেখে দেশীয় শিল্পপতিদের মধ্যে শিল্প গঠনের ভাবনা জন্ম নিতে শুরু করেছিল। স্থানীয় পুঁজিপতিদের উত্থানের সাথে জাতীয়তাবাদী ধারণার বৃদ্ধি হয়েছিল এবং নিজেদের বিকাশ ও সম্প্রসারণকে সুরক্ষিত রাখার চেষ্টা করেছিল। এখানে আরেকটি কথা বলা প্রয়োজনীয় যে, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে জাতীয়তাবাদের প্রসঙ্গ তৈরি না হলে, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে কখনো জাতীয়তাবাদী ধারণা তৈরি হত না।

প্রথমদিকে ঔপনিবেশিক পুঁজির সাহায্যে শিল্প গঠন নিয়ে জাতীয়তাবাদী নেতাদের মধ্যে বিতর্কের সূত্রপাত তৈরি হয়েছিল। শিল্প উৎপাদনের ক্ষেত্রে যে জাতীয়তাবাদী চেতনা জেগে উঠেছিল তাঁর প্রকৃষ্ট রুপ ১৯০৬ সালে বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে আন্দোলনের অংশ হিসাবে ব্রিটিশ পণ্য বয়কট এবং স্বদেশী আন্দোলন শুরু হয়েছিল। শিল্পায়ন বা শিল্প গঠন সম্পর্কে প্রথম দিকে জাতীয় নেতাদের ভিন্ন ভিন্ন মত লক্ষ করা যায় বলে ঐতিহাসিক বিপানচন্দ্র উল্লেখ করেছেন। স্থানীয় শিল্প পতিদের মধ্যে অনেকেই শিল্প গঠনে ব্রিটিশ পুঁজির ব্যবহারের বিরোধী থাকলেও আবার অনেক জাতীয়তাবাদী নেতারা ব্রিটিশ পুঁজির সমর্থন করেছিলেন। ঔপনিবেশিক পুঁজির সাহায্য ও শিল্পায়নে ব্যবহার নিয়ে জাতীয়তাবাদী নেতারা নিজেদের মধ্যে দ্বিধান্বিত ছিলেন। শিল্প থেকে অধিক মুনফা অর্জন করতে গিয়ে দেশীয় শিল্পের রক্ষণাবেক্ষণ নিয়ে তারা নিজেরা চিন্তিত হয়ে পড়েছিলেন। এমনকি যারা বিদেশি পুঁজির বিনিয়োগ সমর্থন করেছিলেন তারাও এই কথা ভেবে সমর্থন করেছিলেন যে, কোনরকম শিল্পায়ন না হওয়ার

7. *Report of Finance committee,* Delhi, Government of India, 1909, P. 6-10.

8. ব্যানার্জি. সুবোধ (সম্পা), *গণদাবী,* সোশইয়ালিস্ট ইউনিটি সেন্টারের বাংলা মুখপত্র পাক্ষিক, তৃতীয় বর্ষ ৭ সংখ্যা, ১লা জানুয়ারি ১৯৫১, পৃ. ৮।

9. Basu. B. D, *The Ruin of Indian Trade and Industries,* Calcutta, Prabasi Press, 3rd edition, 1935, P. 73-101.

চাইতে বিদেশি পুঁজিকে গ্রহণ করে নিয়ে শিল্পের বৃদ্ধি করা ছিল দেশের জন্য প্রয়োজনীয়। কাজেই দেশীয় শিল্পে উন্নতির জন্য বিদেশি মূলধন ঋণ করাকে জাতীয়তাবাদী নেতারা অন্যায় বলে মনে করতেন না। অন্যদিকে ঐতিহাসিক এরিক রোল দেখান যে, খনি শিল্প গঠনে পাশ্চাত্যের চিন্তাকে অনুকরণ করা বাঞ্ছনীয় নয় বলে মনে করেছিল কিছু জাতীয়তাবাদী নেতারা।[10] শিল্পের উপর ব্রিটিশ পুঁজির ব্যবহার ভবিষ্যতে এই দেশকে ব্রিটিশ পুঁজির উপর নির্ভরশীল হয়ে উঠেতে বাধ্য করেছিল। এ প্রসঙ্গে বলা যায় যে, ব্রিটিশরা চেয়েছিলেন এ দেশের পুঁজিপতিদের ব্যবসা ও বাণিজ্যের সাথে যুক্ত করে মুনফা কেন্দ্রিক অর্থ আদায় করতে কেননা স্থানীয় পুঁজিপতিরা ব্যবসার মোহে আবদ্ধ হয়ে পড়লে ব্রিটিশ শাসনকে আরো দৃঢ় ভাবে প্রতিষ্ঠা করা সহজতর হবে। অন্যদিকে জাতীয়তাবাদী নেতারা মনে করেছিলেন যে, বিদেশী পুঁজি ব্যবহার না করলে অতিরিক্ত মূলধন বা মুনফা তৈরি হবে না, কিন্তু একথা সকলের সম্মুখীন স্বীকার করতে চায়নি। এটা লক্ষণীয় ছিল যে, জাতীয়তাবাদী নেতারা মোটের উপর শিল্প পুঁজিরই বিস্তার চেয়েছিলেন বাণিজ্য পুঁজির নয় কেননা জাতীয় আন্দোলনের এই অধ্যায়ে মুৎসুদ্দি শ্রেণির দৃষ্টিভঙ্গি অনুপস্থিত ছিল বলে লক্ষ করা যায়। জাতীয়তাবাদী নেতারা বিদেশী পুঁজির বিনিয়োগ অন্তর থেকে চেয়েছিল। তৎকালীন সময়ে এই ক্ষেত্রগুলিতে বিদেশি পুঁজির বিনিয়োগ নিয়ে দেশীয় পুঁজিপতিরা বিরোধিতা করেনি বলে ঐতিহাসিক বিপানচন্দ্র[11] তাঁর গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। বিদেশি পুঁজির বিনিয়োগ নিয়ে দেশীয় পুঁজিপতিদের ধারণা ছিল ভারতবর্ষের মত গরীব দেশে শিল্প, খনি কারখানা নির্মাণের জন্য অতিরিক্ত পুঁজির অভাব রয়েছে। জাতীয়তাবাদী নেতারা ভবিষ্যতের কথা ভেবে এই বিনিয়োগকে সমর্থন করেছিলেন। একাধারে বলা যায় যে, ঔপনিবেশিক পুঁজি ব্যবহারের বিরোধিতা না করে দেশীয় পুঁজিপতিরা বরং সুবিধা গ্রহণ করতে চেয়েছিল ও আধুনিক বাণিজ্যকে স্বাগত জানিয়েছিল অতিরিক্ত মূলধন লাভের আশায়। এই সময় ভারতীয় পুঁজিপতি শ্রেণিরা অর্থনৈতিক বিকাশকে প্রসারিত করতে যথেষ্ট উদ্যোগী হয়েছিলেন। ১৯ শতকে রেলপথ বিকাশের পর ভারতের অর্থনীতিতে একটি বৈকল্পিক প্রভাব দেখা দিয়েছিল। ঐতিহাসিক এই পর্যায় থেকে জাতীয়তাবাদী অর্থনীতির উত্থান হয়েছিল।

---

10. Roll. Eric, *A History of Economic Thought,* 4th edition, London, Faber & Faber, 1938, P. 368.

11. চন্দ্র. বিপান, *ভারতে অর্থনৈতিক জাতীয়তাবাদের উদ্ভব ও বিকাশ,* কলকাতা, কে পি বাগচি অ্যান্ড কোম্পানি, ১৯৯৮, পৃ. ৪৮

শিল্প গঠনের ক্ষেত্রে পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির ফলে জাতীয়তাবাদী চেতনা দেশের অভ্যন্তরে প্রসারিত হয়েছিল। বিদেশী পুঁজি রেলপথে বিনিয়োগের ফলে অন্যান্য শিল্পের আগমন ঘটেছিল খুব দ্রুত। আর রেলপথের আগমনের ফলেই অন্যান্য শিল্প গঠন খুব অল্প সময়ের মধ্যে সম্ভব হয়েছিল। রেলশিল্পের সূচনা ও আধুনিক যন্ত্রের আগমনের ফলে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার শিল্পপতিদের শিল্পোদ্যোগ অধিক পরিমানে লক্ষ করা যায়। তৎকালীন পুঁজিপতিদের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল মুনফা অর্জন করা তাই ১৮৮৯ এর ২৩ সে সেপ্টেম্বরের হিন্দু পত্রিকার সংখ্যায় বিরল রাজনৈতিক বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়ে লেখা হয়েছিল, 'রাজনৈতিক সংস্কার আন্দোলনের যুগে যদি বিদেশী পুঁজিপতিদের প্রভাব বৃদ্ধি পায়, তাহলে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সাফল্যের সব সম্ভাবনা নষ্ট হয়ে যাবে ও কংগ্রেসের কণ্ঠস্বর চাপা পড়ে যাবে বিদেশী পুঁজিপতিদের প্রচণ্ড সোরগোলে'।[12] অর্থনৈতিক ভিত্তি সম্পর্কে জাতীয়তাবাদী নেতাদের ধারণা ছিল স্বনির্ভর অর্থনীতির প্রতিষ্ঠার বিকল্প চিন্তা করা। এদেশে বৃহদায়তন শিল্প, খনি ও পরিবহন ব্যবস্থা গড়ে তোলার মত যথেষ্ট মূলধন দেশীয় শিল্পপতিদের প্রথম দিকে ছিল না। শিল্পায়নের জন্য মূলধনের অধিক প্রয়োজন হলেও বিদেশী পুঁজির বিরুদ্ধবাদীরা কখোনোই এটা মেনে নেননি যে দেশীয় মূলধনের সাহায্য ছাড়া শিল্পায়ন সম্ভব নয়।

দেশীয় পুঁজিপতিদের খনি ক্ষেত্রে সংযুক্তি

ইংল্যান্ডের শিল্প বিপ্লবের পর খনি শিল্প প্রতিষ্ঠানের প্রসার হতে থাকে এবং দেশীয় পুঁজিপতিরা শিল্প গড়ে তুলতে ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ শক্তির সাথে জোট বেঁধেছিল। আসলে এদেশে খনি শিল্প উন্নয়নের সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধক ছিল দেশীয় শিল্পপতিদের হাতে মূলধনের অপ্রতুলতা। সেই অভাব পূরণ করতে বেসরকারি বিনিয়োগ সরকারী নীতির উপরে নির্ভর করে খনি অর্থনীতির বিভিন্ন খাতে প্রবাহিত হয়েছিল। ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ শক্তির, খনি ও খাদান গড়ে তোলার পাশাপাশি বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার গুটিকয়েক পুঁজিপতি খনি শিল্পে পুঁজি বিনিয়োগ করতে ইচ্ছুক হয়েছিল। ব্রিটিশ শাসন সম্পর্কে কিছু পুঁজিপতি শ্রেণির মধ্যে ইতিবাচক মানসিকতা কাজ করেছিল। ভারতীয় পুঁজিপতি শ্রেণি ব্রিটিশ পুঁজির উপরে সম্পূর্ণ নির্ভর না করলেও ঔপনিবেশিক শাসনকে প্রশ্রয় দেওয়ার কাজ করেছিল।

---

12. Basu. B. D, *The Ruin of Indian Trade and Industries,* Calcutta, Prabasi Press, 3rd edition, 1935, P. 102-120.

খনি ও খনিজ সম্পদের বিকাশ হওয়ার পর অতিরিক্ত খনিজ সম্পদ অন্বেষণ করার জন্য দুইজন ইংরেজ ভূতাত্ত্বিক বিশেষজ্ঞের পরিষেবা সুরক্ষিত বলে মনে করা হয়েছিল।[13] তবে এর পাশাপাশি বেসরকারি উদ্যোগের উৎসাহ দেওয়া হয়েছিল উদার ও আকর্ষণীয় শর্তের মাধ্যমে। রাষ্ট্রের চেয়ে বেসরকারি সংস্থার দ্বারা এই কাজ দ্রুত হতে পারে তাই সমগ্র দেশে রাষ্ট্রের চেয়ে বেসরকারি সংস্থার দ্বারা অর্থনৈতিক উদ্যোগ লক্ষ করা যায়। যদিও এই বিষয়টি জটিল ছিল তাই ব্যক্তিগত সহায়তায় বিষয়টি দেখার দিকে জোর দেওয়া হয়েছিল। খনি শিল্পায়নে মালিকানা পুরোপুরি ইউরোপীয় থাকলেও বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার পুঁজিপতিদের মালিকানা ধীরে ধীরে গড়ে উঠতে শুরু করেছিল। বাংলা, বিহার, উড়িষ্যায় ঔপনিবেশিক পর্যায়কালে শিল্পপতিদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন যারা, তাদের মধ্যে মহারাজা নন্দ কুমার, শ্রীরাম দেও ভঞ্জ, মধুসুদন দাস, গুরুশরন লাল বাধানি থেকে উড়িষ্যার দেওয়ান ও দ্বারকানাথ ঠাকুরের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ছিল।[14] দেশের শিল্প উন্নয়নের এই শিল্পপতিদের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ছিল। এই শিল্পপতিদের তত্ত্ববধানে কয়লা খনি ছাড়াও লোহা, অভ্র, ম্যাঙ্গানিজ, পাথরের ও খনি গড়ে উঠেছিল। তারা ইউরোপীয়দের সাথে জোটবদ্ধ ভাবে স্বাধীন উদ্যোগে ব্যবসা শুরু করেছিলেন। কিছু শিল্পপতি ছিলেন যারা ব্রিটিশদের সাথে যৌথভাবে ব্যবসা করতে চেয়েছিলেন অন্যদিকে কিছু স্থানীয় শিল্পপতি স্বাধীন ভাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন। সংক্ষেপে বলা যায় জাতীয় স্তরে শিল্প পুঁজিবাদের উত্থান হয়েছিল এবং বিকশিত হয়েছিল ভারতবর্ষের প্রতিটি রাজ্যে। ব্রজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ছিলেন একজন বাঙালি যিনি লৌহ ইস্পাত শিল্পে মূলধন বিনিয়োগ করেছিলেন। তিনি ইংরেজদের সহযোগী ছিলেন। এছাড়াও তারাচাদ ঘনশ্যাম দাস (১৮৯৪-১৯৮৩), মোহিনি মোহন ধর (উড়িষ্যার দেওয়ান), কৃষ্ণ চন্দ্র গজপতি দেব (১৮৯২-১৯৭৪), রাম রঞ্জন চক্রবর্তী[15] ও অন্যান্য শিল্পপতিদের খনিজ শিল্পে পুঁজি বিনিয়োগ করার কথা জানা যায়। দেশীয় পুঁজিপতিদের প্রথম মূলধন বিনিয়োগ কয়লা, লোহা, পাথর, অভ্র, তামার মত খনিজ উৎপাদনের একাধিক খনির উপর লক্ষ করা যায়।

13. *The Bihar Herald*, Vol-xxiv, Patna, Bihar, January 21, 1899, P. 5.

14. Sarkar. Suvobrata, *Bengali Entrepreneurs and western Technology in the Nineteenth Century: a social perspective* 48.3, Indian journal of History of Science, 2013, Pp. 447-475.

15. রাম রঞ্জন চক্রবর্তী হেতম্পুরের রাজা ছিলেন। ১৯১২ সালে তিনি 'মহারাজা' উপাধি পেয়েছিলেন। ১৯৫৪ সালের অ্যাক্ট এ জমিদারি বিলুপ্ত করার চেষ্টা করেছিলেন।

বাংলা, বিহার উড়িষ্যার কয়লা খনি ছাড়াও বিহারের হাজারীবাগ জেলার গয়াতে ১০০টি, ১৫ টি মুঙ্গেরে এবং ৫ টি ভাগলপুর জেলায় অভ্র উৎপাদনকারী খনি লক্ষ করা যায়।[16]

খনি অঞ্চলকে কেন্দ্র করে নানা শিল্প সমিতি গড়ে উঠেছিল প্রধানত সুদক্ষ কারিগর ও ইঞ্জিনিয়ারদের বৈজ্ঞানিক বিদ্যা আয়ত্ত করার জন্য। বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির নতুন নতুন আবিষ্কারের সাহায্যে এদেশে কারিগরবিদ্যার উন্নতি করা হয়, তারই উপায় নির্ধারণ করা এই সভা স্থাপনের উদ্দেশ্য ছিল। এদেশে যেহেতু ঔপনিবেশিক পর্যায়ের সমকালীন শিল্প বিপ্লব হয়নি সেহেতু সমাজে ইঞ্জিনিয়ার- কারিগরদের আবির্ভাবও ঘটেনি, তাই নব্য ইংরেজি শিক্ষিত মধ্যবিত্তরাই এই প্রতিষ্ঠানের উৎসাহী প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন।[17] তবে শিল্পক্ষেত্রে আধুনিক যন্ত্রপাতির প্রয়োগে পুঁজিবাদী সমাজের শ্রীবৃদ্ধি ঘটেছিল। ভারতবর্ষের খনি শিল্পোন্নত রাজ্যে ঔপনিবেশিক পুঁজির দ্রুত গতিতে কেন্দ্রীকরন হওয়া শুরু হয়েছিল। বিদেশী পুঁজির লগ্নিতে ধীরে ধীরে এ দেশীয়রা ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ শক্তির মিত্র হয়ে উঠেছিল বলে বুকানন মনে করেন।[18] পুঁজি কেন্দ্রিক শিল্প স্থাপন হতে শুরু হওয়ার ফলে দেশীয় পুঁজিপতিদের অতিরিক্ত মুনফা লাভের সুযোগ উঠে এসেছিল। ১৮৬০ সাল থেকে ১৯১৪ সালের মধ্যে ঔপনিবেশিক শক্তির প্ররোচনায় দেশীয় পুঁজিপতি শ্রেণির সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে শুরু করেছিল। ঔপনিবেশিক শক্তির পুঁজি ব্যবহারের মাধ্যমে দেশীয় পুঁজি বিদেশী পুঁজিতে পরিণত হয়েছিল। ক্রমাগত বিদেশি পুঁজি ও পণ্যের ব্যবহারে মুনফা কেন্দ্রিক অর্থনীতির জন্ম হতে থাকে ধীরে ধীরে।

খনিজ শিল্পের মধ্যে অভ্র খনির মালিকরা প্রথমদিকে মুনফা অর্জন করতে পারেনি কারণ তারা সংগঠিত ছিল না। তাই সমস্ত অভ্র উৎপাদনের খনিগুলির কমিটি একত্রিত হয়ে গিরিডিতে একটি কনভেনশনের আয়োজন করা হয়েছিল। এই আলোচনায় পুঁজিপতিদের উচ্চ মুনফা অর্জন করার পাশাপাশি খনিজ ক্ষেত্রে সামগ্রিক দেশের মুদ্রা অর্জন করার উপর জোর

---

16. *Copy of the speech delivered by Shri S. K. Sen,* Joint Chief controller, Imports & Exports, Calcutta & Chairman, Mica export promotion council at the meeting of Mica Exporters & Mine Owners convened by the Federation of Mica Associations, Bihar, Mica miners & Dealers Association and the Mica mining Association, Kodarma, Bihar, 23 Sept. 1960, P. 20-37.
17. Buchanan. D. H., *The Development of Capitalist Enterprise in India,* New York, The Macmillan Company, 1934, P. 98-100.
18. তদেব। পৃ. ১২০-১২৭

দেওয়া হয়েছিল। এ প্রসঙ্গে বলা যায় ব্যক্তিগত মুনফা অর্জনকে যতটা গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল ঠিক তেমনি বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের মাধ্যমে অধিক মুনফা অর্জন স্থানীয় পুঁজিপতিদের উৎসাহিত করেছিল। খনি শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষ কর্মীর চাহিদা মেটাতে বেশিরভাগ সময়ই নির্ভর করতে হত বিদেশ থেকে নিয়ে আসা উচ্চ বেতনভুক শিল্প বিশারদদের উপর। যার ফলে এই ধারণা গড়ে উঠেছিল যে, ভারতের মাটিতে বৃহৎ শিল্পের শিকড় তৈরী হয়নি কেননা খনি ক্ষেত্রে উচ্চ দক্ষতা সম্পন্ন মানুষদের তৈরি করা হয়নি। এই খনিগুলির সাফাল্য-ব্যবস্থাপক এবং প্রযুক্তিগত দক্ষতা, বিতরণ ব্যবস্থা, বিক্রয় অভিজ্ঞতা, আইনি প্রতিভার পাশাপাশি সরকারের সহযোগিতা প্রয়োজনীয় ছিল। এইভাবে কিছু পুঁজিপতি ও প্রভাবশালী শ্রেণি ছোটনাগপুর অঞ্চলের অন্তর্গত স্থানীয় ব্যবসায়ী খনি শিল্পাঞ্চলকে নেতৃত্ব দান করেছিল। খনিজ পদার্থ রপ্তানির ক্ষেত্রে দেশের যাতে সুনাম নষ্ট না হয় সেদিকে তারা খেয়াল রাখার চেষ্টা করেছিল। কয়লার মত অভ্র খনি শিল্প থেকে ১১ কোটি টাকা লাভের মুনফা উঠে এসেছিল।[19] কনভেনশনের একটি অংশ প্রস্তাব আকারে ভারত সরকারের কাছে প্রেরিত হলে বাণিজ্যের একটি অংশে পুঁজিপতি ব্যক্তিরা উপকৃত হয়েছিল। অভ্র খনিজের কনভেনশন অনুযায়ী ব্যবসায়ীরা রপ্তানি বৃদ্ধি ও অন্যান্য খনিজ ক্ষেত্রে পুঁজি বিনিয়োগ করার পরামর্শ পেয়েছিল।[20] খনিজ খনি তৈরিতে জয়েন্ট স্টক কোম্পানির উদ্ভব ও একচেটিয়াকরণের মাধ্যমে বড় দেশীয় শিল্পপতিরাই ছিলেন এই লগ্নি পুঁজির মালিক।[21] বিংশ শতকের প্রথম ভাগ থেকে সমগ্র দেশের উন্নয়নের ভার এসে পড়েছিল দেশীয় পুঁজিপতিদের উপর। ছোটনাগপুর মালভূমি সহ একাধিক খনিজ খনিতে মুনফা কেন্দ্রিক উৎপাদনের ফলে ব্রিটেনের দ্রুত উন্নয়নশীল শিল্পের জন্য ভারতবর্ষের খনিজ শিল্প উৎপাদক রাজ্যে পরিণত হয়েছিল বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যা।

---

19. Bagchi. Amiya, *The Evolution of International Business 1800-1945 Private investment 1900-1939,* Vol-V, Cambridge University Press, 1972, p 38.

20. *Copy of the speech delivered by Shri S.K. Sen,* Joint Chief controller, Imports & Exports, Calcutta & Chairman, Mica export promotion council at the meeting of mica Exporters & Mine Owners convened by the Fedaration of Mica Associations, Bihar, Mica miners & Dealers Association and the Mica mining Association, Kodarma, Bihar, 23 Sept. 1960, P. 32-37.

21. Ghosh. Suniti Kumar, *The Indian big Bourgeoisie, its genesis, growth and character,* Calcutta, Subarnarekha publication 1985, Pp. 157-165.

আদিবাসী শ্রমিক জীবনের উপর খনি কোম্পানি গুলির প্রভাব

জাতীয়তাবাদী নেতৃবর্গরা দেশীয় মূলধনের পরিমাণ বৃদ্ধি করতে ও ব্রিটেনে সম্পদ চালান বন্ধ করার জন্য একই সাথে আধুনিক শিল্পের সূত্রপাত করাটা প্রয়োজনীয় বলে মনে করেছিলেন। আধুনিক শিল্পের সূত্রপাত করতে গিয়ে 'শ্রম' জনিত সমস্যা নিয়ে বিশেষ দৃষ্টি নিক্ষেপ করেননি। দেশীয় ও বিদেশী খনিজ কোম্পানিগুলি প্রতিষ্ঠা হওয়ার ফলে মুনফা কেন্দ্রিক অর্থনীতি আলোচনায় জাতীয় আয়ের পাশাপাশি 'শ্রম' নামক চিন্তা উঠে এসেছিল। ঔপনিবেশিক পুঁজি ও দেশীয় পুঁজিপতিদের মুনফা কেন্দ্রিক পুঁজির প্রভাব তাদের উপর বিশেষ ভাবে প্রতিফলিত হয়েছিল। হাজার হাজার আদিবাসী শ্রমিক খনি ক্ষেত্রে মজুর হিসাবে যোগদান করেছিল[22] তাদের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি থেকে সামাজিক জীবন অবক্ষয়ের দিকে ধাবিত হতে শুরু করেছিল। এই পরিস্থিতি অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে লায়াল দুর্ভিক্ষ কমিশনের একটি রিপোর্টের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়েছিল যে, কৃষির সাথে যুক্ত নিচুতলার মানুষেরা ও খনির সাথে যুক্ত আদিবাসী শ্রমিকেরা এতটাই দারিদ্র্যে বাস করত যে সারা বছরে দুবেলা তাদের নির্দিষ্ট পরিমানে খাদ্য জোটানো সম্ভব ছিল না। দেশের বিভিন্ন স্থানে চরম অর্থনৈতিক সংকটের পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল। এই পরিস্থিতিতে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার বিভিন্ন স্থানে পুনরায় দুর্ভিক্ষ হয়েছিল। সংকীর্ণ ও সংকুচিত কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থা অর্থনৈতিক বিকাশের নিম্নতম ধাপ ছিল অন্যদিকে মুক্ত ও সম্প্রসারণশীল শিল্প ও বাণিজ্য ব্যবস্থা হয়ে উঠেছিল এক উচ্চতর পর্যায়। এমনকি মোট উৎপাদনের পরিমাণ সমান হলেও এই আধুনিক শিল্প গঠনের শক্তিই আদিবাসী শ্রমিক শ্রেণির অর্থনীতিকে ভঙ্গুর করেছিল গোঁড়া থেকেই।

প্রথমদিকে খনি শ্রম সমস্যার একটি মূল কেন্দ্রে ছিল ইংল্যান্ড, উনবিংশ শতাব্দীতে ধীরে ধীরে ভারতের ছোটনাগপুর মালভূমি অঞ্চলে এই সমস্যা প্রকট হয়ে উঠেছিল। ভারতীয় শ্রম কল্যাণ ও কারখানার শ্রমিকের কল্যাণ- ১৮৭০ এর দশকে আলোচনা করা শুরু হয়েছিল। বিশেষজ্ঞদের একটি কমিটি ভারতে ৫ মাস খনি কারখানার শ্রমিকদের শ্রম সম্পর্কিত তথ্য ভারত সরকারের কাছে প্রেরন করেছিলেন। শ্রমিকের কল্যাণ সম্পর্কিত তথ্য আলোচনায় উঠে এসেছিল যে, ইংরেজ শ্রমিকদের তুলনায় ভারতীয় শ্রমিকের সহ্য ক্ষমতা অনেক কম ছিল এবং

22. Bagchi. Amiya Kumar, *Private Investment in India 1900-1939,* Vol-V, Cambridge University press, 3rd December, 2007, p. 34.

শিল্প জীবনের প্রতি তারা প্রতিশ্রুতি বদ্ধ ছিল বলে জানা যায়। সমগ্র ভারতের প্রেক্ষিতে শ্রম সম্পর্কিত রিপোর্ট তদন্ত হলেও ছোটনাগপুরের খনি অঞ্চলে শ্রম দান সম্পর্কিত যে চিত্র পরিস্ফুট হয়েছিল তা ছিল ভয়াবহ। ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ শক্তি আদিবাসী শ্রমিকদেরকে, ব্রিটিশ পুঁজিপতিদের স্বার্থে কাঠ কাটার জন্য কাঠুরে, আর জল বয়ে আনার জন্য ভারীতে পরিণত করেছিল। এ প্রসঙ্গে সুকোমল সেন স্বীকার করেছেন যে, ব্রিটিশ ও দেশীয় মালিকানা নির্বিশেষে শ্রমিক শ্রেণির উপর পুঁজিবাদী শোষণ শুরু হয়েছিল।[23] নিচু বর্ণের শ্রমিকদের জন্য সংরক্ষিত ছিল নিচু পদগুলি অর্থাৎ রেলশিল্প থেকেই আদিবাসীদের রেল লাইনের ট্র্যাক তৈরীতে ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ শক্তি তাদের কাজে যুক্ত করেছিল।[24] তাদের শ্রমসাধ্য কাজের নমুনা দেখে ঔপনিবেশিক শাসকরাও খুঁজে পেয়েছিল একটি বিশেষ সুবিধে যার ফলে নিচু জাতি ও বর্ণপ্রথাকে কেন্দ্র করে আদিবাসী শ্রমিক শ্রেণিকে খুব সহজেই তীব্র শোষণের নাগপাশে আবদ্ধ করে রাখাটা ব্রিটিশদের পক্ষে সম্ভব হয়েছিল।[25] পুঁজিবাদের জন্মলগ্নে নতুন নতুন কারখানা, খনি কোম্পানির সাথে তৈরি হয়েছিল খনিগুলিতে কর্মরত শ্রমিক শ্রেণির মধ্যে এক নতুন শোষণের সম্পর্ক। স্থানীয় নিয়োগকর্তার সাথে স্থানীয় রাজ্যভিত্তিক স্তরে শ্রমিক নিয়োগ শুরু হয়েছিল। গ্রাম থেকে শহরে আসা এই সমস্ত আদিবাসী পরিযায়ী শ্রমিকদের পুঁজিবাদ নিয়ন্ত্রণাধীনে থেকে জমির সাথে যোগাযোগ ছিন্ন করে শ্রমিককে শ্রম দানে বাধ্য করেছিল। পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থায় আদিবাসী শ্রমিকের অবদান শ্রমের গতিশীলতাকে বৃদ্ধি করেছিল। পুঁজি ও আদিবাসী শ্রম সম্পর্ক একে অপরের পারস্পারিক অঙ্গ হয়ে উঠেছিল। খনিজ উৎপাদন ক্ষেত্রে তাঁদের শ্রমকে যাতে যথাযথ ব্যবহার করা যায় সেইজন্য তাদেরকে কারখানার মধ্যেই বা খনি সংলগ্ন এলাকায় থাকতে বাধ্য করা হয়েছিল। অতিরিক্ত মুনফার লোভে শ্রমিকদের কাজের সময় বৃদ্ধি করা, উন্নত প্রযুক্তির সাহায্যে কাজের তীব্রতা বৃদ্ধি করা এবং নির্দিষ্ট শ্রম মূল্যের

---

23. সেন. সুকোমল, *ভারতে শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাস ১৮৩০- ১৯৭০,* প্রথম খণ্ড, কলকাতা, নবজাতক প্রকাশন, ১৯৭৫, পৃ. ৪৫-৬৩

24. Rana P (Ed), Marcel Vander Linden, *Indias Labouring Poor Historical studies c. 1600-c.2000,* Cambridge, Cambridge, University Press, 2007, Pp. 90-122.

25. Chaudhuri. Binay Bhushan (Ed.), *Economic History of India from Eighteenth to Twentieth Century (Vol. VIII, Part- 3),* New Delhi, Centre for studies in Civilizations, 2005, P. 238-240.

নিচে মজুরী প্রদানের মাধ্যমে সাম্রাজ্যবাদী শক্তি আদিবাসী শ্রমিক শ্রেণিকে শোষণ করা শুরু করেছিল।[26]

ছোটনাগপুর অঞ্চলে অধিক ও বৃহৎ আকারে কয়লা খনি থাকার ফলে সবচেয়ে বেশি কয়লা খনিতে শ্রমিক লক্ষ করা যায়। তবে কয়লা খনির পাশপাশি তামা (২,৭৩৭), লোহা(৯,৬৬৬), চুনাপাথর(৩,২৯৮), অভ্র (২৩,৩৫৮) ও পাথর খনিতেও (৫,৩৮০)[27] আদিবাসী শ্রমিক অধিক পরিমানে কাজ করত। বিহারে অভ্র খনির সংখ্যা ছিল ৬৮৯ টি। বিহারের অভ্র খনিতে প্রায় ২২,০০০ আদিবাসী শিশু শ্রমিক কাজ করত যারা অধিকাংশই আদিবাসী শ্রেণির অন্তর্গত ছিল। সব খনিগুলি মিলিয়ে প্রায় ১,৭০,২১৭ জন আদিবাসী শ্রমিকদের কাজ করার সন্ধান পাওয়া যায়। ১৯৩৮ সালে খনির প্রধান পরিদর্শকের মতে বিহারে কারখানা আইনের অধীনে ছিল ৯৩,০৩৪ জন আদিবাসী শ্রমিক।[28] খনিজ শিল্পের কোম্পানি গুলির প্রভাবে সেখানকার আদিবাসী শ্রমিকদের জীবন অতিস্ট হয়ে পড়েছিল তার প্রমাণ তৎকালীন কোম্পানির বিবরণে উঠে এসেছিল।

বাংলায় দ্বারকানাথ ঠাকুর (১৭৯৪-১৮৪৬), ১৮৩০ থেকে ১৮৪০ এর দশকে ছয়টি যৌথ- স্টক কোম্পানি স্থাপন করে শিল্প বিনিয়োগের দিকে মনোনিবেশ করেছিলেন। দ্বারকানাথ ঠাকুর দক্ষ জমিদারের পাশাপাশি দক্ষ[29] ব্যবসায়িক ছিলেন। ছোটনাগপুরের জমিদার কিশেনাথ রায়ের সাথে দ্বারকানাথের খনি শিল্প নিয়ে সুসম্পর্ক বজায় ছিল। তিনি কৃষি ও ব্যবসার ক্ষেত্রে সাহায্য করার উদ্দেশ্যে ১৫ লক্ষ টাকা মূলধন নিয়ে ইউনিয়ান ব্যাঙ্ক নামক জয়েন স্টক ব্যাঙ্কের পত্তন করেছিলেন।[30] তিনি চেয়েছিলেন ভারতবর্ষের আর্থিক উন্নয়ন করতে পশ্চিমিকরণ ব্যবসা পদ্ধতির মাধ্যমে। তিনি যে কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করেন তাঁর নাম ছিল টেগোর অ্যান্ড কার

---

26. Roy Chowdhury. Rakhi, *Gender and Labour in India (The Kamins of Eastern Coalmines 1900-1940),* Kolkata, Minerva Associates Publications PVT. LTD., First Published 1996, P. 133.

27. *Report of the Bihar Labour Enquiry Committee,* Vol-I, Patna, Bihar, 1940, P. 25- 47.

28. *Report of the Bihar Labour Enquiry Committee,* Vol-I, Patna, Bihar, 1940, P. 25.

29. *ব্লেয়ার কিং এর কথায় দ্বারকানাথ ঠাকুর জমিদার হিসাবে যতটা দক্ষ[29] ছিলেন ঠিক ততটাই ব্যাবসায়িক ছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন ভারতবর্ষের আর্থিক উন্নয়ন করতে, পশ্চিমীকরণ ও ব্যবসার মাধ্যমে।*

30. ঠাকুর. সৌমেন্দ্রনাথ, *ভারতে শিল্প বিপ্লব রামমোহন ও দ্বারকানাথ,* কলকাতা, বৈতনিক, প্রথম সংস্করণ ১৯৬৪, পৃ. ৯

কোম্পানি'। টেগোর অ্যান্ড কোম্পানি প্রকৃতপক্ষে একটি অংশিদারিত্বের চেয়ে পিতৃতন্ত্রের ভার ছিল অধিক পরিমানে।[31] তিনি জমিতে বিনিয়োগের থেকে ভিন্ন কোন ব্যবসায় বিনিয়োগকে লাভজনক বলে মনে করেছিলেন। খনিজ শিল্পাঞ্চলগুলি আয়তনে এতটা বৃহৎ ছিল যে, সেখানে কাজ করতে অসংখ্য শ্রমিকের প্রয়োজনে আদিবাসীদের অসংগঠিত ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হত। 'টেগোর অ্যান্ড কার কোম্পানির' খনি অঞ্চলে সংগঠিত ও অসংগঠিত দুই ধরনের অদক্ষ শ্রমিকদের অসংগঠিত ক্ষেত্রে কাজ করার তথ্য উঠে এসেছিল। কয়লা খনির জন্য প্রচুর সংখ্যক আদিবাসী শ্রমিকের ইজারা নেওয়ার তথ্য দ্বারকানাথ ঠাকুর স্বয়ং স্বীকার করেছেন। সেই সময় রাণীগঞ্জে দক্ষ শ্রমিক রাখা দ্বারকানাথ ঠাকুরের পক্ষে সমস্যাজনক হয়ে উঠেছিল। ১৮৮০ সাল থেকে ১৯০০ সালে টেগোর কার অ্যান্ড কোম্পানিতে আদিবাসী শ্রমিক সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছিল ১৫০ থেকে ৫৮৬ জন। খনি শ্রমিকেরা রাণীগঞ্জের আশেপাশের গ্রামের সাঁওতাল আদিবাসী ও চিনাকুড়ির বাউড়ি ছিল।[32] সাঁওতালরা মূলত উইলিয়াম জোন্স দ্বারা নির্দেশিত কারবার এবং পিক ব্যবহার করত। সাঁওতাল আদিবাসী শ্রমিকদের পিক ব্যবহার করতে শেখানোর জন্য রাণীগঞ্জে নিয়ে আসা হয়েছিল। শ্রমিকদের মধ্যে কিছু সমস্যা দেখা দিলে তাঁদের খনি থেকে বহিষ্কার ও পুড়িয়ে দেওয়ার কথারও উল্লেখ পাওয়া যায়। সাঁওতাল শ্রমিকরা সাধারণত খনি অঞ্চলের অসংগঠিত ক্ষেত্রে অবস্থান করত বলে বালতি বালতি কয়লা ভর্তি করা, উপর থেকে হাতুড়ি দিয়ে কয়লা কেটে কেটে নামানো ইত্যাদি তাঁদের শ্রমসাধ্য কাজে ব্যস্ত রাখা হত। শ্রমিকদের মজুরি বকেয়া রেখে দেওয়া হত।[33] আদিম অবস্থা এবং কাজের বিপজ্জনক প্রকৃতি স্বত্বেও, গুরুতর দুর্ঘটনার প্রায়ই সম্মুখীন হতে হত শ্রমিকদের।[34] উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকেও, শ্রমশক্তির মোট ২০% এর কম প্রযুক্তিগতভাবে এই শিল্প খাতে নিযুক্ত ছিল। বাংলায় ক্যাপ্টেন হাটেনের কাগজটি কলকাতার দুই বণিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল যারা সিংভূমে খনি শুরু করার সিধান্ত নিয়েছিল এবং এম এমিল স্টোহর ১৮৫৭ সালে একটি খনি কোম্পানি চালু

---

31. Kripalani. Krishna, *Dwakanath Tagore A forgotten Pioneer: A life,* New Delhi, National Book trust India, 1902 Saka, P. 76-83.

32. ঠাকুর. সৌমেন্দ্রনাথ, *ভারতে শিল্প বিপ্লব রামমোহন ও দ্বারকানাথ,* কলকাতা, বৈতনিক, প্রথম সংস্করণ ১৯৬৪, পৃ. ৬০-৬৬

33. King. Blair, *Partner in Empire,* Calcutta, Firma KLM Private Limited, 1981, Pp. 94-100.

34. তদেব। পৃ. ১০০- ১০৪

করেছিল। এ প্রসঙ্গে কয়লা খনি মালিকদের তিনটি বড় অ্যাসোসিয়েশনের কথা জানা যায় যথা ১) ইন্ডিয়ান মাইনিং অ্যাসোসিয়েশন ২) ইন্ডিয়ান মাইনিং ফেডারেশন ৩) ইন্ডিয়ান কোলিয়ারি অনার্স অ্যাসোসিয়েশন। এই অ্যাসোসিয়েশনগুলি খনি অঞ্চলকে ধীরে ধীরে শ্রমিক শোষণের কেন্দ্র করে তুলেছিল। দ্বারকানাথ ঠাকুর ১৮৮৬ সালে প্রতিবেদন লিখেছিলেন, "তিনি সেইসব কারাগার স্বচক্ষে দেখেছেন যেখানে অনিচ্ছুক কর্মরত আদিবাসী শ্রমিককে আটকে রাখা হত।[35] এই নীতির ফলে বাঙালি শিল্পপতিরা কয়লাখনির কারবার বন্ধ করে দেন। পরবর্তীকালে এই খনিগুলি মারোয়ারিদের হাতে চলে যায়।[36]

ঔপনিবেশিক পর্যায়ের প্রথমদিকে বিহারের ধল্ভুমের রাজা আকরিক লৌহ খনির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তার জন্য ভাড়া দিতেন ৯,২০০ টাকা এবং এটি সরবরাহ করার জন্য স্টিম ইঞ্জিন সহ ফাউন্ড্রি তৈরি করা হয়েছিল। ১৮৫৯ সালে যদিও কোম্পানিটি বিলুপ্ত হয়ে যায়। লালা গুরুশরন লাল বাধানি (১৯০১-১৯৫৫) ভারতের বিহার রাজ্যের একজন বিশিষ্ট শিল্পপতি ছিলেন। তিনি রামগড় জেলার লাপাঙ্গা গ্রামের জমিদারি পেয়েছিলেন সেখানে তিনি হিন্দুস্থান কোল কোম্পানি লিমিটেড নামে কোম্পানির মালিক ছিলেন। তিনি বিহার চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজের সভাপতি ছিলেন ১৮৪৮-৪৯ সালে।[37] ছোটনাগপুর মালভূমি সংলগ্ন বিহার কেন্দ্রিক অঞ্চলের গ্রামের অর্থনীতি ব্যবস্থায় আদিবাসীদের মধ্যে দুইটি বিশেষ মুণ্ডা ও গাইরো শ্রেণির ভূমিকা পালনের কথা উল্লেখ করেছিলেন। মুণ্ডা ও গাইরো আদিবাসী ব্যতীত ওঁরাও নামের আদিবাসীরা এই খনির পেশায় জড়িত ছিল। খনির কাজে আদিবাসী নারী ও পুরুষ উভয়ে যোগদান করেছিল যদিও এই অবস্থানে আদিবাসী মহিলারা বেশ ঝুঁকিপূর্ণ

---

35. কে. সি. ঘোষ ১৮৯৬ সালের কংগ্রেস অধিবেশনে সমবেত প্রতিনিধিদের সামনে প্রচুর সংখ্যক নারী ও পুরুষ শ্রমিককে একসঙ্গে চাবুক মারার বর্ণনা দেন। চিফ কমিশনার শ্রমিক প্রবসন সংক্রান্ত ১৮৮৭ সালের প্রতিবেদন থেকে উদ্ধৃত করে তিনি দেখান, নারী শ্রমিকদের 'ম্যানেজারের বাংলোর সামনে, খুঁটিতে বেঁধে কোমরের উপরে কাপড় তুলে, নগ্ন নিতম্বে ঘোড়ার পাদানির মোটা চামড়ার দড়ি দিয়ে চাবুক মারা হয়েছিল'।

36. ব্যানার্জি. সুবোধ (সম্পা), *গণদাবী,* সোশ্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টারের বাংলা মুখপত্র পাক্ষিক, ১৪ই ডিসেম্বর, ১৯৪৮, পৃ. ৭

37. *Proceedings of the committee 1956,* Vol-III, Delhi, Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry, 19 October 2014, P. 24.

অবস্থানে ছিল।[38] খনি সংলগ্ন গ্রামগুলিতে পেশাগত শ্রেণির ব্যাপক বিস্তার ও শিল্পায়নের প্রভাবের কারণে একটি বড় পরিবর্তন লক্ষ করা যায় বলে প্রনব কুমার দাসগুপ্তা মনে করেন।[39] স্থানীয় শ্রমের যথেষ্ট ব্যবহার করে আদিবাসীদের খনি ক্ষেত্রে নিয়োগ করা হয়েছিল। শিল্পে যুক্ত শ্রমিকরা, জমির প্রতি কম আগ্রহ দেখাতে থাকে কারণ তাদের আয়ের উৎস জমি আর মুখ্য ছিল না। কৃষি আয়ের বিপরীতে কারখানা বা মজুরী ভিত্তিক পরিষেবার প্রতি আকর্ষণ বৃদ্ধি পেয়েছিল। আদিবাসী শ্রমিকরা মনে করেছিল খনি শিল্পের কাজের মধ্যে নিয়ম ও ধারাবাহিকতা রয়েছে, যেখানে কৃষি উৎপাদন প্রকৃতি পুরোটাই জমিদার ও মহাজন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ছিল। কৃষি জমি থেকে আয় বিশেষভাবে না হওয়ায় তারা খনি শিল্পের বৃহত্তর ক্ষেত্রের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল। শিল্পের কাজে গ্রামবাসীদের সম্পৃক্ততার একটি বড় প্রভাব ছিল কৃষি জমির সর্বোত্তম ব্যবহারে আগ্রহ হ্রাস পেয়েছিল।[40]

উড়িষ্যার ময়ূরভঞ্জ রাজ্যের জমিদার ছিলেন শ্রীরামচন্দ্র ভঞ্জ দেও (১৭ ডিসেম্বর ১৮৭০-২২সে ফেব্রুয়ারি ১৯১২) তাঁর শাসনকালে প্রথম লোহার খনির বৈজ্ঞানিক কার্যক্রম শুরু হয় মধ্য ভারত, উড়িষ্যার গুরুমাহিসিনি ও ময়ূরভঞ্জে। গুরুমাহিসিনির খনিগুলি তিনি টাটা গোষ্ঠীদের কাছে লিজ দেওয়ার ব্যবস্থা করেন।[41] এই খনিগুলিতে ছোটনাগপুরের অন্তর্গত উড়িষ্যার আদিবাসী শ্রমিকদের এই খনিগুলিতে কাজের জন্য ব্যবহার করা হতে থাকে| আদিবাসী শ্রমিকদের মধ্যে সাঁওতাল, হো, ভুঁইয়াদের সংখ্যা ছিল অধিক। সম্বলপুর জেলার বোরসাম্বার জমিদারীর ঝিন্দালদের ক্ষেত্রেও আদিবাসীদের প্রতি নিপীড়নের ঘটনাটি ছিল দৃশ্যমান। টাটা অ্যান্ড সন্স এবং দ্য বেঙ্গল আয়রন অ্যান্ড স্টিল ম্যানুফ্যাক্টারিং কোম্পানির জন্য লৌহ আকরিকের খনিতে স্বল্প মজুরির ভিত্তিতে আদিবাসীদের কাজে যুক্ত করা হয়েছিল। খনির খাত আদিবাসীদের সামাজিক অস্তিত্বকে ক্ষুণ্ণ করেছিল। ঔপনিবেশিক শক্তির মত অন্যান্য

---

38. *Economic Development in Different Regions in India,* New Delhi, Government of India Planning Commission, August, 1962, Pp. 3- 15.

39. Dasgupta. Pranab Kumar, *Impact of Industrialization on a tribe in South Bihar,* Calcutta, Anthropological Survey of India, 1975, P. 45.

40. *Proceedings of the committee 1956,* Vol-III, Delhi, Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry, 19 October 2014, P. 10-15.

41. Frankle. Francine R (Ed), *Dominance and State power in Modern India: Decline of a social order,* Vol-II, Oxford, Oxford University press, 1989, Pp. 59-70.

নিপীড়ক বৈশিষ্ট্যগুলি পদ্ধতিগত ভাবে শক্তিশালী হয়ে উঠলে শ্রমিক শোষণ অনায়াসে করা সম্ভব হয়েছিল। খনিতে পণ্য উত্তোলনের ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলক শ্রম ও জোরপূর্বক যোগান থেকে শুরু করে করের বোঝা পর্যন্ত রাজকীয় শাসকদের নির্দেশে সম্পন্ন হত।[42] পূর্ব ঋণ পরিশোধের নামে আদিবাসীদের জোরপূর্বক ময়ূরভঞ্জের খনিতে নিয়োগ করা হয়েছিল। গুরুমহিশানি, সুলাইপাট, বাদামপাহাড়ের খনিতে কাজ করার জন্য জোরপূর্বক সাঁওতাল আদিবাসীদের ব্যবহার করা হয়েছিল। ছোটনাগপুর মালভূমির এই খনি অঞ্চলে শ্রমিকদের স্বাস্থ্য নিয়ে সমস্যা তৈরি হয়েছিল। খনি অঞ্চলে আদিবাসী শ্রমিকদের মধ্যে গুটিবসন্তের প্রকোপ দেখা যায় এছাড়াও কলেরা রোগের প্রাদুর্ভাব লক্ষ করা যায় ঘিঞ্জি ও অস্বাস্থ্যকর বস্তিতে বাসস্থানের ফলস্বরূপ। স্বাস্থ্য অবনতির পাশাপাশি নিরাময়ের কোনো ব্যবস্থা ছিল না। শ্রমিক স্বাস্থ্যের দিকে ব্যবস্থা ছিল অবহেলাপূর্ণ। ঐতিহাসিক বিশময় পতি[43] খনি শ্রমিকদের এইরুপ অস্বাস্থ্যকর অবস্থাকে ঔপনিবেশিকতার প্রতীক ছিল বলে উল্লেখ করেছেন তাঁর গ্রন্থে।

ছোটনাগপুর অঞ্চলে কয়লা খনির পাশাপাশি বীরভূম ও বর্তমান ঝাড়খণ্ডে ঔপনিবেশিক শাসনকালে বীরভূমের দেওয়ান ও পাথর খনির বড় শিল্পকর্তা ছিলেন কাশিমবাজারের মহারাজা এস সি নন্দী। তাঁর হাত ধরে বীরভুমে পাথর খনিজ খাদান খনির উদ্ভব হয়েছিল।[44] ঔপনিবেশিক শাসনকালের প্রথম ভাগ থেকেই কয়লার মত পাথর খাদানের অস্তিত্ব ছোটনাগপুরের বিস্তৃত স্থানে ছড়িয়ে পড়েছিল। এই খাদানের উপর স্থানীয় হিন্দু ব্যবসায়ীরা ও পুঁজিপতিরা এক এক করে তাঁদের অর্থ বিনিয়োগ করেছিল অধিক মুনফা লাভের আশায়। বীরভূম সংলগ্ন বিহারের একাধিক মালভূমি এলাকায় যেখানে আদিবাসী সাঁওতালদের বসতি ছিল সেই সমস্ত স্থান জুড়েই ধীরে ধীরে পাথর খাদানের অস্তিত্ব লক্ষ করা গিয়েছিল। এই সব খনি অঞ্চল আদিবাসী শ্রমিকদের জোরপূর্বক যোগদানের পাশাপাশি আদিবাসী জনজাতিদের জমি জবরদখলের অন্যতম তথ্যের উল্লেখ পাওয়া যায়। যে জমিগুলির উপর খনি শিল্পাঞ্চলগুলি গড়ে উঠেছিল তা ছিল আদিবাসীদের নিজস্ব জমি। আদিবাসীদের থেকে জমিগুলি জোরপূর্বক কেড়ে নেওয়া হয়েছিল স্বল্প মূল্যের প্রতিশ্রুতির ভিত্তিতে। যাদের থেকে জমির অধিকার স্বত্ব

---

42. দাস. হরপ্রসাদ(সম্পা), *ময়ুরভঞ্জ প্রকাশিকা পত্রিকা,* ২২সে মে, ১৯২০, বারিপদ, বিহার, ১৮৭৯।

43. Pati. Biswamoy (Ed), *Adivasis in Colonial India Survival resistance and negotiation,* Indian Council of Historical Research, Delhi, Orient Blackswan, 2011, P. 237-245.

44. *Report of the List of mines other than coal mines worked under the Indians mines act,* Government of India, 1923, P. 105.

কেড়ে নেওয়া হয়েছিল তাঁদের পুনরায় খনিতে সামান্য পারিশ্রমিকের বিনিময়ে অসংগঠিত ক্ষেত্রে শ্রম প্রয়োগে ব্যবহার করা হয়েছিল। বেশিরভাগ পাথর খাদান খনির কার্যক্রম বেসরকারী নেতৃত্ব দ্বারা সঞ্চালিত হত। আদিবাসী জনগণের জমি দখলের জন্য খাদান মালিকরা অতিরিক্ত ক্ষমতা বা জবরদস্তিমূলক আচরন করেছিল আদিবাসী পরিবারদের সাথে। এই জবরদস্তিমূলক আচরণ থেকেই খুব সহজেই আদিবাসীদের জমি অধিকার করা শুরু করেছিল। এমনকি খনিতে মুনফা কেন্দ্রিক অর্থনীতি উৎপাদনে যে প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছিল সেখানে ইংরেজ স্বায়ত্ত শাসনের সহায়ক হিসাবে পাথর খাদানগুলি গঠিত হয়েছিল প্রয়োজনীয় নথী ও পুলিশ রিপোর্ট ছাড়াই।[45]

মধুসূদন দাস (২৮ সে এপ্রিল ১৮৪৮ – ৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৪) ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ শাসনাধীন কালে উড়িষ্যা অর্থনীতির বিকাশের আরো একজন শিল্পপতি ও সমাজ সংস্কারক ছিলেন। ব্রিটিশ কোম্পানি রাজের জন্য জমি নিলামে চড়াতে গিয়ে উচ্ছেদ হতে হয়েছিল আদিবাসীদের। মধুসূদন দাস সমাজের দরিদ্র, অসহায় এবং বঞ্চিত অংশগুলোর আর্থিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে, বিপুল সংখ্যায় শিল্পের শ্রমিক হিসাবে আদিবাসীদের নিয়োগ করেছিলেন। জমিদারি প্রথার পাশাপাশি উড়িষ্যার দ্রুত শিল্পায়ন করার কথা তিনি ভেবেছিলেন। ব্রিটিশ অর্থনৈতিক নীতি উড়িষ্যার লবন আয়ের উৎসকে ধ্বংস করলে খনি ক্ষেত্রের উপর নির্ভরশীল শ্রমিকেরা মজুরিহীন ও জীবিকাহীন হয়ে পড়েছিল। এই শ্রমিকদের মধ্যে অধিকাংশ ছিল আদিবাসী জাতির একটি অংশ। এই গভীর প্রতিক্রিয়া থেকে মধুসূদন দাস এ্যাসোসিয়েশনে এই দাবি উত্থাপন করেন এবং বাংলার প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণে লবণের মত খনিজ বিভাগকে পুনোরোদ্ধারের দাবি জানান।[46] উড়িষ্যা সরকার ১৮৯৬ সালে জনপ্রিয় আন্দোলনের ফলস্বরূপ, লবন বিভাগ মাদ্রাজ থেকে বাংলায় স্থানান্তরিত করেন। অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্পর্কে তাঁর গভীর অন্তর্দৃষ্টি এবং উন্নততর প্রবৃদ্ধি তাঁর দূরদৃষ্টিকে স্পস্ট করেছিল। তিনি অচিরেই স্বীকার করেছিলেন যে, কায়িক পরিশ্রমের ফলে যেমন জাতির সম্পদ বৃদ্ধি করা যায় না ঠিক তেমনই

45. Pal. Swadesh, Indrajit Mandal, *Impacts of stone mining and crushing on stream characters and vegetation health of Dwarka river basin of Jharkhand and West Bengal, Eastern India,* Journal of Environmental Geography, 10 (1-2), 11-21, Pp. 3-11.

46. Samal. J K. *Economic History of Orissa 1866-1912,* Delhi, Mittal Publication, 1990, P. 100-134.

খনি শিল্পে নিযুক্ত আদিবাসীদের জীবন- আর্থ সামাজিক ভাবে পরিবর্তিত করা যাবে না। দেশীয় শিল্পে উন্নতির জন্য বিদেশী মূলধন ঋন করার পাশাপাশি আধুনিক শিল্প গড়ে তোলার জন্য দরিদ্র ও মধ্যবিত্তদের সঞ্চয়কে ব্যবহার করা হয়েছিল বলে উল্লেখ করেছিলেন। রাষ্ট্র ও পুঁজির যৌথ আঁতাতে শোষিত এই শ্রমিকশ্রেণি মুক্ত বাজারে উৎপাদকে পরিণত হয়েছিল তা তিনি স্বীকার করেছিলেন। ঔপনিবেশিক যুগে আধুনিক শিল্প সভ্যতা ছিল অতিমাত্রায় বাস্তববাদী। ব্যক্তির আত্মিক মুক্তি ঘটাতে গিয়ে যান্ত্রিক আদর্শ আদিবাসী শ্রমিককে নিজ সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়ার ঘটনা তিনি উল্লেখ করেছিলেন। সমাজের প্রান্তিক স্তরের আদিবাসীদের উপরেই এই চিরাচরিত সেবিকার ভূমিকা আরোপিত করা হয়েছিল। এই ভয়াবহ পরিস্থিতিতে শ্রমের মূল্যও অতি তুচ্ছ হয়ে উঠেছিল।[47] এ প্রসঙ্গে বলা যায় সহজ, সরল, আদিবাসীরা ব্রিটিশ শাসনের প্রতি তাঁদের আনুগত্যে দৃঢ় ছিল, কারণ তারা ইংরেজ জনগণের সাধারণ চরিত্র এবং ভবিষ্যৎ সম্পর্কে পুরোপুরি আশাবাদী ছিল।[48] কিন্তু কোম্পানির একচেটিয়া অর্থনৈতিক অধিকারের আওতায় আদিবাসীদের অর্থনৈতিক উন্নতির কোনো সম্ভবনাই ছিল না। এক্ষেত্রে বলা যায় একচেটিয়া বাণিজ্যনীতির সাথে অবাধ শ্রমের দ্বন্দ্ব শুরু হয়েছিল।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী সময়ে, সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলো প্রযুক্তিগত দিক থেকে আধিপত্য বজায় রেখে ভারতের মত দেশগুলোতে এক রকমের বিকৃত পুঁজিবাদের বিকাশ ঘটেছিল। স্বভাবতই নব উদ্ভুত পুঁজিবাদী উৎপাদন কেন্দ্রগুলিতে নতুন জীবিকা অর্জনের ক্ষেত্রে উৎপাদন সম্পর্কের ভিত্তিতে শ্রম বিভাজনের বা শ্রেণি বিকাশের সম্ভাবনা সূচিত হয়েছিল এবং তাঁর মাত্রা বৃদ্ধি পেয়েছিল। শ্রেণি গঠনের ইতিহাস শুরু হয় যদিও ঐতিহাসিকভাবে নির্ধারিত সামাজিক উৎপাদন ব্যবস্থায়। উৎপাদন – উপকরণের সাথে শ্রমের সামাজিক সংগঠনে গৃহীত ভূমিকা শ্রেণি ও শ্রেণি বিরোধের সূচনা করেছিল শ্রমের সামাজিক বিভাজনের বিকাশের ফলে। উৎপাদন ও উপকরণের সাথে সম্পর্কের প্রেক্ষিতে শ্রম বিভাজন শুরু হয়েছিল। শ্রম বিভাজন এবং আদিবাসী শ্রমিকদের মধ্যে খনি অর্থনীতিতে যোগ দেওয়ার ফলে ভিন্ন ভিন্ন পরিবর্তন লক্ষ করা যায়।

---

47. *শ্রমজীবী ভাষা* (মাসিক পত্রিকা), ভলিউম ১০, ১ম জুলাই, কলকাতা, ২০১৯, পৃ. ৫-৭

48. Naoroji. Dadabhai, *Poverty and Un- British Rule in India,* London, Publication Division, Ministry of Information and Broadcasting Government of India, First Published in 1901, Pp 182-187.

জীবিকাহীন ও বেকার আদিবাসী গোষ্ঠী

শিল্পায়ন মানে শুধু খনি ও কলকারখানার বৃদ্ধি ছিল না। শিল্পের সাথে যুক্ত অবাধ শ্রমের প্রবেশ ছিল খনিজ শিল্প গঠনের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। সক্রিয়ভাবে আদিবাসীরা খনির সাথে জড়িত হয়েছিল অন্যান্য কর্ম সংস্থানের পথ বন্ধ হওয়ার ফলে। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসকদের এদেশে আসার পর অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে আদিবাসীদের যে পরিবর্তন হয়েছিল তা লক্ষ করা যায় বেকারদের সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়ার মধ্য দিয়ে। বেকার সমস্যার বোঝা শুধু বেকারদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি বরং সমগ্র শ্রমিক শ্রেণিকে এই বোঝা বহন করতে হয়েছিল। ধনতান্ত্রিক পরিস্থিতিতে বেকার সমস্যা 'মজুর বাজারে' অত্যাধিক চাপের ফলে শ্রমিক শ্রেণির দুর্দশার অন্তঃ ছিল না। লক্ষ লক্ষ আদিবাসী বেকার থাকার ফলে চাহিদা ও সরবরাহের মধ্যে অসামঞ্জস্য সৃষ্টি হয়েছিল।[49] রেলপথের প্রভাব ভারতের পক্ষে সম্পূর্ণটাই মঙ্গলদায়ক হয়েছিল বলে জাতীয়তাবাদী নেতাদের পাশাপাশি লোকহিতৈষী পত্রিকা দাবি করেছিলেন যে, এই রেলপথ প্রসার বেকার কর্মজীবন দূরীকরণে সাহায্য করবে। ঔপনিবেশিক সময়কালে অর্থনীতির পরিবর্তনের ফলে বেকারত্ব এবং হতাশার সময়কাল লক্ষ করা যায়।[50] রেলপথের উপকারিতাকে মূল্যায়ন করা যায় অর্থনৈতিক বিকাশের বৃহত্তর পটভূমিকায়। বিশেষত শিল্প গঠনের চাহিদাকে প্রশ্রয় দিয়ে ব্রিটিশ স্বার্থরক্ষার মধ্য দিয়ে রেলপথের মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়নে আদিবাসী শ্রম একটি বিশেষ ভূমিকা পালন করেছিল। ১৮৪৮ সালে রেলপথ নির্মাণের মধ্য দিয়ে নতুন বাজারের সৃষ্টি, কর্মসংস্থান, দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ সম্ভব হবে এই তথ্য প্রচার করার মধ্য দিয়ে জাতীয় চিন্তাভাবনাকে পরিবর্তন করার চেষ্টা করা হয়েছিল। রেলপথ বাণিজ্য পুঁজিকে দেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করার এবং গ্রামাঞ্চলে প্রভাব বিস্তারের সুযোগ করে দিয়েছিল। রেলপথ সম্পর্কিত জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিভঙ্গির উপরিক্ত বিশ্লেষণ প্রমান করে দিয়েছিল যে, আলোচ্য সময়কালে জাতীয় নেতাদের অর্থনৈতিক চিন্তাধারা গভীর ছিল। রেলপথ নির্মাণের

49. ব্যানার্জি. সুবোধ (সম্পা), *গণদাবী,* সোশ্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টারের বাংলা মুখপত্র পাক্ষিক, ১৯৪৯, ৩রা মাঘ, মঙ্গলবার, ১৩৫৫, ১বর্ষ, ১০ সংখ্যা, পৃ. ৩

50. Bhutani. D. H, *The economic story of Modern India,* New Delhi, Publication Division Ministry of Information and Broadcasting Government of India, February 1973, P. 30-40.

ফলে ইংল্যান্ডে কয়লা, ইস্পাত এবং যন্ত্রশিল্পের শ্রমিকদের প্রাথমিক কর্মসংস্থানের সুযোগ হলেও, ছোটনাগপুরের আদিবাসী শ্রমিকদের ক্ষেত্রে তা ঘটেনি।

ব্রিটিশ ঔপনিবেশিকরা নিজেদের স্বার্থও চিন্তা করেই এই ধরনের কর্মে আদিবাসীদের নিযুক্ত করেছিল, তা না হলে ১৭৭৪ সালে গ্রান্ট হিটলি এবং জন সুমনা কয়লা খনির জন্য ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির অনুমতি পাওয়ার পর ইংল্যান্ড থেকে খনি শ্রমিক আমদানির তথ্য উল্লেখিত হত না। ইংল্যান্ডের খনি শ্রমিকরা এই পরিবেশে মানিয়ে নিতে না পারায় মৃত্যুর সম্মুখীন হয় এবং এই পরিস্থিতিতে খনি থেকে কয়লা উত্তোলনের দায়িত্ব এসে পড়েছিল স্থানীয় শ্রমিকদের উপর।[51] প্রথম দিকে পরিবহনের সঠিক ব্যবস্থা না থাকায় স্থানীয় শ্রমিকদের একত্রিত করতে সমস্যা তৈরি হলেও তা পরে রেলপথের মাধ্যমে সমস্যার সমাধান হয়ে যায়। ঠিক একইভাবে কংগ্রেস নেতা এ নন্দী বিদেশী পুঁজির ব্যবহার করাকে সমর্থন করেছিলেন এবং এ প্রসঙ্গে তাঁর প্রধান যুক্তি ছিল যে, "ভারত একটা গরীব দেশ, এখানে নতুন শিল্প কারখানা নির্মাণের জন্য পুঁজিসংস্থান দুরহ, সেজন্য প্রয়োজন ছিল বিদেশী মূলধনের, যার দ্বারা এদেশের শিল্প ও যোগাযোগ ব্যবস্থায় উন্নতির পাশাপাশি বেকারত্বের সংখ্যা হ্রাস পাবে বলে আশা করেছিলেন।[52] পুঁজিবাদী গোষ্ঠী আদিবাসী শ্রমিকদের উপর নিয়ন্ত্রন করতে শুরু করলে নিয়োগ পদ্ধতি, মজুরি হ্রাস লক্ষ্য করা যায়। খনি ব্যতীত ছোট সংস্থাগুলি প্রথম থেকেই খনির কালো বর্ণের শ্রমিকদের বাদ দিতে শুরু করে, যার ফলে তাঁদের খনি ক্ষেত্রেই একমাত্র কর্মজীবন নিশ্চিত হয়ে উঠে। ১৮৩৬ থেকে ১৮৪৩ সালে দুটি খনি একীকরণ হলে জোরেমিয়া হাম্ফ্রে এবং সিবি টেলর একই অঞ্চলে আধিপত্যের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে পড়েছিল। এদিকে ১৮৮০ এর পর থেকে বাঙালি উদ্যোগপতিরা যাতে সস্তায় শ্রমিক পেতে না পারে তাঁর জন্য ঔপনিবেশিক শাসকরা ভিন্ন ভিন্ন উপায় সন্ধান করেছিলেন।[53] বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার খনি কর্মক্ষেত্রে আদিবাসী শ্রমিকদের বেকারত্ব বৃদ্ধি পায় দেশীয় পুঁজিপতিদের উপর শ্রমিকদের আস্থা নষ্ট করে দেওয়ার মধ্য দিয়ে।

---

51. Meena. Hareet Kumar, *Railway and famines in British India,* Silpakorn University journal of Social science, Humanities and Arts Vol. 16, 2016, P. 1-18.

52. Pillai. P. P., *Economic Condition of India,* London, Cambridge University Press, 1935, P. 1-20.

53. *Report on the Coal mine Labour organization Magazin,* Ranganj, West Bengal, 1928, P. 13-24.

ভারতের সর্বাধিক শিল্পোন্নত রাজ্যে কর্মহীনতা বৃদ্ধি পেয়েছিল। এই কারণ সম্পর্কে নিস্তারন চক্রবর্তী মনে করেন, কর্মহীনতা হ্রাস করার জন্য শ্রমিক পরিবারগুলির আকার নিয়ন্ত্রণ এবং অভিবাসন ঘটেছিল। এটা বলা যায় যে, বহির্গমন সম্পর্কে আদিবাসী নাগরিকের পক্ষে উপেক্ষা করার অর্থ হল বিপদের ঝুঁকি নেওয়া। যেসকল রাজ্যে জনসংখ্যার চাপ অধিক ছিল সে সকল রাজ্যেই সাহায্যপ্রাপ্ত বহির্গমন অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ নীতি হিসাবে গৃহীত হয়েছিল। দুর্ভাগ্যবশত, বড় বড় শিল্পের অধিকাংশ কর্মীরাও এসেছিল ভারতের অন্য রাজ্য থেকে। ছোটনাগপুর মালভূমির অন্তর্গত রাজ্যগুলির কর্মহীনতা এত বেশি ছিল যে কর্মহীন শ্রমিকরা হতাশার বশবর্তী হয়ে যে- কোন কাজের জন্য প্রত্যাশী হয়ে পড়েছিল। এই সকল শিল্পাঞ্চলে শ্রমিকদের জন্য নির্মিত ব্যবস্থা সমূহে জীবনযাত্রার অবস্থা ও সামাজিক পরিস্থিতি বিঘ্নিত হয়েছিল তাতে দারিদ্র্য পরিস্থিতি লক্ষ করা গিয়েছিল।[54]

ভারতবর্ষের সর্বাধিক খনি শিল্পোন্নত রাজ্য বাংলা, বিহার, উড়িষ্যায় অধিক কর্মহীনতা ছিল তাঁর কারণ সম্পর্কে নিস্তারন চক্রবর্তী কিছু কারণ উল্লেখ করেছেন। বড় বড় শিল্পোগুলি বেসরকারি উদ্যোগে বাহিত হওয়ার ফলে বিহার, পশ্চিমবঙ্গের খনি শিল্পাঞ্চলগুলিতে কর্মসংস্থান অন্য রাজ্যগুলির হস্তান্তরিত হয়। সেই শিল্পায়নের ক্ষেত্রগুলিতে স্থানীয় অধিবাসীদের অংশগ্রহণ অধিক পরিমানে বৃদ্ধি পেতে থাকে কারণ খনির ভারবাহী কাজে যুক্ত হওয়া প্রথমদিকে বাঙালি শ্রমিকদের পছন্দ ছিল না। শ্রমিক হিসাবে হিন্দু বাঙালি ও আদিবাসী শ্রমিকদের কাজ করার মধ্যে পার্থক্য দেখা যায়। যেখানে আদিবাসীদের কাছে খনি ক্ষেত্র অন্ন সংস্থানের একমাত্র উপায় ছিল সেখানে অ-আদিবাসী শ্রমিকদের জন্য অন্য কর্মক্ষেত্র বিশেষভাবে অগ্রগণ্য ছিল। স্বভাবতই আদিবাসীরা খনি ক্ষেত্রে অবাধ শ্রমদানে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিল। অন্যান্য কাজের ক্ষেত্রে বাঙালি, বিহারি ছাড়াও অন্যান্য জাতির অগ্রাধিকার ছিল অধিক। খনি ক্ষেত্রে আদিবাসী ভিন্ন অন্যান্য যে গোষ্ঠী এই কাজে যুক্ত ছিল তাঁদের যোগদান পরিমানে কম ছিল। কাজের ক্ষেত্রগুলি ফাকা থাকলে পরিপূর্ণ করতে বাইরের রাজ্য থেকে আদিবাসী শ্রমিক নিয়ে আসার ব্যবস্থা করা হয় এবং স্থানীয় আদিবাসীদের মধ্যে বেকারত্ব সৃষ্টি হয়। কাজের ক্ষেত্রে সুযোগ ধীরে ধীরে হ্রাস পেতে থাকে এবং বেকার হওয়ার প্রবনতা লক্ষ করা যায়। **১৯২১** সালে ইব্রা রহিমতুলার

54. *Report of the Labour Enquiry Commission Bengal 1930-1940*, West Bengal Labour Department, 1946. Pp. 23-34.

সভাপতিত্বে ভারতীয় ফিস্ক্যাল কমিশনের মতামতে দেশের মধ্যে জনসংখ্যার আকার এবং শ্রমিকদের প্রতি ব্যবহার সামঞ্জস্য পূর্ণ না থাকার কথা উঠে এসেছিল। এই কমিশন বিশ্বাস করত যে, খনি শিল্পের উন্নয়ন হলে নতুন উৎস তৈরি হবে যেখানে পুঁজি সঞ্চিত হবে, শ্রমের জন্য লাভজনক কর্ম সংস্থানের প্রসার ঘটবে এবং জাতীয় জীবন ও চরিত্রকে উদ্দীপ্ত করবে। এই পরিস্থিতিতে অবৈধ শ্রমের প্রবেশ লক্ষ করা গিয়েছিল যেমন ১৯২২-২৩ এর প্রথমদিকে যথাক্রমে উড়িষ্যার গ্যাংপুর এবং ময়ূরভঞ্জে কর্মরত কোল এবং লোধাদের দলের কথা উল্লেখিত রয়েছে। সাধারনভাবে আদিবাসীদের একটি বড় দল খনি ক্ষেত্রের কাজের সাথে যুক্ত ছিল। এই স্থানগুলিতে তারা বীনা মজুরিতে কাজ করেছিল।[55] পরিযায়ী শ্রমিকরা দ্বিগুণ শোষিত হত কারণ তাকে গ্রামের পরিবেশ, সম্পত্তি থেকে উচ্ছেদ করে খনিজ খনি অঞ্চলের কাছাকাছি আসতে বাধ্য করেছিল।[56]

আদিবাসীদের জমি হস্তান্তরকরণ

উনবিংশ শতাব্দীর গোঁড়ার দিক থেকে, খনি কারখানাগুলি ক্রমবর্ধমান ভাবে ব্রিটিশ শক্তির মুনফা জনিত ব্যবসার একটি অন্তরঙ্গ অংশ হয়ে উঠেছিল। ১৮১৪ সালের দিকে বাংলা, বিহারে কয়লার চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে খনির অর্থনৈতিক অগ্রগতি হয়েছিল। বিদ্যমান সামাজিক বৈষম্যের প্রতিফলন থেকে খনিক্ষেত্রে শ্রম বাজারের সৃষ্টি হয়েছিল ক্রমবর্ধমান উত্তেজনা সৃষ্টির মধ্য দিয়েই। খনি গঠনের জন্য প্রয়োজন ছিল খনিজ সমৃদ্ধ জমি অঞ্চলের। সেই জমিগুলি একপ্রকার আদিবাসী জনজাতিদের জমির অধিকাংশ ক্ষেত্র নিয়ে গড়ে উঠেছিল। অ-আদিবাসীরা, আদিবাসীদের কাছে জমি লিজ নেওয়া থেকে বিরত থাকবে এমনটাই নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল।[57] স্থায়ীভাবে বন্দোবস্ত করার কথা উল্লেখিত চুক্তিতে বিহার ও উড়িষ্যা অঞ্চলের কথা আলোচনা করা হয়েছিল। ১৮৫৮ সালে, এই বিবৃতি থেকে বিশ্বাস করা যায় যে,

---

55. Behal, Rana P (Ed), and Marcel VanDer Linden, *India's Labouring Poor Historical Studies c. 1600-c.2000,* Delhi, Cambridge University Press India Pvt. Ltd, First Published 2007, Pp. 85-90.
56. Roy Chouwdhury. Rakhi, *Gender and Labour in India (The Kamins of Eastern Coalmines 1900-1940),* Delhi, Minerva Associates Publications PVT. LTD, First Published 1996, P. 133.
57. *Report of The Bihar and Orissa Waste Lands Manual (1918)*, Published Authority of the Board of Revenue (Bihar and Orissa), 1918, p 45-65.

কোম্পানি জমি বিক্রি করছে এবং তার আসল অবস্থান লাভের তালিকার চেয়ে ২০০গুন বেশি অনুকূলে ছিল এবং ৫ বছরের জন্য লিজ নেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছিল।[58] এই পাঁচ বছরের খনি লিজে নেওয়ার লোভে স্থানীয় ব্যবসায়ীরা, আদিবাসী ব্যক্তিদের শারীরিক দুর্বলতার সুযোগে বেআইনি ভাবে কাগজে হাতের আঙ্গুলের ছাপ নিয়ে জমির অধিকার জোরপূর্বক ছিনিয়ে নেওয়া হত। ঠিক একইভাবে দরিদ্র্য আদিবাসী কৃষকদের থেকে একের পর এক জমি হস্তান্তরিত হয়েছিল। যদিও দরিদ্র্য কৃষকদের থেকে খনি শিল্প সংস্থাগুলিতে জমি হস্তান্তরের অনুমতি দেওয়ার ক্ষেত্রে রাজ্যে এই ধরনের জটিলতা লক্ষ্য করা যায়। খনির নেতৃত্বাধীন বৃদ্ধিতে সহায়তা করার জন্য তারা জমির দালাল হিসাবে কাজ করেছিল। এই অঞ্চলের আদিবাসীরা ভূমি, খনি, কৃষিজ ক্ষেত্রে অধিকার নিয়ে প্রতিবাদে যোগদান করেছিল। জমি যে শুধু শিল্পের কাজে ব্যয় হয়েছিল এমন নয় বরং শরণার্থীদের থাকার উদ্দেশ্যে অনেক কৃষি ও দলীয় উপনিবেশ স্থাপন ও জমি অধিগ্রহণের জন্য জরিপ করা হয়েছিল। খনির জন্য আদিবাসীদের ভূমি অধিগ্রহণ ও আদিবাসীদের অপদস্ত করার জন্য রাষ্ট্রীয় এবং বেসরকারি সংস্থা দ্বারা নিয়োজিত আনুষ্ঠানিক কৌশলগুলি প্রকাশ করা হয়েছিল। একের পর এক যখন খনিজ পদার্থের উত্তোলনের জন্য জমি দখল শুরু হয় তখন ঔপনিবেশিক সরকার বর্জ্য জমি বিক্রয় ও দখলের জন্য কিছু নিয়ম তৈরি করেছিলেন নিজেদের স্বার্থে। প্রথমত ১৮৭৪ সালের ২২ সে ফেব্রুয়ারিতে বাংলায়, সরকার কর্তৃক প্রবর্তিত বর্জ্য জমি বিক্রয় এক বিধি দ্বারা বাতিল করা হয়েছিল। জেলার নানা স্থানে স্থানীয় প্রশাসনের পৃথক আদেশ দ্বারা রাজস্ব বোর্ড গঠিত হয়েছিল। বর্জ্য জমিগুলিকে স্থানীয় এলাকায় ইজারা দেওয়ার নিয়মে বিধিবদ্ধ করা হয়।[59] বলা হয়েছিল ভারত সরকার তাঁর অপরিচিতদের কাছে জমি লিজ নেওয়া থেকে বিরত থাকবে স্থানীয় বা ইউরোপীয়রা।[60] স্বতন্ত্র বিচারবিভাগের অনুপস্থিতিতে ঔপনিবেশিক শক্তির পাশাপাশি

---

58. *Friends of India,* (Weekly), 19th May, 1859, P. 462.

59. বিস্তৃত ভাবে বলতে গেলে, ইউরোপীয় বা আদিবাসীদের এই প্রকৃতির ইজারা প্রদান করা ভারত সরকারের বর্তমান নীতি ছিল না। যেখানে মধ্যস্বত্বভোগীরা ইতিমধ্যে বিদ্যমান এবং নির্দেশমূলক অধিকার অর্জন করেছিল। তাদের অবশ্যই সম্মান করা উচিত এবং বজায় রাখা উচিত, এবং যেখানে এই অধিকার আছে বংগত ভাবে তাদের ধারকদের দখলে থাকা স্থানীয় জ্ঞান এবং প্রভাব সাধারণত অনেকাংশে এড়িয়ে যাবে। কিন্তু যেখানে এই ধরনের মধ্যস্বত্বভোগী এবং এই ধরনের কোন অধিকার নেই, যেখানে মাটিতে একমাত্র অধিকার রায়ত এবং রাষ্ট্রের, সেখানে মধ্যবর্তী আধিকারিকদের একটি নতুন শ্রেণি তৈরি করা অনুচিত।

60. *Report of The Bihar and Orissa Waste Lands Manual (1918)*, Published under the Authority of the Board of Revenue Bihar and Orissa, 1918, Pp. 11-23.

রাষ্ট্রের প্রত্যাশিত নজর ছিল খনিজের উপর তাই বর্জ্য জমির ইজারা স্বতন্ত্রভাবে খনিজ সমৃদ্ধ রাজ্যে নেওয়া হত।

খনির ইজারাগুলির জন্য লাইসেন্সের সম্ভাবনার জন্য স্থানীয় সরকার কর্তৃক প্রবর্তিত জমি বিক্রয় বিধি দ্বারা কিছু জমি বাতিল করা হয়েছিল এবং এইগুলি তাঁদের পালাক্রমে, ১৮৭৬ সালে ভারত সরকার প্রত্যাহার করেছিল। ১৮৯৭ সালে ভারত সরকার, বাসস্থান, কারখানা, বাগান, ইত্যাদির জন্য প্রয়োজনীয় জমির রাজস্ব মূল্যায়ন করে ব্যক্তিগত জমি অনুমোদনের জন্য স্থানীয় সরকার কর্তৃক লাইসেন্সের অনুমতি নেওয়া হত। যদিও এই আইনগুলি পরবর্তীকালে প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়েছিল। ১৯০১ সালে পুনরায় ভারতীয় খনি আইন দ্বারা নির্ধারিত নিয়মগুলি পালন করার কথা বলা হয়েছিল। খনির জন্য অধিকৃত জমিগুলি ১৯০৮ সালে ছোটনাগপুর টেন্যান্সি অ্যাক্ট দ্বারা অযোগ্য করে তোলা হয়েছিল। ১৯১৭ তারিখে ২০ সে মার্চ থেকে খনিজ পদার্থ থেকে শুধুমাত্রও রয়্যালটি ধার্য করার অনুমোদন দেওয়া হয়েছিল। উড়িষ্যার সম্বলপুর জেলায় গভর্নর বর্জ্য জমি দখল কেন্দ্রীয় প্রদেশ বিধি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করেছিলেন। জেলার নানা স্থানে প্রশাসনের অনুমতির সাথে স্থানীয় রাজস্ব বোর্ড গঠিত হয়েছিল। স্থানীয় এলাকার বর্জ্য জমিতে ইজারা দেওয়ার নিয়ম চালু হয়। এমতাবস্থায় আদিবাসীদের বিরোধিতা করা ভিন্ন কোনো উপায় ছিল না।

বর্জ্য জমির সীমানা নির্ধারণে, অ- আদিবাসীরা আদিবাসীদের কাছে জমি লিজ নেওয়া থেকে বিরত থাকবে এমনটাই নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল।[61] স্থায়ীভাবে বন্দোবস্ত করার কথা উল্লেখিত চুক্তিতে বিহার ও উড়িষ্যা অঞ্চলের কথা আলোচনা করা হয়েছে। খনিজ শিল্পের খনি মালিকানার অধিকার রয়েছে যারা বর্জ্য জমির অনুদান দেওয়া হবে বলে নির্ধারিত করা হয়েছিল। যাইহোক বর্জ্য জমির ইজারা স্বতন্ত্রভাবে খনিজ সমৃদ্ধ রাজ্যে নেওয়া হত। বর্জ্য জমি থেকে বালি, বড় পাথর নির্গত হলে সেই জমি সরকারের অধিগ্রহণে থাকত এবং তা থেকে যথেষ্ট পরিমাণ ইজারা বা কর সংগ্রহ করা হত। এই নিয়মগুলি উড়িষ্যা রাজ্যের সম্বলপুর এলাকার জন্য প্রযোজ্য ছিল না। খনি শিল্পের ইজারাগুলির পাশাপাশি সরকারী নথীর সম্ভাবনার জন্য স্থানীয় সরকার কর্তৃক লাইসেন্স প্রদানের অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। খনির প্রস্পেক্টিং লাইসেন্সের জন্য বিশেষ কিছু নিয়ম ছিল। বিশেষত অভ্রের খনির জন্য এই নিয়মগুলি বাতিল

61. *Report of The Bihar and Orissa Waste Lands Manual (1918)*, Published under the Authority of the Board of Revenue Bihar and Orissa, 1918, Pp. 62-65.

করা হয়েছিল। অভ্র খনির বিশেষ প্রয়োজনীয়তার জন্য এই ব্যবস্থাগুলি পুনরায় ধার্য করা হয়েছিল। খনির ইজারা ফেরত নেওয়ার ক্ষেত্রেও বেশ কিছু নিয়ম ছিল। প্রতি বছর ৩১ সে ডিসেম্বর তা অনুমোদন করার নিয়ম ছিল। খনিজ শিল্পের উপর রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠলে ১৯২০ সালের প্রথমদিকে কয়লা খনির রাষ্ট্রীয়করণের প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেওয়া শুরু হয়। এ প্রসঙ্গে একটা কথা বলা প্রয়োজনীয় যে, কয়লা ছাড়া অন্যান্য খনিজ দেশীয় কোম্পানিগুলি রাষ্ট্রীয় সাহায্যের জন্য আবেদন করতে থাকে। কয়লা খনিকে রাষ্ট্রীয়করণ করার কথা ভাবা হচ্ছে সেখানে বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার অন্যান্য খনি শিল্পে রাষ্ট্রীয় সাহায্যের প্রয়োজন অনুভূত হয়েছিল মুনফা কেন্দ্রিক অধিক অর্থনীতি লাভের জন্য।[62] রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের নাম করে এক সময় স্থানীয় পুঁজিপতিদের থেকে খনিজ শিল্পের জন্য জমি ক্রয় আদিবাসীদের থেকে বন্ধ করে দেওয়া হলেও, জমির উপর একচেটিয়া ভাবে নিয়ন্ত্রন করতে থাকে রাষ্ট্র নামক শোষণ যন্ত্র। এই একই সময়ে রাষ্ট্র ১৯২৩ সালে বিহার ও উড়িষ্যার খনি শিল্প আইন পাশ করলে তাতে বলা হয়েছিল—

১) জয়েন্ট স্টক কোম্পানিকে কোনো রাষ্ট্রীয় সাহায্য দেওয়া হবে না যদি না পরিচালনা পরিষদের সদস্য সংখ্যা অধিক পরিমানে ভারতীয় না হয়। (জয়েন্ট স্টক কোম্পানিতে ভারতীয় সদস্যের সংখ্যা কম থাকা স্বত্বেও আর্থিক সাহায্য রাষ্ট্রের তরফ থেকে দেওয়া হয়েছিল)।

২) খনি শিল্পাঞ্চলে কোনো বিপত্তি হলে শিল্প বোর্ডের সামনে তা উপস্থাপন করতে হবে এবং তাঁর জন্য শিল্প বোর্ডের পক্ষ থেকে সাহায্য করা হবে।

৩) রাষ্ট্রীয় সাহায্যের প্রতিটি স্থানীয় প্রাপককে অনুমোদন দেওয়ার কথাও বলা হয়েছিল।[63] দুর্ভাগ্যবশত, পর্যালোচনাধীন সময়কালে ঔপনিবেশিক সরকারের পাশপাশি ভারতীয় শিল্প পুঁজিপতিদের আর্থিক উন্নয়ন হলেও আদিবাসীদের আর্থিক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হতে হয়েছিল।

---

62. Naoroji. Dadabhai, *Poverty and Un- British Rule in India,* London, Publication Division, Ministry of Information and Broadcasting Government of India, First Published in 1901, Pp. 100-110.

63. *Department of Industries Bihar and Orissa state aid to Industry Rules, Government of India,* 1928, P.27

খনি শ্রমিকদের নিরাপত্তাহীনতা

খনিজ শিল্পের দ্রুত বিকাশের পথে খনি শ্রমিকদের কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা হীনতা লক্ষ করা যায়।[64] মুনফার লক্ষ্যে এবং কর্তৃপক্ষের অপরিণামদর্শিতার শিকার হয়ে আদিবাসী শ্রমিকদের জীবন অবহেলিত হয়ে পড়েছিল। খনি অঞ্চলের শ্রমিকদের নিরাপত্তাহীনতা লক্ষ করা যায় খনি ধসের ফলে, গভীর খনিতে কাজ করতে গিয়ে মৃত্যুর আশঙ্কা, খনি ও খাদান অঞ্চলে অগ্নি সংযোগ ও যন্ত্রপাতি অসচেতন ভাবে ব্যবহারের ফলে। দীর্ঘদিন ধরে খনিতে ধস, অগ্নি সংযোগের ইত্যাদির কারণে শ্রমিকদের ভয়াবহ বিপদে জীবন কাটানোর প্রকৃষ্ট উদাহরণ পাওয়া যায়। রাণীগঞ্জ কয়লা খনি অঞ্চলের ১২ নং বস্তির বাসিন্দা ছিল ১৯ বছরের হেনা পারভিন। খনি ধসের ফলে তিনফুট ব্যাসের মধ্যে হেনা পারভিনের তলিয়ে যাওয়ার ঘটনা জানা যায়। সেই খনির গর্ত থেকে আগুন আর প্রচন্ড ধোয়া নির্গমনের তথ্য উল্লেখিত ছিল। বস্তিগুলির তলে খনির সাথে সুড়ঙ্গ রয়েছে তা থেকে প্রায়ই ধস তৈরির আশঙ্কা তৈরি হত।[65] এইরকম অসংখ্য ঘটনার শিকার ছিল খনির আদিবাসী শ্রমিকরা। খনিতে ধসের ফলে খনি অঞ্চলের সংলগ্ন বস্তিতে প্রায় সব ঘরগুলিতেই ও রাস্তায় ফাটল তৈরি হত। অনুসন্ধানের ফলে জানা গেছে প্রায় ১৪৬ টি খনি সংলগ্ন এলাকা ধস প্রবন হয়েছিল। বিগত শতাধিক বছরে কয়লা খনি অঞ্চলগুলিতে দুর্ঘটনায় মৃত্যু, মাটিতে ফাটল, ঘর বাড়ি ভাঙ্গা, মানুষের তলিয়ে যাওয়ার ঘটনার চিত্র উঠে এসেছিল। এই ঘটনার বিরুদ্ধে বিভিন্ন বিজ্ঞানী, শ্রমিক সংগঠন, সামাজিক ও পরিবেশ সংগঠন সরকারী দপ্তরের অফিসারদের একাংশ এই বিপদসংকুল অঞ্চলের মানুষের জন্য আন্দোলন সংগঠিত করার তথ্য জানা যায়।[66] ১৯২২ সালে ভারতের মাইনিং মেটারলজিক্যাল অ্যান্ড জিওলজিক্যাল ইন্সটিউটে ধস মোকাবিলার জন্য প্রথম সাবসিডেন্স কমিটি গঠিত হলেও এই কমিটি খনি শ্রমিকদের জন্য বিশেষ কিছুই করেনি। নানা কমিটি, সুপারিশ প্রদান হলেও এই বিপদ থেকে উদ্ধারের কাজের কোনো সুরাহা হয়নি। খনিতে শ্রমিকদের মৃত্যু নিয়ে তারা সচেতন হওয়ার প্রয়োজন মনে করেননি। মুনফা ও অতিমুনফার

64. Coyajee, Kt. J.C, *Current Economic Problems of India,* Bengal, C. R. Battersby Bengal Government Press, 1933, p. 68.

65. *Derived from the Monthly coal Bulletin (s),* compiled by the Director General of Mines Safety in the Ministry of Labour, New Delhi, January- December 1955, section IV, Pp. 20- 23.

66. তদেব। পৃ. ২৫-২৭

লক্ষ্যে দীর্ঘকালব্যাপী অবৈজ্ঞানিক খননকাজ, উচুস্তর থেকে নিচুতলা পর্যন্ত দুর্নীতি ও সামাজিক দায়বদ্ধতার অভাবের ফলেই এই রকমের ঘটনার শিকার হতে হত খনি শ্রমিকদের। ১৭৭৪ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এবং তাঁর দেশীয় এজেন্ট প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের কার অ্যান্ড টেগোর কোম্পানিতেও কয়লা উত্তোলন কোনো বৈজ্ঞানিক নিয়ম ছাড়াই শুরু করা হয়েছিল।[67] অন্যদিকে বোর্ড অ্যান্ড পিলার পদ্ধতির মধ্যে ব্লাস্টিং পদ্ধতিতে খনন করার ফলে খনি শ্রমিকদের নিরাপত্তাহীনতা লক্ষ করা গিয়েছিল। খনিগুলির ফাটলগুলি বন্ধ করা ও খনির উপরের অঞ্চলের স্থিতিশীলতা বজায় রাখার কথা খনি মালিকেরা প্রয়োজন মনে করেননি।

ব্রিটিশ রয়্যাল শ্রম কমিশনের রিপোর্ট থেকে অদক্ষ শ্রমের একটি রিপোর্ট দ্বারা জানা যায় শ্রমিকদের অদক্ষতার ফলেই খনি ক্ষেত্রে নিরাপত্তা হীনতা লক্ষ করা যায়।[68] শ্রমিকদের কাজের জন্য নির্দিষ্ট দক্ষতা দরকার ছিল তা তারা স্বীকার করেন কিন্তু অন্যদিকে অসংগঠিত শ্রমিকদের দক্ষতা বৃদ্ধি করতে কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি।[69] বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার খনি কর্মক্ষেত্রে আদিবাসী শ্রমিকদের পরিস্থিতি উৎসাহজনক ছিল না। উপরন্তু, দেশীয় শিল্পগত কলাকৌশল, বাণিজ্য সংগঠনের প্রশাসনিক বিদ্যা ও উন্নত প্রশিক্ষণের সুযোগ তাদের কাছে এসে পৌছায়নি। ১৯০৯ সালে চিফ ইন্সপেক্টরের কথায় রাণীগঞ্জ এলাকার বুরা ধেমো খনিতে একটা খাদ দুর্ঘটনার শিকার ছিল কানু মাঝি। সেই ঘটনার জেরে অন্যান্য আদিবাসী শ্রমিকদের কাজ থেকে বরখাস্ত করা হয়েছিল। এই ঘটনার কারণ হিসাবে ১৯১২ সালে বাংলার খনি বন্দোবস্ত আইনে স্বাস্থ্য বিষয়ক কমিটি বা বেসরকারি করণকে দায়ী করা যায়।[70] যদিও এই কমিটির সদস্য নির্বাচিত করা হত খনি মালিকদের দ্বারা।[71] এই সমস্ত সমস্যা একাধিকবার

---

67. Kripalani. Krishna, *Dwarkanath Tagore A forgotten Pioneer: A life,* New Delhi, National Book trust India, 1902 Saka, p. 69-76.

68. *Royal Commission report on Labour in India,* London: Majesty's Stationery office, June, 1931, P. 114.

69. *সমীক্ষণ,* বিজ্ঞান মনস্ক মুখপত্র, তৃতীয় বর্ষ সংখ্যা ৪- নভেম্বর ২০১৩ পৃ. ১৮-২৬।

70. *The West Bengal Mining settlements (Health and Welfare bill, 1964),* Government of India, 30th July 1964, 2-14.

71. Clow. A. G, *Indian Factory Legislation- a Historical Survey,* Calcutta, Being Bulletin of Indian Industries and labour, No-37, 1926, P. 8.

তৈরি হলেও খনি শ্রমিকদের জন্য বিকল্প বাসস্থানের কথা চিন্তা করা হয়নি। পুঁজিপতিদের খনি অঞ্চলে আদিবাসী শ্রমিকদের অবস্থান থেকে জানা যায় খনিজ শিল্প প্রতিস্থাপনের মত কঠিন ও বিপজ্জনক কাজের জন্য অনভিজ্ঞ আদিবাসী শ্রমিকদের নিযুক্ত করা হয়েছিল। এই সময়ে পাল্লা দিয়ে বৃদ্ধি পেয়েছিল খনিজ শিল্পের মত অসংগঠিত কর্মসংস্থান।

আদিবাসী শ্রমিক জনস্বাস্থ্যের অবনতি

স্বনির্ভর কৃষি অর্থনীতির সাথে আদিবাসীদের যে স্বাস্থ্যকর সম্পর্ক ছিল তা বিছিন্ন হতে থাকলে খনি শিল্পের মত বিকাশমান শিল্পের সাথে পাল্লা দিয়ে ছোটনাগপুরের আদিবাসী শ্রমিকদের স্বাস্থ্যের অবনতি লক্ষ করা যায়। ব্রিটিশ শাসনের অধীনে সাধারণ জনসাধারণের অবক্ষয়ের বাস্তবতা বিরুপ আকারে ধারন করেছিল। এক্ষেত্রে খনির মজুরেরা সম্মুখীন হয়েছিল দ্বিমুখী মৃত্যুর, একদিকে ছিল খনি ও খাদানে নিরাপত্তাহীনতা আর অন্যদিকে ছিল খনিতে কাজ করার ফলে স্বাস্থ্যের অবনতি। খনি ক্ষেত্রে খনিজ পদার্থ উত্তোলনের ফলে টিউবগুলিতে এবং মাটির নিচের গ্যালেরিতে কয়লার ধুলো থেকে ক্ষতিকারক পদার্থ তৈরি হত। সেই কয়লা খনির ধুলো বিস্ফোরণের মেঘ তৈরি হয়ে শ্রমিকদের স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটত। ১৮০৩ সালে এবং ১৮৪৪ সালে হাসয়েল কোলিয়ারিতে বিস্ফোরণের প্রতিবেদনে এটি উল্লেখ করা হয়েছিল যে, সূক্ষ্ম কয়লার ধুলো স্পষ্টতই বিস্ফোরণের প্রচারে ভূমিকা পালন করত। ১৯০৮ সালে গ্রেট ব্রিটেনের মাইনিং অ্যাসোসিয়েশন দ্বারা নিযুক্ত একটি কমিটির নির্দেশনায় বৃহৎ পরিসরে পরীক্ষা নিরীক্ষার একটি বিস্তৃত অধ্যায় লক্ষ করা যায়। ১৯০১, ১৯০৬ ও ১৯০৭ সালে ইংল্যান্ডের কয়লা খনিতে বিস্ফোরনে শ্রমিকদের স্বাস্থ্যের অবনতি লক্ষ করা গেছে। ১৯০৭ সালে বাংলা ও বিহারের আটটির বেশি কয়লা খনিতে ৮৩০ জনের মৃত্যু হয়েছিল। ১৯১১ সালে ঝড়িয়ার কেন্দয়াদিহ, ১৯১৩ সালের রাণীগঞ্জের চৌরাসি কয়লাখনিতে বিস্ফোরন হওয়ার ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায়। ভারতীয় খনিগুলির অবস্থা ব্রিটিশ খনিগুলির থেকেও নিম্ন মানের ছিল।[72] প্রায় সার্বজনীন ভাবে খনি ক্ষেত্রে প্রচলিত কাজ করার পদ্ধতি হল ১০ ফুট থেকে ১৮ ফুট চওড়া। খনিগুলিতে কয়লা ধূলিকনার পদ্ধতিগত অপসারণ একটি মৌলিক সতর্কতা ছিল যা প্রতিটি খনিতে নেওয়া উচিত ছিল যদিও তা বাস্তবায়িত হয়নি। অনেক সময় মাটি শুষ্ক করার কাজে কয়লার ধূলিকণা ব্যবহার করা হত। বিহার, বাংলা, উড়িষ্যার খনি গুলিতে বারুদের পরিমাণ ও রপ্তানি বৃদ্ধি

72 King. Blair, *Partner in Empire,* Calcutta, Firma KLM Private Limited, 1981, Pp. 100-104.

পেয়েছিল। ১৯১৮ সালের থেকে ১৯২২ সালে খনিগুলিতে দ্বিগুণ বারুদ ব্যবহার হয়েছিল।[73] বিস্ফোরণের সাথে শর্ট ফায়ারিং এর ও সম্ভাবনা ছিল যেমন অনেক বেশি ঠিক তেমনি শ্রমিকদের মৃত্যুভয় ও ছিল। রাণীগঞ্জ, ঝড়িয়া কয়লাক্ষেত্রে ৩৫টির ও অধিক ভেন্টিলেশন সরবরাহ করা হলেও বায়ু চলা চলের জন্য কৃত্তিম ব্যবস্থা চালু করা উচিত ছিল। আমেরিকান কনফারেন্স অফ গভমেন্টাল ইন্ডাস্ট্রিয়াল হাইজিনিস্টদের একটি তথ্য দ্বারা জানা যায় যে, অভ্র খনির সাথে জড়িত শ্রমিকরা দীর্ঘদিন খনিতে কাজ করার ফলে ক্যান্সার ও শ্বাস জনিত সমস্যার উদ্রেক হয়েছিল।[74] এছাড়াও খনির ধুলো থেকে শ্রমিকদের কিডনির সমস্যা অধিক পরিমাণে দেখা দিয়েছিল।[75] বিস্ফোরক কয়লা ধূলিকণা প্রদর্শিত হওয়ার পাশাপাশি, পানীয় জলের দূষণ, শ্রমিকদের শারীরিক অবস্থাকে অবনত করে তুলেছিল[76] এই চিত্র গ্রেট ব্রিটেন এবং আমেরিকার পাশাপাশি ভারতের খনির জল পরীক্ষা করে লক্ষ করা গিয়েছিল। উপরিক্ত তথ্য ছাড়াও বিহার ও উড়িষ্যা রাজ্যের বিভিন্ন সরকারী রিপোর্ট থেকে তৎকালীন সময়ে শ্রমিক স্বাস্থ্য সংস্কারের কথা উল্লেখিত হয়েছিল।[77] (অস্পৃশ্যতা স্যানিটেশন সমস্যার সাথে গভীরভাবে জড়িত ছিল)। দীর্ঘদিন খনি ক্ষেত্রে কাজ করার ফলে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে তাদের বিভিন্ন অসুখের সম্মুখীন হতে হত।[78] খনি শ্রমিকরা অসুস্থ হলে ডাক্তারের কাছে সুস্থতার জ্বাল সার্টিফিকেট তৈরি করিয়ে কাজে যোগ দিতে হত। এই কাজে বাধ্য করত খনি অঞ্চলে মাফিয়া বা দালাল শ্রেণি। শোষণমূলক পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় আদিবাসী শ্রমিকদের সম্পর্কে মালিকদের সচেতনতা ছিল খামখেয়ালি তা লক্ষ করা যায়। এই প্রতিবন্ধকতা দৈনন্দিন জীবনে আদিবাসী শ্রমিকের

---

73. Clow. A. G, *Indian Factory Legislation- a Historical Survey,* Calcutta, Being Bulletin of Indian Industries and labour, No-37, 1926, Pp. 10-11.

74. Das. Anesha, Aarushi Goel, *An assessment of illegal Mica Mining in Jharkhand,* International Journal of Law Management and Humanities, vol-4 Issue-6, 1344, 2021.

75. *A preliminary work on Assessment of Dust hazard in Indian mines,* Dhanbad, Central mining research station, Nov 1931, P. 2-10.

76. Clow. A. G, *Indian Factory Legislation- a Historical Survey,* Calcutta, Being Bulletin of Indian Industries and labour, No-37, 1926, P. 15.

77. Hirtzel. A, *East India (Progress and Condition) MORAL AND MATERIAL PROGRESS AND CONDITION OF INDIA,* 1921, Deputy under Secretary of State for India, Pp. 214-215.

78. *Royal Commission report on Labour in India,* London: Majesty's Stationery office, June, 1931, P. 115.

কর্মক্ষেত্রে বাঁধা প্রসারিত করেছিল, যাতে একজন শ্রমিক শ্রেণির হতাশাগ্রস্থ জীবন ক্রমাগতভাবে আরো হতাশাগ্রস্থ হয়ে পড়ে। ঔপনিবেশিক সরকার স্বাস্থ্য, শিক্ষা প্রভৃতি বিষয়ে পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করলেও বৃহৎ খনিজ শিল্পায়নে যুক্ত শ্রমিকদের স্বাস্থ্য সম্পর্কে গুরুত্ব দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা মনে করেননি। প্রকৃত মজুরির তথ্য ইঙ্গিত করে যে ১৮৮০ সালের মধ্যে, ঔপনিবেশিক ভারতে জীবনযাত্রার মান হ্রাস পেয়েছিল। ঔপনিবেশিক অধ্যুষিত বাগিচা, খনি, কারখানা বা রেলওয়ে শিল্পে যেসব আদিবাসী কুলি মজুর বা অন্যান্য অদক্ষ শ্রমিকেরা কাজ করত, তাদের বেতন ছিল দিনে মাত্র এক আনা বা বড়জোর দু আনা দিয়ে প্র্যাতাহিক জীবন নির্বাহ ছিল অসম্ভব।[79] দীর্ঘদিনের এই নির্যাতনের ফলে ব্রিটিশ ভারতে আদিবাসী মানুষ কথিত 'মৃতপ্রায় শ্রমজীবী জনতায়' পরিণত হয়েছিল।

ব্রিটিশ ভারতের কয়লা খনিতে বিস্ফোরকের ব্যবহার তালিকা

ব্রিটিশ ভারতের কয়লা খনিতে বিস্ফোরকের ব্যবহার (টন হিসাবে)[80]					
	১৯১৮	**১৯১৯**	**১৯২০**	**১৯২১**	**১৯২২**
গান পাউডার	৪,০৪,২৮৯	৪,২৪,০২২	৫,১৭,৫০৫	৭,৮৬,৬৮৯	১,২৬৭,৩৭৭
বিস্ফোরণ	১,৫৪, ১৯২	২,২৮, ১৯২	২,০৭,৬০৪	২,৪৬,৭০১	২,৬১,০০৯

আয়ালেন যুক্তি দিয়েছেন যে, ঔপনিবেশিকতা পূর্ব ভারতীয়দের জীবনযাত্রার মান "পশ্চিম ইউরোপের উন্নয়নশীল অংশগুলির সমতুল্য হতে পারে"।[81] জাতীয়তাবাদী নেতারা আদিবাসী জনস্বাস্থ্যের অবনতির কারণের জন্য কোনো ভাবেই প্রাকৃতিক দুর্ভিক্ষকে দায়ী করেননি বরং মানুষের তৈরি পরিস্থিতিকে দায়ী করেছেন। তারা ব্রিটিশ অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের প্রকৃতিকে নিয়ে নানা ধরনের প্রশ্ন তুলেছিলেন। আসলে এ দেশের রাজ্যগুলিতে দারিদ্র্য পরিস্থিতি

---

79. তদেব। পৃ. ১২১

80. *First Report of the Coal Dust Committee,* Dhanbad, Government of India, 1924. 23.

81. Sullivan. Dylan, Jason Hickle, *Capitalism and extreme Poverty: a global analysis of real wages, Human height, and mortality since the long 16th century,* Australia, Macquarie University, 6 th july 2022, Pp. 1-18.

আদিবাসীদের মত বিশেষভাবে আবদ্ধ হয়েছিল। ১৯২০ সালের দিকে স্পষ্ট হয়েছিল "আদিবাসীরা ধীরে ধীরে একটি মজুর শ্রেণিতে রূপান্তরিত হয়েছিল"।[82] খনি শিল্পায়নের মধ্যে দেশের বৈষয়িক সমৃদ্ধির জন্য যে রেলব্যবস্থা, খনি, কলকারখানার আয়োজন করা হয়েছিল তাতে সমাজের একটি শ্রেণির উপকার হলেও আদিবাসী শ্রমিকগণ ছিল ভুক্তভোগী।[83]

খনি শ্রমিকদের স্বাস্থ্যের এই পরিস্থিতিতে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় দেশে আর্থিক দুর্দশার প্রভাব খনি অঞ্চলের শ্রমিকদের উপর পড়েছিল। অতিরিক্ত পরিমাণে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পেতে থাকার ফলে সাধারণ জনগণের উপর করের বোঝা বৃদ্ধি পেয়েছিল এবং শ্রমিকদের উপার্জন দিয়ে জীবন- জীবিকা নির্বাহ করা কষ্টকর হয়ে উঠেছিল। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিকতায় এই দেশে ১৮৮০ থেকে ১৯২০ সাল পর্যন্ত ১৬৫ মিলিয়ন মানুষের মৃত্যু ঘটেছিল, যখন ট্রিলিয়ন ডলারের সম্পদের বহির্গমন হয়েছিল অর্থাৎ বিশ্বব্যাপী পুঁজিবাদী ব্যবস্থা গণহত্যার উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিকতায় প্রায় ১৮৮০ থেকে ১৯২০ সালের মধ্যে ৪০ বছরে ভারতে কমপক্ষে ১৬৫ মিলিয়ন মানুষের মৃত্যু হয়েছিল। কোথাও কোথাও ঔপনিবেশিকতার উচ্চতায় অকাল মৃত্যু হওয়ার সন্ধান পাওয়া গিয়েছিল।[84] একজন বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ উল্লেখ করেছিলেন যে, ইউরোপীয় সাম্রাজ্য তাদের সীমানার বাইরে গণহত্যার মত অপরাধ করেছিল। দীর্ঘ ১৬ শতকের পর থেকে প্রকৃত মজুরী, মানুষের উচ্চতা এবং মৃত্যুর বৈশ্বিক বিশ্লেষণ শিরোনামে একটি নিবন্ধ প্রকাশ করে তার অর্থ ব্যাখ্যা করলে দেখা যায়, অর্থনৈতিক ইতিহাসবিদ রবার্ট সি অ্যালানের গবেষণা অনুসারে, ব্রিটিশ শাসনের অধীনে ভারতে চরম দারিদ্র্যতা বৃদ্ধি পেয়েছিল"।[85] ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ আমলে প্রকৃত মজুরী হ্রাস পাওয়ার সাথে সাথে, ১৯ শতক এমন একটি শতকে পৌছেছিল, যখন দুর্ভিক্ষ ঘন ঘন এবং অত্যাধিক মারাত্মক হয়ে উঠেছিল।

82. চৌধুরী. বিনয়, নীরা রহমান, *ঔপনিবেশিক পূর্ব ভারতে হিন্দু আদিবাসী সাংস্কৃতিক সম্পর্ক,* চতুরঙ্গ, বর্ষ ৫৫ সংখ্যা ৩ মাঘ ১৪০১, পৃষ্ঠা সংখ্যা- ১৬৬।

83. Hunter. W. W, *The Indian Empire: Its History, People and Products,* London, Trubner and co., 1882, P. 722-724.

84. *British Empire killed 165 million Indians in 40 years: how Colonialism Inspired fascism,* Published on Geopoliticaleconomy.com on December 12.

85. Sullivan. Dylan, Jason Hickle, *Capitalism and extreme Poverty: a global analysis of real wages, Human height, and mortality since the long 16th century,* Australia, Macquarie University, 6 th july 2022, Pp. 3-5.

১৮৮০ এর দশকে দারিদ্র্যের জন্য প্রতি ১,০০০ জনে ৩৭.২ শতাংশ মৃত্যু থেকে ১৯১০ এর দশকে ৪৪.২ শতাংশ হয়েছে।[86] এই মৃত্যু একটি বিস্ময়কর পরিসংখ্যান হয়ে উঠেছিল।

কাজের ক্ষেত্রে শোষণ ও অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে আদিবাসী শ্রমিকদের মৃত্যু বরন করার কথা জানা যায়। এই পরিস্থিতিতে শিক্ষা ও জনস্বাস্থ্যের তুলনায় শিল্প উৎপাদনকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল অধিক। ইউরোপীয়দের সূক্ষ্ম শাসনের পর থেকেই দেশবাসীর কাছে অদৃশ্য বলে বিবেচিত হলেও শ্রমিক মৃত্যু পুরো খনি অঞ্চলে একটি নতুন অধ্যায়ের সৃষ্টি করেছিল। এ দেশের খনি শ্রমিকদের জনস্বাস্থ্য সন্তোষজনক ছিল না কেননা এই ব্যবস্থা পরিচালনা করার মত মৌলিক ব্যবস্থা ছিল না।[87]

আদিবাসী শ্রমিকদের মধ্যে সাংস্কৃতিক পরিবর্তন

পুঁজিবাদী যুগের মৌলিক বৈশিষ্ট্য হল যন্ত্র ও অবাধ শ্রমের উপর পুঁজির কর্তৃত্ব স্থাপন। যন্ত্র সভ্যতার যুগে যেমন গ্রাম থেকে শহর গড়ে উঠেছিল ঠিক তেমনি, শহর কেন্দ্রিক দৈনন্দিন জীবনে সাংস্কৃতিক ও সামাজিক জীবনে আদিবাসী শ্রমিকদের উপস্থিতি কাম্য ছিল না। সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের ধারায় ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ শক্তি আদিবাসীদের খনি ক্ষেত্রে যোগদানের পূর্বে ধর্মান্তরিতকরণের চেষ্টা করেছিল। এছাড়াও আদিবাসী শ্রমিকদের মধ্যে তাঁদের বাস্তবিক জীবনের আনন্দটুকু ধীরে ধীরে হ্রাস পেয়েছিল খনির মত উৎপাদন ক্ষেত্রে কাজ করার ফলে। খনি শিল্পাঞ্চলগুলিতে আদিবাসী শ্রমিকরা উৎসবের দিনেও শারীরিক উপস্থিতি অনেকের ক্ষেত্রে সুযোগ হত না। এই পরিস্থিতি তাঁদের সামাজিক বাধ্যবাধকতা সমাজ থেকে দূরবর্তী করে তুলেছিল। সামাজিক এই অবহেলা প্রদর্শন করে সমাজ ও বৃত্তিমূলক দ্বন্দ্বের একটি বিব্রতকর ও সংঘাতময় পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল ও খনি ক্ষেত্রে শ্রম দান করাটাকে মুখ্য করে তুলেছিল। খনি শিল্পাঞ্চলে যুক্ত ছিল আদিবাসী মহিলারা এবং খনি সংলগ্ন পল্লীগুলিতে বসতি গড়ে উঠার ফলে আদিবাসী মেয়েদের উপর বিরূপ প্রভাব পড়েছিল এবং নাচের আখড়া গড়ে তোলা হয়েছিল।[88] আদিবাসীদের মধ্যে 'মদ' জনপ্রিয় সংস্কৃতির একটি অংশ যা তারা বিভিন্ন আনন্দ

---

86. *British Empire killed 165 million Indians in 40 years: how Colonialism Inspired fascism,* Published on Geopoliticaleconomy.com on December 12.

87. *Royal Report on mine environment committee,* Government of India, 1935, P. 122

88. Dasgupta. Pranab Kumar, *Impact of Industrialisation on a tribe In South Bihar,* Singhbhum, Anthropological Survey of India, Published in Feb 1978, P. 84.

উৎসবে ব্যবহার করত। নিত্যদিন মদ পান তাঁদের সংস্কৃতির বহির্ভূত অংশ হিসাবে অভ্যস্ত হতে হয়েছিল। মদ্য পানের সাথে সাথে তারা বিভিন্ন নেশার সাথে জড়িত হয়ে পড়েছিল।[89] আদিবাসী শ্রমিকদের ক্ষেত্রে এটি একটি এমন বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয় যা ঔপনিবেশিকতা ও পুঁজিবাদের প্রভাবের প্রতিকূলতা থেকে তাৎক্ষণিক বাঁচতে সক্ষম করেছিল।[90] খনি অঞ্চলে সারাদিন কঠোর পরিশ্রম করার পর তাঁদের শারীরিক অবস্থা নেশাগ্রস্থ কামিন এবং রঙিন জীবনে পরিণত হয়েছিল। নেশার ঘোরে প্রায়ই তারা তাঁদের অকথ্য গালি গালাজের মাধ্যমে খনি মালিকদের প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ করার কথা সুপর্ণা লাহিড়ী বারংবার তাঁর গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।[91] বেশিরভাগ কোলিয়ারিগুলিতে দৈনিক প্রায় এক হাজার লিটার মদ তৈরি হত ও কালালীর[92] প্রচলন ছিল। কালালী ছাড়াও কয়লা খনি প্রতিষ্ঠার পর দিয়াং[93] এর ব্যবহার অধিক পরিমানে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। কারখানার গেটের পাশে দিয়াং এর বাজার জনপ্রিয় ছিল। দিয়াং প্রস্তুত বা বিপণন শুধুমাত্র আদিবাসী মহিলারা সম্পন্ন করত।[94] দিয়াং প্রস্তুত শুধুমাত্রও আদিবাসী শ্রমিকদের মধ্যে নয়, কারখানার জনপদে বসবাসকারী অন্যান্য শ্রমিকদের মধ্যে বৃদ্ধি পেয়েছিল। কালালী, দিয়াং, মহুয়া পানি স্থান ভেদে ভিন্ন নামে পরিচিত ছিল। তাঁদের উপার্জনের অর্ধেক তারা নেশার পিছনে ব্যয় করত। কোলিয়ারির সংগঠকদের বক্তব্যে উঠে এসেছিল যে, "এখানকার শ্রমিকরা মদ খেতে চায় না, তাঁদেরকে জোর করে নেশায় আসক্ত করানো হত"।[95] আধুনিক শিল্পসভ্যতা ছিল অতিমাত্রায় বাস্তববাদী যা ভারতীয় আদর্শ ব্যক্তিকে সমাজ থেকে বিছিন্ন করে দিয়েছিল।

---

89. *Royal Commission report on Labour in India,* London: Majesty's Stationery office, June, 1931, P. 120.

90. Pati. Biswamoy (Ed), *Adivasis in Colonial India Survival, Resistance and Negotiation,* Indian Council of Historical Research, Orient Blackswan, 2011, P. 237.

91. বড়ুয়া. সুপর্ণা লাহিড়ী, *বিহার নারী সমাজ সংগ্রাম,* কলকাতা, র‍্যাডিক্যাল, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি, ২০০৮, পৃ. ২০-৩৩।

92. স্থানীয় ভাষায় কালালীর এর নাম দেশিয়া বা মহুয়া পানি নামে পরিচিত।

93. দিয়াং হল এক ধরনের পানীয়।

94. Dasgupta. Pranab Kumar, *Impact of Industrialisation on a tribe In South Bihar,* Singhbhum, Anthropological Survey of India, Published in Feb 1978, P. 25.

95. বড়ুয়া. সুপর্ণা লাহিড়ী, *বিহার নারী সমাজ সংগ্রাম,* কলকাতা, র‍্যাডিক্যাল, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি, ২০০৮, পৃ. ৩২।

ভারসাম্যহীন অর্থনীতির জন্ম ও আদিবাসী শ্রমিক শ্রেণি

আঠারো শতকের পূর্ব পর্যন্ত প্রাকৃতিক দুর্যোগ ব্যতীত ছোটনাগপুরের অর্থনৈতিক অবস্থা ছিল মোটের উপর সমৃদ্ধ ভারতীয় উৎপাদন পদ্ধতি এবং শিল্প- বাণিজ্যের সংগঠন ছিল পৃথিবী অন্যান্য প্রান্তের সাথে তুলনীয় ছিল। আঠারো শতকের পর থেকে দেশ জুড়ে দারিদ্র্য পরিস্থিতির ফলে ছোটনাগপুরের খনি অঞ্চলগুলিতে অর্থনৈতিক ভারসাম্যহীনতা লক্ষ করা যায়। খনিজ শিল্প গঠনের ফলে মুনফা কেন্দ্রিক অর্থনীতির সাথে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার সমাজ কাঠামোয় পরিবর্তন লক্ষ করা গিয়েছিল। সমগ্র জনসাধারণের অর্থনৈতিক অবস্থার ক্ষেত্রে অনিবার্য প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছিল। ১৯১৫ সালের শেষদিকে বাংলা ও বিহারকে বাণিজ্যের সার্বজনীন মন্দার অংশ বহন করতে দেখা যায়। ঔপনিবেশিক বাণিজ্যের হতাশা এতটা গভীরে পৌছেছিল যা ছোটনাগপুরের প্রান্তীয় শ্রেণির জনগণের উপর সবচেয়ে অধিক প্রভাব লক্ষ করা গিয়েছিল।[96] স্ব-নির্ভর কৃষি অর্থনীতির সাথে আদিবাসীদের যে স্বাস্থ্যকর সম্পর্ক ছিল তা বিছিন্ন হয়ে পড়েছিল। খনি শিল্পের মত বিকাশমান শিল্পের সাথে পাল্লা দিয়ে ছোটনাগপুরের আদিবাসী শ্রমিকদের শ্রম প্রয়োগের গতি বৃদ্ধি পেলেও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে উন্নতি হয়নি। সম্পদের অসম বন্টন এবং জোরপূর্বক খনি ক্ষেত্রে আদিবাসীদের প্রবেশ ও বিভিন্ন বৈষম্যের শিকার থেকে উপলব্দধি করা যায় যে, আদিবাসী শ্রমিকদের অর্থনীতি ভঙ্গুর হতে শুরু করেছিল। উন্নত অর্থনীতির সাথে তাঁদের সম্পর্ক ক্ষীণ হয়ে পড়েছিল।[97] শিল্পায়ন যাতে সামগ্রিকভাবে দেশের অর্থনীতিকে উপকৃত করতে পারে, এটাই সর্বক্ষেত্রে কাম্য ছিল কিন্তু তা না হয়ে উন্নয়নের স্তরে শ্রমিক বৈষম্যকরণ দেখা দিয়েছিল এবং ভারসাম্যহীন অর্থনীতির জন্ম হয়েছিল ছোটনাগপুরের সমাজ অর্থনীতিতে। ঔপনিবেশিকতাবাদ যেমন কৃষি থেকে আদিবাসীদের বিচ্যুত করেছিল ঠিক তেমনি ধনতন্ত্র ও পুঁজিবাদ খনি শিল্পে আদিবাসী শ্রমিকদের যুক্ত করে অর্থনীতি থেকে বিস্তর ব্যবধান সৃষ্টি করেছিল। এই ব্যবধান থেকেই খনি শিল্প কারখানার উৎপাদনে ও শ্রম নিয়োগে আদিবাসী শ্রমিক শ্রেণির দৈনন্দিন জীবন যাপনে দারিদ্র্য পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছিল। ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ শক্তি যখন নিজেদের উন্নয়নে ব্যস্ত তখন এই দেশের আদিবাসী শ্রমিকদের পরিস্থিতি

---

96. *Royal Report of East India (Progress and condition) statement,* Government of India, 1921, P. 121.

97. Hunter. W. W, *The Indian Empire: Its History, People and Products,* London, Trubner and co., 1882, P. 212.

নিম্নগামী হয়ে পড়েছিল। এই নিম্নগামী পরিস্থিতির মধ্যে সমস্যা দেখা দিয়েছিল লাখ লাখ মানুষের আয় ও কর্ম সংস্থান বৃদ্ধি নিয়ে। ছোটনাগপুর মালভূমির খনি প্রধান এলাকাগুলির মধ্যে শ্রমিকদের যে পরিমাণ আয় হত তা সঠিক ছিল না। অর্থনীতিবিদদের একটা বড় অংশের মতে বাজার অর্থনীতির প্রভাবে শ্রমের সাময়িকীকরণের মাধ্যমে অপ্রথাগত শ্রমের পরিমাণ বৃদ্ধি ও প্রসারিত হয়েছিল। এ দেশে বাজার অর্থনীতি প্রবর্তনের পর এক দিকে যেমন শ্রমের সচলতা বৃদ্ধি পেয়েছিল ঠিক অন্য দিকে তেমনি বিদেশি বিনিয়োগের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছিল। একই সূত্রে এদেশের মাটিতে বহুজাতিক কোম্পানিগুলির অনুপ্রবেশ বৃদ্ধি পেয়েছিল। বিদেশি কোম্পানি প্রথম থেকেই মুনাফার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করায় মুনফার প্রলভনে অবৈধ শ্রমের পরিমাণ বৃদ্ধি করেছিল। ন্যূনতম মজুরির হার যতটা নিম্নমুখি হয়েছিল, সকল স্তরেই প্রাপ্ত মজুরী প্রাপ্য মজুরির থেকে কম ধার্য করা হয়েছিল। এই পরিস্থিতিতে আদিবাসী পুরুষ শ্রমিকদের পাশাপাশি মহিলাদেরও বহুজাতিক কোম্পানিগুলি ভিন্ন রকমের সুবিধার প্রলভন দেখিয়ে খনি জগতে প্রবেশ করিয়েছিল। সেই পরিস্থিতির শিকার হয়ে আদিবাসী মেয়েরা নতুন পথের দিশা না পেয়ে ভারসাম্যহীন অর্থনীতির শিকার হয়ে পড়েছিল। সামাজিক কাঠামোর কারণে আদিবাসী মহিলাদের বাইরের আর ঘরের কাজ দু'টোই একসাথে পূরণ করা সম্ভব হত না। প্রান্তিক একটি বৃহৎ আদিবাসী গোষ্ঠীর অর্থনীতির সাথে উন্নত অর্থনীতির চ্যালেঞ্জ তৈরি হয়েছিল ক্রমাগত। ভারসাম্যহীন অর্থনীতির শিকার হয়েছিল আদিবাসী মহিলারা তা পরবর্তী অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

ভারসাম্যহীন অর্থনীতি উদ্ভবের প্রকৃষ্ট উদাহরণ দেখা যায় জাতীয় আয়ের পরিমাপের মধ্য দিয়ে।[98] জাতীয় আয়ের চরিত্র সম্পর্কে জাতীয়তাবাদী নেতারা ও ঐতিহাসিকেরা বিভিন্ন যুক্তির ব্যাখ্যা দিয়েছেন। জাতীয় আয় চরিত্রের বৈশিষ্ট্য হিসাবে অমিতব্যয়িতাকে নিয়ে জাতীয় নেতারা অভিযোগ করেছিলেন।[99] যদিও তাঁদের এই ধরনের দাবি বা অভিযোগ, দেশের শ্রমিক ও কৃষকদের উপর যদিও একেবারেই বর্তাই না। সাধারণত এই কাজ পূর্ব ভারতীয় আদিবাসী কৃষক ও শ্রমিকদের জীবনযাত্রার মানের সাথে তুলনা করা যায় না। তাঁদের সেই আয় ছিল না

98. Dasgupta. Pranab Kumar, *Impact of Industrialisation on a tribe In South Bihar,* Singhbhum, Anthropological Survey of India, Published in Feb 1978, P. 32.
99. চন্দ্র. বিপান, *ভারতে অর্থনৈতিক জাতীয়তাবাদের উদ্ভব ও বিকাশ,* কলকাতা, কে পি বাগচি অ্যান্ড কোম্পানি, ১৯৯৮, পৃ. ২৩।

যার মাধ্যমে তারা উচ্চ ব্যায় করতে পারে বা সুখে সাচ্ছন্দে থাকা সম্ভব ছিল। এই ধরনের অমিতব্যায়িতা সমাজের উচ্চবর্গের শ্রেণির মধ্যে সীমিত ছিল। এই অমিতব্যায়িতার জন্য উন্নয়নের নামে কৃষক ও শ্রমিকদের জবরদস্তি শ্রম ব্যবহার করা হয়েছিল। জাতীয়তাবাদী নেতারা যদি গড় আয়ের ভিত্তিতে ব্যয়কে বিচার করেছিলেন কিন্তু সমগ্র দেশের মানুষের গড় আয়ের সাথে কৃষক ও শ্রমিকদের আয় এক করে দেখা যথার্থ হয়নি। ব্রিটিশ শক্তি চেয়েছিল যে উনবিংশ শতাব্দীর শেষ অবধি তারা রেলপথের উপর যত টাকা ব্যয় করেছিল ঠিক তার চেয়েও অধিক পুঁজি ব্যয় করুক ভারত সরকার।[100] উনিশ শতকের প্রথম থেকেই ব্রিটিশরা কৃষি থেকে শিল্পে যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছিল তাতে ভারতীয় কর্মচারীদের সঞ্চিত অর্থও লগ্নি করা হয়েছিল যা ঐতিহাসিক বিপানচন্দ্র স্বীকার করেন। নতুন নতুন যন্ত্রপাতি, সরঞ্জাম ক্রয়ের জন্য যথেষ্ট পরিমানে ব্রিটেন সাহায্য নিয়েছিল ছোটনাগপুরের খনি অর্থনীতির। বিদেশী পুঁজির মালিকেরা সমগ্র খনি শিল্প ক্ষেত্রটিকে একচেটিয়া নিয়ন্ত্রনাধীন করে ফেলে এবং সবটুকু মুনফা তাদের নিজেদের দেশে বহন করে নিয়ে গিয়েছিল।

খনি শিল্পাঞ্চলে স্থানীয় শিল্পপতি ও ঔপনিবেশিকদের মধ্যে বাজারি প্রতিযোগিতার প্রশ্ন দেখা দিলে ১৯২০ সালের শেষের দিকে ছোটনাগপুর মালভূমি অঞ্চলকে বাণিজ্যের সার্বজনীন বিষণ্নতার অংশ বহন করতে দেখা যায়। ১৯২১-২২ সালের বাজেটের মাধ্যমে বাণিজ্য ক্ষেত্রে মন্দার পরিবেশ লক্ষ করা যায়। ১৯২১ সালে একটি প্রাদেশিক মন্ত্রীদের একটি সম্মেলনের আয়োজন খনিজ শিল্পের জন্য অতি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নে দেশের উন্নয়ন নিয়ে প্রশ্ন উঠেছিল। রেলপথ ছিল এমন একটি পরিষেবা যা জাতীয় অর্থনীতির প্রয়োজনীয়তা পূরণ করত। আঞ্চলিক ও সামগ্রিকভাবে জাতীয় অর্থনীতির উন্নয়ন একটি একক প্রক্রিয়ার উন্নয়ন হিসাবে প্রদর্শিত হয়েছিল। জাতীয় অর্থনীতির অগ্রগতি বিভিন্ন অঞ্চলের প্রবৃদ্ধির হারে প্রতিফলিত হবে এবং দেশীয় সম্পদের বৃহত্তর বিকাশ হবে এই আশা করা হয়েছিল। এদিকে কোলিয়ারিতে শ্রমিকের ঘাটতির ফলে কয়লা উত্তোলন হ্রাস পেলে বাণিজ্য ভারসাম্যের উপর ক্ষতিকর প্রভাব ফেলেছিল। তাছাড়া দেশের অবস্থা অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কারণে এমন পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল যে, আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের সাধারণ কার্যক্রম সম্পূর্ণভাবে স্থবির হয়ে পড়েছিল।

---

100. Bagchi. Amiya, *The Evolution of International Business 1800-1945 Private investment 1900-1939,* Vol-V, Cambridge, Cambridge University Press, First published 1972, P. 38.

সামগ্রিকভাবে জাতীয় অর্থনীতির অগ্রগতির জন্য শ্রমিক অর্থনীতিকে বিসর্জন দেওয়া হয়েছিল যদিও জাতীয় অর্থনীতি অগ্রগতির ক্ষেত্রে তাঁদের অবদান ছিল অসামান্য। অর্থনৈতিক উন্নয়নের সম্ভাবনা উপলব্ধি করে জীবনযাত্রার স্তরগুলি পরিবর্তিত হয়েছিল। স্থানীয় পুঁজিপতিরা চেষ্টা করেছিল ঔপনিবেশিক ধাঁচে তাঁদের জীবনযাত্রাকে গড়ে তুলতে যা সামগ্রিকভাবে দূরবর্তী ছিল না।[101] ডিলান সুলিভান এ প্রসঙ্গে পুঁজিবাদের উত্থানের সাথে বিশ্বব্যাপী মানব কল্যাণ সম্ভব নয় তা উল্লেখ করেছেন। তিনি মানব কল্যাণের বাস্তব মজুরী প্রদানের তিনটি অভিজ্ঞতাকে সুচক হিসাবে মূল্যায়ন করেছিলেন। ভারসাম্যহীন অর্থনীতি ও মৃত্যুহারের সাথে পুঁজিবাদের উত্থান ধীরে ধীরে আদিবাসী শ্রমিক কল্যাণের অবনতি ঘটিয়েছিল।[102]

আদিবাসী শ্রমিকদের উপর খনি কোম্পানিগুলির প্রভাব যে বিরুপ ছিল তা মার্কস সহ বহু ঐতিহাসিক লেখায় বারংবার প্রতিফলিত হয়েছিল। মার্কস পুঁজি সম্পর্কিত প্রথম খন্ডের আলোচনাটিতে পুঁজিবাদের দৈনন্দিন চলমান এবং শ্রমিক শ্রেণির সম্পর্কের সম্ভাবনা উত্থাপন করেন। মার্কস এই প্রক্রিয়ায় শ্রমের অবস্থার নিবিড় পর্যবেক্ষণের পর ফ্যাক্টারি আইন সম্পর্কের আলোচনায় ‘প্রতিযোগিতার’ পরিস্থিতিতে অসমতার কথা উল্লেখ করেছেন। শ্রমের মাধ্যমে কাজের সময় দৈর্ঘ্য দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করে উন্নত এবং জটিল যন্ত্রপাতির ভারে আবদ্ধ করে শ্রমিক শ্রেণিকে অন্তর্নিহিত করে ফেলা হয়েছিল বলে মনে করেন।[103] মার্কস, পুঁজিবাদের নিষ্ঠুরতা তুলে ধরার পাশাপাশি শ্রমের সকল শোষণের উপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছিলেন। বৃহত্তর নিয়োগকর্তারা কারখানার পাশাপাশি শ্রমকে নিয়ন্ত্রণে রাখার চেষ্টা করত। শ্রমশক্তিকে ‘শৃঙ্খলাবদ্ধ’ করার প্রক্রিয়ায়, স্বতন্ত্র পুঁজিপতিদের সাথে রাষ্ট্রের স্বার্থ জড়িত ছিল। ইংল্যান্ডের শিল্প বিপ্লবের পরে খনি কেন্দ্রিক ব্যবস্থা শ্রমিকদের জীবনে ডেকে এনেছিল এক চূড়ান্ত অভিশাপ ও বঞ্চনা। জীবনধারণের জন্য নুন্যতম মজুরির হার নির্ধারিত হওয়ার ফলে শ্রমিকদের প্রাপ্ত আয় ক্রমশ হ্রাস পেতে শুরু করেছিল। অধিক পরিমানে খনিজ উৎপাদন

---

101. *Economic Development in Different Regions in India,* Government of India Planning Commission, New Delhi, August, 1962, Pp. 3- 15.

102. Sullivan. Dylan, Jason Hickle, *Capitalism and extreme Poverty: a global analysis of real wages, Human height, and mortality since the long 16th century,* Australia, Macquarie University, 6 th july 2022, Pp. 1-18.

103. Chakrabarty. Dipesh, *Re-thinking Working class History, (Bengal 1890-1940),* Princeton, Princeton University Press, P. 66.

করতে গিয়ে বাধ্যতামূলক শ্রমদান করতে হত। পুঁজিবাদী ব্যবস্থার ভিত্তি ছিল মানুষের দ্বারা মানুষের শোষণ। সমাজের উপর বিভাগের অর্থনৈতিক স্তরের অবস্থানকারী গোষ্ঠী তাঁর নিচের স্তরের মানুষের শ্রম চুরি করে নিজের সম্পদ বৃদ্ধি করবে, পুঁজিবাদী ব্যবস্থার এটাই ছিল দস্তুর। এই কাজে ন্যায্যতার প্রশ্নটি অবহেলিত হলে গণতন্ত্র যে সুরক্ষিত থাকতে পারে না সে বোধও জাতীয়তাবাদী নেতাদের বিচলিত করেনি। ফ্রেড্রিক এঙ্গেলস তাঁর 'অরিজিন অব দি ফ্যামিলি, প্রাইভেট প্রপার্টি অ্যান্ড স্টেট' গ্রন্থে পুঁজিবাদী রাষ্ট্র কাঠামোকে ব্যাখা করেছেন- 'শ্রমিকের শ্রম লুণ্ঠনকারী ক্ষমতাশীল গোষ্ঠীর আইনি রক্ষক'।[104] রাজনৈতিক প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠা করার যন্ত্রের মাধ্যমে রাজনৈতিক ক্ষমতাকে ব্যবহার করে তারা মেহনতি জনতাকে শোষণ করার নতুন নতুন উপায় আয়ত্ত করতে শুরু করেছিল। লেনিন তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'রাষ্ট্র ও বিপ্লবের' ব্যাখা করেছেন যে, "পুঁজিবাদী রাষ্ট্রব্যবস্থা তৈরি হয়েছিল শ্রেণি বিরোধের এক অমীমাংসিত পর্ব এবং দৃষ্টিভঙ্গির মধ্য দিয়ে"। পুঁজিবাদী রাষ্ট্রে পুঁজি কেন্দ্রিক শাসনকে অব্যাহত রেখে, শ্রেণিগত বিভাজনে মেহনতি মানুষ সমান গণতান্ত্রিক অধিকার ভোগ করার সুযোগ পায়নি। পুঁজি এবং শ্রেণি বিভাজনের অবসান না ঘটা পর্যন্ত পুঁজিবাদী রাষ্ট্র ব্যবস্থায় কখোনোই প্রকৃত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না বলে মনে করেছিলেন লেনিন। সমাজের দরিদ্র্যতম অংশের মানুষের জীবন থেকে জীবিকা সবটাই আক্রান্ত হয়েছিল এই ব্যবস্থায়। জীবন- জীবিকা সহ সমাজের বিভিন্ন বিষয়ভিত্তিক, ধর্ম- বর্ণ- সম্প্রদায় নির্বিশেষে সাধারণ মানুষের ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামী ভীত তৈরি হয়েছিল ধীরে ধীরে।[105]

বিনিতা দামোদরন ঔপনিবেশিক পর্যায়ে ছোটনাগপুরের আদিবাসীদের শোষণ সম্পর্কে দেখিয়েছেন যে, প্রথমদিকে আদিবাসীরা কৃষক হিসাবে শোষিত হয়েছিল পরবর্তীকালে বিংশ শতাব্দীতে শ্রমিক হিসাবে আদিবাসীদের নিপীড়নের কথা। ইউরোপীয় শক্তি তাদের বুদ্ধিমত্তা ও পুঁজির প্রয়োগ থেকে দেশীয় শ্রম শোষণের ইতিহাস উঠে এসেছিল। অর্থনৈতিক অভাব, আদিবাসী শ্রমিক শ্রেণির ভাগ্যকে দুর্ভাগ্যের দিকে পরিচালিত করেছিল ধীরে ধীরে। ভূমি ক্ষেত্রে যেমন আদিবাসীদের কর্মক্ষমতা হারিয়েছিল ঠিক তেমনই বড় শিল্প ক্ষেত্রে তাঁদের ব্যক্তিগত

---

104. Engels. Frederick, *The origin of the family private poperty and the state,* Chicago, Charles H. Kerr & company, 1902, Pp 35-42.
105. তদেব।

স্বাধীনতাও রক্ষা পায়নি।[106] ঔপনিবেশিক নিয়মের বেড়াজ্বালে ও উৎপাদন প্রথার মধ্যে আদিবাসী নিপীড়নের বাস্তবতার ভিত্তি লক্ষ করা গিয়েছিল। ছোটনাগপুরের প্রাক্তন কমিশনার এডওয়ার্ড ডাল্টনের কথায় উঠে এসেছিল যে, আইনি জটিলতা ও ভারবাহী কর্ম ক্ষমতার চাপ আদিবাসীদের জন্য অনুপযুক্ত ছিল। যদিও কোম্পানি প্রথম থেকেই ভারতের আদিবাসী সম্প্রদায়ের নিয়ন্ত্রণের প্রচেষ্টার জন্য স্বৈরাচারী উপকরণ সরবরাহ করা হয়েছিল। আদিবাসী জনজাতিরা বর্ণ হিন্দুদের থেকে দূরে বসতি গড়ে তুলেছিল। প্রকৃতির সাথে এই আদিবাসী শ্রমিকদের শ্রমের রোগী, অগ্রগামী চাষি, মৌসুমি নীল শ্রমিক হিসাবে পরিচিত হতে হত। বিনিতা দামোদরন এই প্রেক্ষাপটে আদিবাসী শ্রমিকদের প্রতি প্রথাগত ধারণার চিত্রগুলি উত্থাপিত করেছেন এবং দেখিয়েছেন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী নীতি আদিবাসী শ্রমিকদের সংস্কৃতিকে ধ্বংস করেছিল। খনি অঞ্চলে আসার সান্নিধ্যে মদ্যপান ও আনন্দ উদ্দীপনায় আসক্ত আদিবাসীরা তাদের স্বাস্থ্যকে ক্ষতিগ্রস্থ করে তুলেছিল। অধিকাংশ ঔপনিবেশিক কর্মকর্তাদের মন্তব্য থেকে খনির সব শ্রমিকই মদ্যপানে আসক্ত থাকার কথা জানা যায়। এই শর্তে রিপোর্ট করা কেন্দ্রীয় প্রদেশের ফরথিস মন্তব্য করেছেন যে, অনিয়ন্ত্রিত মদ্যপানের অভ্যাস তাদের উন্নতির জন্য প্রতিবন্ধকতাগুলিকে আরও বৃদ্ধি করেছিল।[107]

কুন্তলা দত্ত লাহিড়ী ও টনি হাটবারট আদিবাসীদের উপর খনিজ কোম্পানিগুলির প্রভাব সম্পর্কে দেখিয়েছেন যে, খনি তৈরি হওয়ার পশ্চাতে ছোটনাগপুরের আদিবাসীদের বাস্তুচ্যুতির ইতিহাসের একটি গভীর সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করেছেন। বাস্তুচ্যুত আদিবাসী শ্রমিকদের জীবনযাত্রার মান, আয়, রোজগারের ক্ষমতা এবং উৎপাদনের মাত্রা উন্নত ছিল না। তারা প্রাকৃতিক সম্পদের পাশাপাশি জমি থেকে বিচ্যুতি অর্থনৈতিক জীবনকে পরিবর্তিত করেছিল এবং দারিদ্র্য আদিবাসী মানুষকে আরও দরিদ্র্য করে তুলেছিল। এই প্রসঙ্গে বলা যায় যে, কিছু সংখ্যক সরকারী ও বেসরকারি কোম্পানিগুলি আদিবাসীদের জমি দখলের চেষ্টা করতে থাকে। খনি গঠনের জন্য আদিবাসীরা যাতে স্বেচ্ছায় জমি দেয় সেইজন্য জমি হস্তান্তরকে আদিবাসীদের মধ্যে প্রোরোচিত করা হয়েছিল। খনি সংলগ্ন এলাকার অধিকাংশ জমির দখল সেটেলমেন্ট

106. Damodaran. Vinita, *Colonial constructions of Tribe in India: The Case of Chotonagpur* , University of Sussex, 2006, Pp. 160-170.

107. Damodaran. Vinita, *Indigenous Agency: customary rights and Tribal protection in Eastern India 1830-1930,* History Workshop Journal, Issue 76, University of Sussex, 13 August 2013, Pp. 87-90.

রেকর্ডের সাথে সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়নি। খনি প্রতিস্থাপনের জন্য অধিকাংশ আদিবাসী জমি অবৈধ ভাবে দখল করা হয়েছিল। তিনি আরোও উল্লেখ করেছেন যে, রাষ্ট্রের সাথে পুঁজির নিবিড় সম্পর্কের কথা অর্থাৎ রাষ্ট্র পুঁজিপতিদের স্বার্থে খনি শিল্পের দ্রুত প্রসারতা বৃদ্ধি পেয়েছিল। এই নীতিটি ব্যবহার করার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের জটিলতা তাঁর শিল্পায়ন পরিকল্পনা থেকে স্পস্ট হয় যে, এই নীতিগুলি আসলে পুঁজিপতিদের লাভের জন্য তৈরী হয়েছিল আদিবাসী শ্রমিকদের স্বার্থে নয়। এই পর্যায়ে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের সাথে আদিবাসীদের দ্বান্দ্বিক সম্পর্ক তৈরি হয়েছিল।[108] এক্ষেত্রে উল্লেখ করা যায় যে, ঔপনিবেশিক আইনি উপকরণ ১৮৯৪ সালের ভূমি অধিগ্রহণ আইন জমি অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়েছিল।

বিশময় পতি, ঔপনিবেশিক উড়িষ্যার আদিবাসী শ্রমিকদের উপর খনি কোম্পানিগুলির প্রভাব প্রসঙ্গে ব্যাখ্যা করেন যে, কৃষক থেকে শ্রমিক শ্রেণিতে রূপান্তরিত হওয়ার সম্পূর্ন পদ্ধতি কৃষির সাথে যুক্ত একটি ব্যবস্থা ছিল। কৃষির সম্প্রসারণ উপজাতিদের শুদ্র শ্রেণিতে রূপান্তরিত করেছিল। উপজাতিরা সাধারণত উড়িষ্যায় ক্রিমিনাল বা অপরাধী জাতি নামে পরিচিত হত।[109] আদিবাসীদের মধ্যে যারা মূলত লোহা তৈরি করত তারা অসুর সম্প্রদায় থেকে এসেছিল তারা লৌহজনি বা আইরন স্মেল্টারস নামে পরিচিত ছিল। আদিবাসীদের বাস্তুচ্যুত প্রক্রিয়াকে তুলে ধরার সাথে সাথে নতুন বসতি স্থাপনের কথা স্বীকার করেছেন। ময়ূরভঞ্জের মত উড়িষ্যা জেলায় গোয়ালা, চাষা, মহন্তি হিন্দুদের দ্বারা সাঁওতাল, হো, কোল, ভূমিজ আদিবাসীদের গ্রাম থেকে উচ্ছেদের কথা জানা যায়। বর্ণ হিন্দুদের মধ্যে গোয়ালা, চাষাদের সমাজে প্রভাব ও প্রতিপত্তি ছিল তাঁর একটি নতুন দিক যা তিনি উল্লেখ করেছেন। ময়ূরভঞ্জের আদিবাসীদের উপর ক্রমাগত অত্যাচারের কথাও উল্লেখিত হয়েছিল। খোন্দমাল নামক এলাকায় ১৯২০-৩০ এর দিকে আদিবাসীদের জমি হারানোর কথা জানা যায়। বিভিন্ন জমিদারিতে ব্রাহ্মণ মহাজনদের দ্বারা শবর[110] জাতির উৎখাত করার কথা উল্লেখিত হয়েছিল।

---

108. Dutta. Kuntala Lahiri (Ed), *The Coal Nation History, Ecologies and politics of coal in India,* Ashgate Publishing house, Australian National University, 2014, Pp. 165-169.
109. Pati. Biswamoy (Ed), *Adivasis in Colonial India Survival, Resistance and Negotiation,* Indian Council of Historical Research, Orient Blackswan, 2011, Pp. 244.
110. শবর হল বাংলা ও উড়িয়া ভাষায় মিশ্রিত ভাবে কথা বলা একটি উপজাতি।

ঐতিহাসিক সতীশচন্দ্র দেখান যে, ১৮৮৮ সালের অর্থনৈতিক অনুসন্ধান সম্পর্কিত সিদ্ধান্তে কৃষির সাথে যুক্ত নিচুবর্ণের জনসাধারণের অবস্থা উদ্বেগজনক ছিল। এই উদ্বেগজনক পরিস্থিতির পাশাপাশি খনির সাথে যুক্ত শ্রমিকদের অবস্থা আরও বেশি খারাপ ছিল। তারা একদিকে যেমন ছিল আদিবাসী অন্যদিকে ছিল প্রান্তিক। বিদেশী পুঁজির সমালোচনা করে আরেকটি বক্তব্য উঠে এসেছিল যে, কুলির কাজ করে শ্রমিকরা যে মজুরি পেয়েছিল, তা যে কোনো মানদণ্ডেই সম্পদ শোষণের ও এদেশের নিজস্ব শিল্পের ধ্বংসসাধনের সামান্যই পূরণ করেছিল। খনিজ সম্পদের ক্ষেত্রে শোষণের পরিমাণ ছিল সাংঘাতিক, পাশাপাশি সেই জাতীয় সম্পদের স্থায়ী ক্ষতি হয়েছিল। জাতীয় নেতাদের অনেকেই অবশ্য পরিস্থিতির অন্য দিকটি সম্পর্কে সচেতন ছিলেন এবং এ প্রসঙ্গে সতীশ্চন্দ্রের মতামত ছিল গুরুত্বপূর্ণ। তিনি খনিতে আদিবাসী শ্রমিকদের এই পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করে খনির মত আধুনিক শিল্পোৎপাদন ব্যবস্থার দুটি ত্রুটিকে বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন। প্রথমত তিনি বলতে চেয়েছেন খনি শিল্পোৎপাদনের ফলে ক্ষুদ্র সুসংগঠিত সংখ্যালঘু পুঁজিপতি গোষ্ঠী তৈরি হয় এবং লক্ষ লক্ষ আদিবাসী শ্রমজীবী মানুষকে যন্ত্রে ও মজুরির দাসে পরিণত করেছিল। অন্যদিকে এই উৎপাদন ব্যবস্থা শ্রমজীবীদের সংঘবদ্ধ করে তোলে এবং অতিকায় সব শ্রমিক সংগঠনের জন্ম দিয়েছিল। দ্বিতীয়ত, একটি যৌথ নৈতিক জীবন গড়ে তোলা- যাতে বিভিন্ন উন্নয়নশীল গোষ্ঠীর স্বার্থরক্ষার ও সামগ্রিকভাবে নৈতিক উন্নতির জন্য প্রতিটি শ্রেণির সুনির্দিষ্ট ও স্বাধীন ভূমিকা থাকবে। বিদেশী পুঁজির নিয়ন্ত্রণে শ্রমের আইনগতভাবে দাসত্ব স্বীকার, পর্যাপ্ত পুষ্টির অভাবে অকথ্য দুঃখদুর্দশা, খ্যাদাভাবে অসংখ্য মৃত্যু এবং হতাশা ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে নৈরাশ্যের কারণে নথীভুক্ত হয়েছিল এমন অগণিত আত্মহত্যার দৃষ্টান্ত। ১৯২০ এর দশকে সামাজিক অস্থিরতা এই নীতি পরিবর্তনের দিকে পরিচালিত করেছিল। ঔপনিবেশিক প্রশাসন একটি নির্দিষ্ট শতাংশ সংরক্ষণ করে বিভাজনমূলক ও বৈষম্যের নীতি শুরু করেছিল প্রান্তিক মানুষদের খনি ক্ষেত্রে কাজ দেওয়ার মাধ্যমে।[111]

গবেষক ধীরজ কুমার নিটে স্বীকার করেছেন যে, ১৮৯৫-১৯৪৮ সালের খনিতে আদিবাসী মহিলাদের অংশগ্রহণে এক ধরনের পরিবার প্রথাকে সমর্থন করেছিল অর্থাৎ ঔপনিবেশিক পুঁজি ও দেশীয় পুঁজিপতিরা স্বল্প মজুরিতে পারিবারিক শ্রম নিয়োগের কথা। পাটনা

111. Mohanty. M, Mining development and displacement of Adivasis in India, International Journal of Development Studies, Vol-15 (4), P. 214-231.

মহাফেজখানার রেকর্ড থেকে জানা যায় যে, খনিতে শ্রম দান করা ছিল আদিবাসীদের কাছে পরিবার ভিত্তিক অর্থনীতির ঐতিহ্য। তাঁদের পারিবারিক গ্যাং বা দলের কথা উল্লেখ করেছেন যা খনির নিচের কাজের সাথে যুক্ত ছিল। খনি পরিবারের সদস্যরা কাঠমিস্ত্রি ও মাটির নিচে রেললাইনে মহিলা ও শিশুরা ওয়াগন লোডার বা কাঠ জিনার হিসাবে কাজ করত। পারিবারিক দলগুলির দুটি বৈশিষ্ট্য ছিল চোখে পড়ার মত। ১) পারিবারিক দলে পুরুষেরা দলের প্রধান ছিল। ২) অনেক ক্ষেত্রে পরিবারগুলি বৈবাহিক দিক দিয়ে কোনো সুত্রে জড়িত ছিল না। ঝরিয়া এবং রাণীগঞ্জ কয়লা খনিতে ৭০০০ জন মহিলার মধ্যে ৪৯ শতাংশ স্বামীর সাথে ও ২৯ শতাংশ আত্মীয়দের সাথে ছিল। এই পরিবার ভিত্তিক কাজ শুধুমাত্র সাঁওতাল ও বাউরি সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত ছিল।[112] ১৯২৯ থেকে ১৯৪৬ সাল পর্যন্ত খনি শ্রমিকদের শ্রমকে পরিবার ভিত্তিক হিসাবে ব্যাখা করেছেন। আদিবাসীদের শ্রমকে খনিতে অব্যাহত রাখার জন্য এই ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিল খনি মালিকরা।

শিল্প কমিশনের রিপোর্টেও ১৯০৩ সালের মন্তব্যে কৃষির উপর অধিকাংশ মানুষের নির্ভরশীলতার কথা উল্লেখিত হয়েছিল। ছোটনাগপুরের বিস্তীর্ণ খনি অঞ্চলে জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি করা ছিল সমস্যার বিশেষ অংশ। দৈনিক স্বল্প আয়ের উপর তাঁদের জীবনের ঝুঁকি ছিল অধিক। দরিদ্র্য ও সম্পদের আপেক্ষিক ধারণায় ছোটনাগপুরের খনি শ্রমিকরা ক্রমাগত দরিদ্র্য হয়ে পড়েছিল। আদিবাসী শ্রমিকদের ক্ষেত্রে 'সাধাসিধে', 'মোটামোটি' এই কথাগুলি তাঁদের অভাব মেটানোর জন্য যথেষ্ট ছিল না। জাতীয় কংগ্রেসের সক্রিয় কর্মী একজন বাঙালি লেখক স্বীকার করেছিলেন যে, এদেশের ইতিহাসের সব পর্বেই ভারতীয় কৃষক ছিল করভারে জর্জরিত, বঞ্চিত শ্রেণি, অদৃষ্টের পরিহাস আর লোভ লালসার শিকার। এরসাথে তিনি যোগ করেছিলেন, ইংরেজ শাসনে দুর্দশা ও বৃদ্ধির পরিনাম। আদিবাসী শ্রমিকদের শুধুমাত্র শ্রম দান করার জন্য ব্যবহার করা হয়েছিল। উনবিংশ শতাব্দীতে 'জাতি' ধারনাটি ব্রিটেন ও ভারতে জনপ্রিয় হলেও ব্রিটিশদের দেশ পরিচালনায় জটিল ভাবে সম্পর্কিত ছিল বলে ক্রিস্পিন বেট

---

112. Nite. Dhiraj Kumar, *Women Mineworkers and family- oriented Labour: Indian collieries (jharia), 1895-1948,* Vol- II, Journal of Archive India Institute, January 2015, Pp. 1-36.

মনে করেন।[113] আদিবাসী শ্রমিক শ্রেণির প্রতি এই দুর্ব্যবহার নিয়ে জি এস আয়ার বলেন যে, “পাশ্চাত্যের দেশের মত তারা একদিন জেগে উঠবেন, তাঁদের অধিকার আদায় করে নেবে”।[114] এই ধরনের মন্তব্য থেকে আরো স্পষ্ট হওয়া যায় যে, পাশ্চাত্যের খনি অঞ্চলেও আদিবাসী শ্রমিকদের প্রতি এই অবহেলা যে করা হয়েছিল তা তারা স্বীকার করে নিয়েছিলেন। আদিবাসী শ্রমিক শ্রেণির উপর খনিজ ক্ষেত্রগুলির নিয়ন্ত্রণের সাদৃশ্য পাওয়া যায় একইভাবে কঙ্গোর তামার খনি অঞ্চলে। এখানে আদিবাসী শ্রমিকদের মধ্যে ক্রমবর্ধমান উত্তেজনা সৃষ্টি হয়েছিল।[115]সমাজে এই চিত্র বিকশিত হয়েছিল যন্ত্রকে উন্নয়নের কাজে উপলক্ষ হিসাবে ব্যবহার করার ফলে।

ঔপনিবেশিক পুঁজির প্রভাব ও তৎকালীন পত্র পত্রিকার প্রতিক্রিয়া

ঔপনিবেশিক পুঁজির প্রভাব ও আর্থ- সামাজিক প্রেক্ষাপটের চিত্র বিভিন্ন সরকারী রিপোর্ট ছাড়াও তৎকালীন পত্র ও পত্রিকার মাধ্যমে যেভাবে উঠে এসেছিল তাতে ভিন্ন ভিন্ন ধরণের রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া লক্ষ করা গিয়েছিল। বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার বিভিন্ন পত্র ও পত্রিকায়, দেশের দুর্বল অর্থনীতির পাশাপাশি ছোটনাগপুরের ভঙ্গুর অর্থনীতির চিত্র পরিস্ফুটিত হয়েছিল। অর্থনীতিকে দীর্ঘস্থায়ী স্থবিরতা থেকে নিষ্কাশিত করার জন্য একটি বিনিয়োগের প্রয়োজন ছিল তা অনেক পত্রিকার মধ্য দিয়ে উল্লেখিত হয়েছিল। তৎকালীন সময়ে বিভিন্ন পত্রিকা দেশের অর্থনীতি সম্পর্কে নিজেদের বক্তব্যগুলি তুলে ধরেছিল তাতে জাতীয়তাবাদী ভাবধারা যুক্ত ছিল। জাতীয়তাবাদী অর্থনীতি ও দেশীয় পুঁজিপতিদের হাত ধরে যে খনি শিল্পাঞ্চলগুলি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তাতে আদিবাসী শ্রমিক অর্থনীতি ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিল তা বিশেষভাবে লক্ষণীয় ছিল।

শ্রম জনিত প্রসঙ্গ উঠে এলেও আদিবাসী শ্রমিক ও শ্রম সম্পর্কিত কোনো তথ্য জাতীয় নেতাদের বক্তব্যে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়নি। জাতীয়তাবাদী নেতাদের মধ্যে

---

113. Bates. Crispin, *Race, Caste and Tribe in Central India: The early origins of Indian Anthropometry,* Centre for South Asian Studies, School of Social & Political Studies, University of Edinburgh, Pp. 4-10.

114. Singh. Hira Lal, *Problems and Policies of the British in India, (1935),* Bombay, 1963.

115. Guene. Enid, *Coppers corollaries: Trade and labour migration in the copperbelt (1910-1940,* Vol-IV No-1, Zambia social science journal, 2013.

জাতীয়তাবোধের উদ্ভব ও বিকাশের ফলে যেখানে বস্ত্র, পাট, রেল শ্রমিকদের নিয়ে তারা যতটা সচেতন ছিলেন ততটা সচেতন ছিলেন না খনিতে কর্মরত আদিবাসী শ্রমিকদের নিয়ে। এ জাতীয় অবহেলা শুরু হয়েছিল ঔপনিবেশিক পর্যায় থেকে। ক্রমাগতভাবে সেই ধারা প্রবাহমান ছিল। যেন মনে হয়েছিল খনি শিল্পে যুক্ত শ্রমিকদের আয় হ্রাস বা বৃদ্ধির সাথে জাতীয় আয় বৃদ্ধি বা হ্রাসের কোনো সম্পর্ক ছিল না। ১৮৯১ সালে কারখানা আইনে মহিলা ও শিশুদের কাজ নিয়ন্ত্রণ করার ব্যাপারে জাতীয়তাবাদী নেতাদের আপত্তির কথা উঠে এসেছিল। ১৯০০ সালে খনি সংক্রান্ত আদিবাসী শ্রমিক নিয়োগ নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছিল। ১৯২০ সালের অর্থনৈতিক অস্থিরতার যে বিষয়টি অব্যাহত ছিল এবং শ্রমিকদের সম্মিলিত পদক্ষেপে তা সবচেয়ে স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। ১৯২১ ও ১৯২২ সালের প্রথমদিকে হতাশাগ্রস্থ শ্রমিক শ্রেণির প্রতিনিধি ও সদস্যদের দ্বারা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। তাছাড়া সকল ধরনের শ্রম আইনগুলিই এদেশে শিল্প বান্ধব শ্রম বাজার গড়ে তোলার ক্ষেত্রে বড় বাঁধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ থেকে বৃহৎ খনি শ্রমিক ক্ষেত্রে কোনো সুরক্ষা আইন ছিল না। উনিশ শতকে দেশের শিল্পের মধ্যযুগীয় অধিবেশন বিদ্যমান শিল্পের সাথে অভিযোজিত ছিল।[116] খনি আইনের লক্ষ্য ছিল সীমিত, এবং সেই সীমিত লক্ষ্য পূরণের জন্যও যে আইনের বিধান প্রয়োজন সেই আইন প্রনয়ণে জাতীয়তাবাদী নেতারা প্রায় সকলেই বিরোধিতা করেছিলেন। খনিজ শিল্পের মত একটি শিল্পের ক্ষেত্রে আইনের প্রয়োজন অস্বীকার করা হয়েছিল। খনির শ্রম কল্যাণের প্রতি আগ্রহ ও প্রশ্ন ভিন্ন দিক থেকে উঠে এলেও আদিবাসী শ্রমিকদের প্রতি সেই আগ্রহ দেখানো হয়নি।[117] কারখানা আইনের মত খনি সম্পর্কিত আইনের ক্ষেত্রেও নেতারা এই আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন যে, এই আইন খনিজ শিল্পের, বিশেষ করে ভবিষ্যতে ভারতীয় মালিকানাধীনে খনির ক্ষতি করবে।[118] শ্রম আইনে নিপীড়িত, শোষিত কলকারখানা ও খনি শ্রমিকদের প্রতি সক্রিয়ভাবে সচেতনতার অভাব ছিল। জাতীয়তাবাদী নেতাদের খনি শ্রমিকদের দুঃস্থ জীবনযাত্রা নিয়ে কোনো মন্তব্য উঠে আসেনি। জি এস আয়ার, জি কে গোখলে

116. Coyajee. J. C, *Current Economic Problems of India,* Bengal, C. R. Battersby Bengal Government Press, 1933, P. 79

117. *East India (Progress and Condition) MORAL AND MATERIAL PROGRESS AND CONDITION OF INDIA,* 1921, Deputy under Secretary State for India, Pp. 220-223.

118. Coyajee. J. C, *Current Economic Problems of India,* Bengal, C. R. Battersby Bengal Government Press, 1933, P. 110

এরা সংসদীয় শ্রমিক সম্পর্কিত ভাষণে শ্রমিকদের সমস্যার কথা তোলেননি। খনি আইনের ব্যাপারে শ্রম আইনগুলি ছিল শ্রমিক বিরোধী। খনির মুনফা কেন্দ্রিক অর্থনীতিতে মূল্যবান কিছু প্রশ্ন ছিল যার মীমাংসা মানবিক অধিকার এবং প্রগতির সাথে জড়িত ছিল। এটা প্রায়শই শ্রমের ক্ষেত্রে উল্লেখ করা হয়েছিল যে, শ্রম তখনও পর্যন্ত ততটা সাশ্রয়ী ছিল না। খনি আইন ১৯০১ এ কাজের সময় সম্পর্কিত কোনো প্রবিধান অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। খনি মালিকরা তাঁদের সুবিধা দেবে এই ভেবে সমস্ত আদিবাসী শ্রমিকরা ভালো মজুরী অর্জনের জন্য মাটির নিচে দীর্ঘ সময় ব্যয় করে বাছাইকারি হিসাবে কয়লা খনির শিল্পের দায়ভার বহন করেছিল। ১৯২৩ সালে খনিতে দৈনিক কাজের সীমাবদ্ধতা ঠিক করা হয়েছিল। বেসরকারি খনিতে শ্রমিক বিনিময় স্থগিত করা হয়েছিল।[119]

শ্রমিক ধর্মঘট সংগঠিত হওয়ার তীব্রতা এবং ব্যবধানের কারণে সাধারণ জনগণের নজরে আসার আগেই শ্রমিক ইউনিয়ানগুলি তৈরি হয়েছিল যার নেতৃত্ব দিয়েছিল পৃথক রাজ্যের শ্রম বিভাগের ব্যুরো সংস্থা। কেন্দ্রীয় সরকারের শ্রম ব্যুরো ১৯২০ সালের মে মাসে শুরু হয়েছিল এবং শ্রম নিয়ে কাজ করা বিশেষ কর্ম কর্তারা মজুরী বৃদ্ধি পাওয়ার জন্য ধর্মঘটের মধ্য দিয়ে শ্রমিকদের সাথে নিয়োগকর্তাদের চুক্তি ভঙ্গ করার জন্য একটি ট্রেড ইউনিয়ানের কর্মকর্তা বা সংগঠককে প্রভাবিত করার জন্য একটি নিষেধাজ্ঞার রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছিল। এদিকে ১৯২০ সালে ১৫ লক্ষ খনি শ্রমিক ২০০ এর অধিক ধর্মঘটে অংশগ্রহণ[120] জঙ্গি আন্দোলনের সম্মুখীন করে তুলেছিল। এ প্রসঙ্গে কংগ্রেসের মুখপত্র লালা লাজপত রায় এই পরিস্থিতিকে বৈপ্লবিক পরিস্থিতির সাথে তুলনা করেছিলেন।[121] আদিবাসী শ্রমিক আন্দোলন জঙ্গি রুপ ধারন করলে ব্রিটিশ সরকারের কাছে তা চিন্তার বিষয় হয়ে দাড়িয়েছিল। গান্ধিজির নেতৃত্বে শ্রমিক আন্দোলনে ছন্দপতন হয়েছিল। দেশীয় বুদ্ধিজীবী থেকে পুঁজিপতিদের পরিচালনায় জাতীয় আন্দোলনগুলির পরিণতি দ্বিমুখী হয়ে পড়েছিল।

---

119. Banerjee. Sukumar, *Impact of Industrialisation on the Tribal Population of Jharia-Raniganj Coal Field Areas,* Calcutta, Anthropological Survey of India, Published in March, 1981, p. 110.

120. *Annual report on the working of the Trade Union act 1926,* Patna, Bihar, Secretariat Press, 1954.

121. Ray. Lala Lajpat, *Presidential addressed to the Calcutta special session of the National congress,* September 1920 p. 280.

ভারতের ছোটনাগপুর মালভূমিতে খনিজ সম্পদের বিকাশের প্রশ্নটি ইংল্যান্ডের পাশাপাশি দেশের বিভিন্ন প্রান্তরে ক্রমবর্ধমান ভাবে মনোযোগ আকর্ষিত করেছিল। ১৮৫৬ সাল পর্যন্ত বিহারে কোনো সংবাদপত্র লক্ষ করা যায়নি যেখানে দেশের অর্থনৈতিক সমস্যা সম্পর্কিত বিষয় আলোচিত হয়েছিল। পাটনা বিভাগের কমিশনার ডবলু টেলরই প্রথম বারের মত একটি উর্দু সাপ্তাহিক পত্রিকা আখবর- ই বেহার প্রকাশের ব্যবস্থা করেছিলেন। ১৯ শতকের ষাটের দশকে মাসিক সংবাদপত্র প্রকাশিত হতে শুরু করলে জনজীবনে সংবাদপত্রের গুরুত্বকে পুরোপুরি তালিকাভুক্ত করা হয়েছিল। জনগণের প্রতি সহানুভূতি থেকে ন্যায়বিচার ও তাঁদের উন্নতির জন্য সুনির্দিষ্ট প্রচেষ্টায় সংবাদপত্রগুলি কৃষক ও শ্রমিকদের কাছে পৌছেছিল। বিহারের প্রথম দিকের সংবাদপত্রগুলি শিক্ষার সাথে জড়িত ছিল। বিহারবন্ধু নামক পত্রিকাটি হিন্দি ভাষাকে সরকারী ভাষা প্রতিপন্ন করার দিকে বিশেষ ভাবে গুরুত্ব আরোপ করেছিল। সামাজিক ক্ষেত্রে বিহারবন্ধু উগ্র মতবাদের বিরোধী ছিল। ১৮৭৫ সালে বিহারে প্রথম ইংরেজি সংবাদপত্র বিহার হেরাল্ড (১৮৭২) গুরু প্রসাদ সেনের হাত ধরে প্রকাশিত হয়েছিল।[122] বাংলার দুই জাতীয়তাবাদী পত্রিকা ছিল অমৃতবাজার ও বেঙ্গলী। জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্রগুলি থেকে জানা যায় যে, শ্রমিক সংগ্রহ এবং তাদের পরিযায়ী করার ব্যবস্থাটির উপর ঔপনিবেশিক শক্তির বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি আরোপ করেছিলেন। হিন্দু পত্রিকা দ্বারা জানা যায় যে, বিদেশিদের দ্বারা লুণ্ঠিত হওয়ার চাইতে বরং এ দেশের খনিজ সম্পদ অব্যবহৃত থাকাও ভালো ছিল তাহলে অন্তত পরবর্তীকালে ভারতীয়রা নিজেদের কাজে ব্যবহার করার কথা ভাবতে পারবে। এই কথাটির সমর্থনে বেঙ্গলী পত্রিকার মন্তব্য ছিল যে, একটি প্রকৃত ভারতীয় সরকারের অন্তত এটুকু সুনিশ্চিত করা উচিত ছিল। এই দেশে 'যান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের' ক্রমাবনতির জন্য সংবাদ প্রভাকর পত্রিকার আন্তরিক ভাবে দুঃখ প্রকাশ করার কথা উঠে এলেও খনি শ্রমিকদের কথা বিশেষভাবে উঠে আসেনি।

ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ শক্তির ব্যবসা – বাণিজ্য বৃদ্ধি পাওয়ার সাথে সাথে খনি শিল্পের প্রতি উদ্যোগ বৃদ্ধি পেলেও ব্যাঙ্ক, স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল তৈরি হয়েছিল এবং ভারতীয় অর্থনৈতিক পরিস্থিতিকে পরিবর্তিত করেছিল। এই তথ্য বিহারের পত্র পত্রিকায় বারংবার

---

122. Jha. Dr. Jata Shankar, *Early Revolutionary Movement in Bihar,* Research Institute Patna, September 1977.

প্রকাশিত হয় যে, ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ শক্তি নিজেদের প্রয়োজনে দেশীয় অর্থকে ব্যবহার করে ভারতীয় অর্থনীতির সংজ্ঞা বদলে দিয়েছিল। এদেশের কৃষিজীবী থেকে শ্রমজীবী মানুষকে দিনের পর দিন শোষণ করে দরিদ্র্য পরিস্থিতির শিকার করে তুলেছিল। এই পরিস্থিতির শিকার হওয়ার আরও অন্য একটি কারণ ছিল ইংল্যান্ডের সামরিক বিভাগের প্রতি ব্যয় ক্রমশ হ্রাস করে ভারতের সামরিক বিভাগের ব্যয় ক্রমশ বৃদ্ধি করা হয়েছিল। ভারতে ঋন ও ব্যয়ের উদ্বেগজনক বৃদ্ধি উনবিংশ শতাব্দীর সর্বশ্রেষ্ঠ ব্রিটিশ অর্থদাতা মিঃ গ্ল্যাডস্টোনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল।[123] ইংল্যান্ডের শিক্ষিত শ্রমিকদের পোষণ করবার জন্য অধিকতর অর্থব্যয়ে প্রতি বিভাগেই একদল শ্বেতাঙ্গ নিয়োগ করা হয়েছিল। বাণিজ্য শুল্ক কারেন্সি এবং ঋণদান নীতি সকলেরেই এক লক্ষ্য ছিল- ব্রিটিশ শিল্পের সহায়তা করা এবং দেশীয় শিল্পকে ব্যবহার করা।[124]

আখবর- ই বিহার নামক একটি উর্দু পত্রিকা উইলিয়াম টেলারের সময় প্রচলিত হয়েছিল। এছাড়াও বিহার বন্ধু(১৮৭২) ও বিহার টাইমস (১৮৯৪) নামে হিন্দি পত্রিকা থেকে তৎকালীন ছোটনাগপুরের খনি অর্থনীতির কথা উঠে এসেছিল। এই পত্রিকা গুলির পাশাপাশি রস্ত গফতার ও কাইজার- ই- হিন্দ নামক পত্রিকাগুলি বম্বে মিলগুলির শ্রম সম্পর্কে ধারণা ব্যক্ত করলেও খনি শ্রমিক সম্পর্কে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করেনি। এই পত্রিকাগুলি থেকে মূলত বস্ত্র মিল মালিকরা শ্রমিকদের প্রতি শোষণের ইতিহাসগুলিও জানা যায়। খনি শিল্পাঞ্চলে কোনো রকম খনি শ্রমিকদের সমৃদ্ধি লক্ষ করা যায়নি। ইন্ডিয়ান স্পেক্টেটর দীর্ঘ সময় ধরে বোম্বে মিল অনার্স অ্যাসোসিয়েশন সম্পর্কিত নানা তথ্য প্রকাশিত করেছিল এবং অধিকাংশ তথ্যগুলি ছিল বোম্বে মিলের মজুর শ্রেণি সম্পর্কিত। বোম্বে মিলের মজুরি হ্রাসের বিষয় নিয়ে স্থানীয় মালিক ও শ্রমিক শ্রেণির দ্বন্দ্বের কথাও এই পত্রিকায় উল্লেখিত হয়েছিল। তৎকালীন সময়ে টাইমস অফ ইন্ডিয়া শ্রম আইনের কঠোরতা নিয়ে বিচার করেছিল।[125]

১৯০৯ সালে ইকোনোমিস্ট পত্রিকা থেকে জানা যায় যে, ঔপনিবেশিক পুঁজি নিয়ে বহুকাল ধরেই জাতীয় নেতৃবর্গের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল অস্পষ্ট, দ্বিধাগ্রস্থ ও বহুবিভক্ত। শিল্পোদ্যোগের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় সহায়তার এই উল্লেখযোগ্য দাবি সম্পর্কে যোশী উত্থাপন করেছিলেন। মূলত

---

123. *East India (Progress and Condition) MORAL AND MATERIAL PROGRESS AND CONDITION OF INDIA,* 1921, Deputy under Secretary State for India, Pp. 210.
124. *বাংলার কথা,* ১৭ই অগ্রহায়ন ১৩৩৫, (৩রা ডিসেম্বর, ১৯২৮)।

125. Times of India, (Daily Newspaper) 16th may, 1920. P. 6.

জাতীয়তাবাদী অর্থনীতিবিদদের মধ্যে ও জাতীয় সংবাদপত্র, সভা, সম্মেলন আদিবাসী শ্রমিক সম্পর্কিত দাবি ততটা সোচ্চার ভাবে তুলে ধরা হয়নি। দাদাভাই নৌরাজি লিখেছিলেন, বিদেশি শাসকরা প্রথমে এই দেশকে লুঠ করে চরম দুর্দশাগ্রস্থ হতভাগ্যে পরিণত করেছিল, তারপর ঐ লুঠ করা সম্পদকে ভূমি ও খনির মধ্যে নিজ প্রয়োজনে ব্যবহার করেছিল।[126] ১৮৮৫ সালে জোশী উল্লেখ করেছিলেন যে, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দিক দিয়ে ঔপনিবেশিক শক্তি ক্ষমতা সম্পত্তি ও সম্পদের দিকে আকৃষ্ট হয়েছিল, ফলে একটি শক্তিশালী বিদেশী বাণিজ্যিক স্বার্থ রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে সক্রিয় প্রভাব লক্ষ করা যায়নি। সর্বদাই ব্রিটিশরা চেষ্টা করত ক্ষমতাকে ব্যবহার করে নিজ স্বার্থের অনুকূলে দেশ ও সরকারের উপর প্রাধান্য বিস্তার করতে চেয়েছিল।

'বাংলার কথা' নামক বাংলার তৎকালীন পত্রিকা থেকে খনি কলকারখানার শ্রমিক সম্পর্কে একটি মন্তব্য উঠে এসেছিল তা হল, "চা- কারখানার মত, খনি কারখানা গুলি ছিল মানুষের রক্ত শোষণ করবার কারখানা"। এই কারখানায় দরিদ্র্য অশিক্ষিত শ্রমিকগণ যে যন্ত্রণা বহন করছে তাদের কথা শিক্ষিত লোকেদের কাছে পৌছায়নি। অশিক্ষিত আদিবাসী শ্রমিকদের বেদনাকে ভাষা দেবার মত শক্তি বা সাহস ছিল না।[127] ভারতীয় খনি কর্মচারী দ্বারা উত্থাপিত প্রস্তাবে খনি অঞ্চলে শ্রমিকদের অবস্থা তদন্ত করবার জন্য একটি কমিটি গঠন করার অনুরোধ জানানো হয়েছিল। বিহার ও উড়িষ্যার শ্রমিকদের অবস্থা পর্যবেক্ষণের জন্য বিহার ও উড়িষ্যা থেকে নির্বাচিত ২ জন সদস্যকে নিয়ে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছিল। ছোটনাগপুর মালভূমির মধ্যে আদিবাসী খনি শ্রমিকদিকে ট্রেড ইউনিয়ানের সাথে যুক্ত করার কথা প্রকাশিত হয়েছিল। এছাড়াও প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় আইনসভার শ্রমিক প্রতিনিধি মনোনীত নির্বাচিত করার কথাও প্রবর্তিত হয়েছিল।[128]

এরই মধ্যে বিহার ও জামশেদপুরে ৩০এ এপ্রিল বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে কয়লা খনি শ্রমিকদের মধ্যে অসন্তোষ ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাওয়ার কথা প্রকাশিত হয়েছিল। এই সম্মেলনে উপস্থিত জনসংখ্যা ছিল ৪০,০০০ জন। শ্রমিকদের দাবি যে মান্য হত না তার উদাহরণস্বরূপ

---

126. Naoroji. Dadabhai, *Poverty and Un- British Rule in India,* London, Publication Division, Ministry of Information and Broadcasting Government of India, First Published in 1901, Pp. 170-180.

127. *বাংলার কথা, (দৈনিক পত্রিকা),* ১৭ই অগ্রহায়ন ১৩৩৫, (৩রা ডিসেম্বর, ১৯২৮)। পৃ. ৫-৭

128. তদেব। পৃ. ৮

বলা যায় যে, টাইম রেটেড শ্রমিকেরা বোর্ডের বিশেষাধিকারে অনুযায়ী সঠিক মজুরী না পাওয়ার কথা উল্লেখিত হয়েছিল এছাড়াও কাজের অতিরিক্ত সময়ের মজুরী তাদের নিয়মিত ভাবে পরিশোধ হত না। ঘোষিত ছুটির দিনেও শ্রমিকদের ওয়াগনে আটকে রাখা হত।[129] এ প্রসঙ্গে অস্ট্রেলিয়ান প্রতিনিধি মিঃ জে, রায়ান ট্রেড ইউনিয়ানের কংগ্রেসে এসে মন্তব্য করেন যে, পূর্ব ভারতের খনি শ্রমিকগণ দুর্বিষহ জীবনের ভার গ্রহন করতে অক্ষম হয়ে পড়েছিল। সাম্রাজ্যবাদীদের হাত থেকে প্রাচ্যের পীড়িত জাতি যাতে উদ্ধার হয়ে স্বাধীনতা লাভ করতে পারে সে বিষয়ে সাহায্য করাকে প্রয়োজনীয় বলে মনে হয়েছিল। তিনি এদেশের পীড়িত, প্রান্তিকরা, শোষকদের হাত থেকে নিষ্কৃতি না পাওয়ার কথা উপলব্দধি করেছিলেন। অন্যান্য দেশের তুলনায় ভারতীয় খনি শ্রমিকদের অবস্থা নিকৃষ্ট ছিল বলে তিনি মনে করেছিলেন।[130] মিঃ হীরাচাদের অভিভাষণে, ভারতবর্ষে গত এক বছর যাবত বৈদেশিক শাসনের কুফল ভোগ করার কথা উঠে এসেছিল। এই দীর্ঘ সময় ধরে ভারতের উপর ঔপনিবেশিকদের নিয়মিত শোষণ চলার পাশাপাশি খনিতে শ্রমিক শোষণের কাজ চলেছিল। দেশের এই দুর্দশার প্রতিকারের জন্য প্রত্যেকের অবহিত হওয়া উচিত বলে তিনি মনে করেছিলেন। এ প্রসঙ্গে বঙ্গবাসী পত্রিকা সাম্প্রদায়িকতাকেই রাজনৈতিক জীবনের বিকাশ পথের প্রধান অন্তরায় বলে সমর্থন করেছিল।[131]

বিহার হেরাল্ড পত্রিকা থেকে খনিজ খনি গুলির শ্রমিকদের উপর কিছু তথ্য জানা যায়। প্রধানত খনিজ শিল্প গুলির উপর নতুন একটি অনুসন্ধানের জন্য অনুরোধ করা হয়। লোহা গলানোর খনি বিহার ও উড়িষ্যার সাংগার, দানোল, সম্বলপুর, ভান্ডারাতে লক্ষ করা গিয়েছিল। লোহার খনিগুলি ইজারার ভিত্তিতে গড়ে উঠেছিল। ইজারা বন্ধ হওয়া ও দুর্ভিক্ষের সময় লোহা শিল্পের সাথে একটি প্রতিকূল প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। দুর্ভিক্ষের সময় বিহার হেরেল্ড পত্রিকার একটি রিপোর্ট থেকে প্রতীয়মান হয় যে, দুর্ভিক্ষের ফলে লোহা শিল্পের ও যুক্ত শ্রমিকদের অনেকটা ক্ষতি সাধন হয়েছিল। বলা যেতে পারে লোহা শিল্পের সাথে যুক্ত আদিবাসী শ্রমিকদের কাজ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, অনেকেই বরখাস্ত হয়েছিলেন। সেক্ষেত্রে লোহা গলানোর কাজ

---

129. The Bihar Herald, VOL-XXIV, January 25, 1899, P. 5.

130. *বাংলার কথা, (দৈনিক পত্রিকা),* ৩রা পৌষ, ১৯২৮।

131. *বঙ্গবাসী পত্রিকা, ১৮৯০, ৩১ শে জ্যৈষ্ঠ।*

শ্রমিকদের অভাবে বন্ধ হয়ে যায়।[132] দেশীয় লোহার নমনীয়তার কারণে লোহা শিল্প থেকে রপ্তানি করা মূলধন কম উঠে এসেছিল যেখানে লোহা রপ্তানি করে ১৬০০ রুপি উঠে আসত অর্থাৎ অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অগ্রগতি হ্রাস পেয়েছিল।

বাংলা গণদাবী পত্রিকা দ্বারা জানা যায় যে, মুসাবনী তামা খনির আদিবাসী শ্রমিকদের উপর ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ শক্তির অত্যাচার বৃদ্ধি পেয়ে চলেছিল। কথায় কথায় শ্রমিকদের বরখাস্ত, জরিমানা ইত্যাদি করা হত। এ প্রসঙ্গে ইউনিয়ান নেতাদের কাছে শ্রমিকরা অভিযোগ জানালেও, আরো দশ বছর এই অত্যাচার সহ্য করে কাজ করার পরামর্শ দেওয়ার তথ্য উঠে এসেছিল। ইউনিয়ান নেতাদের এই কথায় বীতশ্রদ্ধ হয়ে তারা সংগ্রামের ডাক দিয়েছিল। বিহারের মুসাবনী তাম্র খনির সংগ্রামকারীদের সাথে কেও জোট বাঁধলে তাকে খনি থেকে বরখাস্ত করা হত বলে উল্লেখিত হয়।[133] এছাড়াও এই পত্রিকা থেকে জানা যায় যে, বিদেশী পুঁজি ব্যবহার করে এদেশের সম্পদ বৃদ্ধিতে যেটুকু সুবিধা পাওয়া যাচ্ছিল, তাও ছিল অত্যন্ত সীমাবদ্ধ বলে দাবি করেছিলেন এদেশের নেতারা।[134]

এদেশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতির জন্য ঔপনিবেশিক পুঁজির ব্যবহার অতি অল্প সংখ্যক বাড়তি কর্ম নিয়োগের সংস্থান করতে পেরেছিল। হিন্দু পত্রিকায় তাই আক্ষেপ করে লেখা হয়েছিল, খনি শিল্পে কর্ম নিয়োগের সুযোগ বৃদ্ধি পেলেও শিল্পগত জ্ঞান ও শিক্ষালাভের সুযোগ এদেশের শ্রমিকরা তা থেকে বঞ্চিত ছিল। বিদেশী সংস্থায় কর্মরত দেশীয় শ্রমিক যে মজুরী পেত তাতে সুস্থ ভাবে দৈনিক জীবনযাত্রা নির্বাহ করা যেত না। বিদেশী পুঁজির সমালোচকদের আরেকটি বক্তব্য ছিল যে, কুলির কাজ করে শ্রমিকরা যে মজুরী পেয়েছিল, তা যেকোন মানদণ্ডেই এদেশের সম্পদ শোষণের ও নিজস্ব শিল্পের ধ্বংসসাধনের ক্ষতি সামান্যই পূরণ হয়েছিল।

খনি ক্ষেত্রে আদিবাসী শ্রমের শোষণ চলার পাশাপাশি তৎকালীন প্রতিটি পত্রিকায় অর্থনৈতিক দারিদ্র্যতা ও দুর্ভিক্ষের কথা বারংবার উঠে এসেছিল। এই দরিদ্র্য অর্থনীতির ফলে

---

132. The Bihar Herald, VOL-XXIV, Saturday, February 15, 1839, P. 7

133. ব্যানার্জী. সুবোধ (সম্পা), *গণদাবী,* সোশ্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টারের বাংলা মুখপত্র পাক্ষিক, ৩রা মাঘ, মঙ্গলবার, ১৩৩৫, ১ম বর্ষ, ২২ সংখ্যা, পৃ. ৮

134. *বাংলার কথা, (দৈনিক পত্রিকা),* মঙ্গলবার, ১২ই জ্যৈষ্ঠ, ১৯৩০। পৃ. ৫

প্রান্তীয় আদিবাসীদের উপর ঔপনিবেশিক ও দেশীয় পুঁজিপতিদের শোষণ স্পস্ট হয়ে উঠেছিল। দেশের আর্থিক সংকটের প্রভাব যে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিল তাঁর প্রমান ১৮৭৬ সালে দাদাভাই নৌরাজি 'দারিদ্র্য'[135] গ্রন্থটি প্রকাশের মধ্য দিয়েই প্রকাশিত হয়েছিল। ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ শক্তির শিল্পক্ষেত্রে অতিরিক্ত পুঁজি ব্যয় ও অতিরিক্ত মুনফাকে কেন্দ্র করে দেশীয় অর্থনৈতিক পরিস্থিতিকে দরিদ্র্যতর করে তোলা হয়েছিল। এই চরম দুরাবস্থার সময়ে গড় আয়ের মধ্য দিয়ে জনসংখ্যার দরিদ্র্য অবস্থার একপ্রকার তুলনা করা হলেও সেই জনসংখ্যার মধ্যে আদিবাসী শ্রমিক শ্রেণি বাতিল তালিকায় ছিল। মাথাপিছু আয়ের বন্টন শুধুমাত্রও সাধারণ জনসংখ্যার মধ্যে নির্ণয় করা হয়েছিল। সাধারণত একটি শ্রমিক ও কৃষকের মজুরির সমতুল্য হলেও বড় বড় জমিদার, শুহুরে বনিক, গ্রামীণ ও শুহুরে মধ্যবিত্ত সবার আয় এক ছিল না। এ অর্থে দারিদ্র্য অবস্থা নির্ণয়ে অসম বণ্টনের ধারণা করা জাতীয়তাবাদী নেতাদের এক অর্থে ব্যর্থ ও ভ্রান্তিকর ছিল। সাধারণ জীবনযাত্রার ব্যায় বা পুষ্টির মান সম্পর্কে সমস্ত রাজ্যের সম্পূর্ণ তথ্য জাতীয়তাবাদী নেতাদের কাছে প্রায় ছিল না। ঐতিহাসিক তাঁরাচাদ মনে করে—

> "Imperial Britain treated dependent India as a satellite, whose main function was to sweat and labour for the master, to sub serve its economy and to enhance the glory of the empire".[136]

১৮৯২ সালেও সংবাদ প্রভাকর থেকে জানা যায় যে, "এদেশের লোক লক্ষ্মীহারা হইয়া নিতান্ত দীনবশে দাসত্বের শরন লইয়াছে"।[137] অতএব অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বাঙ্গালীর সমস্যা উনিশ শতকের মধ্যভাগ থেকেই বেশ জটিল রুপ ধারন করেছিল। বেকার জীবনের বিভীষিকা ঠিক ভয়াবহ রুপ ধারন না করলেও, শিক্ষিত বাঙালিদের উদ্বিগ্ন করলেও মন্তব্য যথেষ্ট ছিল না। ১৮৮০ সালে কর্ষিত জমির পরিমাণ যেখানে ১৯ কোটি ৪০ লক্ষ একর ছিল তা ১৮৯৮ সালে বৃদ্ধি পেয়ে হয়ে দাঁড়িয়েছিল ৮৪০ একর। সেই পরিস্থিতিতে খাদ্যের যোগান বৃদ্ধি পেলেও

---

135. Naoroji. Dadabhai, *Poverty and Un- British Rule in India,* London, Publication Division, Ministry of Information and Broadcasting Government of India, First Published in 1901,

136. চন্দ্র. বিপান, *ভারতে অর্থনৈতিক জাতীয়তাবাদের উদ্ভব ও বিকাশ,* কলকাতা, কে পি বাগচি অ্যান্ড কোম্পানি, ১৯৯৮, পৃ. ৪৮

137. *সংবাদ প্রভাকর,* (প্র্যাতাহিক পত্র) মাঘ ১২৪০ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৭

শ্রমের চাহিদাও বৃদ্ধি পেয়েছিল কিন্তু আয় বৃদ্ধি পায়নি কেননা আদিবাসী শ্রমিকরা তখন বিপুল করভারে জর্জরিত ছিল। এক কথাই বলা যায় এই জাতীয় বিরোধ ভারতীয় জাতীয়তাবাদী নেতারা সাধারণত উপভোগ করেছিলেন।

১৮৯১ সালের **৩১** মে দৈনিক ও সমাচার চন্দ্রিকার মত পত্রিকার মাধ্যমে জানা যায় যে, "রেল ব্যবস্থা দেশের অর্থনীতিকে দরিদ্র্য করে ফেলার অন্যতম কারণ ছিল"। রেলশিল্প আশীর্বাদের বদলে অভিশাপ হয়ে দাঁড়িয়েছিল আদিবাসী শ্রমিকদের পক্ষে। ঠিক একইভাবে ইন্দু প্রকাশ **১৯০৪** সালের ৩০ সে নভেম্বর অভিযোগ করেছিল যে, রেলপথ ভারতের অর্থনৈতিক উন্নতির মূলেই কুঠারাঘাত করেছিল।[138] এই পরিস্থিতিতে আদিবাসী শ্রমিক ও কৃষকদের অর্থনীতি চাঙ্গা হয়ে উঠেনি। জাতীয় নেতাদের কাছে বৈদেশিক বাণিজ্য গুরুত্বপূর্ণ ছিল শুধু এই কারনেই দরিদ্র্যতা, বিদেশী রাষ্ট্রের দ্বারা অর্থনৈতিক শোষণ উদ্ভাসিত হয়েছিল।[139] **১৯০৩** সালের ২৩ সে ফেব্রুয়ারী অমৃত বাজার পত্রিকায় উল্লেখিত হয়, দেশের বর্তমান অবস্থার প্রেক্ষিতে ঔপনিবেশিক পুঁজির বিরোধিতা করা একান্তই মূর্খতা ছিল, অনেকটা আত্মহত্যার সমান। আসলে এদেশের শিল্পপতিরা দেশের শিল্প বাণিজ্যকে উন্নীত করবে এই আশা নিয়ে তাদের একাংশ ব্রিটিশ বাণিজ্য সংস্থাকে মূলধন লগ্নি করতে সমর্থন করেছিল। সেইসময় অতিরিক্ত উদ্বাস্তুর আগমন দেশের সকল জনগণের খাবারে ঘাটতি তৈরি করেছিল যার ফলে দারিদ্র্যে পরিস্থিতির প্রভাব কৃষক থেকে শ্রমিকদের মধ্যে নিত্য দিন বৃদ্ধি পেয়েই চলেছিল।

ব্রিটিশ অর্থনীতিকে জোরালো ভাষায় 'Verily the moisture of India blesses and fertilizes other land'[140] বলা হলে পরে ব্রিটিশ অর্থনীতির বিরুদ্ধে এগিয়ে আসেন ডি ডি জোশী, গোপাল কৃষ্ণ গোখলে, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। এই মতামত দ্রুত জনগণের কাছে পৌঁছে দিয়েছিল আনন্দবাজার পত্রিকা। অর্থনৈতিক সমস্যাকে স্বীকার করে নিলেও অর্থনৈতিক সমস্যার বিরোধিতা করার উপায় সন্ধানের প্রয়াস ততটা হয়নি। ঔপনিবেশিকদের সাথে সাথে দেশীয় পুঁজিপতিরা তাদের প্রতি অবহেলা প্রদর্শন করেছিলেন ও অন্যদিক থেকে বলা যায় স্বাধীনতা পরবর্তীকালে কাজ করার ভিন্ন ক্ষেত্র তৈরি না হওয়ায় খনি ও খাদানের মত শিল্পে

138. *সমাচার চন্দ্রিকা, দৈনিক, ১৮৯১, ১৬ই আশ্বিন,* পৃ. ৯৯
139. Times of India, (Daily), 11 and 18 march, 1923.
140. *বাংলার কথা, (দৈনিক পত্রিকা),* ৮ই মাঘ, ১৩৩৭, পৃ. ৮।

নিযুক্ত থাকতে বাধ্য হয়েছিল আদিবাসী শ্রমিকরা। খনিজ খনিগুলিতে ঔপনিবেশিক শক্তির পাশাপাশি দেশীয় পুঁজিপতিদের উদ্ভব ও জাতীয়তাবাদী প্রেক্ষাপটে আদিবাসী শ্রমের এই করুন পরিস্থিতি লক্ষ করা যায়। এই পরিস্থিতি কয়লার মত অন্যান্য খনি ক্ষেত্রেও ঘন হয়ে দেখা দিয়েছিল। পরিযায়ী শ্রমিকদের ক্রমবর্ধমান দুর্দশার ছবি ও পুঁজিবাদী শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম ব্যতীত বাঁচার যে উপায় নেই তা উপলব্দধি করা যায় আদিবাসী পুরুষ তথা মহিলা শ্রমিকদের যোগদানের মধ্য দিয়ে। তবে এ প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে যে, জাতীয়তাবাদের আদর্শ কিছু বছরের মধ্যে লুপ্ত হয়ে যায়নি বরং এই আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে স্থানীয় পুঁজিপতিদের উদ্যোগে খনি শিল্প প্রসারিত হলে আদিবাসী পুরুষদের পাশাপাশি মহিলা শ্রমিকদের যোগদান খনি ক্ষেত্রে অধিক হতে থাকে। খনি শিল্পে আদিবাসীদের এই শোচনীয় অবস্থায় আদিবাসী মহিলাদের শ্রমের বাজার গঠন হতে থাকে যা পরবর্তী অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচিত হয়েছে।

পর্যবেক্ষণ

এই অধ্যায়টি মূলত ১৮৫০ সাল থেকে ১৯৩০ সাল পর্যন্ত আলোচনা করা হয়েছে। ১৮৫০ সাল থেকে এই অধ্যায় আলোচনা করার কারণ হল ছোটনাগপুরের খনি অর্থনীতির সাথে জাতীয়তাবাদী প্রভাব ও ভাবধারা প্রসারিত হয়েছিল। তাঁর প্রকৃষ্ট উদাহরণ হল রেলপথ স্থাপন। ভারতবর্ষে রেলপথ স্থাপনের মধ্য দিয়েই ছোটনাগপুর মালভূমি অঞ্চলে খনি শিল্পের সম্প্রসারণ হয়েছিল। উপরিক্ত অধ্যায়ে তথ্যের ভিত্তিতে উপলব্দধি করা যায় যে, ব্রিটিশ শক্তি অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতার উচ্চতায় দেশীয় পুঁজিপতিদের ঊর্ধ্বমুখী আরোহণে যে বুদ্ধিবৃত্তিক কাঠামো তৈরি করেছিল তা তৎকালীন সাধারণ জনগণের উপলব্দধির বাইরে ছিল। ঔপনিবেশিক শক্তি দেশীয় পুঁজিপতিদের ব্যবহার করে অর্থনীতিকে উজ্জীবিত করতে চেয়েছিলেন নিজেদের স্বার্থে। সেই স্বার্থকে বুঝতে ভারতবাসী ব্যর্থ হলে জাতীয়তাবাদী আদর্শের নাম দিয়ে দেশীয় পুঁজিপতিরা ছোটনাগপুর অঞ্চলকে প্রশাসনিক ও আর্থিক ভাবে নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করেছিলেন। শিল্পায়নের মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়ন অবশ্যই বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যাবাসীদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ হলেও আদিবাসী শ্রমিকদের জীবনযাত্রার মানের উন্নয়ন হয়নি। আদিবাসী জীবনযাত্রাকে বিশৃঙ্খল করে তুলেছিল ঔপনিবেশিক থেকে দেশীয় পুঁজিপতিদের ক্ষমতার প্রয়োগ। পুঁজিপতি অনুশাসনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হিসাবে আদিবাসী শ্রমজীবী মানুষের

অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে অবরোধ সৃষ্টি করা হয়েছিল ভিন্ন ভিন্ন প্রক্রিয়ায়। জাতীয়তাবাদী নেতারা একাগ্রভাবে এবং নিষ্ঠার সাথে শুধু দ্রুত শিল্পায়নই চেয়েছিলেন, তাতে অসুবিধার কথা নিয়ে বিন্দুমাত্রও ভাবেননি। আদিবাসী অর্থনীতি অগ্রগতিতে বাঁধা দিনের পর দিন দৃষ্টির অন্তরালে শ্রমের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠা সভ্যতার এই পীলসুজের দায়িত্ব নিতে হয়েছিল আদিবাসী শ্রমিক শ্রেণিকেই। খনির আদিবাসী শ্রমিক শ্রেণির এই চিত্রের পশ্চাতে জাতীয়তাবাদী আদর্শের দায়বদ্ধতা কতটা ছিল তা উল্লেখ করার প্রসঙ্গেই এই অধ্যায় আলোচিত হয়েছে। খনি শিল্পে আদিবাসীদের এই শোচনীয় অবস্থার পাশাপাশি আদিবাসী শ্রমিকদের মধ্যে মহিলাদের যোগদান গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠে তা পরবর্তী অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়

বিবর্তিত আদিবাসী কৃষক সমাজ ও আদিবাসী মহিলাদের শ্রমের বাজার

(১৮৯০-১৯৪০)

ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষের ছোটনাগপুর মালভূমি অঞ্চলে সামাজিক ও অর্থনৈতিক যে পরিবর্তনগুলি ঘটেছিল তা মূলত একটি বিবর্তনীয় প্রকৃতির ছিল। বিবর্তনীয় দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমে সামাজিক শ্রমের অস্তিত্বের প্রক্রিয়াটি স্পষ্টই সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। আঞ্চলিক ভারতীয় রাজনৈতিক কর্তৃত্বের পতন এবং প্রত্যক্ষ কোম্পানির আধিপত্য প্রতিষ্ঠার সময়ে বিশেষ করে শ্রমশক্তির চরিত্রে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটেছিল তা আগের অধ্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকে ছোটনাগপুরের অঞ্চলগুলিতে ভারী শিল্প গড়ে উঠতে থাকলে জমির সাথে যুক্ত আদিবাসী মহিলা কৃষকরা খনি কারখানায় শ্রম বিক্রয় করে শ্রমিকশ্রেণি রূপে আবির্ভূত হতে থাকে। জমি ভিত্তিক উৎপাদন পদ্ধতি থেকে বেরিয়ে এসে পুঁজি ভিত্তিক উৎপাদন পদ্ধতি অর্থাৎ খনি ও ভারী শিল্প ক্ষেত্রগুলিতে আদিবাসী পুরুষদের পাশাপাশি মহিলাদের সংখ্যা ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পেয়েছিল এবং খনি অঞ্চলে কর্মে যুক্ত হবার পর থেকেই আদিবাসী মহিলাদের শ্রমের বাজার গঠিত হয়েছিল। শিল্পে নিযুক্ত আদিবাসী মহিলারা ভারবাহী শ্রমসাধ্য কাজের জন্য প্রসিদ্ধ হতে শুরু করে। তারা খনি এলাকায় যোগদানের জন্য দ্রুত পরিযায়ী হতে থাকে এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে। আলোচ্য অধ্যায়ে আদিবাসী মহিলা শ্রমিকদের খনি কর্ম ক্ষেত্রে অভিপ্রয়ান ও শ্রম শক্তি ব্যবহারের ইতিহাস এই অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে। মূলত ছোটনাগপুর মালভূমি কেন্দ্রিক আদিবাসী মেয়েদের আর্থ- সামাজিক পটভূমিতে অভিবাসনের কারণ, পদ্ধতি ও ফলাফল নিয়ে আলোচনা করার পাশাপাশি খনি ও ভারী শিল্পে আদিবাসী নারীদের যোগদানে শ্রমের বাজার গঠনের তথ্য বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করা হয়েছে। আদিবাসী মহিলারা খনি এলাকায় একই সাথে সামাজিক ও রাষ্ট্রিক উৎপাদনে শুধুই উৎপাদকের ভূমিকা পালন করে চলেছিল। বিবর্তিত আদিবাসী কৃষক সমাজে আদিবাসী মহিলা শ্রমিকের উত্থান পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক কাঠামোয় লিঙ্গ ও জাত নির্বিশেষে শ্রেণি শোষণ ও বৈষম্যের পুনরুৎপাদন লক্ষ করা যায়। শ্রম বিভাজনের মধ্য দিয়েই ব্যাখ্যা করা হয়েছে ছোটনাগপুর মালভূমি সংক্রান্ত পশ্চিমবঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যা রাজ্যের খনি ও খাদানের মহিলা শ্রমিক বাজার গঠনের মুল্যহীন শ্রমের ইতিহাস।

মানুষের সমাজ, সভ্যতা ও সংস্কৃতির ইতিহাসের ধারা কখনোই এক সরলরেখায় প্রবাহিত হয়নি। এই ইতিহাসের মূল ধারাটি ছিল মানুষের জীবন সংগ্রামের ধারা। যুগ থেকে যুগান্তরে

যাত্রার চালকশক্তি ছিল উৎপাদন পদ্ধতি। উৎপাদন পদ্ধতিকে মানুষ গ্রহণ করাতে বাধ্য হয়েছিল জীবন ধারণের তাগিদে এবং তার ফলে সমাজের মধ্যে একটি মানুষের সাথে আরেকটি মানুষের একটা জটিল সামাজিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল। এই সামাজিক সম্পর্কের মধ্য দিয়েই অর্থনৈতিক উৎপাদন পদ্ধতিতে রুপান্তর ঘটতে থাকে। বাস্তব জীবন সংগ্রাম অর্থনৈতিক শ্রেণি সংগ্রামের মধ্য দিয়ে পরিবর্তিত হয়েছিল।[1] আদিবাসী জনজাতিকে সমাজের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে নিয়ে যেতে অর্থাৎ কৃষক থেকে শ্রমিকে পরিণত করতে ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ শক্তি থেকে স্থানীয় পুঁজিপতিদের ক্রমশ চক্রান্ত যা পূর্ববর্তী অধ্যায়ে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছিল। অর্থনীতিতে জাতীয়তাবাদী ভাবধারা প্রবেশের ফলে খনি শ্রমশক্তিতে আদিবাসী পুরুষদের পাশাপাশি মহিলাদের কঠোর শ্রমের সাথে পরিচিত হয় এবং ধীরে ধীরে তাঁদেরকে নিয়ে অবৈধ শ্রম বাজারের এক বিছিন্ন ইতিহাস গড়ে উঠেছিল।[2]

সেই ইতিহাসের বিস্তারিত পর্যালোচনায় একই ভাবেই বলা যায়, ঔপনিবেশিক পূর্ব ভারতের ছোটনাগপুর অঞ্চলে আদিবাসী জনজাতির বসবাস বৈচিত্রপূর্ণ ও বৈশিষ্ট্যে স্বতন্ত্র ছিল। বৈচিত্র্যপূর্ণ বৈশিষ্ট্যে আদিবাসী পুরুষদের পাশাপাশি আদিবাসী নারীর সামাজিক ও অর্থনৈতিক দায়িত্ব ছিল সমান ভাবে গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু এই স্বতন্ত্রতা খুব বেশি দিন দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। লর্ড লিটনের শাসনকালের শেষদিক থেকে আদিবাসী চাষিদের দুঃখদুর্দশার পাশাপাশি ইতিহাসের সিংহাবোলোচনে আদিবাসী সাঁওতাল নারী চর্চিত হয়েছিল এক ভিন্ন মাত্রায়। আর্থ সামাজিক পীড়নে, শিক্ষাহীনতায়, মানসিক পুষ্টিহীনতার এক অন্ধকার জীবনযাপনে অভ্যস্ত বৃহৎ কৃষক সমাজ যখন পঙ্গু ছিল তখন সেই পরিস্থিতিতে সাঁওতাল মেয়েরা সামাজিক ভাবে পশ্চাৎপদ ছিল, তা সহজেই অনুমান করা যায় সাঁওতাল বিদ্রোহের ইতিহাস পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে। সামাজিক ভাবে আদিবাসী মেয়েরা পশ্চাৎপদ হলেও অর্থনৈতিক উৎস সংক্রান্ত বিষয়ে সচেতন ছিল। অর্থনীতিকে কেন্দ্র করে বস্তুত জোতদার, জমিদার, বণিক শ্রেণি, ব্রিটিশ আমালাদের শোষণের বিরুদ্ধে আদিবাসী মহিলাদের বিদ্রোহে যোগদানের ঘটনা বিশেষভাবে আদিবাসী বিদ্রোহগুলিতে গুরুত্বপূর্ণ ছিল। যার ইতিহাস বিস্তারিত ভাবে পূর্ববর্তী অধ্যায়ে উল্লেখ করা

---

1. ঘোষ. বিনয়, *বাংলার নবজাগৃতি,* কলকাতা, ওরিয়েন্ট ব্ল্যাক সোয়ান প্রাইভেট লিমিটেড, প্রথম সংস্করণ ১৯৭৯, পৃ. ১১।

2. চক্রবর্তী. দীপঙ্কর (সম্পা), *আদিবাসী নারী,* অনিক পত্রিকা (মাসিক পত্রিকা), সেপ্টেম্বর ২০১৩, পৃ. ৮৬

হয়েছে। ঔপনিবেশিক কাল থেকে সামাজিক ও অর্থনৈতিক কাঠামোগত বৈশিষ্ট্যে কৃষির সাথে প্রান্তিক আদিবাসী মানুষদের পারস্পরিক সম্পর্ক ছিল। তৎকালীন সামাজিক প্রেক্ষাপটের পর্যায় থেকে সাঁওতাল মহিলাদের সামাজিক ক্ষমতায়ন ও পরিচয়ের প্রশ্ন তোলা শুরু হলে আদিবাসী মহিলাদের আর্থিক ভাবে পরনির্ভরতা ও অধীনতা সংক্রান্ত নানা বিতর্ক ঐতিহাসিক মহলে লক্ষ করা যায়। এই প্রেক্ষাপটের পথ ধরেই আদিবাসী নারীদের মুখ্য জীবিকার সন্ধান প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছিল। এ প্রসঙ্গে বলা যায় যে, ঔপনিবেশিক যুগে কৃষিই ছিল একমাত্র জীবিকা নির্বাহের প্রধান সম্বল আদিবাসী মহিলাদের নিকটে। ছোটনাগপুর মালভূমির অর্থনৈতিক ইতিহাসে আদিবাসী মহিলাদের সম্পূর্ণ জীবনযাত্রা কৃষিকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হত। ঔপনিবেশিক আমলের প্রথম থেকেই কৃষিক্ষেত্রে সর্বাধিক অংশগ্রহণ ছিল প্রান্তীয় আদিবাসী মহিলাদের। তৎকালীন রিপোর্ট ও তথ্যের ভিত্তিতে অনুভূত হয়, কৃষির সাথে আদিবাসী মহিলাদের সম্পর্ক সম্পৃক্ত হলেও জমির উপর তাদের নিজস্ব কোনো অধিকার ছিল না। বহিরাগত সংস্কৃতির প্রভাব ও পুরুষতান্ত্রিক সমাজের আরোপিত নিয়ম নীতি ‘জমি’ নামক সম্পত্তির উপর থেকে মহিলাদের অধিকারকে বঞ্চিত করে রাখা হয়েছিল। আদিবাসী যৌথ পরিবারের মূল নীতিই ছিল নারীদের সমান অধিকার প্রদানের বিরুদ্ধে।[3] ঔপনিবেশিক আমলে আদিবাসী মহিলা কৃষকরা প্রত্যেকেই জমিদারের জমির উপর নির্ভরশীল হয়ে কাজ করত। অন্যের জমিতে তারা ছিল পুরোপুরি নিয়ন্ত্রিত। জমির উপর অধিকার না থাকায় তারা সাধারণত অন্যের জমিতে কৃষক মজুর হিসাবে কাজ করত। উনবিংশ শতাব্দীতে পূর্ব বিহারে ‘দাসত্ব’ ও ‘বন্ডেজ’ নামক প্রথায় আদিবাসী মহিলা কৃষক মজুরদের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায়। ‘বন্ডেজ’ কৃষকদের পাশাপাশি কামিয়তি[4] নামক আদিবাসী মহিলাদেরও পরিচয় পাওয়া যায়। ‘বন্ডেজ’ কৃষকদের সাথে মালিক বা প্রভুর সম্পর্ক দীর্ঘস্থায়ী হওয়ার ফলে এক কর্তৃত্বপূর্ণ সামাজিক সম্পর্ক গড়ে উঠতে থাকে ভাগচাষী ও জমির মালিকের মধ্যে[5]। আদিবাসী মেয়েরা এই সম্পর্কের একটি গুরুত্বপূর্ণ একক ছিল। ১৮৪৩ এর পর থেকে কামিয়তি প্রথা বিলুপ্ত হলেও

---

3. Sreenivas. Mytheli, *Conjugality and Capital: Gender, Families, and Property under colonial Law in India,* The journal of Asian studies 63, no-4, November 2004, Pp. 937-960.

4. Prakash. Gyan, *Bonded Histories: Genealogies of Labour Servitude in Colonial India,* Cambridge, Cambridge University Press, 1990, Pp. 13-17.

5. তদেব।

সামগ্রিক ভাবে শেষ হয়ে যায়নি। ঔপনিবেশিক আলোচনায় সম্পত্তির মালিকানার বিষয়টিতে আইনত ভাবে মহিলাদের অধিকারের কথা বলা হলেও বিশেষভাবে গুরুত্ব আরোপ করা হয়নি। জমিকে কেন্দ্র করেই আদিবাসী মহিলাদের যে জীবনযাপন নিয়ন্ত্রিত হত এ ধারনা সঠিক ছিল না। জমি ও সম্পত্তির উপর অধিকার না থাকায় জমির সাথে আদিবাসী মহিলাদের এই অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক স্তিমিত হয়ে এলে যন্ত্র শিল্পের উপর নির্ভরশীলতা ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পেয়েছিল।

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে ছোটনাগপুর মালভূমি অঞ্চলের আদিবাসী কৃষকেরা জমি থেকে উচ্ছেদিত হলে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে তাদের আয়ের সুযোগ হ্রাস পেতে থাকে। জমির সাথে আদিবাসী মহিলাদের সম্পর্ক ক্ষীণ হয় ধীরে ধীরে। জমির সাথে এই সম্পর্কের ফলস্বরূপ নিত্যদিনের কর্ম সংস্থানের অভাব দেখা যায়। জমিহীন পরিস্থিতিতে সামাজিক ও অর্থনৈতিক বঞ্চনার মোকাবিলায় আদিবাসী মহিলাদের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে নিত্য নৈমিত্তিক ভাবে অংশগ্রহণ একটি বড় প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছিল। অন্যদিকে ঔপনিবেশিক পর্যায়ে দেশের শ্রমশক্তিতে আদিবাসী মেয়েদের অংশগ্রহণের আলোচনায় অর্থনৈতিক অবস্থা শোচনীয় থাকার ইঙ্গিত দিয়েছিল তা স্পষ্ট করে অবগত হওয়া যায়। উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে ভূমি সম্পর্কিত অর্থনৈতিক পরিবর্তনের ফলে ভূমির সাথে জড়িত 'কামিয়া' ও 'বন্ডেজ' মহিলা আদিবাসী শ্রমিকরা রাষ্ট্রীয় উৎপাদন সম্পর্কের ক্ষেত্রে জড়িত হয়েছিল। কৃষি থেকে শিল্পে উৎপাদিত পণ্যের সাথে সাথে আদিবাসী মহিলাদের শ্রমের বাণিজ্যিকরণ হওয়া শুরু হয় যার ফলে মহিলা শ্রমিক শ্রেণির চাহিদার নতুন ক্ষেত্র তৈরি হতে থাকে। জমির উপর মালিকানা নিয়ন্ত্রণ করে কামিয়াদের[6] উপর তাদের ক্ষমতার প্রজননের মাধ্যমে আদিবাসী মহিলা শ্রেণির শ্রমের বাজার তৈরি হওয়ার প্রথম প্রক্রিয়া শুরু হয় অভিবাসন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে।

আদিবাসী মহিলা শ্রেণির অভিবাসন ও ভারী শিল্পে যোগদান

ঔপনিবেশিক সমাজে দ্রুত শিল্পায়নের কর্মসূচীতে পরিকল্পনাকারী এবং নীতিনির্ধারকরা শিল্পায়ন বৃদ্ধির সাথে সাথে 'মহিলা শ্রম বাজার' ও 'পরিযায়ী' নামক দুটি সাধারণ সামাজিক সমস্যার

6. কামিয়া নামে অভিহিত গয়া জেলার এই শ্রমিকেরা প্রধানত ভুঁইয়া বর্ণের ছিল। দক্ষিণ বিহারের ভুইয়ারা নিম্ন বর্ণের কামিয়া হিসাবে অধীনস্ত ছিল হিন্দুরা ও ধানের সেচ উন্নয়নে নিযুক্ত ছিল।

কথা বিশেষ ভাবে উল্লেখ করেছিলেন ইতিহাসের পাতায়। উনবিংশ শতকের মধ্য ভাগ থেকে বানিজ্যিকরণ ফসল পাট, বয়ন, চা, কয়লা, লোহা, ইস্পাতের মত ভারী শিল্পের কারখানা গড়ে উঠলেও আদিবাসী মহিলাদের অংশগ্রহণ ছোটনাগপুর মালভূমির কয়লা, অভ্র ও লৌহ আকরিকের মত অন্যান্য খনিজ শিল্পে অধিক লক্ষ করা যায় অর্থাৎ কিনা ভারী শিল্পাঞ্চলগুলিতে উদ্বৃত্ত শ্রমশক্তির বিকাশের ক্ষেত্র প্রস্তুত হতে দেখা যায়। এই বিকশিত ক্ষেত্র গুলিতে পদার্পণ করার জন্য 'অভিবাসন' নামক প্রক্রিয়ার সাথে আদিবাসী মেয়েরা নিজেদেরকে নিয়োজিত করে ফেলেছিল। 'অভিবাসন' নামক প্রক্রিয়াটি ছিল আদিবাসী মহিলাদের শ্রমের বাজারে প্রবেশের প্রথম ধাপ। অভিবাসনের ক্ষেত্রে, ঔপনিবেশিক শক্তি স্থানীয় শ্রমের চেয়ে আদিবাসী কর্মী বাছায়ের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে গুরুত্ব দিয়েছিল কেননা, আদিবাসী কর্মী বাহিনী নিয়োগের অনুভূত সুবিধা ছিল উপলব্ধ শ্রম ও অত্যাধিক শ্রমের ঘাটতি পূরণ করার সাম্ভাব্যতা। আসলে সস্তা এবং স্থিতিশীল শ্রম শক্তিকে স্থায়ী করার জন্য 'অভিবাসনের' মত কৌশলকে বাস্তবায়ন করা শুধুমাত্র সম্ভব ছিল সমাজের প্রান্তিক, অশিক্ষিত, অদক্ষ আদিবাসী মহিলাদের মধ্যে। তারা সমাজে যেমন ক্ষমতাহীন ছিল ঠিক তেমনই সর্বাপেক্ষা সামাজিক ভাবে শোষিত ও বঞ্চিত ছিল। ঔপনিবেশিক সরকার সামাজিক মৌলিক কাঠামোর মধ্যে আন্তঃসম্পর্কগুলিকে মিথস্ক্রিয়ার মধ্যে অভিবাসন প্রক্রিয়াকে জটিল আকার দিয়েছিল। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে জমি ভিন্ন বিকল্প পেশায় আদিবাসী মহিলাদের অভিবাসন দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছিল। উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধ থেকে অর্থনৈতিক আদিবাসী শ্রমিক ইতিহাস চর্চায় 'বাস্তুচ্যুতি' একটি বৃহত্তর সমস্যার রূপ নিয়েছিল। উনবিংশ শতকের শেষ ভাগ থেকে বিংশ শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত বাংলা ও বিহারে গ্রামীণ আদিবাসী প্রান্তিক মহিলাদের একটি বড় অংশ জমি থেকে কাজ হারিয়ে বা জমি হারিয়ে রাজ্য থেকে গ্রামের অন্তরভাগে অভিবাসন করেছিল। এই অভিবাসন গ্রাম থেকে গ্রাম, গ্রাম থেকে শহরে ও রাজ্য থেকে ভিন রাজ্যে[7] দেখা গিয়েছিল যার বিস্তৃত বিবরণ হরপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় তাঁর গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। যেহেতু ছোটনাগপুর মালভূমির অধিকাংশ অংশ জুড়ে বর্তমান ঝাড়খণ্ড রাজ্য অন্তর্ভুক্ত ছিল তাই অভিবাসনের ক্ষেত্রে বিহার থেকে বাংলা, বাংলা থেকে বিহার, বিহার থেকে উড়িষ্যা ও উড়িষ্যা থেকে বাংলায় আদিবাসী মহিলাদের অভিবাসন লক্ষ করা যায়। জীবিকার জন্য অসংগঠিত ক্ষেত্রে পুরুষদের পাশাপাশি আদিবাসী মহিলারা জোটবদ্ধ হয়ে

7. Chattopadhyaya. Haraprasad, *Internal Migration in India a case study of Bengal,* Calcutta, K. P. Bagchi and Company, 1987, p. 55, 198.

দেশের নানা প্রান্তরে অভিপ্রয়ান করতে শুরু করেছিল। ১৮৭০-৭৫ সালের দিক থেকে ছোটনাগপুর মালভূমি অঞ্চলের মানভুম, বরাভুম, পালামৌ, বাঁকুড়া ও বীরভূমের সাঁওতাল আদিবাসীদের অধিক সংখ্যায় পরিযায়ী হওয়ার তথ্য লক্ষ করা যায়। বিহার থেকে বাংলায় যে আদিবাসী মহিলারা অভিবাসিত হয়েছিল, তার মধ্যে ছোটনাগপুর মালভূমি এবং উড়িষ্যার খনি ক্ষেত্রগুলি বিশেষভাবে অন্তর্ভুক্ত ছিল। স্বাভাবিকভাবেই বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার আদিবাসীরা জীবিকার সন্ধানে নতুন বসতির জন্য ফেলে এসেছিল তাদের বাড়ি-ঘর, পরিবার পরিজন ও ফসলহীন এক টুকরো জমির স্মৃতি।

সাঁওতাল পরগনা ও দুমকা জেলার শিকতিয়া, খগা, সারসা, পালাজোড়ি, সটকি থেকে আদিবাসীদের মধ্যে সাঁওতাল, কোল সম্প্রদায়ভুক্ত মহিলা শ্রমিকরা অভিবাসনে অংশগ্রহণ করেছিলেন। যদিও আদিবাসী মহিলা ভিন্ন 'বিহারি' মহিলাদের খনির কাজে অংশ্রহনের ইতিহাস জানা যায়। ১,০৪০ আদিবাসী পরিবার জামশেদপুর, মানভুম, সিংভুম, সারন, হাজারীবাগ, গয়া, শাহবাদ, মুজাফরপুর, দ্বারভাঙ্গা, ভাগলপুর ও বিহার থেকে এসেছিল।[8] জামশেদপুর, বিহার, বাংলা, উড়িষ্যা, মাদ্রাজ, পাঞ্জাব, আসাম থেকে ৩০৫ জন অদক্ষ আদিবাসী মহিলা শ্রমিকের আগমন ঘটেছিল। ১৮৯১ এর সেন্সাসের রিপোর্ট থেকে ৫৬,৯৮৫ জন শ্রমিকের পরিযায়ী হওয়ার কথা জানা যায়। তবে উড়িষ্যা থেকে যে সমস্ত শ্রমিকেরা পশ্চিমবঙ্গে এসেছিল তাদের অধিকাংশ দঃ২৪পরগণা (১১,৫৬১), কলকাতা (২৫,৫১৮), হুগলি (২,৭৫০), মেদিনিপুর (৩,২৭৩), হাওড়া (৪,১৮৩) অঞ্চলে স্থায়ী বসতি গড়ে তুলেছিল। অন্যদিকে বাংলা থেকে উড়িষ্যায় পরিযায়ী হয়েছিল ১৮,৩৩৪ জন শ্রমিক। কিছু শ্রমিক যারা উড়িষ্যা থেকে উত্তরবঙ্গে ও পূর্ববঙ্গেও পরিযায়ী হয়েছিল। তাদের সংখ্যা যদিও ছিল খুব সামান্য।[9] উড়িষ্যার কটক ও বালাসোর থেকে বর্ধমান, বাঁকুড়া, বীরভূম ও মেদিনীপুরে আদিবাসী মহিলা শ্রমিকরা পরিযায়ী হয়েছিল ৬৫,৯৪৫ জন। অন্যদিকে বাংলা থেকে উড়িষ্যাতেও আদিবাসী মহিলা শ্রমিকদের অভিবাসন ঘটেছিল। তৎকালীন সময়ে বীরভূম ছিল সাঁওতাল পরগণার একটি বড় অংশ। বীরভূমের সাঁওতালরা তাদের প্রতিদিনের রুটি রোজকারের জন্য জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে ঘুরে

---

8. *Report of the Bihar Labour Enquiry Committee,* Vol-1, Patna, Bihar, 1940, p. 33-36.
9. Chattopadhyaya. Haraprasad, *Internal Migration in India a case study of Bengal,* Calcutta, K.P. Bagchi and Company, 1987, p. 292.

বেড়াত[10] উদাহরণ স্বরূপ, পাকুড়, রামপুরহাট, বোলপুর, সিউড়ির কথা উল্লেখ করা যায়। বাঁকুড়ার স্থানীয় সাঁওতালরা বছরের নির্দিষ্ট কিছু অংশে তাদের আয়ের পরিপূরক হিসাবে নিজস্ব বাড়ি ত্যাগ করে অস্থায়ীভাবে কয়লাক্ষেত্রে বসতি স্থাপন করেছিল।[11] স্থানীয় সাঁওতালরা বছরের নির্দিষ্ট কিছু অংশে তাদের আয় পরিপূর্ণ করতে বিহার, পশ্চিমবঙ্গের বীরভূম, বাঁকুড়া থেকে ধানবাদ, গিরিডির কয়লাক্ষেত্রে একে একে যোগ দিয়েছিল।[12] আদিবাসীদের অধিকাংশই এসেছিল বাংলার আশেপাশের এলাকা ও জেলার কৃষিজীবী ও জেলে সম্প্রদায় থেকে। বিহার, উড়িষ্যা[13] এবং ইউনাইটেড প্রদেশের আদিবাসীরা ক্রমবর্ধমান কর্মশক্তির একটি ছোট অংশ ধীরে ধীরে তৈরি করে ফেলেছিল খনি ক্ষেত্র গুলিতে। অন্যদিকে বাঁকুড়া থেকে সাঁওতাল শ্রমিকেরা খনি এলাকা ছেড়ে কাছার ও আসামের চা বাগানেও বসতি স্থাপন করেছিল। ভূমিহীন কৃষক শ্রমিকেরা কর্মসংস্থানের সন্ধানে প্রতিবেশী গ্রাম বা জেলায় পরিযায়ী হওয়ার চিত্র লক্ষ করা যায়। উত্তর ভারত থেকে পূর্ব ভারতে ও বিশেষ করে মধ্য ভারতেও আদিবাসী মহিলা শ্রমিকদের অভিপ্রয়ান দেখা দিয়েছিল। তবে এই প্রসঙ্গকে কেন্দ্র করে জানা যায় ৮৫% আদিবাসী মহিলার খনি ক্ষেত্র সমৃদ্ধ অঞ্চলগুলিতে কাজ করার তথ্য উঠে এসেছিল। সাঁওতাল আদিবাসীদের সাথে সাথে বাউড়িয়াদের পর ধাঙ্গর ও কোরা নামক আদিবাসীদের মা, স্ত্রী, কন্যাদের কয়লাক্ষেত্রে কাজ করার চিত্র লক্ষ্য করা যায়।

১৮৯৬ সালে ছোটনাগপুর মালভূমির বাঁকুড়া, হাজারীবাগ এবং মানভূমের খনিতে মোট শ্রমিকের সংখ্যা ছিল ৩, ২৪, ৩৯৫ জন শ্রমিক। এর মধ্যে ৯৭,৭৭৬ জন খনির ভূগর্ভে কাজ করতেন। ১৯০১ সালে খনি গর্ভে ৬৫ হাজারের মত আদিবাসী মহিলাদের কাজের অবস্থান ছিল। ১৯১০ ও ১৯১৪ সালে সেই সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছিল যথাক্রমে ৭৫ হাজার থেকে ৯৮,৪০০ জন।[14] কারখানার প্রধান পরিদর্শকের মতে বিহারে কারখানা আইনের অধীনে ছিল ৯৩,০৩৪

10. তদেব। পৃ. ৫১৫

11. Choudhuri. Binay Bhushan, (Ed.), *History of science, philosophy and culture in Indian civilization,* Pearson Education, New Delhi, Centre for studies in civilization, 2008, ঋ. 355-357.

12. তদেব। পৃ. ৩৫৭-৩৫৯

13. এই আদিবাসীদের অনেকেই উড়িয়া ভাষার সাথে বাংলা ভাষা মিশিয়ে কেরা ভাষায় কথা বলতেন।

14. Athar. Shakeeb, *Condition of women coal mine workers in Bihar till 1947,* Vol. 73, Proceeding of the Indian History Congress, 2012, Pp. 932-940.

জন ১৯৩৮ সালে। অভিবাসনের ইতিহাসে নতুন এক ইতিহাসে আদিবাসী মহিলাদের পরিযায়ী হওয়ার দ্বিতীয় ধাপ শুরু হয়েছিল রেলশিল্প থেকে অসংগঠিত খনি কর্মক্ষেত্রে ভারী, শারীরিক শ্রমসাধ্য কাজের মধ্যে। এই 'অভিবাসন' ভিন্ন ভিন্ন ভাবে হওয়ার ফলে আদিবাসী মহিলাদের শ্রমের বাজারে স্থায়ী হওয়ার এবং অর্থনৈতিক দিক থেকে পঙ্গু করার একটি চিত্র ভেসে উঠেছিল। আদিবাসী মহিলাদের অভিবাসনের কারনগুলি কি ছিল তা নিয়ে ঐতিহাসিকের ভিন্ন ভিন্ন মত পরিলক্ষিত হয়। উড়িষ্যা থেকে বাংলায় আদিবাসী অদক্ষ শ্রমিকদের আগমন ঘটেছিল। তারা অনেকেই উড়িয়া ভাষার সাথে বাংলা ভাষা মিশিয়ে কেরা ভাষায় কথা বলতেন। আন্তঃরাজ্য অভিবাসি শ্রমিকদের কর্মসংস্থানে নিয়ন্ত্রণ কিন্তু বন্ধ হয়নি। তাছাড়া এই নিয়ে কোনো আইন ও পাশ হয়নি স্বাধীনতার পূর্বে।

হরপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ১৮৬৭ থেকে ১৮৭৪ সাল পর্যন্ত আদিবাসী শ্রমিক পরিযায়ীর ইতিহাসকে অভ্যন্তরীণ ও বহিরাগত[15] দুই ভাগে ভাগ করে দেখিয়েছেন। হরপ্রসাদ চট্টোপ্যাধ্যায়, বাইরের অভিবাসন ছাড়াও দেশের ভেতরে, রাজ্যের ভেতরে বা বাইরে অভিবাসনের প্রক্রিয়াকে স্বীকার করেছেন। গ্রামীণ ও শহরে আদিবাসী অভিবাসনের দুটি কারণকে মূলত তিনি স্বীকার করেছেন আসলে অভিবাসনের স্তরগুলিকে তিনটি ভাগে ভাগ করেছেন উদ্দেশ্যমুলক, আদর্শিক ও মনোসামাজিক। গ্রাম থেকে শহরের অভিবাসনে অর্থনৈতিক নীতি স্থবির থাকায় অনুন্নত গ্রাম খাত থেকে শহরে টেনে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল আদিবাসীদের। এই ধরনের অভিবাসনকে গ্রামীণ এলাকায় বিদ্যমান বহিস্কারী শক্তি এবং শহুরে কেন্দ্রগুলিতে কর্মরত আকর্ষণীয় শক্তিগুলির আন্তঃখেলার ফলাফল হিসাবে বিবেচনা করা যায় বলে তিনি মনে করেন।[16] এই ধরনের অভিবাসনের কথা, বাঁকুড়া ম্যাজিস্ট্রেটের রিপোর্ট থেকে ও বিভাগীয় কমিশনের কাছে ২৮ সে ফেব্রুয়ারী ১৮৬৬ সালের জমা দেওয়া রিপোর্ট থেকে বিশেষ করে জানা যায়। বিষ্ণুপুর জেলার আদিবাসী বাসিন্দারা সবচেয়ে অধিক দুর্ভোগের শিকার হয়ে এই ধরনের শ্রমিক অভিবাসনে রাজি হয়েছিল। ১৮৮২ সালে দ্বিতীয় আইনের অধীনে বাঁকুড়া থেকে ৪৭১ টি কুলি আদিবাসী শ্রমিক চা বাগানে স্থানান্তরিত হয়েছিল, যেখানে

---

15. Chattopadhyaya. Haraprasad, *Internal Migration in India a case study of Bengal,* Calcutta, K.P. Bagchi and Company, 1987, p. 55, 198.

16. Chattopadhyaya. Haraprasad, *Internal Migration in India a case study of Bengal,* Calcutta, K.P. Bagchi and Company, 1987, p. 68.

১৮৯৪-৯৫ সালে ২০৯ জন এবং ১৮৯৫-৯৬ সালে ২৬৪ জনের সন্ধান পাওয়া যায়। সামাজিক কারন হিসাবে আদিবাসী মহিলাদের বিয়ের কারণকেই অনেকক্ষেত্রে অভিবাসনের অন্যতম ক্রিয়া হিসাবে ব্যাখ্যা করার কথা তিনি বলেছেন। এই ধরনের অভিবাসন সামাজিক হলেও চরিত্রগত ভাবে ছিল স্থায়ী।[17]

প্রকৃতপক্ষে বিদ্যমান বস্তুনিষ্ঠ অবস্থা যেমন চাকরির সুযোগ, আবাসন, বেতন, শিক্ষাগত সুযোগ সুবিধা সেইসাথে নিয়ম, বিশ্বাস, মূল্যবোধ বৈশিষ্ট্যযুক্ত শহুরে সমাজ এর উপাদান আদিবাসীদের উপর গভীর প্রভাব ফেলেছিল। বাঁকুড়া জেলা থেকে অভিবাসনের মাত্রা ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পেয়েছিল কর্মসংস্থানের উদ্দেশ্যে। বাঁকুড়ার দক্ষিণাঞ্চলে বসবাসকারী পোদে জনগোষ্ঠীর অভিবাসন এমন মাত্রায় বৃদ্ধি পেয়েছিল যে কিছু এলাকায় পুরো গ্রাম জনশূন্য হয়ে পড়েছিল। এই পরিযায়ী শ্রমিকদের মধ্যে বেশিরভাগ আদিবাসী মহিলাদের একটা বড় জনসংখ্যা শহরের অভিমুখে যাত্রা করেছিল। গ্রামীণ থেকে শিল্পাঞ্চলগুলির অভিবাসনকে শুধুমাত্র পুল ফ্যাক্টরগুলির পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে অতিসরলীকরণের ঝুঁকির কথা বিশেষভাবে উঠে এসেছিল। বাহ্যিক নৈর্ব্যাক্তিক শক্তিকে এক ধরনের যান্ত্রিক ভারসাম্যের চাপে হ্রাস করা হতে থাকে। এই কাজে তাঁরা যুক্ত হয়ে বছরে এক থেকে দুইবার নিজের বাড়ি যাওয়ার সুযোগ পেত। এদের মধ্যে ২৭৮ টি পরিবার দুই থেকে একবার বাড়ি যাওয়ার সুযোগ পেত। ১৮৩ টি পরিবারে বাড়ি যাওয়ার মাত্র তিনবারের মত সুযোগ পেত।[18] যারা একেবারেই বাড়ি যাওয়ার সুযোগ পেত না সেইরকম পরিবারের সংখ্যা ছিল ২২১ টি। যদিও এ কথা প্রসঙ্গে স্বীকার করা যায় ১৮৯৯-১৯০১ সালে ম্যালেরিয়া ও প্লেগের মত বড় রোগকে কেন্দ্র করে ও কর্ম সংস্থানের জন্য হুগলী ও বর্ধমান থেকে কলকাতা, সাঁওতাল পরগনা, মুর্শিদাবাদ ও মানভুমের দিকে আদিবাসী শ্রমিকরা পরিযায়ী হয়েছিল অর্থাৎ শুধুই যে জমি হারানো একমাত্র কারণ ছিল অভিবাসনের সেই ধারনাকে ভঙ্গুর করেছিল হরপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের অভিবাসন সম্পর্কিত মতামত।

আদিবাসী মহিলাদের এই অভিবাসন সম্পর্কে রাখী রায়চৌধুরী দেখান যে, কৃষি একটি ভিন্ন বিভাগ হলেও স্থানীয় শ্রমশক্তির ক্রমাগত বহিঃপ্রকাশ লক্ষ করা গিয়েছিল, বিশেষ করে বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে। ভারতবর্ষের পূর্ব দিকের ছোটনাগপুর মালভূমি অঞ্চলের অন্তর্গত

17. তদেব। পৃ. ৭০-৭৫

18. *Report of the Bihar Labour Enquiry Committee,* Vol-1, Patna, Bihar, 1941, P. 37.

১২০০০ স্কোয়ার মাইলকে কেন্দ্র করে ১৮৭৮ সালে রাণীগঞ্জ, রামগড়, করনপুরা, ঔরঙ্গাবাদ এবং দৌলতাগঞ্জে কয়লা খনিগুলি গড়ে উঠে বিশেষ করে আদিবাসী এলাকাকে কেন্দ্র করে। এই অসংগঠিত ক্ষেত্রে আদিবাসী শ্রমিকদের সন্ধান পাওয়া গিয়েছিল গয়া, পাটনা, শাহবাদ, সারন, মুজাফরপুর অঞ্চলে অন্যদিকে পূর্ব বিভাগের জেলাগুলি হল আজমগড়, বালিয়া, গাজিয়াপুর, বেনারস, জৌনপুর ও বিলাসপুর।[19] খনিজ পদার্থ সমৃদ্ধ অঞ্চলগুলিতে অভিবাসন দ্রুত হারে বৃদ্ধি পেয়েছিল বলে ব্যাখা করেন।

দিলিপ সাইমনের অভিমতে ১৯১১ এর সমীক্ষা থেকে জানা যায় স্থানীয় খনি অঞ্চলগুলিতে স্থানীয় আদিবাসীদের ভিড় অধিক পরিমানে লক্ষ করা যায়। রাণীগঞ্জ কয়লা খনিতে ছয় ভাগের একভাগ আদিবাসী মহিলা শ্রমিকের অভিবাসন দেখা যায় ছোটনাগপুর মালভূমির বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে। সাইমন দেখাচ্ছেন, ১৯১০ সালে বর্ধমান থেকে দুই তৃতীয়াংশ আদিবাসী মহিলার অভিবাসন হচ্ছে রাণীগঞ্জ কয়লা খনিতে[20]। তবে মানভুম থেকে আগত শ্রমিকদের কয়লা খনিতে যোগদানের সংখ্যা ছিল ৪৭.৫%। এই প্রদেশের মধ্যেই আপাত শ্রম উদ্বৃত্ত থাকা স্বত্বেও তারা পূর্ব ভারতীয় কয়লাক্ষেত্রে এই শ্রম প্রবর্তন করেছিল। ১৯২০ সালের পর থেকে নিয়মিত রাণীগঞ্জ, আসানসোলে কয়লা খনি গুলি শুরু হলে প্রচুর মহিলা শ্রমিকের চাহিদা বৃদ্ধি পায়। স্থানীয় শ্রমিকদের বহিঃপ্রবাহের উচ্চ হার বছরের পর বছর ধরে ধীরে ধীরে হ্রাস পেলেও অভ্যন্তরীণ অভিবাসন দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছিল। এই অভ্যন্তরীণ অভিবাসনে আদিবাসীদের মধ্যে সাঁওতাল মহিলা শ্রেণির 'অভিবাসন' অন্যান্য খনিজ খনি ভিন্ন কয়লা খনি এলাকায় অধিক ছিল।[21]

সুপর্ণা লাহিড়ী বড়ুয়া মনে করেন, আদিবাসীদের মধ্যে সাঁওতালদের অভিবাসনের কারন ছিল সংগঠিত ক্ষেত্রে জীবিকা নির্বাহে বাধাদান। যা লক্ষ করা যায় বাংলা ও বিহারের অঞ্চলে। আদিবাসী মহিলারা সংগঠিত ক্ষেত্রে কাজের সুযোগ না পাওয়ার কথা তিনি বিস্তারিত ভাবে

---

19. তদেব। পৃ. ৩৭

20. Simeon. Dilip, Coal and Colonialism; Production Relations in an Indian CoalField, (1895-1947), International Review of Social History (41), 1996, P. 90.

21. Economic and political weekly, *Supply of Industrial labour in India,* Vol-8, issue no-21 May, 1956, Pp. 628-630.

ব্যাখ্যা করেন তার গ্রন্থে[22]। তিনি ছোটনাগপুর মালভূমির ৯৬% মহিলা আদিবাসীদের খনি ক্ষেত্রে কাজ করতে এগিয়ে আসার কথা উল্লেখ করেছেন। আদিবাসীদের মধ্যে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার এবং তাদের স্বতন্ত্র আর্থ সামাজিক ব্যবস্থার ভাঙ্গন বিশেষ করে ১৮৫৫-৫৭ সালের বিদ্রোহ দমনের পরে নতুন ক্ষেত ও চারণভূমির জন্য বিভিন্ন অঞ্চলে ঘুরে বেড়াতে চাপ দিয়েছিল।[23] জীবিকার সন্ধানে সরকারী দালালদের মাধ্যমে শ্রমিকদের খনিতে জবরদস্তি প্রবেশ করানোর কথা উল্লেখ করেছেন। প্রথম দিকে জমিদারি প্রথার মাধ্যমে খনি ও শিল্পাঞ্চলগুলিতে তালুক শ্রমিক নিয়োগ হত বলে তিনি মনে করেন।[24] তালুক শ্রমিকদের কয়লা কোম্পানিগুলিতে জবরদস্তি নিয়োগ করা হয়েছিল।[25] এই সম্প্রদায়ের মহিলাদের অভিবাসনের কারণকে তিনি জীবিকা সন্ধানের উদ্দেশ্যের সাথে জবরদস্তি মহিলাদের খনি ক্ষেত্রে প্রবেশের বিষয়টিকে অনেকটা সুযোগের সদ্ব্যবহার হিসাবে ব্যাখা করেছেন। খনিতে মহিলা শ্রমিকদের ভিড় বৃদ্ধি হওয়ার উল্লেখযোগ্য সময় ছিল জানুয়ারি থেকে ফেব্রুয়ারি মাস। ১৮৮১ থেকে ১৯৩১ সালের মধ্যে ছোটনাগপুর কয়লা খনিতে উত্তোলন বা খাদানের স্থানগুলিতে আদিবাসীদের জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার কথা উল্লেখ করেছেন। এর পরিমাণ ছিল প্রায় ৫৭.২%[26] যা তিনি পিঁপড়ের সাথে তুলনা করেছেন। ললিতা চক্রবর্তী মূলত এই পটভূমিতে ভাড়াহীন ভাবে অসংখ্য মহিলাদের সাথে পরিবারের আগমন ঘটার কথা উল্লেখ করেছেন। খনি অঞ্চলের প্রতি বর্গ কিমিতে আদিবাসী মহিলাদের বসতির সন্ধান পাওয়া গিয়েছিল।

---

22. বড়ুয়া. সুপর্ণা লাহিড়ী, *বিহার নারী সমাজ সংগ্রাম,* কলকাতা, র‍্যাডিক্যাল, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি, ২০০৮, পৃ. ১৪

23. Roychouwdhury. Rakhi, *Gender and Labour in India (The Kamins of Eastern Coal mines 1900-1940),* Kolkata, Minerva Associates Publications PVT. LTD., First Published 1996, P. 120.

24. Banerjee. Sukumar, *Impact of Industrialization on the tribal population of Jhariya-Raniganj coal Field Areas,* Bihar, Anthropological survey of India, First Published in 1981, March, P. 55-75.

25. Malley. L. S. S. O, *Bengal District Gazetteers Santal Paraganas,* New Delhi, Logos Press, 1984, Pp. 45-80.

26. *Unemployment among Women in West Bengal,* Calcutta, Government of west Bengal Labour Department, Directorate of national employment Service West Bengal 28 Theatre Road, Nov 1928, p. 21.

মারগারেট আদিবাসী মহিলাদের খনি ক্ষেত্রে অভিবাসনের কারন নিয়ে ব্যাখা করছেন। যে সমস্ত আদিবাসী মহিলা কৃষকরা জমিতে দাসত্বের বন্ধনে আবদ্ধ ছিল অথচ তারা গ্রামের বাইরে নিজে থেকে কাজের সন্ধান করতে পারত না, তারাই মূলত ধীরে ধীরে খনি গর্ভের কাজে যুক্ত হয়েছিল। তিনি কঠোর শারীরিক পরিশ্রমের কথা ভেবে 'প্রান্তিক ও নিচু' জাতির আদিবাসী মহিলাদের অভিবাসনের পথ অবলম্বন করতে হত বলে মনে করেন। এ প্রসঙ্গে মারগারেট আরো মনে করেন যে, কাজের মান নিচু থাকায় অন্যান্য সম্প্রদায়ের সাথে আদিবাসী মহিলাদের অংশগ্রহণ অধিক মাত্রার কথা উল্লেখ করেছেন। খনি ক্ষেত্রে নারী শ্রমিকদের অংশগ্রহণে শতকরা মাত্র ২ ভাগ ছিল হিন্দু, ২১ শতাংশ তপশিলি জাতি, ৪৬ শতাংশ আদিবাসী এবং ৩১ শতাংশ ছিলেন অনগ্রসর শ্রেণিভুক্ত।[27] বিহার থেকে আদিবাসী শ্রমিকদের পরিযায়ী হওয়ার পিছনে কারন ছিল অর্থনৈতিক দারিদ্র্যতা, পরিবারের একমাত্র উপার্জনকারীর মৃত্যু, পুরনো কাজ থেকে বিতাড়িত সেই সংখ্যা প্রায় হয়ে দাঁড়িয়েছিল ১৯৩৮ সালে প্রায় ৯৩৮ টি পরিবার[28]। 'National Sample Survey' এর (১৯০০-৪০) একটি উক্তি এখানে প্রাসঙ্গিক ভাবে উল্লেখ করা যায় যে, "The workforce participation rate among the SC/ST women is much higher compared to women from other castes and there is evidence of higher incidence of casual labour amongst these women".[29] এ কে বাগচি মনে করেন, মানসিক, ধার্মিক ও সামাজিক প্রতিবন্ধকতার ফলেও পরিযায়ী আদিবাসী শ্রমিকের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছিল।

১৮৭০-১৯০০ সালে খনি শিল্পাঞ্চলে মেয়েদের অভিবাসনের কথা শমিতা সেন স্বীকার করেন। এই অভিবাসনে পাটকলের মহিলাদের কথা উল্লেখ করেছেন। পাট মালিকরা শহুরে নিয়োগকর্তাদের মতে, গ্রামাঞ্চল থেকে অব্যাহত শ্রমিক সরবরাহের উপর নির্ভরশীল ছিল। পাটকলে প্রথম দিকে পুরুষ আদিবাসী শ্রমিক পরিযায়ী হত। ঔপনিবেশিক পর্যায়ের প্রথম

---

27. *Unemployment among Women in West Bengal,* Calcutta, Government of west Bengal Labour Department, Directorate of national employment Service West Bengal 28 Theatre Road, Nov 1928, P. 43-67.

28. *Report of the Bihar and Bengal Labour Enquiry Committee,* Vol-1, Patna, Bihar, 1941, p. 12.

29. বন্দ্যোপাধ্যায়. কল্যাণী, *নারী শ্রেনী ও বর্ণ (নিম্নবর্গের নারীদের আর্থসামাজিক অবস্থান),* কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, জানুয়ারী ২০০০।

দিকে পাট শিল্পে নারী শ্রমিকদের বর্জিত করা হলেও মহিলা শ্রমিক সংখ্যা ছিল মোটামোটি ২০ শতাংশ।[30] ১৮৯০ এ ১৭-২০% মহিলা শ্রমিকের কাজ করার উল্লেখ পাওয়া যায়। পাটকল মিলে সাধারণত পরিত্যক্ত ও বিধবা বাঙালি মহিলাদেরও পরিচয় পাওয়া যায়। ১৮৯০ সালে উত্তরপ্রদেশ, বিহার, উড়িষ্যা থেকে মহিলা শ্রমিকদের আগমন হয়েছিল। কিছু মহিলা শ্রমিকদের পরিযায়ী হওয়ার চিত্র ধরা পরে বীরভূম, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর থেকে তবে তাতে কোনরকম আদিবাসী মহিলা শ্রমিকদের কথার উল্লেখ ছিল না। উড়িষ্যা থেকে আগত শ্রমিকদের অধিকাংশ পাট শিল্পে যুক্ত হয়েছিল। উচ্চ পরিযায়ী হওয়ার হার ছিল মেদিনীপুর ও হুগলী জেলা থেকে। রাজ্যে গেজেটিয়ার থেকে অধিক মহিলা শ্রমিক অভিবাসনের উল্লেখ পাওয়া যায় এই রাজ্যে। ১৯০১ সালে আসাম শ্রমিক এবং ইমিগ্রেশন অ্যাক্ট পাশ হলে মহিলা শ্রমিকদের পরিযায়ী হওয়ার ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ হওয়া শুরু হয়েছিল।[31] অন্যান্য ক্ষেত্রে আদিবাসী মহিলাদের কাজ করা বা পরিযায়ী হওয়ার সুযোগ কম ছিল বলে তিনি উল্লেখ করেন। মহিলা শ্রমিকদের মধ্যে কিছু উঁচু জাতির হলেও অধিকাংশ ছিল হরিজন, মুচি নামক নিচু জাতের মহিলাদের কথা উল্লেখিত হয়েছিল। ম্যানেজিং দালালদের ভূমিকাকে স্বীকার করার পাশাপাশি পারিবারিক প্রেক্ষাপটের বাইরে আদিবাসী মহিলাদের অভিবাসনকে বিচ্যুত হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। এই ধরনের অভিবাসন, স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছাকৃত ভাবে মহিলাদের যৌনতার উপর পারিবারিক নিয়ন্ত্রণের হুমকির ফলে কিছুটা পরিযান হয়েছিল। এই প্রভাবশালী মূল্যবোধ বা পারিবারিক নিয়ম বজায় রক্ষা এবং লিঙ্গ নির্বিশেষে বিছিন্নতার নিয়মগুলি উনবিংশ শতাব্দীর মধ্য দিয়ে পরিবর্তিত হয়ে চলেছিল।[32] পারিবারিক নিয়ন্ত্রণ থেকে তাদের মুক্ত করতে পুঁজিবাদী পরিসরে কাজ করা বিশেষ অবদান ছিল না বরং শ্রমের চাহিদা থাকায় এই কাজে যোগ দিতে বাধ্য হয়েছিল।[33]

---

30. Sen. Samita, *Women and Labour in Late colonial India,* Cambridge, Cambridge University Press, First Published 1999, p. 21-23.

31. তদেব। পৃ. ২৫

32. Das. A. K. Trends of Occupation Pattern through Generations in rural Areas of west Bengal, Calcutta, Scheduled castes and Tribes Welfare Department, 1968.

33. Sen. Samita, *Women and Labour in Late colonial India,* Cambridge, Cambridge University Press, First Published 1999, p. 177-179.

ঔপনিবেশিক ভারতে, গ্রামীণ কৃষি ব্যবস্থা শীঘ্রই শ্রম অর্থনীতির ফলে কর্মসংস্থানের সাথে জড়িয়ে ছিল। আধুনিক কলকারখানা থেকে বাদ দেওয়া এবং শহরে তাদের নির্দিষ্ট লিঙ্গের অনুপস্থিতি এগুলি উনবিংশ শতাব্দীর শেষ থেকে শুরু হয়েছিল। অভিবাসনের ইতিহাসে আদিবাসী যুবতী মেয়েদের সংখ্যা পুরুষদের তুলনায় দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছিল। তারা কাজের উদ্দেশ্যে শহরের নানা প্রান্তরে ছড়িয়ে পড়েছিল। পরিযায়ী আন্দোলনের ইতিহাসে এদের ভূমিকা ছিল অনস্বীকার্য"।[34] এই ধরনের অভিবাসনের পশ্চাতে একটি 'অর্থনৈতিক ধাক্কা' কাজ করেছিল। অসংগঠিত ক্ষেত্রগুলিতে কাজ করার জন্য জমিহারা আদিবাসী মহিলাদের উৎসাহিত করা হয়েছিল বা বলা যেতে পারে এই কাজে যোগ দেওয়া ভিন্ন তাদের অন্য কাজের ক্ষেত্রের সুযোগ ছিল না।

কাওট স্কিরর দেখিয়েছেন আদিবাসী অভিবাসনের ফলস্বরূপ, সামাজিক গঠন প্রাক পুঁজিবাদী উৎপাদন সম্পর্কের সাথে কৃষি ভিত্তিক পুঁজিবাদের সহাবস্থানকে চিত্রিত করে তুলেছিল। খনন শিল্পের সামগ্রিক যৌক্তিকরণ দিকে সমসাময়িক প্রবণতা বিচার করলে বারংবার কৃষি অবক্ষয়ের ফলে অদক্ষ ভূমিহীন শ্রমিকদের সংখ্যা বছরের পর বছর বৃদ্ধি পেয়েই চলেছিল।[35] ভূমিহীন অদক্ষ শ্রমিকদের বৃদ্ধির হার চলতে থাকলে কোলিয়ারি পরিচালকরা সর্বদা খনির কাজের জন্য পুরুষের পাশাপাশি মহিলা কৃষি শ্রমিকদের আকৃষ্ট করার চেষ্টা করেছিলেন। ক্ষুদ্র চাষিরা, যারা তাদের শ্রমকে বিক্রি হওয়া স্বত্বেও প্রান্তিক কৃষক হিসাবে তাদের অবস্থানকে সুসংহত করতে পারেনি ঠিক তেমনই সাঁওতাল মহিলারা ভিন্ন স্থানে কাজের সন্ধান না পেয়ে গ্রামাঞ্চল পরিত্যাগ করে সর্বহারা শিল্প শ্রমিক হয়ে যোগদান করতে শুরু করেছিল।

---

34. Roychouwdhury. Rakhi, *Gender and Labour in India (The Kamins of Eastern Coalmines 1900-1940),* Kolkata, Minerva Associates Publications PVT. LTD, First Published 1996, Pp. 27-28.

35. Gupta. Ratna (Ed), *Profiles of Tribal women in West Bengal,* Government of West Bengal, Scheduled Castes and Tribes Welfare Department, 1990, p. 90.

দেবশ্রী দে উড়িষ্যার দারিদ্র্য কবলিত আদিবাসী মেয়েদের অভিবাসনের যে প্রবনতার উল্লেখ করেছেন তা হল আদিবাসী যুবতি মেয়েদের শহরমুখি হওয়া তাঁর পশ্চাতে যে কারণটি তিনি উল্লেখ করেছেন তা হল কর্মক্ষেত্রে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ।[36]

যদিও কিছু ঐতিহাসিকরা আদিবাসী মহিলাদের পরিযায়ীর কারন হিসাবে অপহরণ এবং বিদেশীদের জালিয়াতি করার ভূমিকার উপর জোর দিয়েছিলেন। বিভিন্ন এজেন্সি সংস্থার মাধ্যমে পাঁচ বছরের চুক্তিতে আবদ্ধ হয়ে ধাঙ্গর সম্প্রদায়ের মহিলা শ্রমিকদেরকে বিদেশে কাজের চুক্তিতে আবদ্ধ করা হয়েছিল। প্রথমদিকে পুরুষ শ্রমিকের অনুপাতে মহিলা শ্রমিকের সংখ্যা কম ছিল। ১৮৪৩ সালে ধীরে ধীরে ৪,৩০৭ এবং ১৮৪৪ সালে ১,৮৪০ জন ছিল মহিলা শ্রমিক।[37] ১৮৫৫-৫৬ সালের পর তার পরিমান বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং বিদেশে মোট মহিলা শ্রমিকের ২৫% কাজে যুক্ত ছিল[38] বিদেশে তারা কুলি ও খনির কাজে অংশগ্রহণ করেছিলেন। ইউরোপীয় উপনিবেশগুলি থেকে শ্রমিক পাঠানোর বিষয়টি একটি প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবসায়ে পরিণত হয়েছিল। মহিলাদের অপহরণের নিদর্শন থেকে অনুধাবন করা যায় যে, কোলিয়ারির জন্য দেশান্তরে পাঠিয়ে অভিবাসনকারীদের সাধারণ ভাবে পতিতা হিসাবে গণ্য করা হয়েছিল।[39] ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ অবগত ছিল যে, পতিতারা সমাজ বহির্ভূত অংশ। সমাজ তাঁদেরকে গ্রহণ না করলে জীবিকার তাড়নায় পুনরায় খনি ক্ষেত্রে ফিরে আসতে বাধ্য হবে তাই এই ভাবনাকে প্রশয় দেওয়া হয়েছিল। ছোটনাগপুরে আদিবাসীদের চলাফেরার ক্ষেত্রে অভিবাসনকে ইচ্ছার প্রমাণ হিসাবে অনুবাদ করা হয়েছিল কিছুক্ষেত্রে। অভিবাসী শ্রমিকদের অবস্থান এবং সম্ভাবনা

---

36. দে. দেবশ্রী, *পূর্ব ভারতের আদিবাসী নারী বৃত্তান্ত (১৯৪৭-২০১০),* কলকাতা, সেতু পাবলিকেশন, প্রথম সংস্করণ এপ্রিল ২০১২, পৃ. ২৮

37. *Unemployment among Women in West Bengal,* Calcutta, Government of west Bengal Labour Department, Directorate of national employment Service West Bengal 28 Theatre Road, Nov 1928, P. 43-67.

38. *Unemployment among Women in Orissa,* Orissa, Government of Orissa Labour Department, Nov 1928, Pp. 12-16.

39. Roychouwdhury. Rakhi, *Gender and Labour in India (The Kamins of Eastern Coalmines 1900-1940),* Kolkata, Minerva Associates Publications PVT. LTD, First Published 1996.

নির্ধারণে ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের ভূমিকা ছিল বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ।[40] খনি ক্ষেত্রে এই অভিবাসনের কারণ হিসাবে ঐতিহাসিকরা দেখিয়েছিলেন যে আদিবাসীরা, মহাজনদের অত্যাচারিত অবস্থা থেকে মুক্ত হওয়ার কথা ভেবেই এই ভারবাহী কাজে অংশগ্রহণ করেছিল। তথাকথিত পিছিয়ে পড়া জনগণের মধ্য থেকে খনি শ্রমে নিয়োগ করলে তারা তাদের দাবি ও চাহিদার কথা ব্যক্ত করতে পারবে না। এছাড়াও তারা শ্রম জনিত সুযোগগুলি সম্পর্কে অবগত ছিল না বলেই এই ধরনের সুযোগ ব্যবহার করা হয়েছিল ।[41]

১৯২০-১৯৩০ পশ্চিমবঙ্গের কয়লা খনিতে ভিন্ন ভিন্ন স্থানের আদিবাসী পুরুষ ও মহিলাদের অবস্থান[42]

স্থান	পুরুষ	মহিলা	মোট
বর্ধমান	৫,৬৮২	৭,৮৫৩	১৩,৫৩৫
বাঁকুড়া	১৪২	১৮৬	৩২৮
মেদিনীপুর	৬৮	৬৭	১৩৫
হুগলী	৭৫৪	৮৩	৩৭৩
হাওড়া	২৯০	১০২	১,১৯০
নদীয়া	১৫৫	১৮২	৩৩৭
মুর্শিদাবাদ	৪,৯৯২	৭,৫২৭	১২, ৫১৯
যশোর	৪৭	৩৯	৮৬
খুলনা	৪	১	৫
দিনাজপুর	১৯০	১৮২	৩৭১

40. Bates. Crispin, Marina Carter, *Tribal and Indentured Migrants in Colonial India: Modes of recruitment and forms of incorporation,* Oxford University Press, January 1994, P. 40-58.

41. তদেব। পৃ. ১৬০-১৭২

42. *Government of West Bengal Labour Directorate Report on an enquiry into the living conditions of workers employed in the Factories at Raniguni*, Asansol, IAS Labour Commissioner, 1955, G.P.339.42 (5415) W52rds.

দার্জিলিং	১৬	১৬	৩২
মালদা	২৮২	৩২৯	৬১১
ফরিদপুর	১২	২১	৩৩
চট্টগ্রাম	৮২	১১৮	২০০
কোচবিহার	৩	৪	৭
পাবনা	২৫	২৩	৪৮
বগুড়া	৩৭	৪৪	৮১

অন্যান্য স্থানে আদিবাসী মহিলাদের অভিপ্রয়ান

ঔপনিবেশিক সরকারের নীতির পরিণতিগুলি বিশেষ করে আর্থ সামাজিক বৈষম্যের জন্ম দিয়েছিল যা থেকে গ্রামীণ জনসংখ্যার একটি বড় অংশ জীবিকা নির্বাহ নিয়ে সমস্যায় জর্জরিত হয়েছিল। ইন্ডেঞ্চার সমর্থক মুখপাত্ররা দাবি করেছিলেন যে বাংলায় 'অতিপ্রচুর শ্রম' বিদ্যমান ছিল যা পাহাড়ি কুলি শ্রমিকদের কেবল বাংলা প্রদেশে নয়, বরং উত্তর দিকে দিল্লী পর্যন্ত কাজের সন্ধানে ঘুরে বেড়াতে প্রোরোচিত করেছিল। শ্রমিক নিয়োগকর্তা এবং মধ্যস্বত্বভোগীরা আদিবাসী মহিলাদের প্রলুব্ধ করে উত্তরপ্রদেশ, বিহার, আসাম, মনিপুর ও ত্রিপুরার চা বাগান ইত্যাদির কাজ করার জন্য বহু দূরবর্তী স্থানে নিয়ে যাওয়ার চিত্র পরিলক্ষিত হয়।[43] রাজ্যের বাইরেও সাম্ভাব্য উপায়ে আদিবাসী মহিলা শ্রমিকদের শোষিত হওয়া ছাড়া কোনো উপায় ছিল না বলে মনে করেন S.N. ROY।[44] রাজ্যের বাইরে মহিলা শ্রমিকদের জন্য্ বিশেষ প্রতিবন্ধকতা ছিল পুরুষদের থেকে তীব্র প্রতিযোগিতার মুখে লাভজনক কর্মসংস্থানের পথ বেছে নেওয়া। এছাড়া অধিকাংশ নিয়োগকর্তারা তাদের কাজের স্থানে মহিলাদের নিয়োগের বিরুদ্ধে রায় দিয়েছিল। সেক্ষেত্রে আদিবাসী মহিলাদের জন্য খনি ক্ষেত্রগুলিতে কর্মসংস্থান খুঁজে পাওয়া আরও জটিল হয়ে পড়েছিল।[45] মহিলা জনসংখ্যার উপর কর্মসংস্থান সমস্যার ঘটনা মূল্যায়ন করার জন্য, রাজ্যের জনসংখ্যার পাশাপাশি কর্মসংস্থানের চিত্রে তাদের অবস্থান গুরুত্বপূর্ণ ছিল। মোট জনসংখ্যার উপার্জনকারীদের অনুপাত ১৯১১ সাল থেকে স্পস্টতই হ্রাস পেয়েছিল।

১৮৭৪-৭৬ সালে কয়লা খনিক্ষেত্র গুলির পাশাপাশি চা বাগানের কাজে আদিবাসী মহিলাদের পরিযায়ী হওয়ার চিত্র লক্ষ করা যায়। ১৮৭০ থেকে ১৯০০ সাল পর্যন্ত বিহার ও বাংলায় যে সমস্ত আদিবাসী মহিলারা ক্ষেত ছেড়ে মজুর শ্রেণির কাজ করত তাদের মধ্যে কিছু শ্রমিক স্ব-ইচ্ছায় চা বাগানের কাজে যুক্ত হতে চেয়েছিল। স্থানীয় বাসিন্দা রাজবংশীরা বাগিচার কাজ করতে অনিচ্ছুক থাকায় ইউরোপীয়দের পাশাপাশি বাঙালি ব্যবসায়ীরাও ছোটনাগপুরের

---

43. *Report of the Bihar and Bengal Labour Enquiry Committee,* Vol-1, Patna, Bihar, 1941, p. 18, 34.

44. Roy. S. N, *Migrant Women workers,* Bihar Tribal Welfare Research Institute, Ranchi, Varmes Union Press, P. 78.

45. *Unemployment among Women in West Bengal,* (Directorate of national employment Service West Bengal), Calcutta, Government of west Bengal Labour Department, Nov 1958, P. 1-15.

আদিবাসী শ্রম সরবরাহ করতে বা সংগ্রহ করার চেষ্টা করেছিল। তিস্তা নদীর পশ্চিম অংশ ও পশ্চিম ডুয়ারস এলাকার দিকে অভিপ্রয়ান করেছিল।[46] ১৮৭২ থেকে ১৯৩১ সালের মধ্যে কোচবিহার রাজ্যে ছোটনাগপুর থেকে অভিবাসনের মাধ্যমে আদিবাসীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। আদিবাসীদের মধ্যে ছিল ওঁরাও, মুণ্ডা, খরিয়া, সাঁওতাল। বিহারের ছোটনাগপুরের আদিবাসী পাহাড়িয়াদের মধ্যে অনেকেই জলপাইগুড়ি জেলার চা বাগান এলাকায় বসবাস করত। ১৯০১ সালের আদমসুমারি অনুযায়ী পরিযায়ী শ্রমিকের বিবৃতিতে দেখা গেছে যে, রাঁচি জেলা থেকে ১০,৫৬২ জন সাঁওতাল পরগণা থেকে এসেছিল। ৬২,৮৪৪জন ওঁরাও নামক আদিবাসী সম্প্রদায়ের মহিলাদের আগমন হয়েছিল এবং মুণ্ডা ছিল ১১, ৬৭২ জন। বিশেষ ভাবে উল্লেখ্য ছিল যে, ছোটনাগপুর- সাঁওতাল পরগণা থেকে বিপুল সংখ্যক আদিবাসী সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক অবস্থানের ফলে অন্যত্র চলে যেতে বাধ্য হয়েছিল। ১৯১৫ থেকে ওঁরাওদের একাংশ চা বাগানের শ্রমিক ছিল। চা বাগানের ক্ষেত্রগুলি ছাড়াও আদিবাসী মহিলাদের সংখ্যা ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পেয়েছিল ১৯৩০ এর পর থেকে। ঝাড়খণ্ডের রাঁচি, গিরিডি, পালামৌ জেলার যে যে গ্রাম থেকে আদিবাসীরা খনির কাজের জন্য ছুটে এসেছিল সেই গ্রামগুলির একটি তালিকা চার্টের মাধ্যমে উল্লেখ করা হয়েছে।[47]

জেলা [48]	ব্লক	গ্রাম	জেলা	ব্লক	গ্রাম
খুন্টি	তোরপা	আম্মা			ছালকারি
		হুসির		লেতাহার	চিরকি
		কোমাং			বারাইপুর
		গোপলা			গোড়ানা
		পাওরা			গাংকারা
		লাতাউলি	পালামৌ		সাবানো
		রামজায়			কাইমা

46. Gupta. Ranajit Das, *Labour and Working class in Eastern India,* New Delhi, K. P Bagchi and Company, 1994, p. 233-254.

47. Roy. S. N, *Migrant Women workers,* Bihar Tribal Welfare Research Institute, Ranchi, Varmes Union Press, P. 15-35.

48. *Report of the Indian Factory Labour Commission* Vol. II, *London, 1909,* Pp. 263-264.

		পাখনা			হেসলা
রাঁচি	চাইনপুর	বেলভক্ত			হেটলত
		শিলকারি		মাহুয়াডানের	সুগি
		নগর সিমারতলি			সারনাডিহ
		নগর পুল্বারতলি			চেনপুর
		নগর রাইনতলি			সেম্বারখুরানি
		নগর পারহাতলি		রাঙ্কা	স্যালা
		তাঙ্গার তলী			খুরা
	জালডেগা	গাঙ্গুতলী			সন্ডাং
		জালডাঙ্গা			খারদিশা
		কোলেমডেগা			কাঞ্চনপুর
		বেলডেগা			রাঙ্কা
গিরিডি	পিরতানার	হারলাডিহ			

বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মহিলাদের যোগদান পূর্ব ভারতের কয়লা খনিতে[49]

সম্প্রদায়	১০০ জনে মহিলায় তাদের পরিমাণ	উচ্চ সম্প্রদায়	প্রতি ১০০ মহিলায় %
ডোম	১১১.০	বাউরি	৫৫.৮
বেলদার	১০২.০	কুমোর	৪১.৮
মুশাহর	৮৭.৯	পাসিস	৫৩.০
সাঁওতাল	৮৭.৪	তেলিস	৪৫.৫
ভুঁইয়া	৮০.১	কাহার	৪৪.৫
মাল	৭৯.৫	ব্রাহ্মণ	৩১.২
কুরমিস	৬৭.৫	রাজপুত	২৭.২

49. *Report of the Women Labour in the Indian Coal Industry,* Raniganj, Government of India, 1935, P. 129.

নুনিয়া	৬৭.৫	গোয়ালা	২৪.৫
জোলা	৫৯.৪	কোরিস	১২.৫

কয়লা খনিতে আদিবাসী মহিলাদের শ্রমের বাজার গঠন

ছোটনাগপুর মালভূমির আদিবাসী মহিলা শ্রম অভিবাসন মৌলিকভাবে একপ্রকারের জবরদস্তি মূলক[50] ছিল। কয়লা খনিতে ৩ ধরনের মহিলা শ্রমিকের কথা জানা যায় যারা এই কাজে যুক্ত ছিল প্রথমত বিবাহিত, দ্বিতীয়ত বিধবা, তৃতীয়ত অসংলগ্ন নারী কর্মী[51] যারা শান্ত কামিন নামে পরিচিত ছিল। আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতির জন্য আদিবাসী মহিলাদের কর্মসংস্থানে প্রবেশ ছিল বাধ্যতামূলক।[52] খনিতে যন্ত্রপাতি নিয়োগের ফলে উদ্যত পুঁজিপতিদের লুব্দধ দৃষ্টি প্রথম থেকেই নিপাতিত হয়েছিল আদিবাসী মহিলা শ্রম শক্তির উপর। জীবিকা নির্বাহের নগ্ন উপায়ে আদিবাসী মহিলাদের শ্রমের বাজারে দ্রুত নিক্ষেপ করে ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ শক্তি খুব অল্প সময়ে মুনফা লাভের চেষ্টা করতে চেয়েছিল। ছোটনাগপুর মালভূমি এলাকায় কয়লার মত বড় খনিজ শিল্প ব্যতীত অন্য খনিজ খনি বৃহৎ আকারে প্রসারিত হয়নি। কয়লার মত খনিজ শিল্প থেকেই প্রথম মহিলাদের কারখানায় অবৈধ শ্রম বাজার গঠনের পথ প্রশস্ত হয়েছিল। প্রথম দিকে খনিতে খুব নগণ্য পরিমাণের মহিলা শ্রমিক দেখা যেত কারন মহিলাদের সাধারণত কয়লা খনিতে প্রথম দিকে কাজ করার সুযোগ ছিল না। এছাড়াও দক্ষ শ্রমিকদের দ্বারাই শিল্পাঞ্চলগুলি প্রথম দিকে পরিচালিত হলেও শ্রমিকদের শ্রম অধিক পরিমানে ব্যবহার করা হতে থাকে পরবর্তীকালে। কয়লা খনি ছাড়াও গঙ্গা উত্তরের সমস্ত জেলার ক্ষেত্রে ঝড়িয়া, বারমো, করনপুরার কয়লা শিল্পে ও চুনাপাথর শিল্পের খনি, হাজারীবাগ ও গয়া জেলার অভ্র খনি, ডুম্রাখার, বাউলিয়া ও খালারির চুনাপাথর খনি, নোয়ামুন্ডি গুয়ার আকরিক খনি, সিংভুমের ম্যাঙ্গানিজ খনিতে ঠিকাদারদের উপর শ্রমিক আনার ভার ছিল। কয়লা খনিতে আদিবাসী মহিলারা শ্রম প্রক্রিয়ায় উৎপাদনশীল ভূমিকা

50. Roy. S. N, *Migrant Women Workers,* Bihar Tribal welfare Research Institute, Ranchi, Varmes Union Press, 2006, P. 49-55.

51. Roychouwdhury. Rakhi, *Gender and Labour in India (The Kamins of Eastern Coalmines 1900-1940), Calcutta,* Minerva Associates Publications PVT. LTD., First Published 1996, P. 49.

52. Gupta. Ranajit Das, *Labour and Working class in Eastern India,* New Delhi, K.P Bagchi and Company, 1994, p. 324.

গ্রহণ করেছিল।[53] এ প্রসঙ্গে এনভি সোমানির মতবাদ ছিল যে, শ্রম বাজারের কাঠামোয় আদিবাসী নারীরা ছিল নিষ্পেষিত ও দুর্বল।

এক্ষেত্রে আমেরিকান শ্রম ইউনিয়ান থেকে শ্রমের কাঠামো গঠনের ধারণা প্রাপ্ত হয়েছে বলে মনে করেন অনেক ঐতিহাসিকরা। তবে এই বিশ্বে খনির শ্রমিকদের সাথে শ্রমের ইতিহাস গঠন ও শ্রম সরকার গঠনে তৃতীয় বিশ্বের থেকে ভিন্ন ছিল। গ্রেট ব্রিটেনে শ্রমিকদের পরিবারের আকার বৃহৎ থাকায় খনি অঞ্চলে মহিলা শ্রমিকদের অবদান অন্যান্য দেশের মহিলাদের তুলনায় অধিক ছিল। ঔপনিবেশিক পর্যায়ে খনির পেশা ছিল আদিবাসী মহিলাদের কাছে অর্থনৈতিক কর্ম কান্ডের মধ্যে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। বৃহৎ পরিমাণ খনিগুলি শ্রমিকদের কঠোর শ্রম যা শেষ পর্যন্ত ইউরোপ এবং উত্তর আমেরিকার ঔপনিবেশিক ও পুঁজিবাদী সাম্রাজ্যগুলিকে ইন্ধন যুগিয়েছিল[54]। তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে খনি অঞ্চলে আদিবাসীদের জোরপূর্বক শ্রমে নিয়োগ করা হয়। ঐতিহাসিক বিশ্লেষণে ল্যাটিন আমেরিকায় খনি শ্রম ইতিহাস গঠনে ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকার সমৃদ্ধ ইতিহাসবিদরা এক ধরনের মডেল অনুসরণ করেছেন। তাঁরা শ্রমিক ইতিহাসের শ্রম গঠনের প্রক্রিয়াকে উত্তর আটলান্টিকের অর্থনীতির মত বলে মনে করেছেন অর্থাৎ তারা পিছিয়ে ছিল। শিল্পের অস্থিরতা ধীরে ধীরে শ্রমিকদের চেতনার পরিবর্তন ঘটিয়েছিল বলে মনে করেন এরিক ডি ল্যাঙ্গার। বলিভিয়াতে রুপার খনিতে শ্রমকে বিশেষভাবে চিহ্নিত করা যায় স্প্যানিশ ঔপনিবেশিক শাসকদের মধ্য দিয়ে।[55]

আফ্রিকায় খনি শ্রমিদের টিকিয়ে রাখা হয়েছিল উপনিবেশ গঠন বা আধিপত্য তৈরি করার জন্য। জাম্বিয়াঁর তামা খনি থেকে রোডেশিয়ার সোনা খনি শ্রমিক সংগঠন 'কালো'

---

53. Dutt. Kuntala Lahiri, Kamins building The Empire: Class, Caste and Gender Interface in Indian Collieries, Research School of Pacific and Asian Studies, 2002, P. 4-7.

54. Lahiri-Dutt. Kuntala, *Roles and status of women in extractive Industries in India: Making a place for a Gender- sensitive mining development,* Vol. 37 No-4, December 2007, P. 38-43.

55. Amin. Shahid (Ed), Erick D Langer, *The Barriers to Proletarianization: Bolivian mine labour, 1826-1918,* Vol-41, International review of social History, Cambridge University Press, 1996, P. 27- 52.

শ্রমিকদের সংগঠন নামে পরিচিত ছিল।[56] আফ্রিকায় শ্বেতাঙ্গ শ্রমিকদের কাছে আফ্রিকান শ্রমিকদের কৃষ্ণাঙ্গ শ্রমিক বলে পরিচয় দেওয়া হয়েছিল। তাঁরা খনিতে কারাগারের মত বন্দি ছিল। খনি মালিকরা আফ্রিকান শ্রমিকদের উপর গুপ্তচর বৃত্তি করত।[57] শ্বেতাঙ্গ শ্রমিকরা খনিতে শ্রমের অভিজাত হয়ে উঠেছিল কারণ তাঁরা ছিল উচ্চ বেতন ভোগী। ঠিক একই ভাবে, দক্ষিণ আফ্রিকায় শ্বেতাঙ্গ শ্রমিকদের সিংহভাগই হয়ে ওঠেছিল ধারাবাহিক বর্ণবাদী শাসনের প্রধান এবং সবচেয়ে সোচ্চার সমর্থক।[58] খনিগুলিতে আফ্রিকার খনি শ্রমিকদের মত ভারতীয় খনি শ্রমিকদের একই অবস্থা তৈরি করা হয়েছিল।

পশ্চিমা সমাজের মত ভারতীয় সমাজের শ্রম বিশেষভাবে শিল্পায়নের সাথে অভিযোজিত হয়ে চলেছিল। রণজিৎ দাসগুপ্তা ঔপনিবেশিক পর্যায়ে ভারতে খনির ইতিহাসে কাঠামো গঠন করতে গিয়ে শ্রম বাজার গঠন ও বিকাশের প্রক্রিয়াকে স্বীকার করেছেন। তাছাড়া তিনি স্বীকার করেছেন যে, এই শ্রম বাজারকে ধরে রাখার জন্য মধ্যস্তাকারিদের ভূমিকা অনেকাংশে ছিল। ঔপনিবেশিক ভারতের শ্রম বাজারের কাঠামোকে পশ্চিমের বিশেষ করে ব্রিটেন ও রাশিয়ার প্রাথমিক শিল্পায়নের সাথে তিনি তুলনা করেছেন। এখানে শ্রম বাজারের কাঠামো বিকৃত শিল্প পরিবর্তনের কাঠামোর মধ্যে পরিবর্তিত হয়েছিল যা ব্রিটিশ স্বার্থের অধীন ছিল।[59] সি পি সিমেন্স ঔপনিবেশিক খনি শিল্পে বিশেষ করে কয়লা খনিতে শ্রমের বাজার গঠনে আদিবাসী পুরুষ, মহিলা, শিশু, বৃদ্ধ আদিবাসী শ্রমিকদের অনুপ্রবেশ বা অতিরিক্ত অংশগ্রহণ শ্রম বাজার গড়ে তুলতে বৈচিত্র সৃষ্টি করেছিল।[60] খনিতে মহিলা শ্রম বাজার তৈরি হওয়ার পশ্চাতে অর্থনৈতিক পশ্চাদপদতা অন্যতম কারণ ছিল। পুরুষেরা দীর্ঘ দূরত্বে শহরে কাজে যোগ দিলে, জীবিকা নির্বাহের জন্য তাদের স্ত্রী সন্তানদের বাড়িতে রেখে যেতে হত। এই তথ্য থেকে অবগত হওয়া

---

56. Rosenberg. David, *African mine labour in southern Rhodesia (1900-1933),* London, Pluto press, 1976, Pp. 106-120.

57. Hepple. Alex, *Birth of the African mine workers union,* South African History Archives, 27 Aug 2019. Access Dated on 22/03/2022.

58. তদেব।

59. Dasgupta. Ranajit, *Structure of the labour market in colonial India,* Vol. 16, No. 44/46, J. Store, Nov 1981.

60. Simmons. C. P, *Recruiting and organizing and Industrial Labour force in Colonial India: The case of the coal mining Industry,* (1880-1839), The Indians Economic and social history review, Vol-xiii, No-4, 1976, P. 122-136.

যায় যে, পরিবারের সাথে আদিবাসী মেয়েদের সম্পর্ক ক্ষীণ হতে শুরু করেছিল। আদিবাসী মহিলারা তাদের কম সাক্ষরতা, বেক্‌রত্ব, দক্ষতার অভাব নিয়ে অসংগঠিত ক্ষেত্রে অবৈধ শ্রমের বাজারে অংশগ্রহণ করতে থাকে। শিল্পে আদিবাসী শ্রম শক্তির ব্যবহারের মধ্য দিয়েই আদিবাসী মহিলাদের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে চিত্রপট পরিবর্তিত হতে শুরু করেছিল।

সুপর্ণা লাহিড়ী বড়ুয়ার দীর্ঘদিন কয়লা খনির শ্রমিকদের উপরে গবেষণা করে বলেন, কয়লা খনি আবিস্কারের মধ্যেই রাতারাতি মহিলা শ্রমিকদের অবাধ শ্রম ব্যবহারের স্তর তৈরি হওয়া শুরু হয়েছিল। সুপর্ণা লাহিড়ী বড়ুয়া 'অভিবাসন' শব্দটিকে অবৈধ শ্রম বাজার গঠনের সাথে এক করে দেখেছেন। মহিলাদের শ্রম বাজার গঠনের ক্ষেত্রে অভিবাসনের পারস্পরিক সম্পর্কের কথাকে স্বীকার করেছেন। তিনি খনিতে আদিবাসী মহিলাদের অবৈধ শ্রমের বাজার গঠনে রাখি রায়চৌধুরির মত খনি ক্ষেত্রে আদিবাসী মহিলাদের অংশগ্রহণের তিনটি পদ্ধতির কথা স্বীকার করেছেন, যথা ১) জমিদারী প্রথা ২) চুক্তিকরন পদ্ধতি ৩) সরকারী এজেন্সি প্রথা[61]। **প্রথমত** গিরিডি অঞ্চলের মোহনপুর, মজলডিহি, আমবাড়ি ও ঝড়িয়া অঞ্চলের মানুষের আর্থিক উপার্জনের উৎস কৃষি ছিল বলে শতকরা তিরানব্বই ভাগ মানুষই বাস করত গ্রামীণ এলাকায়। খনি শিল্প তৈরি হওয়ার ফলে কৃষিযোগ্য ভূমির পরিমাণ হ্রাস পেয়েছিল ও মাত্র শতকরা ৪.৫৭% ভাগে কৃষিকার্যের ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়েছিল। জমিহীন হয়ে অসংগঠিত কর্মক্ষেত্রে কাজ করার জন্য আদিবাসী মহিলারা খনিতে কাজ করতে এগিয়ে এসেছিল কোলিয়ারির শ্রমিকের কাজে যুক্ত হবে ভেবে। **দ্বিতীয়ত** স্বামীর আয় করার ক্ষমতা না থাকার ফলে ভিন্ন চুক্তির মাধ্যমে উত্তরপ্রদেশ, উড়িষ্যার কোরাপুট, ময়ূরভঞ্জ, বিহার থেকে প্রচুর সাঁওতাল মহিলা শ্রমিকের আগমন হয়েছিল। বারুদ তৈরিতে কয়লার ব্যবহার যারা করত তারা মূলত গয়া, মুঙ্গের, বিলাসপুর, রায়পুর, এলাহাবাদ, মির্জাপুর থেকে অধিক পরিমানে শ্রমিকরা পরিযায়ী হয়েছিল[62]। এই অভিবাসন মূলত চুক্তিমুলক ছিল। কিছু ঐতিহাসিক অনুমান করেছিলেন যে চুক্তিবদ্ধ অভিবাসন ছিল শ্রমের সাথে যুক্ত শ্রমিকদের সুবিধাবঞ্চিত করার একমাত্র সুযোগ। শ্রমিকদের সুবিধা বঞ্চিত করে অবৈধ শ্রমের ব্যবহারের জন্যই এই অভিবাসন গুরুত্বপূর্ণ ছিল। **তৃতীয়ত** ১৭৮০ সালের মধ্যবর্তী সময় থেকে ব্রিটিশ কোম্পানি কর্তৃক গ্রামীণ

---

61. বড়ুয়া. সুপর্ণা লাহিড়ী, *বিহার নারী সমাজ সংগ্রাম,* কলকাতা, র‍্যাডিক্যাল, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি, ২০০৮, পৃ. ১৪।

62 তদেব। পৃ. ৫৫

আদিবাসীদের লোভের বশবর্তী করে ঝরিয়া অঞ্চলে 'ইন্ডিয়ান মাইনিং অ্যাসোসিয়েশন' নামক সরকারী সংগঠনের মাধ্যমে গ্রামে গ্রামে এজেন্ট কর্তৃক মহিলা মজুর ধরে আনার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল। ১৯০০ দশক পর্যন্ত বিভিন্ন ক্যাম্পের মাধ্যমে এই অঞ্চলের ১১,০০০ সরল আদিবাসী গ্রামীণ মজুরকে কাজে ব্যবহার করা হয়েছিল খনি ক্ষেত্রে। ক্ষুদ্র পুঁজিপতিদের একটি স্তর চুক্তিবদ্ধ তত্ত্বাবধান এবং নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে এই ব্যবস্থা পরিচালনা করত বলে জানা যায়। খনি ক্ষেত্রে প্রবেশের পরে তাদের কঠোর শারীরিক পরিশ্রমের সম্মুখীন হওয়ার কথা মারগারেত স্বীকার করেছেন। দিলিপ সাইমন, ঠিক একই ভাবেই গ্রাম প্রধানের মাধ্যমে দালাল দ্বারা মজুর ধরে আনা ও শ্রমের বাজার তৈরি হওয়ার কথাকে স্বীকার করেছেন।[63]

এ প্রসঙ্গে হরপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় বলেন যে, রেলপথ স্থাপনকে মাধ্যম করে কোম্পানির কর্মচারীরা মহিলা শ্রমিকদের শ্রমের বাজারের সূচনা করেছিল।[64] শ্রম বাজার গঠনে যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রথম দিকে না থাকায় শ্রম বাজার প্রসারিত হয়নি। যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত হওয়ার ফলে গ্রামীণ এলাকা থেকে আসা ব্যক্তিদের শিল্পাঞ্চলে প্রবেশ করানো সহজ হয়ে উঠেছিল। অনেক মহিলা শ্রমিক স্ব- ইচ্ছায় বাড়ি ত্যাগ করে খনির কাজে যোগ দিতে শুরু করেছিল। অন্যদিকে মহিলা শ্রমের বাজার গঠনে কম মজুরি প্রদানকেও অন্যতম উপাদান ছিল তা বলতে চেয়েছেন। খনি শ্রম সম্পর্কীয় তথ্যের বিশ্লেষণে উঠে এসেছিল যে, কোম্পানি নিজ দেশকে আর্থিক ভাবে সমৃদ্ধ করতে এদেশের স্বল্প মূল্যের আদিবাসী মজুরদের ব্যবহার করেছিল। স্বল্প মজুরির পাশাপাশি শ্রম ব্যবহার করা সহজলব্ধ ছিল আদিবাসী মহিলাদের ক্ষেত্রে।[65] ললিতা চক্রবর্তী[66] বিহারের এই খনিক্ষেত্রে আদিবাসী শ্রম বলয়কে তীক্ষ্ণভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি আদিবাসী মহিলা শ্রমের বাজার গঠনে অভিবাসনকে যতটা গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেছেন ঠিক একইভাবে পিতৃতান্ত্রিক পরিবারে নির্ভরশীলতার কাঠামোটির এক অর্থে ভঙ্গুর হওয়ার চিত্র

---

63. Simeon. Dilip, *Work and resistance in the Jharia coalfield,* Contribution to Indian Sociology, Vol 33, Issue 1-2, 1999, p. 51.

64. Chattopadhyaya. Haraprasad, *Internal Migration in India a case study of Bengal,* Calcutta, K. P. Bagchi and Company, 1987, p. 24-29.

65. বড়ুয়া. সুপর্ণা লাহিড়ী, *বিহার নারী সমাজ সংগ্রাম,* কলকাতা, র‍্যাডিক্যাল প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি, ২০০৮, পৃ. ৫৫

66. Chakrabarty. Lalita, *Emergence of an Industrial Labour force in a Dual economy-British India 1880-1920,* The Indian Economic and Social History Review, vol-15, issue-3, https://doi.org/10.1177/001946467801500301.

প্রতিফলিত হয়েছিল বলে তিনি মনে করেন। এই ঘটনা সম্ভব হয়েছিল আদিবাসী মহিলাদের মধ্যে আর্থিক দারিদ্র্য পরিস্থিতির জন্য। অনেক ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছিল পরিবারের মধ্যে মহিলাই ছিল একমাত্র আয়ের উৎস। আদিবাসী মহিলারা তাদের সাথে কঠোর পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়ে কয়লার মত খনিতে কাজ করতে বাধ্য হত। আদিবাসী পরিবারগুলি দারিদ্র্যের তাড়নায় মেয়েদের নিরাপত্তার কথা না ভেবে পরিবারের অবিবাহিত মেয়েদের শহরে কাজে পাঠাতে বাধ্য হত। বেশিরভাগ পরিবারে পুরুষ উপার্জনকারীদের প্রয়োজন অপর্যাপ্ত হলে পারিবারিক আয়ে অবদান রাখতে নারীদের অসংগঠিত কর্ম সংস্থানের বাজারে প্রবেশ করতে হয়েছিল। অর্থনৈতিক স্বাধীনতার পাশাপাশি সামাজিক অবস্থানের জন্য তারা ক্রমাগত প্রচেষ্টা চালিয়ে গিয়েছিল। এছাড়াও মহিলাদের মধ্যে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার পর্যাপ্ত সুবিধার অভাব ছিল। পাশাপাশি তাদের কর্মসংস্থান বাজারের সেই অংশের চারপাশে ভিড় করতে অনুপ্রাণিত করেছিল যা শুধুমাত্র অপ্রযুক্তিগত চাকরির জন্য পূরণ করেছিল।

ললিতা চক্রবর্তীর মতামতের সহমত পোষণ করেন ই- বোসেম্প। তিনি ১৯ শতকের আদিবাসী মহিলাদের ঐতিহ্যগত সামাজিক অবস্থান সম্পর্কিত ই বোসেম্পের ১৯৭০ সালে প্রকাশিত "অর্থনৈতিক উন্নয়নে মহিলাদের ভূমিকা" বিশ্লেষিত গ্রন্থটি। তিনি আদিবাসী মহিলাদের অবস্থার একটি নির্দিষ্ট রিপোর্ট ও প্রান্তীয় আদিবাসী নারীদের বঞ্চিত হওয়ার কারণ অনুসন্ধান করেছিলেন এবং আদিবাসী মহিলা শ্রম বাজার গঠনের কথা স্বীকার করেন। ই-বোসেম্প একই ভাবে ব্যাখ্যা করেন গ্রামীণ মহিলাদের মধ্যে আর্থ সামাজিক সতর্কতার কোনো মাত্রা ছিল না, তাই এটি মূলত মহিলাদের নিরাপত্তা হীনতার অনুভুতি তৈরি করেছিল। দুর্ভিক্ষ ও অনাহারের সাধারণ ভয় যা তাঁদেরকে তাদের পৈতৃক বাড়ি থেকে বহির্মুখী করে তুলেছিল। তারা নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ের বসবাসের কোন পূর্ব ধারণা ছাড়াই কয়লা ক্ষেত্রে পৌছেছিল। তাদের কাছে যে কোন উপায়ে অর্থ উপার্জন করা ছিল একমাত্র উদ্দেশ্য। সেই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ঔপনিবেশিক সরকারের তৈরি করা বিভিন্ন অসংগঠিত ক্ষেত্রে মহিলাদের অংশগ্রহণ বাধ্যতামূলক ছিল। এই আদিবাসী অভিপ্রয়ানের বৈশিষ্ট্য এর মধ্য দিয়েই শ্রম বাজার গঠনের ভাবনাকে প্রশয় দিয়েছিল।[67]

---

67. দে. দেবশ্রী, *পূর্ব ভারতের আদিবাসী নারী বৃত্তান্ত (১৯৪৭-২০১০)*, কলকাতা, সেতু পাবলিকেশন, প্রথম সংস্করণ এপ্রিল ২০১২, পৃ. ২৮।

রাখী রায়চৌধুরী খনিতে মহিলাদের শ্রমের বাজার নিয়ে তাঁর “Gender and Labour in India” গ্রন্থে ব্যাখা করেন যে, বিহারের আদিবাসী অঞ্চলের নিম্ন ঘনত্ব অবশ্যই স্থানীয় কৃষিতে জড়িত হওয়ার উপর একটি উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলেছিল। অন্যদিকে শ্রম বাজারের অগনিত উপাদান কয়লা খনিতে প্রবেশ করতে শুরু করে এবং ভারী শিল্পকে কেন্দ্র করে আদিবাসী মহিলা শ্রমশক্তি একের পর এক সংগঠিত করে অভ্যন্তরীণ শ্রমবাজারের পরিপ্রেক্ষিতে অবৈধ শ্রম কাঠামোর জন্ম দিতে শুরু করেছিল। তিনিই প্রথম আদিবাসী মহিলা শ্রম বাজার গঠনে ‘অবৈধ’ শব্দটিকে ব্যবহার করেছেন। মূলত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের স্বার্থের অধীন এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে শ্রমের প্রকৃত গতিশীলতা কম থাকায় শ্রমিক শ্রেণির চাহিদা তৈরি হয়েছিল।[68]

রাখী রায়চৌধুরী আদিবাসী মহিলাদের অভিবাসনকে উদ্দেশ্যমূলক হিসাবে দেখিয়ে শ্রমের বাজার গঠনের কথাকে স্বীকার করেন। স্বভাবতই খনিজ পদার্থের সন্ধান পাওয়া যাওয়ায় এলাকাগুলি থেকে আদিবাসীদের উচ্ছেদিত করার একটা প্রবণতা তৈরি হয়। তাদের মধ্যে কাজের প্রলভন দেখানো শুরু করেছিল এছাড়া অর্থনৈতিক ভাবে পিছিয়ে পড়া অঞ্চলগুলি থেকে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির অধিক মুনফা উঠে আসবে জেনেই এই ধরনের অভিবাসন করানোর উদ্যোগী হয়েছিল খনির ম্যানেজিং দালালরা। এরা কোথাও ঠিকাদার বা সিরদার নামে পরিচিত ছিল।[69] তিনি মনে করেন অভিবাসনের মধ্য দিয়ে শুধু আদিবাসী মহিলাদের শ্রমের বাজার তৈরি হয়নি বরং খনি ক্ষেত্রে শ্রমের বাজার গঠন হয়েছিল দালালদের হাত ধরে।[70] অত্যধিক দরিদ্র্য অবস্থায় তারা দালালদের কাছে ‘বাঁধা শ্রমিকে’ পরিণত হয়েছিল কেননা শিল্পক্ষেত্রে কন্ট্রাক্টারদের আধিপত্যের পাশাপাশি দৈনন্দিন সংসার খরচ মেটাতে অর্থের

---

68. Roychouwdhury. Rakhi, *Gender and Labour in India (The Kamins of Eastern Coalmines 1900-1940),* Calcutta, Minerva Associates Publications PVT. LTD., First Published 1996, P. 20-27.

69. *Report of the Bihar Labour Enquiry Committee*, Vol-1, Patna, Bihar, 1940, P. 36.

70. Roychouwdhury. Rakhi, *Gender and Labour in India (The Kamins of Eastern Coalmines 1900-1940),* Calcutta, Minerva Associates Publications PVT. LTD, First Published 1996.

প্রয়োজনে কন্ট্রাক্টারদের থেকে ঋন নিতে বাধ্য হত নারী শ্রমিকরা।[71] একবারের ঋন শোধ করার জন্য পুনরায় ঋন নিতে বাধ্য করত কন্ট্রাক্টররা। এইভাবে ঋনের পরিমাণ ক্রমাগত বৃদ্ধি পেতে থাকলে মহিলা শ্রমিকরা কন্ট্রাক্টারদের 'বাঁধা' শ্রমিকে পরিণত হয়েছিল। কম বেতনের শ্রমিক হয়ে কাজ করা তাদের বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল। আদিবাসী মহিলা শ্রমের অবৈধ বাজার গঠনের অন্যতম দিক হিসাবে অর্থনীতির পাশাপাশি 'ধর্ম ও জাতের' মত উপাদানকে ব্যবহার করেছিল ব্রিটিশ কোম্পানি। অর্থনৈতিক ভাবে বিপর্যস্ত কামিওতি বা বাঁধা শ্রমিকদের শিল্পাঞ্চলের বাইরে যাওয়ার ক্ষমতা ছিল না প্রান্তিক ও নিচু জাতি হওয়ার জন্য। সমাজে তাদেরকে অচ্ছুৎ বলে গণ্য করা হয়েছিল। অচ্ছুৎ হওয়ায় সাঁওতাল মহিলাদের অন্যান্য কাজের ক্ষেত্রে সুযোগ হ্রাস পেয়েছিল। এই দারিদ্র্য অবস্থার কারণে তারা শ্রমের বাজারে সস্তা শ্রমিকে পরিণত হয়েছিল। শ্রমের প্রতি আদিবাসী মহিলাদের নির্ভরশীল করে তোলার জন্য দুর্বল অর্থনীতির সাথে 'ধর্ম ও জাতের' মত উপাদানকে একসাথে ব্যবহার করা হয়েছিল। সাঁওতাল মহিলাদের শিল্পাঞ্চলে কাজের অভিজ্ঞতা না থাকার ফলে মালিকদের পছন্দমত খনির অভ্যন্তরে ভারী শ্রমসাধ্য কাজের সাথে যুক্ত হতে হত। খনি ক্ষেত্রে সাধারণত গর্ভে কয়লা খননের কাজ ব্যতীত খনির অন্যান্য কাজে আদিবাসী মহিলাদের নিয়োগ করা হত না কেননা তাদের কাজের মধ্যে অদক্ষতা প্রকাশ পেত। কাজে অদক্ষতা প্রকাশ পাওয়ার ফলে ধীরে ধীরে তাদের মধ্যে শিল্পাঞ্চলের বাইরে কাজের সন্ধান করার প্রবণতা হ্রাস পেয়েছিল। তাদের খনির একেবারে নিচে অর্থাৎ খনি গর্ভে গিয়ে কাজ করতে সম্মত হত। কোলিয়ারি গুলিতে সাধারণ শ্রম পরিচালনার অভিযোগ ও ব্যর্থতা দেখা দেওয়ার কারণ প্রসঙ্গে রাখী রায়চৌধুরি বলেন, কোলিয়ারিতে শ্রমিকদের স্ক্রিপিং[72] করার অভিযোগ উঠেছিল দালালদের মধ্য দিয়ে। যদি কোনো কোলিয়ারি অসতর্ক থাকত অর্থ প্রদানে, সেক্ষেত্রে শ্রম প্রদানে শ্রমিকদের অনুপস্থিতি লক্ষ করা যায়। অন্যদিকে শ্রমিক দালালরা এই অসন্তুষ্ট শ্রমিকদের অন্যান্য কোলিয়ারিতে শ্রমিকদের অন্যান্য কাজে যুক্ত করত। আদিবাসী মহিলা শ্রমের ব্যবহার ১৯০০ সালের মধ্যে

---

71. Prakash. Gyan, *Bonded Histories: Genealogies of Labour Servitude in Colonial India,* Cambridge, Cambridge University Press, 1990, P. 188-189.

72. Roychouwdhury. Rakhi, *Gender and Labour in India (The Kamins of Eastern Coalmines 1900-1940),* Kolkata, Minerva Associates Publications PVT. LTD, First Published 1996, P. 41.

রীতিমত শুরু হলেও এই প্রক্রিয়া ১৯৬০ পর্যন্ত নিয়মিত ভাবে চলেছিল যা একপ্রকার আদিবাসী মহিলা অবৈধ শ্রম বিক্রির বাজারের রুপ নিয়েছিল।

কোলিয়ারিতে আদিবাসী মহিলা শ্রমিক নিয়োগ ও শ্রমের বাজার তৈরি নিয়ে একটি রিভাইস দৃষ্টিভঙ্গির কথা উল্লেখ করেছেন শমিতা সেন। কোলিয়ারির মত বৃহৎ পরিসরে সংগঠিত ভাবে আদিবাসী মহিলাদের নিয়োগ ও অভিবাসনকে সফল করা হয়েছিল অবৈধ শ্রমের ব্যবহারের জন্য। আদিবাসী মহিলা শ্রমিকদের খনিজ শিল্পে শ্রম প্রয়োগের জন্য ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের যোগাযোগে তাদের জবরদস্তি মূলক ভাবে মোতায়েন করেছিল।[73] ও মেলি রাষ্ট্রের যোগাযোগের কথা না মেনে তিনি বলেন, খনি ক্ষেত্রে মহিলাদের দ্বারা অবৈধ শ্রম ব্যয় হওয়া শুরু হয়েছিল জমিদারিতে দাসত্ব ও বেগার শ্রমের বিলুপ্তির প্রবণতা থেকে। ১৯২১ এর এক লিখিত চিঠি থেকে কিছু আদিবাসী মহিলা শ্রমিকের জোরপূর্বক খনি ক্ষেত্রে প্রবেশ ও কাজের নামে অসহ্যকর যন্ত্রণা দেওয়ার চিত্র উঠে এসেছিল। খনির মত অবৈধ শ্রমের বাজারে কোন শ্রমিক কাজের চুক্তি ভেঙ্গে ফেললে তাকে 'ক্রিমিনাল'[74] নামে তকমা দেওয়ার নিয়ম প্রচলিত ছিল, তাই চুক্তি ভেঙ্গে ফেলার কোনো সুযোগ ছিল না। খনি ব্যবস্থাপক এবং উত্তোলনকারী ঠিকাদারদের স্বার্থ কদাচিৎ ভিন্ন থাকায়, উভয়ের মধ্যে দ্বন্দ্ব প্রায়ই সংঘর্ষে পরিণত হত। ১৯২১ সালে ডবলু সিম্যান্স পরীক্ষা করে বলেন যে, খনি অঞ্চলে ব্যস্ত রাখা হত বিপুল সংখ্যক মহিলা শ্রমিকদের তা না হলে কমপক্ষে দুইমাস পর তাঁরা চাষের কাজে নিয়োজিত হওয়ার পরিকল্পনা করত। ভুলনবারীরে খনি শ্রমিক কল্যান ইন্সটিটিউটের জনপ্রিয়তা প্রমানিত করেছিল যে, পার্শ্ববর্তী খনি থেকে মহিলা শ্রমিকদের সম্পূর্ণ সুবিধা গ্রহণ করেছিল। স্বতন্ত্র রায়ত হিসাবে অর্থনীতির অগ্রগতি সম্পর্কে সাঁওতাল আদিবাসীদের কোনো জ্ঞান ছিল না।[75]

---

73. Sen. Samita, *Women and Labour In Late colonial India,* Cambridge, Cambridge University Press, First Published 1999, P. 21-45.

74. *Unemployment among Women in West Bengal,* Calcutta, Government of west Bengal Labour Department, (Directorate of national employment Service West Bengal, Nov 1928, P. 7-14.

75. Chattopadhyaya. Haraprasad, *Internal Migration in India a case study of Bengal,* Calcutta, K. P. Bagchi and Company, 1987, Pp. 513-517.

খনি ক্ষেত্রে আদিবাসী মহিলারা প্রথমদিকে বহিরাগত এবং অনিয়মিত ছিল। সাধারণত গ্রামগুলি থেকে অনুসৃত উৎপাদনের পদ্ধতিতে মহিলাদের ব্যবহার করা হয়েছিল, তবে ঔপনিবেশিক সংগঠিত শিল্পগুলিতে গত কয়েক দশকে অবাধ শ্রমের দিগন্তকে প্রসারিত করে দিয়েছিল। উৎপাদনের নতুন পদ্ধতিতে, পরিবার এবং সংগঠিত শ্রম নিয়ে পরিবারের মহিলারা বন্দী ছিল না। তাদের শ্রমের বাজারে প্রবেশের সাথে সাথে ভারবাহী কাজের সাথে যুক্ত হতে হয়েছিল। খনি ক্ষেত্রে প্রবেশের পরে তাদের কঠোর শারীরিক পরিশ্রমের সম্মুখীন হওয়ার কথা মারগারেত মনে করেছিলেন। এই ভারবাহী শ্রমসাধ্য কাজ যেন তাদের জন্য তৈরি হয়েছিল বহু যুগ ধরে তা এই চিত্র দেখে প্রতিভাত হয়েছিল। ক্রমাগত এই শ্রমসাধ্য কাজ, তাঁদের কাছে যে একদিন মূল জীবিকা হয়ে দাঁড়াবে সেই ধারণা আদিবাসীদের কাছে প্রায় অজানা ছিল। সার্বিকভাবে, ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষের ছোটনাগপুর অঞ্চলে আদিবাসী মহিলা শ্রমকে নিয়ে ধীরে ধীরে এক উদ্বেগজনক বাজার গড়ে তোলার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল। ১৯ শতক থেকে বিংশ শতকের ঔপনিবেশিক পর্যায়ে আদিবাসী মহিলা শ্রমিকদের শ্রম বাজার গঠিত হয়ে প্রসারিত হয়েছিল পূর্ব ভারতের আসাম, কোচবিহার, দার্জিলিং এর দিকে।[76] অদক্ষ শ্রমিক হিসাবে শ্রম বাজারে প্রবেশ করেও মহিলাদের কাজের চাপ বৃদ্ধি পেয়েছিল যদিও তাদের পদের কোনো উন্নতি হয়নি। খনি গর্ভে মেয়েদের শ্রমশক্তির ভয়াবহ শোষণের মধ্য দিয়েই শিল্পগত পুঁজিতন্ত্রের যুগ আরম্ভ হয়েছিল বলে মনে করা হয়। কঠোর পরিশ্রমে অভ্যস্ত একঘেয়ে কাজের পদ্ধতি এবং কারখানা জীবনের শৃঙ্খলার প্রতি গভীরভাবে বিদ্বেষী হয়ে উঠেছিল। শ্রমের টার্নওভারের ফলে কারখানার কাজের একঘেয়েমি বন্ধ করতে পারিবারিক অনুষ্ঠানে যোগ দিতে বা পরিবারের সদস্যদের সাহায্য করার জন্য পূর্বানুমতি ছাড়া দেখা করার সুযোগ পেত না। এতে তাদের পারিবারিক সম্পর্কও ধীরে ধীরে ভঙ্গুর হতে শুরু করেছিল।[77] শিল্পাঞ্চলে শ্রমের বিকাশের সাথে সাথে আদিবাসীদের সামাজিক ও সংস্কৃতি বিনাশের মত সামাজিক বিবর্তন ঘটতে শুরু করেছিল। ১৮৯০ সালের দিকে এই কর্মক্ষেত্রে বাসস্থানের পরিবেশ ছিল

76. *Unemployment among Women in West Bengal,* Calcutta, Government of west Bengal Labour Department, (Directorate of national employment Service West Bengal), Nov 1958, P. 7-10.

77. Curjel. Dagmar F, *Womens Labour in Bengal Industries,* Calcutta, Government of India, 1923, p. 1-31.

অস্বাস্থ্যকর, অত্যন্ত কম পারিশ্রমিক এবং দালালদের হাতে দারিদ্র্য আদিবাসী নারীর শোষণের পাশাপাশি খনিতে শ্রম বিভাজন ও বৈষম্য ছিল চোখে পড়ার মত।

কয়লা খনিতে আদিবাসী মহিলা শ্রমিকদের গৃহ যাত্রার চিত্র

গৃহে যাত্রার কারণ	শ্রমিক সংখ্যা [78]	গৃহে যাত্রার কারণ	শ্রমিক সংখ্যা
অসুস্থতা	৪৫	কৃষি কাজে সাহায্য	১৯
নিজ আত্মীয়ের বিয়ে	১২৪	সম্পত্তি জনিত নিস্পত্তিকরণ	৪
নিজ আত্মীয়ের মৃত্যু	৮	ঘর ভাড়া সংক্রান্ত	৪
ঘর মেরামত	২৪	কোম্পানির কাজ বন্ধ	৫
ধার্মিক পরব	১৪	অসাময়িক ভাবে কাজ থেকে বিরতি	৪

কয়লা ও অন্যান্য খনিজ খনিতে শ্রম বিভাজন

ছোটনাগপুর মালভূমি বা “The Ruhr of India” তার খনিজ সম্পদের প্রাচুর্যের জন্য পরিচিত হলেও আদিবাসী শ্রমিকদের অভিবাসন ও অতিরিক্ত শ্রম ব্যয় হওয়ার ফলে এই মালভূমি নতুন নাম ধারন করেছিল, “Nation of the Proletariat[79]”। শিল্প অভিযোজনের জটিল প্রক্রিয়ায় পশ্চিমবঙ্গ ও বিহারে বসবাসকারী আদিবাসীদের জীবিকাকে প্রভাবিত করেছিল। কয়লা ছাড়াও ছোটনাগপুরের বিভিন্ন খনিজ খনি যেমন অভ্র, ম্যাঙ্গানিজ, পাথর, চুনাপাথর খনিতেও মহিলাদের শ্রমের বিভাজন একদিনে তৈরি হয়নি। ছোটনাগপুর মালভূমি খনি অঞ্চলে মহিলা শ্রমিক শ্রেণি

78. *Report of the Bihar Labour Enquiry Committee,* Vol-1, Patna, Bihar Government, 1940, P. 25.

79. দে. দেবশ্রী, *পূর্ব ভারতের আদিবাসী নারী বৃত্তান্ত (১৯৪৭-২০১০),* কলকাতা, সেতু পাবলিকেশন, প্রথম সংস্করণ এপ্রিল ২০১২, পৃ. ১৩

শ্রমের বাজার প্রবেশ করার সাথে সাথে শ্রম বিভাজন ও শ্রম গঠনের আকৃতি তৈরি করা ছিল পুঁজিবাদী সমাজের এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য। ঔপনিবেশিক পর্যায়ে ভিন্ন ভিন্ন খনিজ শিল্পাঞ্চলে অভিবাসনের ফলে শ্রমের বিভাজন স্পষ্টত লক্ষ করা যায়। বাংলা ও বিহারের আদিবাসী মহিলাদের শ্রমিকদের বণ্টন ও শ্রমের কর্মসংস্থান মোটামোটি ভাবে নির্দিষ্ট ছিল বিশেষ করে কয়লা, পাথর, চুনাপাথর, ইস্পাত, লোহা, তামা শিল্পে ও চা শিল্পাঞ্চলগুলি। ভিন্ন রকমের শিল্প প্রতিষ্ঠিত হলেও কয়লার মত খনিজ পদার্থের চাহিদা অব্যাহত রাখার জন্য কয়লা নির্ভর স্টিমার কোম্পানি, ইট ও চুনের ভাটা, কারিগরি কর্মশালায় মহিলা শ্রমিকের চাহিদা বৃদ্ধি পেয়েছিল।[80] আদিবাসী মহিলাদের খনি ক্ষেত্রে প্রবেশের জন্য বৃহত্তর ব্যবস্থা স্থাপনকারীরা নিজস্ব ব্যবহারের জন্য উত্তরাধিকারী নিয়ম অনুসরণ করেছিল। খনি মালিকদের অধিনে গঠিত একটি সুসংগঠিত শ্রম ব্যুরো ছিল। দক্ষ, অদক্ষ, অল্প দক্ষ সব ধরনের মহিলা শ্রমিক নিয়োগে ভিন্ন ভিন্ন নিয়ম ছিল। কিছু কোম্পানি তাদের প্রাক্তন কর্মচারীর পরিবারকে অগ্রাধিকার দিত কারণ মালিকেরা মনে করেছিল তা না হলে উপার্জনের উদ্দেশ্য পূরণ হবে না। দক্ষতা সম্পন্ন এবং শিল্পের উচ্চতর পরিষেবাগুলিতে এই অঞ্চলের জনগণের উপস্থাপনা ছিল অপ্রতুল। দক্ষ শ্রমিক নিয়োগের সময় আদিবাসী মহিলাদের বিভিন্ন বৈষম্যের শিকার হতে হয়েছিল।[81] আদিবাসী মহিলারা তাদের কম সাক্ষরতা, বেকা্রত্ব, দক্ষতার অভাব নিয়ে এই কাজে যোগ দিলে, শ্রম পটভুমিকায় ভিন্ন রকমের বৈষম্যের চিত্র লক্ষ করা যায়।

উনবিংশ শতাব্দীতে শিল্পের মূল ক্ষেত্র ছিল কয়লা খনির পেশা। এই পেশায় যেমন শ্রমিকের চাহিদা দেখা যায় ঠিক তেমনই অতিরিক্ত শ্রম প্রয়োগে বিভাজন লক্ষ করা যায়। ঔপনিবেশিক যুগে শিল্প ক্ষেত্রে শ্রমের বিভাজন শুরু হওয়ার পশ্চাতে কৃষি ক্ষেত্রের বিশেষ ভূমিকা লক্ষ করা যায়। এ প্রসঙ্গে মারগারেট তার দ্যা ইন্ডিয়ান পিজেন্ট আপ্রুটেড বইতে মন্তব্য করেছেন, "শ্রম বাছায়ের জন্য লাঙ্গল ছিল একটি অনিচ্ছুক বিনিময়"[82]। আদিবাসী মহিলা মজুরদের মূলত জমি তৈরির ক্ষেত্রে বীজ বপন, চারা রোপণ, শস্য কাটা ও মারাই এর কাজে

---

80. Das Gupta. Pranab Kumar, *Impact of Industrialization on a tribe In South Bihar,* Calcutta, *Anthropological Survey of India,* 1978, Pp. 14-30.

81. *Report of the Bihar Labour Enquiry Committee,* Vol-1, Patna, Bihar Government, 1940, P. 33-37.

82. Read. Margaret, *The Indian Peasant Uprooted: a study of the Human Machine,* London, Longmans green, 1931, P. 127-130.

ব্যবহার করা হত।[83] আসলে কিছু ঐতিহাসিক মনে করেন কৃষির মত ক্ষেত্র থেকেই যদিও শ্রম বিভাজনের জন্ম হয়েছিল। শ্রম বিভাজনের পূর্বে আদিবাসী মহিলাদের অনেকগুলি বিপত্তির সম্মুখীন হতে হয়েছিল। নির্দিষ্ট শ্রেনীবিন্যাস প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে পুরুষদের জন্য কোনো নিষেধাজ্ঞা না থাকলেও আদিবাসী মহিলাদের নিয়ে এ ধরনের অবস্থান লক্ষ করা যায়। সমাজে মহিলাদের কাজের বিরুদ্ধে সামাজিক- ধর্মীয় নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছিল প্রথম থেকেই। আদিবাসী সম্প্রদায়ের মধ্যে হো ও মুণ্ডা সম্প্রদায়ের মহিলাদের মধ্যে লাঙ্গল স্পর্শ করা ছিল গুরুতর অপরাধ।[84] অসাবধানতায় লাঙ্গল স্পর্শ করার সম্ভাবনা মহিলাদের মধ্যে হ্রাস করতে, এটি বাড়ির বাইরে রাখা হত। লাঙ্গল স্পর্শের জন্য মহিলাদেরকে জমির অধিকাংশ কাজ থেকে দায়িত্ব মুক্ত করা হয়েছিল। সাঁওতাল, ওঁরাও এবং খরিয়া মহিলাদের মধ্যে লাঙ্গল স্পর্শ করার বিরুদ্ধে কোনও নিষেধাজ্ঞা না থাকলেও, তাদের জোয়াল করা লাঙ্গল স্পর্শ করার অধিকার ছিল না। এছাড়াও তারা তীর, ছোড়া, ক্ষুর, কুড়াল ব্যবহার করতে পারত না। দেশের বাইরেও বড় খনি অঞ্চলেও আদিবাসী মহিলা শ্রমিকদের ক্ষেত্রে কিছু প্রবাদ প্রচলিত ছিল। উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর গোঁড়ার দিকে ইউরোপ এবং উত্তর আমেরিকার অন্যান্য পেশার তুলনায় খনি ও খনন খাতের দিকে নজর দিলে মহিলাদের অংশগ্রহণ অধিক মাত্রায় লক্ষ করা যায়। বলিভিয়া, কলম্বিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকায় খনি ক্ষেত্রের সাথে মহিলাদের সম্পর্ক এতটাই সম্পৃক্ত ছিল যে প্রাচীন পৌরানিক কাহিনীর মধ্য দিয়ে তার পরিচয় পাওয়া যায়। তারা মনে করতেন যে, "মাটির দেবী এবং ভূগর্ভস্থ নারী শ্রমিকদের মধ্যে গভীর সম্পর্ক ছিল"[85]। মরিচ খনি শ্রমিকরা মনে করতেন যে, "খনিতে একটি নারীর উপর পুরুষ শ্রমিকরা তাদের ইচ্ছা প্রয়োগ করতে পারত"[86]। এ প্রসঙ্গে মনুর মতামতের সাথে সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়।[87]

---

83. Krishnaraj. Maithreyi, Aruna Kanchi, *Women Farmers of India,* Delhi, National book trust India, Pp. 65-66.

84. দে. দেবশ্রী, *পূর্ব ভারতের আদিবাসী নারী বৃত্তান্ত (১৯৪৭-২০১০),* কলকাতা, সেতু পাবলিকেশন, প্রথম সংস্করণ এপ্রিল ২০১২, পৃ. ৪৮-৫০

85. Banerjee. Saheli, *Labour in Mining Industry in Eastern India,* unpublished research, Calcutta, Rabindra Bharati University, 2017, Pp. 116-123.

86. Gier. Jaclyn J (Ed), Laurie Mercier, *Mining women: Gender in the global development of a global Industry, 1670-2005,* New York, Palgrave Macmillan, 2006, Pp. 320-350.

বিশেষত আদিবাসী সমাজে পুরুষের মালিকানা হিসাবে নারীর দেহ ও জীবন, বিশেষ করে তার যৌনতা পর্যন্ত সম্পত্তি হিসাবে বিস্তৃত ছিল।

ঠিক এই চিত্রের পাশাপাশি জমি রয়েছে এমন দারিদ্র্য হিন্দু পরিবারের মহিলাদের যেমন জমির কাজ বাদ দিয়ে বাড়ির কাজ, গৃহে কাপড় বোনা এবং শস্যপণ্য বিক্রির মধ্যেই আয় সীমিত ছিল। দারিদ্রতার থেকেও উচ্চ জাতিত্ব প্রমাণ তাদের কাছে মুখ্য ছিল। জাতিত্বের স্বচ্ছতা প্রমাণ করতে সর্বদাই ব্যস্ত থাকত। হিন্দু পরিবারের মহিলাদের ধারনায় গাঁথা ছিল, জমির কাজের জন্য সাধারণত অস্পৃশ্য, নিচু আদিবাসী মহিলারা উপযুক্ত। আদিবাসী মহিলারা 'ঘরোয়া শ্রমিক' বলে সমাজে কটাক্ষের শিকার হত এমনকি একজন নারী যে পুরুষের উপর নির্ভরশীল সেই প্রসঙ্গটি সর্বদা মহিলাকে স্মরণ করানো হত। মেয়েদের শ্রম দান করাকে পুরুষদের 'সম্পত্তি' বলে উল্লেখ করেন বলে এই ধরনের দাবি উঠে এসেছিল, যা উল্লেখ করেন ১৯৮৪ সালে হিরসন তার লেখায়। ক্ষেত থেকে খনির মত কর্মক্ষেত্রে আদিবাসী নারীদের মুখোমুখি হওয়া চ্যালেঞ্জ এবং বাধাগুলির মধ্য দিয়ে অন্যান্য অন্তর্দৃষ্টি তৈরি করতে এদেশের সমাজকে সাহায্য করেছিল ঔপনিবেশিক শক্তি। কয়লার মত অন্যান্য খনিজ খনি অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে আদিবাসীদের যোগদানের পশ্চাতে ছিল সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিধিনিষেধ যা শ্রম বিভাজন করার চিন্তাধারায় সহায়তা করেছিল।

ঔপনিবেশিক পর্যায়ে খনি ক্ষেত্রে মহিলা ও পুরুষ শ্রমের বিভাজন লক্ষ করা গিয়েছিল। শ্রম বিভাজনে মেয়েদের শ্রমের গঠন আকৃতি কাজের মধ্য দিয়ে পরিবর্তিত হয়েছিল। সাঁওতাল সমাজের মধ্যে কর্মক্ষেত্রে লিঙ্গ বিভাজন না থাকলেও আদিবাসী মহিলাকে খনি ক্ষেত্রে এসে লিঙ্গ বিভাজনে বিভাজিত হতে হয়েছিল। উপরিক্ত আর্থ- সামাজিক ক্ষমতায়ণের মধ্য দিয়ে আদিবাসী মহিলাদের সামাজিক অবস্থানে শ্রম সম্পর্কীয় বিভাজন দেখা যায়। এই বিভাজন খনি ক্ষেত্রে চরমে পৌছায় কেননা আদিবাসী মহিলাদের বিশ্বাস করানো হত যে, ১) তাদের শ্রম দেশের উৎপাদন প্রক্রিয়ায় জন্য গুরুত্বহীন বা গৌণ ভূমিকা পালন করে। দ্বিতীয়ত তাদের

৪৭. মনুর মতে, স্ত্রী ও ক্রীতদাসরা ছিল সম্পত্তিহীন পুরুষরা যা উপার্জন করে তাই ছিল তাদের সম্পত্তি। একজন পুরুষের নারীর শরীর, মন এবং আর্থ- সামাজিক অবস্থার উপর বসতি স্থাপন করা কৃষি এবং সম্পত্তির ব্যাক্তিগত মালিকানার প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

উপার্জন পারিবারিক আয়ের দুর্বল পরিপূরক[88] বলে গণ্য হয়েছিল। একটি পুরুষ, মহিলার শ্রম ব্যবহার করতে পারলে সেই মহিলার সাথে পুরুষের কাজ করতে দ্বিধাবোধ থাকার কথা নয় তবুও, ক্ষমতাবান খনির কর্ম কর্তারা নির্ধারণ করে দিত কোন কাজটিতে মহিলা শ্রমিকরা গ্রহণযোগ্য। কর্মক্ষেত্রে খনির পরিবেশ এইভাবে দ্বি- বিভক্ত হয়ে পড়েছিল। ওয়েবারের ব্যাখায় লিঙ্গ ও প্রজন্মের উপাদানের মধ্যে শ্রমের অভ্যন্তরীণ সম্পর্ক জড়িত ছিল। শারীরিক শক্তির কারণে, পুরুষেরা মহিলাদের উপর ব্যাক্তিগত মালিকানা সংযুক্ত করার পর থেকে নিজস্ব সম্পত্তি হিসাবে বিবেচিত করতে শুরু করেছিল। ব্যাক্তিগত সম্পত্তির পূর্ণ বিকাশ হিসাবে কাকতালীয়ভাবে সৃষ্টি করা পুরুষ এবং মহিলাদের মধ্যে অবিছিন্ন বিভাজন রাষ্ট্রীয় শক্তি ও যন্ত্রপাতির মধ্য দিয়ে তৈরি হয়েছিল।

ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষে কৃষি জনিত শ্রমক্ষেত্রে মহিলা কৃষক থেকে মজুরে যোগদান ৫০ শতাংশের কাছাকাছি ছিল। আদিবাসী সম্প্রদায়ের মধ্যে মহিলাদের সংগঠিত করে অর্থনৈতিক উন্নয়নের উৎপাদনশীলতায় চালিত করা হয়েছিল। তারা প্রয়োজনে প্রচলিত সামাজিক নিয়মের বিরুদ্ধে যাওয়ার জন্য প্রতিশোধের সম্মুখীন হতে পারত না। ঐতিহাসিক এবং ঐতিহ্যগতভাবে মহিলারা সিধান্ত নেওয়ার অত্যাবশ্যক অধিকার এবং তার পারিবারিক আয়ের অংশ থেকে বঞ্চিত ছিল। আদিবাসী মহিলাদের সম্পত্তির উপর অধিকার না থাকায় অর্থনৈতিক দিক থেকে সম্পূর্ণ রূপে পুরুষের উপর নির্ভরশীল হতে হয়েছিল। সম্পত্তি সম্পর্কের সাথে দ্বন্দ্ব থাকার পাশপাশি খনির কর্মক্ষেত্রে শ্রম বিভাজনে প্রতিক্রিয়া স্বরূপ ফুটে উঠেছিল। লিঙ্গ নির্বিশেষে একজন আদিবাসী মহিলা শ্রমিককে কর্মক্ষেত্রে ক্ষমতার সীমা নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছিল, সেক্ষেত্রে পুরুষদের সামাজিক কাজ করার কোনো নিষেধাজ্ঞা ছিল না। শিল্প ক্ষেত্রে নীতি পরিবর্তন এবং প্রযুক্তিগত উন্নয়নগুলি অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমকে প্রভাবিত করেছিল গভীর ভাবে। খনির মত অসংগঠিত ক্ষেত্রের বৈশিষ্ট্যগুলি নিয়ে আলোচনা করার সময়, কৃষি ও শিল্পের মধ্যে পরিবর্তিত শ্রমিক ও শ্রম সম্পর্কের উপর বিশেষ করে জোর দেওয়া হয়েছিল। অন্যদিকে পুরুষরা আয় করার ফলে মহিলাদের চিরকাল পুরুষের অধীন করে রেখেছিল সমাজ। যদিও এই বিভাজন পুরুষতন্ত্রের আধিপত্যের দ্বারাই নারীদের উপর নিপীড়নের অনুশীলনের ফলেই শ্রমের দ্বৈত কাঠামো তৈরি হওয়া শুরু হয়েছিল। মহিলাদের

---

88. Banerjee. Saheli, *Labour in Mining Industry in Eastern India,* unpublished research, Calcutta, Rabindra Bharati University, 2017, Pp. 116-123.

উপর পুরুষের আধিপত্যের পরিপ্রেক্ষিতে পুরুষতন্ত্রকে সংজ্ঞায়িত করার অর্থ হল শ্রমের প্রেক্ষাপটে পুরুষ ও নারী উভয় গোষ্ঠীর বিভাজন নিশ্চিত হয়েছিল। খনি ক্ষেত্রে আদিবাসী মহিলাদের শ্রম, উৎপাদক হিসাবে পরিচিতি পেয়েছিল। ছোটনাগপুর কয়লা খনি অঞ্চলে সাঁওতাল এবং কোরা নামক আদিবাসী মহিলারা ঐতিহ্যবাহী কয়লা কাটা শ্রেণিই হিসাবে প্রথম পরিচিত ছিল। খনি শিল্পের প্রাথমিক পর্যায়ে আদিবাসী মহিলাদের তারা সারাদিনে ওজন বহন করতে হত ৫০ থেকে ৬০ কেজি। কোলিয়ারিতে আদিবাসী মহিলা শ্রমিকদের শ্রমের সাথে সাথে 'কর্মঠ' নতুন নামের সাথে পরিচিত হতে শুরু করেছিল 'লোডিং বিবি' ও 'কামিন'[89] নামে। বিলাসপুরি আদিবাসী মহিলাদের শরীরে কার্যক্ষমতা অধিক থাকায় খনি মালিকের প্রিয় হয়ে উঠেছিল তারা অল্প সময়ের মধ্যে।[90]

বিহারের আদিবাসী শ্রমিকদের ক্ষেত্রে কয়লা আর একটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায় খনির পাশপাশি ইট ভাটায় কাজ করা। বিহারের ইট ভাটায় কর্মরত এই সকল আদিবাসী মেয়েরা পরিচিত হত রেজা মজুর নামে। বিহারের অবিভক্ত রাঁচি প্রদেশে রেজা মজুরদের অধিক লক্ষ করা যায়। আদিবাসী শ্রমিকদের মধ্যে পেশার বৈচিত্র না থাকলেও সামাজিক ও অর্থনৈতিক শ্রম বিভাজনে বৈচিত্র লক্ষ করা গিয়েছিল। অবিভক্ত বিহারের রাঁচি প্রদেশ থেকে রেজা মজুর হিসাবে অধিকাংশ আদিবাসী মেয়েরা ইট ভাটায় ও সিংভুমের হো মহিলারা নোয়ামুন্ডি, গয়া জেলায় লৌহখনিতে কাজ করত। একটি ছোট লৌহ খনিতে ৪৮৯ জন শ্রমিকের মধ্যে ৩৭৭ জন আদিবাসী পুরুষ ও ১১২ জন আদিবাসী মহিলা কাজ করত।[91] বর্তমানেও বিহারের ভাগলপুর, পাটনা, গয়া জেলাতে অধিকাংশ আদিবাসী মহিলারাই রেজা মজুর হিসাবে কাজ করে থাকে। এই অঞ্চলে একটা প্রবাদ প্রচলিত ছিল- 'একবার যে রেজা হয় সে আজীবন সে রেজা থাকে'। এই প্রবাদ থেকে রেজাদের অর্থাৎ শ্রমিকদের অবস্থার পরিচয় পাওয়া যায়।[92] সিংভুমের একাধিক স্থানে হো সম্প্রদায়ের মহিলারা ছোট লৌহ খনিতে ৪৮৯ জন শ্রমিকের

---

89. বড়ুয়া. সুপর্ণা লাহিড়ী, *বিহার নারী সমাজ সংগ্রাম,* কলকাতা, র‍্যাডিক্যাল প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি, ২০০৮, পৃ. ৩৬- ৩৮

90. তদেব। পৃ. ৫৩

91. Malley. L. S. S. O, *Bengal District Gazetteers Santal Paraganas*, Vol-1, West Bengal, National Book depot, 1910, p. 147-150.

92. দে. দেবশ্রী, *পূর্ব ভারতের আদিবাসী নারী বৃত্তান্ত (১৯৪৭-২০১০),* কলকাতা, সেতু পাবলিকেশন, প্রথম সংস্করণ এপ্রিল ২০১২, পৃ. ২১

মধ্যে ১১২ জন আদিবাসী মহিলাদের কাজ করার কথা জানা গেছে। লৌহ-খণ্ড গুলি সংগ্রহ করে সঠিক আয়তনে ভেঙ্গে জমা করা তাদের কাজ ছিল। ১৯৩০ সালের সমীক্ষায় চাইবাসা সিমেন্ট খনিতে কর্মরত ছিল ২৫২ জন হো মহিলা শ্রমিক। রাঁচি ও ধানবাদ এলাকায় খরিয়া নামক শিকারি আদিবাসী মহিলাদের সংখ্যা ছিল অধিক। তারা সাধারণত বনজ সম্পদের উপরেই নির্ভরশীল ছিল। বনজ সম্পদ বানিজ্যকরণ হলে শাল ও কেন্দু পাতা বিক্রি করা ও ভাড়াতে শ্রমিক হিসাবে কাজ করার মধ্য দিয়ে জীবিকা নির্বাহ করত। লোহা গলানোর কাজটি প্রধানত আদিবাসীদের কার্যকলাপ[93] ছিল। এই শিল্পটি ব্রিটিশ শাসনের অধীনে আদিবাসী সমাজকে প্রভাবিত করে এবং শ্রমের বিভাজন করতে সুবিধা হয়েছিল।

কয়লা খনিতে শ্রম সাধারণত সি আই এল দ্বারা নির্ধারিত ও নিয়ন্ত্রিত হত এবং পুরুষ ও মহিলাদের মধ্যে আর্থিক দিক দিয়ে শ্রম বিভাজন করা হত। আদিবাসী পুরুষরা কয়লা কাটার সময় তাদের বেশীরভাগই লোডার হিসাবে কাজ করত। একজন ব্রিটিশ খনি ব্যাবস্থাপক দ্বারা জানা যায় যে, মহিলাদের মধ্যে যারা কয়লা কাটতেন তারা পুরুষ সঙ্গির অধিনস্ত ছিল যা পূর্ব ভারতের উনবিংশ শতাব্দীর অন্যান্য শ্রম পদ্ধতিকে চিহ্নিত করেছিল। আদিবাসী পুরুষদের সাথে মহিলাদের কাজ ভাগাভাগি করার সমস্ত সুযোগ দেওয়া হয়েছিল।[94] নিম্ন বর্ণের মহিলাদের সাথে উচ্চ বর্ণের পুরুষদের কয়লা বহনে অনিচ্ছা থাকায় স্থানীয় আদিবাসী মহিলাদের ভূগর্ভস্থ খনির কাজ বেছে নেওয়ার জন্য প্ররোচনা করা হয়েছিল। সাধারণত খনিগুলি অগভীর খাদের মধ্য দিয়ে বাঁক দ্বারা প্রবেশ করতে হত এছাড়াও মহিলা লোডারদের দীর্ঘ সময় মাটির নিচে কাটাতে হত। মিঃ রিডারের দেওয়া তথ্য থেকে ২৫০ জন আদিবাসী মহিলা ও শিশুর সন্ধান পাওয়া যায় কর্মস্থলে যেখানে, বায়ু চলাচল সম্পর্কে মানুষের অস্তিত্বের জন্য অনুপযুক্ত ছিল। ১৯১০ সালে মন্তব্য করা খনির চিফ ইন্সপেক্টরের মতামত ও একই রকমের ছিল। বছরের পর বছর দুর্ঘটনার শিকার হয়েছিল আদিবাসী মহিলা শ্রমিকরা।[95] ১৯১০ সালে রাণীগঞ্জ, বিহার,

---

93. The Statesman, (weekly), Friday, Calcutta, 1930, P. 398.

94. Yeshart. Gedam, *Tribal Women Dynamics Sustainable Development,* India, Dattsons, 1 Sep, 2014, Pp. 35-65.

95. *Royal Report of The Bengal and Bihar Labour Enquiry Committee,* Vol-1, Patna, Bihar Government, 1940, P. 43.

গিরিডিতে খনি গর্ভের কয়লা কাটার মহিলা শ্রমিকদের সাপ্তাহিক ৬০ ঘন্টা[96] ছিল। ১৯২৩ সালের দিকে রাণীগঞ্জ ও গিরিডিতে শ্রমিকদের সময় সাপ্তাহিক ৪৮ ঘণ্টা[97] হলেও ঝরিয়ায়ে ৫২ ঘণ্টা ছিল।

দীর্ঘদিন ধরে খনিতে অবস্থানের ফলে শিশু শ্রমিকরা অল্প মজুরির বিনিময়ে খনি গর্ভ থেকে কয়লা তোলা, রেলের ওয়াগন থেকে কয়লার টুকরো বাইরে ফেলা প্রভৃতি কাজের সাথে যুক্ত হয়েছিল। মহিলা শ্রমিকদের পক্ষে অত্যাধিক পরিশ্রমের কাজ ছিল মাথায় করে কয়লার বোঝা নিয়ে মালগাড়ি ভর্তি করা। বিহারে দুমকা জেলার কয়লা খনি অঞ্চলে সাধারণ কর্মী মহিলা শ্রমিকরাও ট্রাকে কয়লা তোলার কাজে নিযুক্ত হত। খনির উপরে কয়লার ধোঁয়া ঘসা, বাছা, কয়লা গুড়ো করা প্রভৃতি অদক্ষ সময়সাপেক্ষ কাজে মহিলারা নিযুক্ত থাকতেন ও সেই কাজের অনুপাতে কম পারিশ্রমিক ছিল তাদের। কঠোর শারীরিক পরিশ্রম, মাটির নিচে দীর্ঘ সময় অতিবাহিত করা, খনির বস্তিতে বিভীষিকাময় জীবনযাত্রা খনির সাথে গ্রামীণ সংযোগকে আঁকড়ে ধরেছিল। আশির দশকের মধ্যভাগে আকরিক খনি অঞ্চলে নিযুক্ত কর্মীদের মধ্যে মহিলা শ্রমিকদের কারখানায় বাঁশি বাজিয়ে মহিলাদের প্রলভন দেখানো হত।

আদিবাসী মহিলা শ্রমশক্তি দ্বারা এই ভারবাহী, শ্রমসাধ্য কাজ করানো সম্ভব সেই অবস্থা বুঝতে অসুবিধা হয়নি খনি ও ফ্যাক্টারির মালিকদের। আদিবাসী মহিলাদের খনিতে নিয়োগ প্রক্রিয়ার বিষয়ে একটি বিষয় উল্লেখ করা উচিত যে, কাজের প্রতি তাদের শ্রম ও যত্ন উভয়ই প্রাথমিকভাবে নতুন কয়লা খনি গুলির জন্য অপরিহার্য বলে মনে হয়েছিল। প্রথমদিকে খনিগুলি মহিলাদের নিয়োগের প্রক্রিয়াতে আগ্রহ প্রদর্শন না করলেও পরবর্তীকালে তার ভিন্ন রূপ দেখা যায়। ১৯২৩ সালের পূর্বে প্রতি দশজন পুরুষের মধ্যে প্রায় ছয়জন মহিলা শ্রমিক খনি ভূগর্ভস্থতে কাজ করত। খনি ও কোলিয়ারিতে মহিলাদের অংশগ্রহনের চিত্র বিবেচনা করে উপলব্ধি করা যায় যে, কিছু খনিতে মহিলা শ্রমিক যাতে পুরুষদের মত কাজ করতে পারে, তার ব্যবস্থা করার জন্য স্থানীয় গ্রামগুলি এই পেশায় মহিলাদের অবৈধ ভাবে যুক্ত করা হত।

---

96. Malley. L. S. S. O, *Bengal District Gazetteers Santal Paraganas*, Vol-1, West Bengal, National Book depot, 1910, Pp. 147-150.
97. Roychouwdhury. Rakhi, *Gender and Labour in India (The Kamins of Eastern Coalmines 1900-1940),* Calcutta, Minerva Associates Publications PVT. LTD, First Published 1996, P 53.

২০ বছর বয়স থেকে তাদের খনির কাজে যুক্ত হত। নিকটাবর্তী কোলিয়ারিতে পুরুষ শ্রমিকদের পরিমাণ বৃদ্ধির জন্য মেয়েলি প্রলভন দেখানো হত। খনি মালিকেরা পরবর্তীকালে পুরুষ মজুরদিগকে স্থায়ী করে রাখার ও বিশাল জনবলকে আকৃষ্ট করতে নানা উপায় তৈরি করে রাখত[98]। এই উপায়ে আদিবাসী মহিলাদের প্রলভন দেখিয়ে খনিতে শ্রমিকের সংখ্যা বৃদ্ধি করা হত।

বছর	বাংলার বিভিন্ন খনিজ খনিতে কর্মরত পুরুষ / মহিলা শ্রমিকের শতকরা ভাগ[99]	মহিলা শ্রমিকের শতকরা ভাগ
১৯২২	৬৬.৯	৩৯.৭
১৯২৩	৬৮.১	৪০.১
১৯২৪	৭৩.৯	৪১.৬
১৯২৫	৭০.৯	৩৯.৬
১৯২৬	৭৯.৮	৪০.৩
১৯২৭	৮০.১	৩৩.৮
১৯২৮	৭৪.৪	৩৬.৪
১৯২৯	৮৫.৮	২৯.৮
১৯৩০	৯২.৮	২৩.৯
১৯৩১	৯১.০	৩৬.০
১৯৩২	৮৯.৪	১৬.০
১৯৩৩	৮৯.৫	১৪.৪
১৯৩৪	৯৫.৯	১২.৫
১৯৩৫	১০২.৩	১০.০

98. তদেব। পৃ. ৫৩

99. Employment Among Women in West Bengal, Government of West Bengal Labour Department, Calcutta, West Bengal Government Press, 1946, P. 20-35.

১৯৩৬	১০৫.৪	৯.২
১৯৩৭	৯৮.৪	৩.৮
১৯৩৮	১০২.২	-
১৯৩৯	১২৪.৭	-

ভারতীয় শ্রমিক শ্রেণির গঠন ও বৃদ্ধির ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ায় মার্কসবাদী ভিন্ন অন্যান্য উগ্র দৃষ্টিভঙ্গির ভূমিকা ছিল বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। মার্কস তাঁর লেখার বিভিন্ন স্তরে সংগ্রাম ও মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যমে শাসনতন্ত্রের জটিল প্রক্রিয়া এবং শ্রমিক শ্রেণির পুনর্গঠনের দিকে মনোনিবেশ করে বলেছিলেন, অর্থনৈতিক পরিস্থিতি থেকেই এদেশের শ্রমিকের মধ্যে শ্রমের বিভাজন দেখা গিয়েছিল। মার্কসবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে বিশিষ্ট ঐতিহাসিক রণজিৎ গুহ মনে করেন যে, উৎপাদন ও উৎপাদন সম্পর্কের কাঠামোর পাশাপাশি শ্রমিক শ্রেনীর শ্রম বিভাজনের বিভিন্ন চিত্র পরিলক্ষিত হয়েছিল। নিরাপত্তা উদ্বেগের অগ্রগতি এবং যান্ত্রিকীকরণ শ্রমের মধ্যে বিভাজন আরও স্পষ্ট করে দিয়েছিল। আদিবাসী মহিলারা উৎপাদনের সাথে চুক্তিতে আবদ্ধ হয়ে কাজ করতে শুরু করেছিল। বিংশ শতকের অধিকাংশ সাহিত্য ও ইতিহাস সাঁওতাল মহিলাদের বর্ণনায় 'প্রান্তিক' কথাটির পাশাপাশি 'কর্মঠ শ্রমিক বা শ্রমসাধ্য নারী' রূপে বিবেচিত করেছিল। আদিবাসী নারী শরীরের সাথে 'কর্মঠ'[100] শব্দটি ধীরে ধীরে যেন ওতপ্রোত ভাবে জড়িয়ে পড়েছিল। এ প্রসঙ্গে আরেকটি কথা বলা প্রয়োজনীয় যে, মার্কসবাদী লেখায় স্পষ্ট প্রতিভাত হয়েছিল শ্রমের গঠন আকৃতির ফলে সামাজিক সম্পর্কের বিলুপ্তি ও শ্রেণি সম্পর্কের চূড়ান্ত পর্যায় প্রস্ফুটিত হয়েছিল।

---

100. ঘোষ. বিনয়, *বাংলার নবজাগৃতি*, কলকাতা, ওরিয়েন্ট ব্ল্যাক সোয়ান প্রাইভেট লিমিটেড, প্রথম সংস্করণ ১৯৭৯, পৃ. ৫০

ছোটনাগপুর মালভূমি অঞ্চলের আদিবাসী মহিলা শ্রমিকের জীবিকায় অংশগ্রহণ

স্থান	মোট জনসংখ্যা[101]	কৃষি		খনি		জীবিকাহীন	
		মহিলা	পুরুষ	মহিলা	পুরুষ	মহিলা	পুরুষ
সাঁওতাল পরগণা	১২,৯৫৫,৪০৯	১,৮৪৪,২৩৬	২,৫৭৪,২৩৯	১১০,৬৭২	৫৪১,৫১১	১৬,৮৭৫,০০৫	১০,৩৪৬,০৪০
বীরভূম [102]	৬৬,০৬৩	৮,৩৫৬	৫,৭১৪	৩,৯৭৯	১১,৯৯১	৩৫,৫৬৩	১৬,৫০২
শাহবাদ	১,৫২২৬৮৭	১৩৯,৬৩৪	১৫৬,৭২৯	২৯৬০	১১,৪৩৩	১,১১৬, ৭৫৩	৭২৪,০৮৮
আসাম	৪৯	৪	৬	৩	২	৩০	৮৪
কেউঞ্ঝর	৩,২২৩	৫৭১	১৫৪	৩০০	২৮	১,১৪২	৩,৪৫২
মানভুম	৮৬২,১০৩	১২৬,৩৩০	১,৫৪,৬৬৯	৫,০৫৭	২৪,৫০৪	১,২৬৯,০৭১	৭৫৪,৬২৯
পুরনিয়া	৩৬৬	২৬৫	১২৮	৫৮	৪২	৫৩৬	১,২০৪
সম্বলপুর [103]	৯৪৪,৪৫০	১৩২,৫৭০	২২৭,১০২	২,২৬৮	৪১,৯৭৫	৬৬২,৮২৬	১,২০৫,৮৩৪
খরিয়া[104]	১১০	৩০	১৮	৩	-	২১৭	২৩৪
সিংভুম	১৮,৭৯৩	৬,১২৯	২,১৫৫	৩,৩৭১	২৫২	৩,৯৩৪	১,৮৫১

---

101. *Report of The Bengal and Bihar Labour Enquiry Committee*, Vol-1, Patna, Bihar, 1940, P 20-43.

102. *Report on Intensive type studies on Rural Labour in India,* Bankura (1968-69) Labour Bureau, Government of India Ministry of Labour, P 28-45.

103. *Report of the Tribal and Rural welfare work in Orissa in 1934,* Orissa, Tribal and Rural welfare department, 1940, P. 11-23.

104. *Report of Labour Enquary Commision Bengal 1930-40,* Calcutta, West Bengal Labour Department, P. 46-57.

শ্রম বিন্যাস ব্যবস্থায় আদিবাসী মহিলা শ্রমিক এবং বৈষম্যের পুনরুৎপাদন

খনি ক্ষেত্রে উদ্যত পুঁজিপতিদের লুব্দধ দৃষ্টি নারী শ্রম শক্তির উপর নিপাতীত হলে আদিবাসী মহিলা শ্রমিকদের শ্রমের বাজারে দ্রুত নিক্ষেপ করা হয়েছিল। অল্প সময়ে মুনফা লাভের আশায় খনি অঞ্চলগুলিতে শ্রমশক্তির বাজার গঠন, শ্রম বিভাজনের পাশাপাশি শ্রম বিন্যাস ব্যবস্থায় বৈষম্য লক্ষ করা যায়। ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ শক্তির পরিচালনায় কয়লা খনিতে শ্রমশক্তির গঠন ও আকৃতির বিকাশের ফলে কাজের অভ্যাস এবং নতুন দক্ষতার সাথে অভিযোজনেও উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। খনি শিল্প শ্রমশক্তির গঠনে বৃদ্ধির প্রক্রিয়াটি ছিল বৈষম্যমূলক।[105]

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে আদিবাসী মহিলা শ্রমিকদের প্রতি সামাজিক বৈষম্যের সূত্রপাত ঔপনিবেশিক আমলে খনি ক্ষেত্রে প্রবেশের পূর্ব থেকেই শুরু হয়েছিল। বৈষম্য শুরু হয়েছিল জমির উপর অধিকারকে কেন্দ্র করে ও পরবর্তীকালে জমিতে শ্রমের ব্যবহার নিয়ে লিঙ্গগত বৈষম্য লক্ষ করা যায়। সামাজিক উৎপাদন থেকে উপার্জনের দুই পদ্ধতিতে মহিলাদের অংশগ্রহণ থাকলেও সম্পত্তি অধিকারের প্রতি লিঙ্গবৈষম্য সমাজের মধ্যে দেখা যায়। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে আদিবাসী সমাজে নারী ও পুরুষ উভয়ের মধ্যে লিঙ্গ বিভাজন না[106] থাকলেও সম্পত্তি বিভাজনে বৈষম্য বজায় ছিল। কেননা জমির অধিকার, মেয়েদের গ্রাম্য জীবনে পরিবর্তন নিয়ে আসতে পারত। 'lack of rights over resources reduces women to a poor bargaining position'[107]। জমির অধিকারই হল একমাত্র জটিল উপাদান যেখানে মহিলাদের না থাকায় সমাজে তাদের স্থান নিম্নে ছিল। মহিলাদের জমি অধিকারের কথা প্রসঙ্গে একাধিক আদিবাসী পুরুষদের বক্তব্য ছিল মেয়েরাও জমির ফসল ব্যবহার করছে, জমি নিয়ন্ত্রণ করে হবেটা কি"[108]। সম্পত্তির উত্তরাধিকার থেকে শুরু হয়েছিল বৈষম্যের উত্তরাধিকার।

---

105. লিয়নটিয়েভ. এ, *মারক্সীয় অর্থনীতি,* কলকাতা, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি, দ্বিতীয় পরিমার্জিত মুদ্রন, ১৯৭৯ পৃ. ৯৩-১১৭

106. Prakash. Gyan, *Bonded Histories: Genealogies of Labour Servitude in Colonial India,* Cambridge, Cambridge University Press, 1990, p 82-85.

107. Agarwal. Bina, *Beyond Family Farming: Gendering the Collective,* Rome, LEO S. OLSCHKI, 2021, P. 27-38.

108. Krishnaraj. Maithreyi, Aruna Kanchi, *Women Farmers of India,* National book trust India, Pp. 22-40.

পারিবারিক বঞ্চনা পরিবারের মধ্যে দ্বন্দ্ব তৈরি করতে থাকে। পুরুষতান্ত্রিক আধিপত্য থেকে সৃষ্ট এই ‘শ্রম বৈষম্য’ আদিবাসী মহিলা শ্রমিকদিকে চরম নির্যাতনের দিকে ঠেলে দিয়েছিল। মহিলাদের জমিতে নিজস্ব অধিকার না থাকার ফলে কোটি কোটি টাকার জমি হস্তান্তরিতকরণ হয়েছিল বড় বড় জমিদার ও কোম্পানির হাতে।

আদিবাসী মহিলা শ্রমিকরা খনির উৎপাদন ক্ষেত্রের মাটির উপরে বা নিচে উভয়ই কাজ করতেন। এই মধ্যে শারীরিকভাবে চাহিদাপূর্ণ কাজ কিছুটা হলেও পুরুষ খনি শ্রমিকের সাথে যুক্ত ছিল। ১৯০০ এর সালের গোঁড়ার দিকে, ভারতে কয়লা খনি শ্রমিকদের মধ্যে মহিলাদের অনুপাত ছিল ৪০-৫০%। শ্রমের বাজারে আদিবাসী মহিলাদের অধিক সময় কাজ করানো, কম মজুরী দান, মহিলাদের খনির আইনে সুযোগ না দেওয়ার মধ্যে অবৈধ শ্রমের ব্যবহার হওয়ার ফলে বৈষম্যের উৎপাদন দেখা যায়। দশ শতাংশের ও কম অ- কৃষি ক্ষেত্রগুলিতে ৮৭% ভাগ সাঁওতাল ও হো সম্প্রদায়ের আদিবাসী শ্রমিক নিযুক্ত ছিল[109]। আদিবাসী মহিলাদের মধ্যে খনি ক্ষেত্রে কাজ করতে বাধ্য হত সাধারণ কামিন রূপে[110] তাই বলা যায় বৈষম্যের ধারণা অনেক আগে থেকেই শুরু হয়েছিল। শ্রমের বিভাজন দৃঢ়ভাবে লিঙ্গ বৈষম্যের ধারনার উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

আদিবাসী মহিলাদের সক্রিয় শ্রম কয়লার মত বড় খনিজ পদার্থের বস্তুজগতে মিথস্ক্রিয়ার মত হয়ে উঠেছিল। Gerda Lerner,[111] উল্লেখ করেছেন যে, সমাজে ব্যক্তিগত সম্পত্তির প্রথম বরাদ্দ হল প্রজননকারী হিসাবে মহিলাদের শ্রম। খনির আদিবাসী মহিলা শ্রমিকরা ছিল মালিকানাহীন শ্রমিকদের প্রথম ঐতিহাসিক বিভাগ। ‘পুঁজিবাদী’ শক্তির পাশাপাশি ‘পিতৃতন্ত্র’ নামক দুটি শক্তি মিলিত ভাবে আদিবাসী মহিলার শ্রমকে ব্যবহার করেছিল[112]। শ্রমের বাজারে প্রবেশ করার পর আদিবাসী নারীদের মধ্যে শ্রম বিভাজনের মধ্য দিয়ে ভিন্ন রকমের

109. *Royal Report of The Labour in Bengal and Bihar Coal Mine Area,* Calcutta, Government of India, 1941, P. 46.

110. Prakash. Gyan, *Bonded Histories: Genealogies of Labour Servitude in Colonial India,* Cambridge, Cambridge University Press, 1990, Pp. 13-17.

111. Lerner. Gerda, *The Creation of Patriarchy,* New York, Oxford University Press, 1986, P. 7-10.

112. Hans, Asha. *Tribal Women, a Gendered Utopia? : Women in the Agriculture Sector,* South Asian Publishers, 1999, P. 155-175.

বৈষম্যকরন শুরু হয়েছিল, যা থেকেই জন্ম নিয়েছিল মজুরী প্রাপ্ত আবশ্যক শ্রম এবং মজুরিহীন উদ্বৃত্ত শ্রমের মধ্যে ক্রমাগত দ্বন্দ্ব[113]।

খনি ক্ষেত্রে লিঙ্গ বৈষম্য

খনিতে কর্মরত আদিবাসী মেয়েরা একইসাথে শ্রেণিশোষণ ও লিঙ্গ বৈষম্যের শিকার ছিল। লিঙ্গ নির্ভর শোষণ ও বঞ্চনা সব শ্রেণির মধ্যেই ভিন্ন ভিন্ন মাত্রায় লক্ষ করা গিয়েছিল। লিঙ্গ সমতা হল এক ধরনের উদ্যোগ যেখানে 'ক্ষমতা' শব্দটিকে এক অন্য মাত্রায় ব্যাখ্যা করা হত। ক্ষমতা শব্দটির মধ্য দিয়ে মহিলাদের অর্থনৈতিক ভাবে স্বাবলম্বী সিধান্ত গ্রহণ করতে সাহায্য করেছিল। সব সিধান্ত গ্রহণে অধিকার আবার মহিলাদের দেওয়া হত না। আদিবাসী মহিলারা ক্ষেত ও জমির পাশাপাশি খনি ও শিল্পাঞ্চলে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। যে সমস্ত মহিলা শ্রমিক খনিতে যুক্ত ছিল তারাই একদিন বিনামূল্যে পরিবারের সাথে ক্ষেতে কাজ করত। চার ভাগের মধ্যে তিন ভাগ মহিলারা জমি তৈরি, বীজ বোনা, জমিকে উর্বর করা, বিষ দেওয়া, চারা রোপন করত। এই সমস্ত উৎস থেকে আদিবাসী পরিবারের মেয়েরা যে আয় করতে শুরু করেছিল তাতে বৈষম্যমূলক প্রভাব দেখা যায়নি। সামাজিক ক্ষেত্রে আদিবাসী মহিলাদের অবস্থান পুরুষদের নিম্নে হলেও পুরুষতান্ত্রিক সমাজের পাশাপাশি আদিবাসী মহিলাদের কাছে তারা ছিল এক প্রকারের অবহেলিত তা পূর্বে উল্লেখিত হয়েছিল। এই অবহেলনের মাত্রা ভিন্ন স্থানে ভিন্ন রকমের ছিল। খনি কেন্দ্রে উৎপাদন বৃদ্ধিতে আদিবাসী মহিলাদের শ্রম শক্তিকে প্রয়োজনের অতিরিক্ত উৎপাদনের কাজে ব্যবহার করার ফলে প্রয়োজনীয় কর্তব্য পরিবারের প্রতি করা হত না। কোনো কোনো আদিবাসী পরিবারে স্ত্রীই ছিল একমাত্র পরিবারের আয়ের কর্তা। শ্রম বিষয়ক চুক্তি বলবত থাকার পরও মহিলা শ্রমিককে পুরুষ সমান অধিকারের চিহ্নটুকুও মালিকের পায়ের তলায় বিসর্জন দিতে হত। ১৮৪৪ সালে এঙ্গেলস কল-কারখানার ও খনির খাদে আদিবাসী মহিলা শ্রমিক নিয়োগের ভয়াবহ রূপ উদ্ঘাটিত করেছিলেন, যা থেকে বোঝা যায় "পুঁজিতন্ত্র শ্রমিক জীবন ভেঙ্গে ফেলেছে[114]"। খনি ও খাদানের বিভিন্ন কর্মসংস্থানে বৈষম্য বজায় ছিল। শ্রমিকের পরিবার বর্গ থেকে খনি শিল্পক্ষেত্রের সমস্ত স্থানে আদিবাসী মহিলাদের

---

113. লিয়নটিয়েভ. এ, *মারক্সীয় অর্থনীতি,* কলকাতা, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি, দ্বিতীয় পরিমার্জিত মুদ্রন, ১৯৭৯ পৃ. ৬৫-৯৮।

114. পোলিট. হ্যরি, *নারী ও কমিউনিজম মার্কস থেকে মাও,* কলকাতা, র‍্যাডিক্যাল প্রকাশনী, ডিসেম্বর ২০১২, পৃ. ১৭

শ্রম বিনামূল্যে বিক্রি হত। অদক্ষতা ও অনভ্যাসের কারণে আদিবাসী মহিলারা তাদের ভূমি ও কৃষি নির্ভরতার গন্ডি পেরিয়ে অর্থনীতির অন্যান্য ক্ষেত্র যেমন ব্যবসা বাণিজ্য, ক্ষুদ্র উৎপাদন ও কুটিরশিল্পে নিজেদের যুক্ত করতে পারেনি। তবে এখানে বলে রাখা ভালো যে, সমাজ থেকে শিল্পক্ষেত্রে যে বৈষম্যকরণ প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল তাঁর ভয়াবহতম শিকার ছিল আদিবাসী মহিলারা। সমাজের প্রচলিত দৃষ্টিভঙ্গিতে আদিবাসী মহিলাদের দেখা হয়েছিল দুর্বল হিসাবে। খনি শিল্প প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি অন্য ক্ষেত্রগুলিতে কাজ করলেও তাদের অবস্থান একই রকমের ছিল[115]। মহিলাদের উপর শারীরিক অত্যাচার বৃদ্ধি পেলে খনি কর্মক্ষেত্রে আদিবাসী মহিলা শ্রমিকদের বৃদ্ধি কিছুটা হ্রাস পেয়েছিল। গুমলা, রাঁচি, জামতারা/ দুমকা থেকে প্রায় ১৩০ জন আদিবাসী মহিলা শ্রমিকের (১৩ থেকে ৬৭ বছর) সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে এই মহিলাদের মানসিকতা এবং মনোভাব মূল্যায়ন করা হয়েছিল।

খনি ক্ষেত্রে কাজ করতে গেলে আদিবাসীদের বিবাহিত হতে হবে এই আইন মেনে চলার প্রথা ছিল। আদিবাসী মহিলারা যেখানেই কাজ করুক না কেন, বিবাহের একটি শর্ত পালন করতে হত অর্থাৎ আদিবাসী বিবাহিত মহিলাকে বিচ্ছিন্ন থাকতে দেওয়া হত না। খনিতে পারিবারিক ভাবে পুরুষ ও মহিলা সবসময় বিবাহিত হত না। বাইরের সমাজের সংস্পর্শের থেকে আদিবাসীদের দূরে রাখার জন্য এ ধরনের পরিকল্পনা হতে পারে বলে উপলব্দধি করা যায়। এই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে আদিবাসীদের যৌথ পরিবার প্রথা ভঙ্গুর হতে শুরু করেছিল। আদিবাসী মহিলাদের ভবিষ্যৎ জনিত সঠিক সিধান্ত নেওয়ার অধিকার পরোক্ষ ভাবে খনি মালিকদের হাতে পৌঁছে গিয়েছিল তাই আদিবাসীরা মুক্ত কর্মসংস্থানের পাশাপাশি তাদের নিজস্ব সংস্কৃতি হারাতে বসেছিল। আদিবাসী পুরুষদের খনির কিছু ক্ষেত্রে স্থায়ী ভিত্তিতে নিয়োগ হলেও মহিলাদের চাকরি স্থায়ী করা হত না। আদিবাসী মহিলা শ্রমিকরা মূলত অস্থায়ী কর্মী হিসাবে কাজ করত খনি ক্ষেত্রে। আদিবাসী মহিলারা অনেক ক্ষেত্রে চাকরি বাঁচাতে গিয়ে তাঁদের যৌন অত্যাচারের শিকারে পরিণত হয়েছিল। অস্থায়ী মহিলা কর্মীদের উপর খনির উঁচু পদের পদাধিকারীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করতে না পারার কারণ হল, কাজ হারানোর ভয় তাদের মধ্যে কাজ করত। সাধারণত আদিবাসী মহিলাদের খনির নিয়মের বাইরে গিয়ে কাজ

115. Bag. Dhanipati, *Santal Samaj Sameeksha - A Study on Santal Society,* Calcutta, Samatat Prakashani, 1983, Pp. 2- 5.

করার প্রমাণ বিশেষ ভাবে পাওয়া যায় না। তাও আদিবাসী শ্রমিক মহিলাকেই দুর্নীতিযুক্ত বলে আখ্যা দেওয়া হয়েছিল যদিও তা সত্য ছিল না।

একই রকম পরিস্থিতির উদাহরণ লক্ষ্য করা যায় কঙ্গোর খনি ক্ষেত্র গুলি অর্থাৎ গ্রেট লেক অঞ্চলে ASM সেক্টরের সাথে যুক্ত মহিলা শ্রমিকদের ক্ষেত্রে যৌন ও লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতার ঝুঁকি বেশি ছিল বলে জানা যায়। কঙ্গোতে, এ এস এম স্থানগুলিতে সুরক্ষা ও সঠিক ভাবে ব্যবস্থার জন্য যৌন বিনিময় রেকর্ড করা হয়েছিল[116] তাই আধুনিক উন্মুক্ত খনিতে অনেক মহিলা ট্রাক অপারেটর কয়েক বছরের পরে তারা চাকরি ছেড়ে দেওয়ার কথা জানা যায়। পুরুষ শ্রমিক শ্রেণি খনি অঞ্চলে একত্রিত হয়ে পুরুষতান্ত্রিক সংস্কৃতিকে জন্ম দিতে থাকে। পুরুষ খনি শ্রমিককে শ্রমজীবী শ্রেণির প্রতিনিধি হিসাবে বিচার করা হয়। খনির মধ্যে সাধারণভাবে পুরুষ শ্রমিকরা "মাচো পুরুষত্ব" গ্রহণ করেছিল। আদিবাসী মহিলাদের সামাজিক অবস্থানে ক্ষমতা প্রকাশ না করতে পারায় প্রথমদিকে শোষণ ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে আদিবাসী মেয়েদের ক্ষমতায়ন প্রকাশিত হয়নি।

প্রাপ্ত বেতন বৈষম্য—

মার্কসের সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা নিয়ে বহু সমালোচনা উঠে এলেও এই আদর্শে প্রথম নারী ও পুরুষদের সমান বেতনের দাবি প্রকাশ করেছিলেন। ঔপনিবেশিক ও পুঁজিপতিদের অধীনে ছোটনাগপুর মালভূমির অর্থনীতি নিয়ন্ত্রিত শুরু হবার ফলেই খনির শ্রমিক শ্রেণির মধ্যে মজুরী নিয়ে যে বৈষম্য দেখা দিয়েছিল তা ছিল খনি ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুতর সমস্যা। ১৯১৮ সালে পালামৌতে ৬০,০০০ কামিয়া খনি ক্ষেত্রে যুক্ত ছিল। একজন কামিয়া ন্যূনতম মজুরীতে জীবন নির্বাহ করত এবং তাকে কখোনই গ্রাম ছেড়ে যেতে দেওয়া হত না। ম্যাক ডোল্যান্ড (১৯৯৪) এই প্রসঙ্গে ইংল্যান্ডের খনি মালিকদের উপর জোর দিয়ে 'খনি প্রলেতারিয়েত'[117] জন্ম দেবার কথা বলেছেন। একই খনিতে কাজ করতে গিয়ে মহিলা ও পুরুষের মধ্যে শ্রম বিভাজনের সাথে মজুরী দানে অসমতা লক্ষ করা যায়। মহিলা শ্রমিকরা পুরুষদের মত একই সম্মান ও মজুরী পেতেন না। এই বৈষম্য খনির পরিযায়ী শ্রমিকের ইতিহাসে আরেক নতুন বৈশিষ্ট্য যুক্ত

116. Gender Equality, *Intergovernmental Forum on Mining, Minerals, Metals and Sustainable Development,* Canada.

117. Smith. Adam, *Women in Mining: can a mining law unlock potential of women.* Canada, May 2017, Accessed Dated on 15.05.2023.

করেছিল। শ্রমশক্তির ক্রয় ও বিক্রয় মহিলা শ্রমিকদের অতি সহজেই শিল্পক্ষেত্র গুলিতে সহজলভ্য করে তোলা হয়েছিল। মহিলাদের ঘরোয়া ও অস্থায়ী শ্রমিকের নাম করে মজুরির সংখ্যা হ্রাস করে দেওয়া হয়েছিল। আদিবাসী মহিলা শ্রমিকরা কঠোর পরিশ্রম করে নগন্য মজুরী পাওয়ার পাশাপাশি তারা নিয়মিত নিরাপত্তাহীনতার সাথে লড়াই করে চলেছিল। মজুরী প্রাপ্ত আবশ্যক শ্রম এবং মজুরিহীন উদ্বৃত্ত শ্রমের মধ্যে ক্রমাগত দ্বন্দ্বের মধ্যে পুঁজিবাদের আওতায় সমস্ত ব্যাপার এমন ভাবে চিত্রিত কর হত যাতে মনে হয় যে শ্রমিকের সম্পূর্ণ শ্রমের পারিশ্রমিকই বোধ হয় শ্রমিককে দেওয়া হয়েছে কিন্তু তা একেবারেই সত্য ছিল না।

খনিতে মজুরী বৈষম্য দেখা দেওয়ার অন্যতম কারণ ছিল মহিলারা অদক্ষ ছিল। অদক্ষ মহিলা শ্রমিকদের দ্বারা পরিচালিত বহুবিধ খনি শ্রম অংশগ্রহণের পরিমাণ মূল্যায়ন করা কঠিন হয়ে পড়েছিল। খনি অঞ্চলে পুরুষ শ্রমিকদের দায়িত্ব ছিল ব্লাস্টিং এর অন্যদিকে একই সময়ে কামিনরা ৬০ থেকে ৮০ কেজি ওজনের ঝুড়ির বোঝা বহন করত[118] তবুও তাদের বেতন পুরুষ শ্রমিকদের সমান ছিল না। তারা খনন, কয়লা কাটা, লোডিং, ডাম্পিং এর মত কয়লা শিল্প কার্যক্রমের সাথে সাথে লোহা আকরিক খনিতেও যোগ দিতে দেখা যায়। সেখানেও নিরাপত্তা সরজ্জামের অভাব, নির্ধারিত কাজের সময় বা মজুরিহীন কাজ এই খনিতেও লক্ষ করা যেত। সুপর্ণা লাহিড়ী বড়ুয়া ধানবাদ কোলিয়ারিতে দুই ধরনের মহিলা শ্রমিকের কথা উল্লেখ করেছেন। এক হল টাইমরেট ও দুই পিসরেট শ্রমিক। পিসরেট শ্রমিকদের[119] প্রতিদিন নির্দিষ্ট পরিমাণ কয়লা লোড করতে হত এছাড়াও প্রতিদিন তাদের ২২ টন কয়লা লোড করতে হত। এই শ্রমিকদের কাজের কোনো সময় বাঁধা ছিল না। টাইমরেট শ্রমিকদের টানা ৮ ঘন্টা কাজ করতে হত। টাইমরেট শ্রমিকের মধ্যে অফিসের পিওন, হাসপাতালের দাই এর কাজ মহিলা শ্রমিকদের করতে হত।[120] এছাড়াও মহিলা শ্রমিকদের একটি বড় অংশ উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের বাংলোতে কাজ ও বি সি সি এল এ বহালির কাজ করত। খনি ক্ষেত্রে পাইস রেটেড শ্রমিক অর্থাৎ প্রথম বিভাগের লোডার ও সাফাই কর্মীদের মাইনে ছিল দৈনিক ৫.২৫

---

118. *Report of the Central Wage Board for the Coal Mining Industry,* Volume I, Government of India, Ministry of Labour Employment and Rehabilitation, Department of Labour and Employment, Volume I, 1927-35, P. 39.

119. বড়ুয়া. সুপর্ণা লাহিড়ী, *বিহার নারী সমাজ সংগ্রাম,* র‍্যাডিক্যাল কলকাতা, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি, ২০০৮, পৃ. ২৪

120. *West Bengal Labour Gazette,* Calcutta, Depatment of Labour, June 1927, P. 13-14.

টাকা। দ্বিতীয় বিভাগে কয়লা খনি পরিস্কার করত যারা তাদের মাইনে ছিল ৫.৪০ টাকা। তৃতীয় বিভাগের ওয়াগন লোডার, ট্রাক লোডার, নরম কয়লা প্রস্তুতকারক ও ড্রিলারদের মাইনে ছিল ৫.৯০ টাকা। চতুর্থ বিভাগের কয়লা খনন কারী, কয়লা উত্তোলনকারী মহিলাদের মাইনে ছিল ৬ টাকা[121]। এই উপার্জনে তাঁদের নিত্যদিনের সংসার চালানো অসম্ভব হয়ে পড়েছিল। তাদের কম উপার্জনের আরেকটি কারন হল তাদের 'পিস রেট' ভিত্তিতে অর্থ প্রদান করা হত। যেখানে পুরুষদের 'সময়ের' ভিত্তিতে প্রদান করা হত। এই অসমতা নিয়েই খনি এলাকায় মহিলা শ্রমিকরা অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনযাপন শোষিত হতে থাকে। এই বৈষম্যের জন্য মহিলা শ্রমিকরা তীব্র প্রতিবাদ করেছিল। হস্তচালিত কাজে নিয়োজিত মহিলা কর্মীদের ক্ষেত্রে ২-২৫ ইউনিট খরচ করা হয়েছিল।[122] কয়লা ছাড়া অন্যান্য খনি অঞ্চলে মহিলাদের প্রসবকালীন সময়ে কোনো বেতন দেওয়া হত না। মহিলা শ্রমিকদের মজুরী বাকি পরার দায়ে এক খনি ছেড়ে অন্য খনিতে যোগদান করার তথ্য ও উল্লেখিত হয়েছিল। তথ্য অনুসারে ৯০ শতাংশ মহিলা শ্রমিক খনির মত অসংগঠিত ক্ষেত্রে কাজ করত। সাধারণভাবে নিম্ন স্তরের খনির কর্মসংস্থানে আদিবাসী মহিলাদের পদোন্নতির কোনো সুযোগ ছিল না।[123]

১৯৩৬ সালে মজুরী প্রদান আইন খনি ক্ষেত্রে মহিলাদের কম মজুরী পাবার ক্ষেত্রে পুরুষদের অভিমত ছিল যে, কর্মক্ষেত্রে মেয়েদের যাওয়ার সময় জ্ঞান নির্দিষ্ট ছিল না অর্থাৎ দেরি করে কাজে যায়।[124] খনির আদিবাসী মহিলাদের শরীরকে তারা দুর্বল মনে করত। আসলে দেশীয় উদ্যোগীদের এই সুলভ শ্রমিক ব্যবহারের সুযোগ থেকে বঞ্চিত করাই ছিল ব্রিটিশ সরকারের লক্ষ্য। বাংলার কয়লা খনিজ কোম্পানিগুলি দেশীয়দের উপর কর্তৃত্ব করতে পারবে

---

121. Banerjee. Sukumar, *Impact of Industrialization on the tribal population of Jhariya-Raniganj Coal Field Areas,* Calcutta, Anthropological survey of India, First Published in 1981, March, P. 137.

122. *Report of the Central Wage Board for the Coal Mining Industry,* Vol- I, Government of India, Ministry of Labour Employment and Rehabilitation, Department of Labour and Employment, 1927-35, P.43.

123. *Decision of the Labour Appellate Tribunal of India on Appeals Against the award of the all India Industrial Tribunal (colliery Disputes) Ministry of Labour,* Delhi, Government of India press, 1957, P. 36-38.

124. Krishnaraj. Maithreyi, Aruna Kanchi, *Women Farmers of India,* National book trust India, Pp. 22-40.

এই দিয়ে ঔপনিবেশিক শক্তির এক ধরনের দ্বন্দ্ব শুরু হয়েছিল। এ নিয়ে জাতীয় বণিক সম্প্রদায় থেকে বহু সমালোচনা করা হয় কিন্তু ব্রিটিশ সরকার এ আলোচনায় কর্ণপাত করেনি। আদিবাসী মহিলা শ্রমিকরা বাড়ির একমাত্র উপার্জনকারী হলেও নিয়োগকর্তারা মনে কতেন যে মহিলারা খনি অঞ্চলে পুরুষ মজদুরদের মত বিনিময় যোগ্য নয়। খনি মালিকেরা এটা মনে করতেন একজন মহিলা শ্রমিককে হস্তচালিত কাজে ব্যবহার করা হলেও যান্ত্রিক কাজে তা উপলব্দধ ছিল না। এই এলাকায় মহিলাদের প্রবেশের ধারনাটি কল্পনাতীত বলে অধিক বেতনের এবং তথাকথিত খনিতে দক্ষ চাকরিগুলো পুরুষ শ্রমিকদের দেওয়া হয়েছিল। এছাড়াও বলা যায় যে, অশিক্ষা ও অদক্ষতার সুযোগের জন্যই মহিলাদের বেতনের পরিমাণ অনেক কম ছিল পুরুষদের তুলনায়[125]। ১৯৩৬ সালে মজুরী প্রদান আইন প্রথম দিকে তৈরি হলেও স্বাধীনতার পূর্বে আর কোনো আইন তৈরি ও কার্যকর হয়নি। নারী ও পুরুষ নির্বিশেষে সমান মজুরী প্রদানের কথা I.L.O. স্বীকার করেছিল কিন্তু তৎকালীন সময়ে শুধুমাত্র চিনি শিল্প ব্যাতীত এই সমান মজুরী প্রদান বাস্তবে প্রয়োগ করা হয়নি।[126]জুলুম ও শোষণের উপর প্রতিষ্ঠিত অর্থনীতি পুঁজিবাদী ব্যবস্থাতে সংগ্রাম ও সংগঠনগুলিতে আদিবাসী শ্রমিক জটিলতাগুলিকে উপেক্ষা করা হয়েছিল বারংবার। মুক্ত বাজার অর্থনীতিতে পরিবর্তনের ফলে অদক্ষ আদিবাসী মহিলা শ্রমিকদের আনুষ্ঠানিকভাবে অবৈধ শ্রম প্রয়োগে ঠেলে দেওয়া হয়েছিল[127]।

মাতৃত্ব কালীন সুবিধা থেকে বঞ্চিত

খনির কাজ বিশেষত ভূগর্ভস্থ, আদিবাসী মহিলা শ্রমিকদের উপস্থিতি এবং ভারী কায়িক শ্রমে অংশ নেওয়ার ফলে মহিলাদের স্ত্রী এবং মা হিসাবে অযোগ্য করে তোলার মধ্য দিয়ে নানা প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছিল। ঠিক একই ভাবেই মহিলা শ্রমিকদের কাজের ক্ষেত্রে অস্থিরতা, তাদের সন্তানদের স্বাস্থ্য, শিক্ষা এবং রেশন কার্ডের মত প্রাথমিক সুবিধা থেকে বঞ্চিত করে রাখা হয়েছিল। এছাড়াও যে সুবিধা থেকে তারা সব থেকে অধিক বঞ্চিত হয়েছিল তা হল খনি ক্ষেত্রে মাতৃত্বকালীন ছুটির সুযোগ সুবিধা। বৃহৎ আকারের খনির ক্ষেত্রে মহিলা কর্মীদের

---

125. এক্রামুল হক. এ ওয়াই এম, *নারীর ক্ষমতায়ন: প্রেক্ষিত বাংলাদেশ,* ঢাকা, ইত্তেফাক, ১৮ই সেপ্টেম্বর ২০০৮।

126. *Decision of the Labour Appellate Tribunal of India on Appeals Against the award of the all India Industrial Tribunal (colliery Disputes) Ministry of Labour,* Delhi, Government of India press, 1957, P. 36-38.

127. শ্রীজা. এ, *ভারতে অসংগঠিত শ্রম বাজার,* যোজনা পত্রিকা (মাসিক), এপ্রিল ২০১৭, পৃ. ১২-১৫

উপস্থিতি থাকবে সেখানে প্রসব আইনের ব্যবস্থা থাকবে এটাই স্বাভাবিক। স্বাধীনতার পূর্বে খনি আইনগুলি স্বাক্ষরিত হয় ১৯১০ সালে। খনির সমস্ত আইন স্বাক্ষরিত হলেও মহিলা সম্পর্কিত আইনগুলি কার্যকরী হত না। মাতৃত্বকালীন আইনের সুবিধার জন্য আদিবাসী মহিলারা কোনো দাবি জানাতে পারত না কারণ তাদের নির্দিষ্ট কোনো সংগঠন ছিল না। তারা একাধারে ছিল অশিক্ষিত ও অদক্ষ। ১৯২৩ থেকে ১৯৩৮ সাল পর্যন্ত খনির সমস্ত আইন মহিলাদের বাদ দিয়ে তৈরি করা হত। এই সুবিধা থেকে আদিবাসী মহিলা শ্রমিকদের বঞ্চিত করা হয়েছিল। ১৯৪০ সালের পূর্বে খনিগুলিতে মাতৃত্বকালীন কোনো আইনের ব্যবস্থা ছিল না। মহিলাদের প্রসব যন্ত্রণা হলে ছুটি নিতে হত বা দীর্ঘদিনের জন্য কাজ থেকে বিরতি নিতে হত। এই সময় তাদের বীনা মজুরিতে কাজ করতে হত বা কাজের প্রতি কোনো সুরক্ষা ছিল না। প্রসব কালীন ছুটির ব্যবস্থা ও প্রসব কালীন ছুটির জন্য বেতন পাওয়া সবটাই শুরু হয় ১৯৪০ সালের পর থেকে।[128]

১৮৯০ থেকে ১৯৪০ সালের মধ্যে পাটকল মহিলা শ্রমিকদের রাজনৈতিক সংগ্রামে মজুরী ও কাজের অবস্থার উন্নতি হয়। পাটকল মহিলা শ্রমিকদের মাতৃত্ব কালীন ছুটির আবেদন জনিত আইন প্রথম ১৯১৯ সালে আই এল ও এর মিটিং এ আলোচিত হয়েছিল। ১৯৪০ সাল থেকে বাংলায় প্রথম খনিতে মাতৃত্বকালীন ছুটির আইন শুরু হয়। মাতৃত্ব কালীন ছুটির জন্য কোনো বাড়তি অর্থ প্রদান করা হত না। বোম্বের ফ্যাক্টারি গুলিতে এই আইন ১৯২৪ সাল থেকেই প্রণীত হয়েছিল। একটি ১২ টাকা মূল্যের স্ট্যাম্প পেপারে স্বাক্ষর করার মধ্য দিয়ে ফ্যাক্টারির মহিলারা ছুটির আর্জি জানাতে পারতেন। ফ্যাক্টারিতে মহিলাদের মাতৃত্বকালীন ছুটি সম্পর্কিত যে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছিল, এই আইন সাধারণ ভাবে ‘ক্যাজুয়াল’ নয় এমন মহিলা শ্রমিকদের জন্য প্রযোজ্য ছিল। প্রসঙ্গিত পূর্বে উল্লেখ্ করা হয়েছে যে আদিবাসী মহিলারা সাধারণত ‘ক্যাজুয়াল’ শ্রমিক হিসাবে অধিকাংশ কাজ করত। এই পর্যায়ে সহজেই উপলব্ধি করা যায় যে, কয়লা কাটার, লোডার, ডাপিং করা মহিলা শ্রমিকদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা বা আইন তৈরি হয়নি।

খনি ক্ষেত্রে মাতৃত্বকালীন ছুটি সম্পর্কিত কিছু নিয়ামাবলী ছিল। সেই নিয়ম অনুযায়ী ১) সমস্ত মহিলাদের প্রসবকালীন ৯ মাস পর্যন্ত ছুটি পাবে। ২) প্রত্যেক মহিলা তাদের প্রসূতির

---

128. *Report on the Department of Industries Bihar and Orissa state aid to Industry Rules, 1928, P. 13.*

কথা জানার পর একমাসের মধ্যে জানাতে হবে।[129] ৩) শিশুর জন্ম হওয়ার ১ সপ্তাহের মধ্যে বি ফর্ম এবং সি ফর্ম স্বাক্ষর করতে হবে। ৪) শিশুর জন্ম হওয়ার পর মাকে বেতন দেওয়া হত, কিন্তু মা মারা গেলে বা বাচ্চার ভরন পোষণের দায়িত্ব মায়ের অবর্তমানে অন্য কেও নিলে তাকে টাকা দেওয়া হত। অন্যদিকে মা ও শিশু উভয়েই মারা গেলে কোন রকম বেতন দেওয়ার কোনো নিয়ম ছিল না। ৫) কোনো মহিলা শ্রমিককে কাজ থেকে ছাঁটাই করা যাবে না যে সময় সে মাতৃত্ব কালীন ছুটির অধীনে রয়েছে। উপযুক্ত কারণে ছাঁটাই করলেও কোনো মহিলাকে মাতৃত্ব কালীন ছুটি থেকে বঞ্চিত করা হত না।[130] এক বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছিল যে, সমস্ত ফ্যাক্টারির মহিলা শ্রমিকদের ফ্যাক্টারিতে প্রবেশের জন্য খাতায় প্রবেশিকার স্বাক্ষর করা প্রয়োজনীয় ছিল। এই বিষয় সম্পর্কিত নিয়ামাবলীগুলি ২ বছরের জন্য নির্ধারিত হত। এই নিয়ামবলীর বিরুদ্ধে মহিলা শ্রমিকদের প্রতিক্রিয়া তেমন ভাবে প্রকাশ পায়নি কারণ বিরোধিতা করলে ৫০ টাকা জরিমানাও শাস্তি গ্রহণ করতে হত যা তাদের প্রতিদিনের মজুরির থেকে অনেক বেশি ছিল। যারা ক্যাজুয়াল শ্রমিকের আওতায় থাকত তারা এই নিয়মের কথাও জানতে পারত না এবং দাবির কথাও উল্লেখ করতে পারত না। এই সময় ১,২৭২ তা ফ্যাক্টারি ও খনিতে ৮৭,৪৪২ সংখ্যক মহিলা শ্রমিকদের কাজের বিবরণ পাওয়া যায়। সাধারণ ভাবে চা এর ফ্যাক্টারি বাদ দিয়ে আলোচনা করলে ১৭,৬৪২ টি মাতৃত্বকালীন ছুটির জন্য আবেদনের প্রমাণ পাওয়া যায়। এদের জন্য বরাদ্দ হয়েছিল ১৮,৩৩,৪৯২ ও চা ফ্যাক্টারির জন্য ১৭,৫৮,৭৫৯ টাকা। খনিতে মাতৃত্ব আইনের সুবিধা পেয়েছিলেন ৩,৮০৬ জন মহিলা কর্মী।[131] এই নিয়ম লঙ্ঘন করলে শাস্তি প্রদানের ব্যবস্থা ছিল ও জরিমানা দিতে হত ৫০ থেকে ৯০ টাকা। কয়লা খনিগুলিতে মাতৃত্ব আইনের পাশাপাশি পিঠেট বাথ ও মাইনস ক্রেচ নিয়মাবলীর সন্ধান পাওয়া যায়, যা ১৯৪৬ সালে কার্যকর হয়েছিল। সাধারণত বেশির ভাগ আদিবাসী মহিলা শ্রমিক যুক্ত ছিল ক্যাজুয়াল হিসাবে। ক্যাজুয়াল শ্রমিকদের কোন ছুটি প্রাপ্য ছিল না, অন্যদিকে তাদের থাকার জন্য ক্রেস স্থাপনও বাধ্যতামূলক হলেও তা মান্য করা হয়নি।

---

129. *The Bengal Maternity Benefit Rules 1940,* Government of West Bengal Department of Commerce and Labour, Alipore, West Bengal Press, p. 7-10.

130. তদেব। পৃ. ৭-১০

131. তদেব। পৃ. ৭-৮

মাতৃত্বের সুযোগ হারানোর পাশাপাশি বোনাস স্কিমের সুবিধাও তারা হারিয়েছিল। পশ্চিমবঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যা সহ নানা স্থানে কয়লা খনি বোনাস স্কিম প্রচলিত ছিল। পশ্চিমবঙ্গের পাটকল গুলিতে কিছু মহিলা শ্রমিককে বীমার মাধ্যমে আকৃষ্ট করা হত অথচ খনি অঞ্চলগুলিতে ১৯৫৭ সাল থেকে এই নিয়ম চালু হয়েছিল। এই নিয়মে যুক্ত ছিল খাদ্য ব্যতীত বাড়ি ভাড়া, অন্যান্য অনুরূপ ভাতা, দীর্ঘক্ষণ কাজের সময় ইত্যাদি। তবে যদি কোন স্ত্রীর কাজ বন্ধ হয়ে যেত তাহলে সেই শ্রমিক এই নিয়মের অধিকারী হতে পারত না। ৩৭ টাকার মাইনে যুক্ত কেন্দ্রীয় বোর্ডের দ্বারা সুপারিশ কৃত সুযোগসুবিধার অধিকারিদের এই স্কিমের বোনাস দেওয়া হত। পশ্চিমবঙ্গ, উড়িষ্যা ও বিহারের কয়লাখনিতে এই বোনাসের সুযোগ পেত তবে, কাজ শুরু হওয়া থেকে ত্রৈমাসিক উপস্থিত থাকা বাঞ্ছনীয় ছিল।[132] দেশের উৎপাদন প্রক্রিয়ার অংশ হওয়ার নাম করে আদিবাসী মহিলা শ্রমকে বঞ্চিত ও প্রতারিত করা হত। পুঁজিবাদী গোষ্ঠীর শোষণের অন্যতম লক্ষ ছিল শোষণের মাত্রা তীব্র করে মানুষের শরীরকে কাঠামোগত বস্তুতে পরিণত করা। শ্রমিকের দেহে শক্তির অভাব থাকায় শ্রমটি বিক্রিত ছিল। পুঁজিবাদী সমাজে একটি মহিলা শ্রমিক শরীরের মূল্যকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল পণ্যের ন্যায়। কম বেতন প্রাপ্যের মূল্য শ্রম শক্তির মূল্যের দ্বারা কম হয়েছিল। খনিতে কোন লক আউট সংগঠিত হলে সেই খবর শ্রম কমিশনারের কাছে পৌঁছাত এবং সেই ধর্মঘট আইনি বা বেআইনি কিনা প্রমাণ হওয়ার পর বোনাস পাওয়ার কথা ভাবা হত। কোনো ইউনিয়ানে যুক্ত শ্রমিককে বোনাস স্কিম দেওয়া হত না যার ফলে অনেকেই এই ধর্মঘটে অংশ নিতেন না।[133]

শ্রমিকদের সন্তানের প্রতি বৈষম্যকরন

১৯২০ থেকে ১৯৩৮ এর মধ্যে তাদের ভূগর্ভস্থ কর্ম সংস্থানের উপর নিষেধাজ্ঞার পূর্ব পর্যন্ত, বাংলা ও বিহার কয়লা ক্ষেত্র গুলিতে একটি সাধারণ পারিবারিক ব্যবস্থা চালু ছিল। কন্ট্রাক্টারের মাধ্যমে ক্যাজুয়াল শ্রমিক রূপে[134] এই পর্যায়ে গ্রামীণ জীবনযাত্রা থেকে বিছিন্ন হয়ে খনি সংলগ্ন আশ্রয় গড়ে তুলেছিল ৫% মহিলা আদিবাসী স্থায়ী শ্রমিক। খনি শিল্পে দীর্ঘ সময় ধরে আদিবাসী

---

132. Ministry of labour, Employment and Rehabilitation, *Coal mine Bonus scheme, 1948 and Sister Schemes,* Delhi, Publication Government of India, 1948, P. 5-12.

133. তদেব। পৃ. ৫-১২

134. Read. Margaret, *The Indian Peasant Uprooted: a study of the Human Machine.* London, Longmans green, 1931, P. 20-25.

মহিলারা এই শ্রমশক্তির গুরুত্বপূর্ণ উপাদান ছিল। এই নিস্তেজ পেশায় খনি শ্রমিকরা মাটির গর্ভে গিয়ে সন্তানদের সাথে বিশ্রাম, খাওয়া দাওয়া করা সবটাই একসাথে করত। দৈনিক ১৬ থেকে ৩০ ঘণ্টা কাজের সঙ্গে যুক্ত থাকা ও অতিরিক্ত জনসাধারণের মধ্য থেকে আদিবাসী মেয়েদের শ্রমশক্তিকে সস্তা মূল্যে কেনা ছিল ব্রিটিশ পুঁজিবাদী সমাজের বৈশিষ্ট্য[135] অন্যদিকে খনিতে যে সব মহিলা শ্রমিকদের কোলে শিশু সন্তান থাকত, সেই শ্রমিক মহিলারা কাজে যাওয়ার পূর্বে শিশুকে অল্প মাত্রায় আফিম খাইয়ে রেখে যেত, যাতে তারা মৃতের ন্যায় শয্যায় পড়ে থাকত। অধিকাংশ মহিলা মা শ্রমিকদের কারখানার উত্তাপ ও দুর্গন্ধের মধ্যে শিশুকে শুইয়ে রাখার তথ্যের উল্লেখ পাওয়া গিয়েছিল। কয়লাখনিগুলিতে মাতৃত্ব আইনের পাশাপাশি 'মাইনস ক্রেস' নিয়মাবলীর সন্ধান পাওয়া যায় যা, ১৯৪৬ সালে কার্যকর হয়েছিল। অধিকাংশ আদিবাসী মহিলা শ্রমিক ক্যাজুয়াল শ্রমিক হিসাবে যুক্ত থাকায় সেইসব শ্রমিকদের কোন ছুটি প্রাপ্য ছিল না, অন্যদিকে তাদের থাকার জন্য ক্রেস স্থাপনও বাধ্যতামূলক ছিল না।[136]

কালিদাসবাবু উক্ত বিষয় প্রসঙ্গে বলেছেন যে, শ্রমিকদের প্রতি এইসব অত্যাচার ব্রিটিশ সরকার নিরবে সমর্থন করেছিল।[137] পাশ্চাত্য দেশে মহিলা শ্রমিক কারখানার কাজে ব্যস্ত থাকলে তার শিশুর তত্ত্বাবধান করবার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা থাকত। এই দৃশ্য যদিও পাটের মত বড় বড় শিল্প খনিতে লক্ষ করা যায়নি। ১৯২০-১৯৩০ সালের দিকে খনি ভিন্ন পাট শিল্পাঞ্চলে মহিলা শ্রমিক শিশুদের মাতৃদুগ্ধ পানের কথা নিয়ে বিতর্ক তৈরি হয়েছিল। এই বিতর্কের সাথে সাথে পাট শিল্পাঞ্চলে শিশুদের মাতৃদুগ্ধ পানের ব্যবস্থা অব্যাহত ছিল। শিশুর শরীরে অন্যান্য খাবার ক্ষতি করবে বলে তারা(উঁচু বর্ণের মহিলা শ্রমিকরা) মাতৃদুগ্ধ পান করাতে সাছন্দ্যবোধ করতেন।[138] কাজের সময় বাচ্চাদের স্বাস্থ্য জনিত সমস্যা হলে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হত পাটের মত শিল্পাঞ্চলগুলিতে একই সময়ে। এক্ষেত্রে আশ্চর্যের বিষয় হল যে, সেই পাটকল গুলিতে 'দায়' হিসাবে কাজ করত আদিবাসী মহিলারা। আসলে 'দায়' এর কাজ

---

135. মার্কস. কার্ল, *মজুরি দাম মুনফা মজুরি ও পুঁজি,* কলকাতা, ন্যাশানাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, প্রথম সংস্করণ ১৯৫৪, পৃ. ২৪

136. *Royal Report of The Labour in Bengal and Bihar Coal Mine Area,* Calcutta, Government of India, 1941, P. 30-42.

137. *বাংলার কথা,* (দৈনিক পত্রিকা), কলকাতা, ৩রা ডিসেম্বর, ১৯২৮ পৃ. ৪

138. Sen. Samita, *Women and Labour in Late colonial India,* Cambridge, Cambridge University Press, First Published 1999, P. 150.

ছিল অস্বাস্থ্য কেন্দ্রিক। ১৯৪০ সালে পাট শিল্পাঞ্চলে ৫২২ টি 'দায়ের' উল্লেখ পাওয়া যায়।[139] ১৮৯৪ সালে ২০ সে জুন ইন্ডিয়ান মাইনিং অ্যাসোসিয়েশনের একটি সভার বক্তৃতায় সুরক্ষামূলক ও কল্যাণমূলক আইনের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে বিতর্কে মহিলা ও শিশুদের বিষয় মুখ্য হয়ে উঠেছিল। ট্রাইবুনাল আইন দ্বারা উল্লেখ করা হয়েছিল মাতৃত্ব কালীন সুবিধা, ক্রেচের ব্যবস্থা, যার মধ্যে ৭৫% থেকে ১০০% পূরণ করতে হয়েছিল৷ খনিতে শিশুদের নিয়ে আসার নিষেধাজ্ঞা মান্য করা হয়নি কারণ মহিলা শ্রমিকরা তাদের সন্তান বাড়িতে রেখে আসার সাথে শ্রম হ্রাস পাওয়ার কথা ভেবে এই পরিকল্পনা করা হয়েছিল৷ অন্যদিকে মহিলাদের মধ্য রাত্রিকালিন কাজ করা নিষিদ্ধ হয় ১৯০০ সালের আন্তর্জাতিক শ্রম আইনের তত্ত্বধানে। ১৯২৯ সালে মহিলাদের কর্মসংস্থান এবং খনির মত ঝুঁকিপূর্ণ পেশায় শিশুশ্রমের উপর বিধিবদ্ধ নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছিল৷ আই এল ও দ্বারা নির্ধারিত সমসাময়িক আন্তর্জাতিক শ্রমে ব্রিটিশ কয়লা মালিকদের নিজস্ব প্রতিযোগিতা বন্ধের জন্য, ১৩ বছরের কম বয়সী শিশুদেরকে প্রতি সপ্তাহে ৫৪ ঘন্টা ও মাটির উপরে ৬৬ ঘণ্টা কাজ করা এই আইনে নিষিদ্ধ করা হয়েছিল[140]৷ ১৯২২ সালে ভারত সরকারের শিল্প বিভাগের একটি চিঠিতে, ইন্ডিয়ান মাইনিং ফেডারেশন ভারতীয় খনি বিলের একটি বিধান নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশিত হয়েছিল৷

স্বাস্থ্য জনিত বৈষম্য

খনি ক্ষেত্রে আদিবাসী মহিলা শ্রমিকদের সুরক্ষায় বেসরকারি খাতের ভূমিকার মূল্যায়ন করতে গিয়ে লক্ষ করা যায় যে, বড় আকারের শিল্প খনি এবং ছোটো মাপের খনির শ্রমিকদের মধ্যে একটি স্পষ্ট পার্থক্য লক্ষ করা যায়।[141] বৃহত্তর পুঁজি চালিত খনি কোম্পানিগুলি মূলত মহিলা শ্রমিকদের স্বার্থকে উপেক্ষা করে, সুরক্ষা মূলক আইন পাশ না করে শ্রমিকদের খনিতে যুক্ত করেছিল। খনি ক্ষেত্রের মত অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে একাধিক কাজে যুক্ত থাকার ফলে মহিলাদের স্বাস্থ্যের প্রতি অযত্ন হতে থাকে এবং স্বাস্থ্যের অবনতি দেখা যায়। যে সমস্ত আদিবাসী মহিলা

---

139. তদেব। পৃ. ১৪২-১৪৪

140. *Annual report on the working of the Indian Trade Unions act (1954),* Government of West Bengal Labour Directorate, Alipore, West Bengal Governmental press, 1956, P. 5, 7

141. John. Kochuchira, *Political History of Santal Paragana: From 1765-1872,* New Delhi, Inter- India, 2000. p 9.

শ্রমিকরা তাদের শারীরিক শ্রম বিক্রি করতে অক্ষম হয়ে পড়েছিল কোলিয়ারির শেষ প্রান্তে। ১৯০৫ সালে, মেসের প্রধান পরিদর্শক মহিলা শ্রমিকদের কাজের বর্ণনা দিয়েছিলেন, মহিলা শ্রমিকরা পুরুষের দ্বারা কাটা কয়লা বহন করত। ১৯৩৫ সালে এবং ২০ এর দশকের শুরুর মধ্যে ভূপৃষ্ঠের নীচে কাজ করত। প্রতি ১০ জন পুরুষের মধ্যে ৬ জন মহিলা তবে ২০ এর দশকের শেষের দিকে মহিলারা পুরুষদের তুলনায় বেশি ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিল। এই ধরনের ছবি খনি এলাকাগুলিতে সর্বত্র দেখা দিতে থাকে। শ্রম বিভাজনের ফলে কোলিয়ারিগুলিতে ঘন ঘন বসতি পরিবর্তিত হয়েছিল অর্থাৎ কিছু স্থানে বসতি বৃদ্ধি পায় আবার কিছু স্থানে হ্রাস পাওয়ার কথা জানা যায়। কোলিয়ারিগুলিতে অতিরিক্ত জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে ম্যালেরিয়া ও কলেরার প্রকোপ দেখা দিয়েছিল। খনি শ্রমিকদের শ্রমের পাশপাশি স্বাস্থ্য গুরুত্ব পাওয়া প্রয়োজনীয় ছিল কিন্তু এই কাজের প্রতি অবহেলা করা হয়েছিল।[142] খনি কেন্দ্রগুলিতে সরাসরি ভাবে কর্মরত মহিলা শ্রমিকদের জন্য শৌচালয়ের ব্যবস্থা, টিফিনের জন্য কোনো বিশ্রাম ঘরের ব্যবস্থা ছিল না। বিশেষত খনি গর্ভের কর্মরত মহিলা শ্রমিকদের স্বাস্থ্য পরিষ্কার থাকাটা প্রয়োজনীয়তা থাকলেও তা ব্যবস্থা ছিল না।

১৯৪০ সালের পূর্বে ফ্যাক্টারি অ্যাক্ট অনুযায়ী খনিতে একজন মহিলা শ্রমিক থাকলেও ক্রেশ রাখা অত্যাবশ্যক ছিল কিন্তু সেই ব্যবস্থা লক্ষ করা যায় না। ধানবাদের সেন্ট্রাল হাসপাতালে ৩০ টি শয্যা খনির মহিলা শ্রমিক রোগীর জন্য বরাদ্দ ছিল অথচ খনি কর্মীদের জন্য ওষুধের জন্য অনুমোদন করা হয়েছিল ৫,৭০,৯০০ টাকা। কয়লা খনিগুলিতে হাজার হাজার খনি শ্রমিক কাজে যুক্ত থাকার পরও ১২ টি সাধারণ ও ৬ টি প্রসুতি সেবার জন্য শয্যার ব্যবস্থা করা ছিল।[143] ধানবাদ হাসপাতালের মত, বিহার ও বাংলার কয়লাক্ষেত্রে কাজ করা খনি শ্রমিকদের সুবিধার জন্য একটি আধুনিক হাসপাতাল গড়ে তোলা হয়েছিল কিন্তু বাংলা ও বিহারের অন্যান্য খনি ক্ষেত্রে শ্রমিকদের জন্য হাসপাতালের কোনো ব্যবস্থা ছিল না। মহিলাদের স্বাস্থ্যের দ্রুত অবনতি হলেও ১৯৪০ সালের পূর্বে কোনো ব্যবস্থা বিশেষভাবে খনির মহিলা শ্রমিকদের জন্য নেওয়া হয়নি। কর্মক্ষেত্রে চুক্তিভিত্তিক শ্রমের ভিত্তিতে কাজে যোগদান করলেও ১০ থেকে ১২ বছরের মধ্যে আদিবাসী মহিলা শ্রমিকদের স্বাস্থ্যের যে জটিলতা তৈরি হয়েছিল

---

142. Boal. W. M, Work Intensity and worker safety in early Twentieth century coal Mining, Vol-70, Explorations in Economic History, October 2018, P. 132-137.

143. তদেব। পৃ. ১৩২-১৩৭

তা উপেক্ষা করা যায় না[144]। এ প্রসঙ্গে বলা যায় হাসপাতাল তৈরির জন্য আদিবাসীদের জমি অধিগ্রহণের কথা ভাবা হয় ও আদিবাসীদের জমির উপরে হাসপাতাল তৈরি হওয়ার কথা উল্লেখিত হয়েছিল। খনিতে রোগীর সংখ্যা ১,৫২০ ও যথাক্রমে মহিলাদের সংখ্যা ১,২১১ জনের কাছাকাছি দ্রুত বৃদ্ধি পাওয়ার চিত্র লক্ষ করা গিয়েছিল।[145] এই সংখ্যা বৃদ্ধির পাশাপাশি খনির নিচে মহিলাদের কাজের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছিল। অধিক সময় কয়লা ক্ষেত্রে কাজ করার ফলে, কয়লার গুড়ো তাদের বুকের মধ্যে বাসা বেঁধে শ্বাস কষ্ট থেকে টিবি রোগের উৎপত্তি দেখা দিয়েছিল। টিবি বিভাগের জন্য আঞ্চলিক হাসপাতালের সিধান্ত নেওয়া হয়েছিল। টিবি রোগের পাশাপাশি কলেরা ও ম্যালেরিয়ার প্রকোপ বৃদ্ধি পেয়েছিল খনি ক্ষেত্র সংলগ্ন অঞ্চলগুলিতে। খনি অঞ্চলে সাঁওতাল মহিলা শ্রমিকদের সংখ্যা ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে ঘিঞ্জি ও আবর্জনাময় বস্তিতে পরিণত হয়েছিল। এই অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ থেকে বেরোনোর উপায় ছিল না খনি শ্রমিকদের।[146] ঝরিয়া, রাণীগঞ্জ, হাজিরাবাগ, পাঞ্চ ভেলী ও মার্গহেরিতা কয়লাখনি সংলগ্ন ম্যালেরিয়ার প্রকোপ অধিক পরিমানে বৃদ্ধি পেয়েছিল।[147] অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ, কাজের বিপজ্জনক প্রকৃতি এবং স্বল্প ও অনিয়মিত মজুরির কারণে তাদের স্বাস্থ্য নিয়ে বিভিন্ন সমস্যা দেখা দিয়েছিল। বিদেশে প্রেরিত শ্রমিকদের স্বাস্থ্য জনিত মৃত্যু ঘটনা প্রতিরোধ করতে প্রথম ১৮৫৬ সালে ২১ নং আইন পাশ হয়েছিল। এই আইনে উল্লেখিত ছিল যে, চুক্তিবদ্ধ শ্রমিকদের নিরাপত্তার উপযুক্ত ব্যবস্থা না থাকলে বিদেশে প্রেরিত হবে না বলে উল্লেখিত হয়েছিল।[148]

---

144. Dutt. Kuntala Lahiri, *Roles and status of women in extractive Industries in India: Making a place for a gender- sensitive mining development,* Vol. 37 No-4, December 2007, Pp. 40-45.

145. *Report of the Bihar Labour Enquiry Committee*, Vol-1, Patna, Bihar, 1941, P. 121-127.

146. Dutt. Kuntala Lahiri, *Roles and status of women in extractive Industries in India: Making a place for a gender- sensitive mining development,* Vol. 37 No-4, December 2007, p. 40-45.

147. *Ministry of Labour Report on the Activities of the Coal Mines labour Welfare Fund 1950-51,* Government of India, P. 21.

148. Legislature, joint committee *Report on the west Bengal mining settlement bill (1952),* Labour class Department, Calcutta, West Bengal, 1964.

মাস[149]	পুরুষ	মহিলা	মোট
এপ্রিল ৩৯	৩৫	৮	৪৩
মে	২৫	১৪	৩৯
জুন	৩৫	১৩	৪৮
জুলাই	৪৬	১৯	৬৫
আগস্ট	৪৬	২১	৬৭
সেপ্টেম্বর	২৪	১১	৩৫
অক্টোবর	৭	২	৯
নভেম্বর	১১	২	১৩
ডিসেম্বর	১১	৩	১৪
জানুয়ারি ৪০	১১	৭	১৩
ফেব্রুয়ারি	৫৬	৫	৭১
মার্চ	৩৭	১৪	৫১

খনি অঞ্চলে ছাঁটাই প্রক্রিয়ায় বৈষম্য

কয়লা খনিতে আদিবাসী মহিলা শ্রমিকদের প্রতি বৈষম্য দেখা যায় ছাঁটাই প্রক্রিয়া নিয়ে। যে সমস্ত আদিবাসী মহিলারা জীবিকার জন্য খনি কাজে যুক্ত হয়েছিল এবং তারা অবাধ শ্রম প্রয়োগে অভ্যস্ত হয়ে উঠলে ছাঁটাই প্রক্রিয়া প্রচলনের তথ্য উঠে এসেছিল। ১৯০০ সালে, সুইডেনে একটি আইন প্রবর্তন করার মধ্য দিয়ে মহিলাদের ভূগর্ভস্থ কাজ করা নিষিদ্ধ হয়েছিল যদিও ততদিনে ভারতবর্ষে প্রায় অনেক মহিলা শ্রমিকদেরকে খনি থেকে ছাঁটাই করেছিল। আধুনিক পুঁজির দৌলতে খনি ক্ষেত্রে নতুন প্রযুক্তি প্রচলন হওয়ার ফলে আদিবাসী মহিলা শ্রমিকদের ১৯২৩ সালের দিকে কাজ হারানোর তথ্য উঠে এসেছিল। খনির মালিকের ইচ্ছে অনুযায়ী আদিবাসী মহিলা শ্রমিকদের যে কোন সময় বিতাড়িত করা হত। ছোটনাগপুর অঞ্চলের খনি ক্ষেত্রে শ্রমিক ছাঁটাই প্রক্রিয়ায় পুরনো কুসংস্কারের সুবিধা ও নানা কিংবদন্তি গল্প ব্যবহার করে মহিলাদের মাটির নিচে কাজ করা থেকে দূরে সরিয়ে রাখা হয়েছিল। খনি ক্ষেত্রে মহিলাদের কাজ করা নিষিদ্ধ হওয়ার পাশাপাশি 'নিকৃষ্ট খনি শ্রমিক' হিসাবে কলঙ্কিত করা হয়েছিল। খনি মালিকদের লক্ষ্য ছিল একটি নতুন ধরনের কর্মী তৈরি করা। কোম্পানির একটি

149. *Ministry of Labour Report on the Activities of the Coal Mines labour Welfare Fund,* Raniganj, Government of India, 1950-51, P. 15.

গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য ছিল এমন একটি শ্রমশক্তি গড়ে তোলা যা স্থায়িত্বশীল এবং অর্থনৈতিকভাবে স্থিতিশীল পরিবেশে শ্রমের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করা যেতে পারে। পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক কাঠামোয় এই পর্যায়ে শ্রমের বিভাজন থেকে ধীরে ধীরে জন্ম নিতে থাকে লিঙ্গ জনিত শ্রেণি শোষণ ও নিচু জাতিতে জন্ম হওয়ার জন্য বৈষম্যকরণ। ১৯২৯ সালের মার্চ মাসের খনি গর্ভে আদিবাসী মহিলাদের কাজ নিষিদ্ধ করার বিজ্ঞাপনের আগেই আদিবাসী মহিলা শ্রমিকদের সামগ্রিক গুরুত্ব হ্রাস পেয়েছিল। ১৯৩৮ সালের মধ্যে, মহিলা শ্রমিকদের মোট শ্রমশক্তির মাত্র ১১% আদিম প্রযুক্তি ব্যবহারের কারণে খনি শিল্পে অদক্ষ থেকে দক্ষ শনাক্ত করা কঠিন ছিল"।[150] কোলিয়ারিগুলিতে মহিলাদের অবসর নেওয়ার পর মালিক শ্রেণি তাঁদের পছন্দমত শ্রমিকদের কাজে যুক্ত করার তথ্য উল্লেখিত হয়েছিল। এমন নয় যে, পুরুষ শ্রম ব্যতীত অন্য কেও ইচ্ছেমত কাজে যোগ দিতে পারত না। তবে কিছুক্ষেত্রে মহিলা শ্রমিকদের স্বামীর মৃত্যু হলে তারা কাজ করার জন্য দাবি করার অধিকার পেত। যদিও তা পূরণ করা বা না করা মালিক শ্রেণির হাতে ন্যস্ত ছিল। এই সমস্ত বৈষম্য মানবিক অধিকার লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে বিশেষ ভাবে উল্লেখিত হয়েছিল। আসলে খনি মালিকরা, খনি ক্ষেত্রে নতুন প্রযুক্তির আগমনের ফলে দক্ষ পুরুষ শ্রমিকদের উপস্থিতিকে পছন্দ করত। প্রধানত আইনি অধিকার এবং সেই সঙ্গে উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে খনিতে আদিবাসী মহিলা শ্রমিকের সংখ্যা ক্রমশ হ্রাস পেয়েছিল। আধুনিক প্রযুক্তির প্রবর্তনের কারণে আদিবাসী মহিলা শ্রমিকদের বাস্তুচ্যুত হওয়ার এই ঘটনা ও কাজ হারানোর তথ্য শ্রম ব্যুরোর সমীক্ষাও নিশ্চিত করেছিল।[151] আদিবাসী মহিলারা বিভিন্ন ধরনের বাজার সীমাবদ্ধতার শিকার হয়েছিল। চিত্রা জোশী ঔপনিবেশিক পর্যায়ের শ্রমিকদের শ্রেণি গঠনের ধারনা আলোচনার পরিবর্তে শ্রেণি, সম্প্রদায় এবং শ্রমিক শ্রেণির শ্রমের ধারণাগুলি রাজনীতির আওতায় জটিল হয়ে উঠার কথা আলোচনা করেছেন।[152] বাঁধাধরা চিন্তা এবং কাজের প্রতি অনীহা, কর্মক্ষেত্র সঠিক বা নিয়মিত না হওয়ার কথা তাঁর লেখায় বারংবার উল্লেখিত হয়েছিল। উৎপাদনের ক্ষেত্রে কর্ম বিভাজনের প্রক্রিয়াগুলির সমন্বয়- সাধনের ফল

150. *Report of the Bihar Labour Enquiry Committee,* Vol-1, Patna, Bihar, 1940, P. 40-43.
151. *Report on the Activities of the labour Department* Government of West Bengal, Vol-1, Kolkata, West Bengal Government, (January to April) 1948.

152. Joshi. Chitra, *Histories of Indian Labour: Predicaments and Possibilities,* Vol 6, Issue 2, History Compass, 2008, P. 439-443.

হিসাবে আদিবাসীদের ভুক্তভোগী হতে হয়েছিল।[153] ছোটনাগপুর মালভূমিতে ঠিক এইভাবেই, কয়লা ব্যতীত পাথর খনি ক্ষেত্রেও আদিবাসী মহিলাদের উপর বৈষম্য চিত্রিত হয়েছিল।

কুন্তলা লাহিড়ী যুক্তি দেন যে, খনির স্থানীয় সংস্কৃতির কারণে কোম্পানিগুলি প্রধানত পুরুষদের নিয়োগ করেছিল। আদিবাসী মহিলা এবং পুরুষদের মধ্যে শ্রমিক হিসাবে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিল মহিলারা। এই অর্থনৈতিক স্তরে এসে আদিবাসী মহিলারা একটি 'অদৃশ্য সমাবেশ লাইন' বরাবর কাজ করলেও পণ্যের ন্যায় ব্যবহৃত হত। এছাড়াও মহিলারা যে অর্থনৈতিক উন্নয়নের ভাগীদার হতে পারেনি তা খনি ক্ষেত্রে শ্রম বিভাজনের মধ্যেই যে প্রকাশ পেয়েছিল তা তিনি উল্লেখ করেছিলেন।[154] এছাড়াও তিনি উল্লেখ করেছিলেন, এক অস্ট্রেলিয়ান লিঙ্গ সমীক্ষায় লোজেভা এবং মারিনোভা দেখান যে, উন্নয়নশীল দেশগুলিতে বৃহৎ আকারের খনির ক্ষেত্রে দ্রুত সামাজিক পরিবর্তন পুরুষদের তুলনায় মহিলাদের উপর অধিক নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছিল। সুইডিশ খনির শিল্পে লিঙ্গ বৈষম্যকে স্পষ্টভাবে একটি কৌশলগত রাজনীতি বলে ধরা হয়েছিল।

খনি এলাকায় লিঙ্গ বৈষম্যের কারণ হিসাবে অর্থনীতিবিদরা গ্রামের আদিবাসী মহিলাদের অশিক্ষার কারণকেই দায়ী করেছেন। ভেঙ্কাটা রমন ও জৈন একই কথা সমর্থন করে বলছেন যে—

> "The Employers perceive these measures as liabilities and refrain from hiring women altogether. The prohibition from working in underground mines is clearly discriminatory against the fundamental human rights of women.[155]"

---

153. তদেব।

154. Dutt. Kuntala Lahiri, *Roles and status of women in extractive Industries in India: Making a place for a gender- sensitive mining development,* Vol. 37 No-4, December 2007, p. 40-45.

155. Gupta. Ranajit Das, *Labour and Working class in Eastern India,* New Delhi, K. P Bagchi and Company, 1994, p. 58.

এ প্রসঙ্গে একটা কথা বলা প্রাসঙ্গিক যে, ছোটনাগপুর মালভূমির খনিতে কর্মরত আদিবাসী মহিলা শ্রমিকদের সমানাধিকার, সামাজিক ন্যায় সম্পর্কে সমাজের উচ্চবর্গের শ্রেণি বিশেষভাবে সচেতন ছিল না। প্রান্তিক মহিলারা অশিক্ষিত থাকার কারণে এই সমস্ত অধিকার, ন্যায় এর কথা নিয়ে সচেতন হতে পারেনি। কর্মক্ষেত্রে আদিবাসীরা প্রতিবাদ করলেও লাভ বিশেষ হত না কারণ তাঁদের কাছে সেই পরিস্থিতিতে নিজেদের অধিকারের কথা ভাবাটা সহজ হয়ে উঠেনি। ঔপনিবেশিক সরকার, সমাজ ব্যবস্থাটাকে একটি গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ করে নিয়ন্ত্রণ করেছিল।

খনির বাইরে তথা অন্যান্য শিল্পক্ষেত্রে লিঙ্গ বৈষম্যের পাশাপাশি নিচু জাতি ও বর্ণকে কেন্দ্র করে বৈষম্য লক্ষ করা যায় বলে শমিতা সেন বিশেষ ভাবে উল্লেখ করেছেন তার গ্রন্থে। খনি ক্ষেত্রগুলি শুধুমাত্র আদিবাসীদের অবাধ শ্রম গ্রহণ করবে বলেই তৈরি হয়েছিল কেননা খনির বাইরে পাটকলগুলিতে মহিলা শ্রমিকদের অবস্থান ছিল বেশ গুরুত্বপূর্ণ। পাটকলগুলিতে মহিলা কর্মসংস্থানের আলোচনায় লক্ষ করা যায় হিন্দু বিবাহিত মহিলাদের পাশাপাশি বিধবা মহিলাদের অধিক যোগদান ছিল। এই মহিলাদের সাধারণত স্বামীর হাত ধরেই এই শিল্পাঞ্চলে আগমন হয়েছিল। পূর্বে পেশার অভিজ্ঞতা না থাকায় ক্রমবর্ধমান ভাবে পরিবারের মধ্যে তাদের সম্পর্ক পরিবর্তিত হয়েছিল। কলকাতার কাছাকাছি শিল্পাঞ্চলগুলিতে বাঙালি বিধবা শ্রমিকদের আগমনের কথা শমিতা সেন স্বীকার করেছেন। একই সময়ে পাটের কলগুলিতে সেইভাবে আদিবাসী মহিলাদের নিদর্শন পাওয়া যায় না।[156] শ্রম ব্যবস্থার সাথে সাথে ঐতিহ্যবাহী আবাস্থল থেকে বিচ্ছিন্ন করা আদিবাসী মহিলা শ্রমিকদের নতুন বৈশিষ্ট্য ছিল চোখে পড়ার মত[157]। বাঙালি শ্রমিকদের লৌহ, ইস্পাত শিল্পাঞ্চলগুলিতে বৃহত্তম একক গঠিত হয়েছিল[158]। পাটকলগুলিতে ইউরোপীয় ব্যবস্থাপকরা বাঙালি শ্রম প্রতিস্থাপনের একটি ইচ্ছাকৃত নীতি অনুসরণ করেছিল[159]। এক্ষেত্রে জনসংখ্যার চাপ এবং শ্রম অভিবাসনের মধ্যে সাযুজ্যকরণ বজায় ছিল। ঘরোয়া অশান্তি বন্ধ করতে বাঙালি ঘরের গৃহবধূরা পাটকলের কাজে যোগ দিয়েছিল অন্যদিকে

---

156. Raychouwdhury. Rakhi, *Gender and Labour In India, The Kamins of Estern Coal Mines 1900-1940,* Delhi, Minerva Associates Publication, First Published 1996, P. 33.

157. Gupta. Ranajit Das, *Labour and Working class in Eastern India,* New Delhi, K. P Bagchi and Company, 1994, p. 258.

158. তদেব। পৃ. ৫৮

159. তদেব। পৃ. ৬০

আদিবাসীরা আর্থিক অভাবের কারণে এই ক্ষেত্রে যোগ দিয়েছিল। শিল্পায়নে আদিবাসী মহিলাদের শ্রম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য ছিল কারণ এই শ্রমের উপর ভর করেই খনি ও খাদানের ভারবাহী শ্রমসাধ্য কাজগুলি সম্পূর্ণ হত।

ঔপনিবেশিক আমলে ছোটনাগপুর কয়লা খনির ভিন্ন খাতে বৈষম্য দেখা দিলে, শ্রমিকেরা ধর্মঘটের পথ অবলম্বন করেছিল। ধর্মঘটগুলি ছিল খনি শিল্পের এক বিশেষ মৌলিক বৈশিষ্ট্য কেননা মূলত আদিবাসী শ্রমিকরা খনি ক্ষেত্রে একটি পারিবারিক শ্রম ইউনিটের অংশ হিসাবে কাজ করেছিল। অত্যন্ত শ্রমঘন এলাকায় খনির কাজ থেকে শ্রমিকদের ইউনিয়ান তৈরি হওয়া ও আদিবাসী মহিলাদের বর্জন করা ছিল পুরুষ নির্মাণের অংশ। ১৯২০ সাল থেকে শ্রমিক ট্রেড ইউনিয়ান গুলির আবির্ভাব হলেও এই সংগঠনগুলি খনি শ্রমিকদের সম্পর্কে বিশেষ ভাবনা চিন্তা করেনি সাথে এটাও বলা বাহুল্য আদিবাসী মহিলাদের সম্পর্কে কোনো নতুন চিন্তা ভাবনা তৈরি হয়নি। এ প্রসঙ্গে যদিও দীপেশ চক্রবর্তী মনে করেন—

> "Working class culture and consciousness and trade union activities, organization derived or transmitted from pre- colonial, Pre-capitalist society and culture"[160].

তাই ট্রেড ইউনিয়ানের মধ্যে আদিবাসী মহিলা শ্রমিকদের অংশগ্রহণ নিয়ে অস্পষ্ট ধারণা তৈরি হয়েছিল।

স্বাধীনতার পূর্বে মহিলাদের নিয়ে আত্মরক্ষা সমিতি বা সংগঠন কমিউনিস্ট পার্টির তরফে পশ্চিমবঙ্গের জেলায় জেলায় গড়ে উঠেছিল কিন্তু তাতে আদিবাসী মহিলা শ্রমিকদের উল্লেখ বিশেষ ভাবে চিত্রিত হয়নি। তবে কৃষক আন্দোলনের মত রেল, চা, কয়লা খনির মহিলা শ্রমিকরা এই আন্দোলনে অংশগ্রহন করেছিল।[161] ১৯২০ থেকে ১৯৪০ এর দশকে ছোটনাগপুর অঞ্চলে কয়লাখনিগুলির কর্মসংস্থান অব্যাহত রাখার জন্য ঝরিয়া খনির মহিলা ও পুরুষদের সংগ্রাম বিশেষ ভাবে গুরুত্বপূর্ণ ছিল। পুরুষদের নিয়ন্ত্রিত শ্রমিক ইউনিয়ানে আদিবাসী

---

160. Chakrabarty. Dipesh, *Rethinking Working- class History: Bengal 1880-1940,* Calcutta, Oxford University, 1989, p. 186- 200.

161. দাসগুপ্ত. কল্যানি, *তেভাগার জেলায় মেয়েরা,* পশ্চিমবঙ্গ, তেভাগা সংখ্যা ১৪০৪ বঙ্গাব্দ, বর্ষ ৩০ সংখ্যা ৪২-৪৬।

মহিলাদের অংশগ্রহন কম ছিল। কোলিয়ারিতে বেশিরভাগ কাজ দল দ্বারা সম্পন্ন হত অর্থাৎ দলের মুখ্য যিনি থাকতেন তিনি দলের সদস্যদের মধ্যে কাজ ভাগ করে দিতেন, যারা মূলত শ্রম ঠিকাদার নামে পরিচিত ছিল। আদিবাসীদের মধ্যে বাউরিয়া শ্রমিকদের বড় দল গঠন হলেও পুরুষদের দ্বারা প্রতিবাদের ধর্মঘট কার্যকর হয়েছিল। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির গিরিডি কোলিয়ারিতে ধর্মঘট শুরু হয়েছিল, খনিতে কর্মরত মহিলার উপর গুলি চালানোর প্রতিবাদে। এই ধর্মঘটে খনি শ্রমশক্তি কাজ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল কিন্তু এই ঘটনার নেতৃত্ব পুরুষ কর্মীদের মধ্য থেকেই উঠে এসেছিল। ১৯২৯ এর রেগুলেশন পরবর্তী ১০ বছরে ভূগর্ভস্থ খনি থেকে মহিলা খনি শ্রমিকদের ধীরে ধীরে বহিষ্কার করার তথ্য উল্লেখিত হয়েছিল। ১৯৪০ এর পর থেকে খনি ক্ষেত্রে আদিবাসী মহিলাদের প্রবেশের ক্ষেত্র বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। আই এল দ্বারা গৃহীত ভূগর্ভস্থ খনি থেকে মহিলাদের নিষিদ্ধ করার নতুন কনভেনশনটি মহিলা খনি শ্রমিকদের ভাগ্যের উপর তালা দিয়েছিল। পারিবারিক শ্রম অর্থনীতি এবং পরিবার ভিত্তিক শ্রম অব্যাহত রাখার জন্য খনি শ্রমিকদের সংগ্রাম তীব্র হয়ে উঠেছিল। কোলিয়ারি ব্যবস্থাপনায় তথাকথিত পারিবারিক দল যা ১৯২০ সাল পর্যন্ত খনি বিভাগগুলিতে পুরুষ শ্রমিক সংগঠনগুলি ছিল পিতৃতন্ত্রের দালালে এবং পুরুষালি চিত্র তৈরি হতে শুরু করেছিল। বিশেষ করে সাঁওতাল, বাউরি, ভুঁইয়া গোষ্ঠীর বেশ কয়েকজন কয়লা কাটার মহিলা শ্রমিকদের বাতিল করার প্রসঙ্গে খনির চিত্রের পুরুষালিকরন উঠে এসেছিল। ঐতিহ্যবাহী কোলিয়ারির শ্রমিকরা পরিবার ভিত্তিক দল সিস্টেমের ধারাবাহিকতার উপর জোর দিয়েছিল। ঝরিয়া কোলফিল্ড মজদুর ইউনিয়ানে সভাপতি ছিলেন আব্দুল বারী। আব্দুল বারির মতে বিভিন্ন সমিতি একত্রিত হয়েছিল। রয়্যাল কমিশনের রিপোর্টে শ্রম সংক্রান্ত এই রেগুলেশনের প্রভাব থেকে জানা যায় যে, খনির আদিবাসী মহিলা শ্রমিকরা বিভিন্ন উপায়ে পারিবারিক শ্রম- অর্থনীতির প্রথা নিয়ে আক্ষেপ করেছিল যখন তারা নিষেধাজ্ঞার মুখোমুখি হয়েছিল। তদুপরি, মহিলা শ্রমিকদের সাথে শ্রমিক ইউনিয়ানের যোগাযোগ সহজ না হওয়ার ফলে নির্দিষ্ট অভিযোগগুলির বিশেষভাবে উল্লেখ পাওয়া যায় না। ধর্মঘটগুলিতে মহিলা শ্রমিকদের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে বলে ইউনিয়ানের কিছু সদস্যরা প্রয়োজনীয়তা মনে করতেন না সেই তথ্যও উঠে এসেছিল।

১৯৩৪ সালে মহিলা কর্মীদের অপসারণ বন্ধ করার জন্য কোলিয়ারিতে বিক্ষোভের আয়োজন হয়েছিল। রাধিকা দোসাধীন(৩৮), এতোয়ারিয়া দোসাধীন (৩০), মেঝি ভুইনি (৪০), যশোধা দোসাধীন (২৫) এবং গুলাবি কেওটিনের মত আদিবাসী খনি শ্রমিক মহিলারা এই

ধর্মঘটে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছিল। চিকুহো কয়লা খনিক্ষেত্রে ১৯৩০ এর দশকের গোঁড়ার দিকে মজুরির উন্নতি এবং কর্ম সংস্থানের সংগ্রামে সোনে নামক মহিলা সমর্থনকারী ভূমিকা পালন করেছিল।[162] ধর্মঘটের সময় পরিবার ও সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত পার্থক্য অনেকটাই ঝাপসা হয়ে যাওয়ার চিত্র লক্ষ করা গিয়েছিল। ধর্মঘট গুলির মধ্য দিয়ে শ্রমিকদের পরিবারগুলি শুধু রাজনৈতিক সম্প্রদায়ে পরিণত হয়নি বরং এর পরিধি ভিন্ন ভিন্ন স্তরে প্রসারিত হয়ে শ্রমিক শ্রেণি নামক একটি সামাজিক বিভাগ তৈরি হয়েছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে সক্রিয়ভাবে আদিবাসী মহিলা খনি শ্রমিকরা গণসংগ্রামে যোগ দিয়েছিল।

পর্যবেক্ষণ

উপরিক্ত এই অধ্যায় আলোচনা করা হয়েছে ১৮৯০ এর সূচনাকাল থেকে ১৯৪০ সাল পর্যন্ত। এই সময়কালের মধ্যেই খনির সংখ্যা ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাওয়ার সাথে শ্রমিক সংখ্যাও বৃদ্ধি পেয়েছিল। অধিক সংখ্যায় মহিলাদের খনি ক্ষেত্রে অংশগ্রহণ দেখা দিলে ধনতান্ত্রিক 'পুঁজি' শোষণের ভিত্তিকে প্রসারিত করেছিল অর্থনৈতিক স্বাধীনতাকে ক্ষুণ্ণ করার মাধ্যমে। এই অধ্যায়ের মধ্য দিয়ে তৎকালীন সময়ে আদিবাসী মহিলা শ্রমিকদের সামাজিক অবস্থানের বাস্তবতা সম্পর্কে অবগত হওয়া যায়। আরো অবগত হওয়া যায় যে, আদিবাসী মহিলা শ্রমিকরা খনি ক্ষেত্রে একটি উৎপাদকের থেকে অধিক কিছু ছিল না। দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতা এবং সমালোচনা যাই হোক না কেন, কোন সন্দেহ নেই যে, আদিবাসী মহিলা শ্রমিকদের জীবন এই খনি অর্থনৈতিক ক্ষেত্রগুলিকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছিল। সামাজিক পশ্চাদপদতা বর্তমানে আদিবাসী মহিলাদের মধ্যে থাকলেও তাঁর কারণ একদিনে তৈরি হয়নি বরং দীর্ঘদিনের অত্যাচারে জর্জরিত হয়ে এই ধরনের অবস্থানে পরিণত হয়েছিল। এছাড়াও এই অধ্যায়ে লক্ষ করা যায় ক্ষমতাকে কেন্দ্র করে ঔপনিবেশিক শক্তি সহ স্থানীয় পুঁজিপতিরা, খনি শ্রমের আদিবাসী মহিলাদের কিভাবে সামাজিক অবক্ষয়ের সূচনা করেছিল। অসংগঠিত খনি ক্ষেত্রগুলি শ্রমিকদের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ও মঙ্গলের জন্য তৈরি হয়নি বরং গোলামির উৎসস্থলে পরিণত হয়েছিল ধীরে ধীরে। শোষণ আর অর্থনৈতিক স্তরে সীমাবদ্ধ না থেকে তা অর্থনীতির বাইরেও নানা রূপে প্রভাবিত হয়েছিল। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক ক্ষমতার নিয়ন্ত্রণে আদিবাসী মহিলা

162. *Annual report on the working of the Trade Union act 1926,* Patna, Bihar, Secretariat Press, 1941, P. 23-33.

শ্রমিকদের চিন্তাশক্তি ও কর্মশক্তি হারিয়ে গিয়েছিল। খনির মত ক্ষেত্র বিশেষ করে কয়লা খনি থেকেই আদিবাসী মহিলাদের শ্রমের বাজার তৈরি হওয়ার পথের সূচনা হয়েছিল। কয়লা খনি ক্ষেত্রে শোষণের মাত্রা ও বরখাস্তের পরিমাণ বৃদ্ধি পেতে থাকলে কয়লা খনির পাশাপাশি সমৃদ্ধ অঞ্চলে আদিবাসী শ্রমিকদের পাথর খাদানে আদিবাসী শ্রমিকদের ভিড় বৃদ্ধি পেতে থাকে। অসংগঠিত কর্মক্ষেত্র গুলির মধ্যে পাথর খাদানে, সামাজিক জীবনশৈলী থেকে অর্থনৈতিক চালচিত্রের ধারা আদিবাসী শ্রমিকদের জীবন আবর্তিত করে গড়ে উঠেছিল তা পরবর্তী অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়

বীরভূমের আদিবাসী শ্রমিক ও পাথর খাদান ক্ষেত্র (১৯৪০-১৯৬০)

ঔপনিবেশিক যুগ থেকে পরবর্তী ঔপনিবেশিক যুগে ছোটনাগপুর মালভূমি অঞ্চলে আদিবাসী শ্রমিক ইতিহাস চর্চা করতে গিয়ে কয়লা ভিন্ন অন্যান্য খনিজ খনিতে আদিবাসীদের যোগদান আলোচনার আরেকটি ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছিল যা খননের ইতিহাসে ব্রাত্য হয়েছিল। পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলি আলোচনার প্রেক্ষাপটে ঔপনিবেশিক যুগ থেকেই কয়লাখনির পাশপাশি পাথর খাদান খনিতেও আদিবাসী শ্রমিকদের অংশগ্রহণ বিস্তর পরিমাণে ছিল। একইসাথে পাথরখনির ইতিহাসে আদিবাসী শ্রমিকশ্রেণির সংগ্রামের কথা উঠে এসেছে। সেই আলোচনায় আদিবাসী শ্রমিকদের সাথে খনিক্ষেত্রের সম্পর্ক যে বিরুপ হয়ে উঠেছিল তা নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই। ঔপনিবেশিক সময়কাল থেকেই ছোটনাগপুর মালভূমিকে কেন্দ্র করে বীরভূম ও বীরভূম সংলগ্নের নানা অংশে কয়লার মত অসংগঠিত পাথর খাদান গড়ে উঠেছিল। পাথর খাদানের সাথে যুক্ত হয়েছিল আদিবাসী শ্রমিকদের আরো এক ইতিহাস। অতিরিক্ত শ্রমের যোগান মেটাতে খাদান ও ক্রাসারের মালিকরা স্থানীয় আদিবাসী শ্রমিকদের উপর ভরসা করেছিল যদিও এই ভরসা শ্রমিক শোষণেক্ক পান্তরিত হয়েছিল। এই অধ্যায়ে মূলত ছোটনাগপুর মালভূমি অঞ্চলের বীরভূমের বিস্তর পাথর খাদানের উৎপত্তি ১৯৪০ সাল থেকে আদিবাসী শ্রমিকদের শ্রমের ইতিহাস নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। অতিরিক্ত মুনফা আদায়ের জন্য কয়লাখনির মালিকদের মত দেশীয় খাদান মালিকেরা আদিবাসী শ্রমিকদের সাথে কিধরনের শোষণক রেছিল তার ব্যাখ্যা এই অধ্যায়ে বিস্তারিত ভাবে করা হয়েছে। খাদান মালিকদের শোষণের পাশাপাশি খাদানের প্রভাব শ্রমিকদের জীবনে শারীরিক ক্ষতির পরিমাণ বৃদ্ধি করেছিল তার বিস্তারিত আলোচনা এই অধ্যায়ে করা হয়েছিল। এই প্রসঙ্গে ঔপনিবেশিক বীরভূমের অর্থনীতি ও সামাজিক পরিস্থিতি সম্পর্কে কিছুটা আলোচনা করা প্রয়োজন যার মাধ্যমে পাথর খাদানের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট অনুধাবন করা সম্ভব হবে।

ছোটনাগপুর মালভূমির পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান বিভাগের অন্তর্গত বীরভূম জেলার আকৃতি সমদ্বিবাহু ত্রিভুজের মত। বীরভূম তার উত্তর প্রান্তে অবস্থিত। জেলার উত্তরে ও পশ্চিমে ঝাড়খণ্ড রাজ্য (পূর্বে বিহার রাজ্যের অংশ বিশেষ সাঁওতাল পরগনা জেলা) পূর্বে মুর্শিদাবাদ আর বর্ধমান জেলা, দক্ষিণে অজয় নদ। বীরভূম জেলা ছিল সাঁওতাল পরগণার পূর্বে অবস্থিত। এটি

১,৭৫২ বর্গ মাইল এলাকা জুড়ে রয়েছে।[1]এই জেলাটির পশ্চিমাঞ্চলে ছোটনাগপুর মালভূমির অন্তর্গত পরিপূর্ণ একটি এলাকা। প্রাকৃতিক ভাবে পাথুরে গঠনে তৈরি হয়েছিল এই জেলা।পশ্চিম বীরভূমের সমগ্র ও মধ্য বীরভূমের অধিকাংশ অঞ্চল ছিল গভীর জঙ্গলে পরিপূর্ণ। জেলাটির পশ্চিমাঞ্চল ক্রমশ ঢালু হয়ে নেমে এসে মিশেছে পূর্বদিকের পলিগঠিত উর্বর কৃষিজমিতে।

ঔপনিবেশিক যুগে বীরভূমের অর্থনীতি ও আদিবাসী জনজাতি

ঔপনিবেশিক বীরভুমের অর্থনৈতিক চালচিত্রকে ৩ ভাগে ভাগ করা যায়। কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, মোটামুটি ভাবে বলতে গেলে কৃষিকাজের ওপর স্থানীয় জমিদার ও মহাজন যেমন নির্ভরশীল ছিল ঠিক তেমনই তপশিলি জাতি ও উপজাতির মানুষের জীবিকা কৃষির উপর নির্ভর করেই চলত।অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দশক থেকে উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশক পর্যন্ত বীরভূমের অর্থনীতি অগ্রগতি পূর্ণ ছিল, তার যথেষ্ট প্রমাণ ঔপনিবেশিক বীরভূমের অর্থনীতিক চালচিত্র সম্পর্কে বিস্তারিত জানলে অবগতহওয়া যায়।এই পরিস্থিতির সাথে যুক্ত হয়েছিল বন্যা, খরার মত পরিস্থিতি যা বীরভূমের অর্থনীতিকে ক্ষতিগ্রস্থকরে তুলেছিল। ১৯৩৪ সালে বীরভুমে বন্যার কারণে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল। অন্যদিকে ১৯৪০ সালে তীব্র খরার কারণে বীরভূমের অর্থনীতিতে তীব্র ঘাটতির তথ্য উঠে এসেছিল। এছাড়াও বর্গী হাঙ্গামা সমগ্র বাংলার সঙ্গে বীরভূমের কৃষি তথা বাণিজ্যের সামগ্রিক অর্থনীতির অপরিমেয় ক্ষতি সাধন করেছিল।[2] ১৯৪৩ থেকে ১৯৪৪ সালের ঘটমান মহামারিতে গ্রামীণ বাংলায় বীরভূমের অর্থনীতির ক্ষতি হয়েছিল অনেকাংশে।[3]

অর্থনৈতিক জীবনের ভিন্ন ভিন্ন সমস্যা গুলিকে বীরভূমের আদিবাসীদের বিদ্রোহ থেকে ভিন্ন করে পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব ছিল না। প্রতিটি ঘটনা অর্থনীতির বিকাশের পথে অন্তরায় হয়ে

1. Mazumdar. Durga Das, *West Bengal District Gazetteers,* Birbhum, Published by The State editior Calcutta, Government of West Bengal, December 1975, Pp. 1-20.

2.Malley. L.S.S.O, *Bengal District Gazetteers Birbhum,* Calcutta, Bengal Secretariat Book Depot, 1975, P. 222-226.

3. Robertson. P. M, *Report of the Survey and Settlement operations,* Birbhum, (1909-1914), Calcutta, Bengal secretariat book depot, 1915, Pp. 5-12.

দাড়িয়েছিল।১৯৪২ সালের ৯ আগস্টের পর বাংলার গ্রামগুলিতে যথেষ্ট রাজনৈতিক অস্থিরতা দেখা দিয়েছিল। কমিউনিস্ট নেতৃত্বাধীন প্রাদেশিক কিষানসভা, অধিকারের জন্য খাদ্য কমিটি আন্দোলন সংগঠিত হয়েছিল। মজুতদার ও কালো বাজারিদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে যোগদান করেছিল আদিবাসীরা দলে দলে। বীরভূম জেলার নানুর, ফতেপুর, সিউড়ি, জাজিগ্রাম, পাইকর, মুরারই,সাইথিয়া, দুবরাজপুর, রামপুরহাট এলাকার বিপুল সংখ্যক আদিবাসী বিদ্রোহীরা প্রতিবাদে যোগ দিয়েছিল। ১৯৪৩ সালে মনুষ্যসৃষ্ট দুর্ভিক্ষের সূচনা আদিবাসী কৃষকদের জীবন সংগ্রামকে কঠোর করে তুলেছিল।[4] খাদ্য আন্দোলনের এই বিদ্রোত্মক পরিস্থিতি ধীরে ধীরে ব্যাপক আকার ধারণ করেছিল।কৃষি থেকে আদিবাসীদের বিতারিত করা হয়েছিল।এই প্রসঙ্গে বাংলায় প্রায় সব জেলা থেকে লুটপাটের তথ্য উল্লেখিত হয়েছিল যদিও এই ঘটনার জন্য দায়ী করা হয় আদিবাসী সাঁওতালদের।[5] গ্রামীণ বিদ্রোহের পাশাপাশি বিক্ষিপ্ত ভাবে দরিদ্র সাঁওতাল, ওঁরাও, মুণ্ডারা ভাড়া ও নো ট্যাক্স আন্দোলনে যোগদান করেছিল। এইজেলারনলহাটি, রামপুরহাট, সিউড়ি ও অন্যান্যঅঞ্চলেবিদ্রোহীদেরআধিপত্যদীর্ঘকালপর্যন্তঅব্যাহতছিল। কাজের উদ্দেশ্যে নানা স্থানের শ্রমিক, কৃষক ও মধ্যবিত্তরা আন্দোলনে যোগ দিতে বাধ্য হয়েছিল।

বীরভূমের সমবায় আন্দোলন

বীরভুমের সমবায় আন্দোলনের মধ্য দিয়ে জানা যায় যে, এই আন্দোলনের মধ্যে মজুর,কৃষক, কারিগর, গ্রামীনমহিলা, ভূমিহীনকৃষকদেরযুক্তকরাহয়েছিল। তদুপরি চুরি ডাকাতি, রাহাজানি, দাঙ্গা- হাঙ্গামার অব্যাহত ধারা নিচু বর্ণের মানুষদের বিক্ষোভ ও অসন্তোষের বহিঃপ্রকাশ হিসাবে প্রশাসনকে সর্বদা ব্যস্ত রেখেছিল। কমিউনিস্ট সৌমেন্দ্রনাথঠাকুর এই সমাজের পথপ্রদর্শক ছিলেন। তাঁর বক্তব্য সমাজের প্রতিটি স্তরে পৌছেছিলএবং তিনিকৃষক, ফ্যাক্টারিরশ্রমিক, ছাত্রদের একত্রিত করেছিলেন। ১৯৩৪খ্রিস্টাব্দেসৌমেন্দ্রনাথঠাকুরশ্রমিকওকৃষকদেরজন্যকিছুসংঘগড়েতুলেছিলেন।খয়রাশোল,দুবরাজপুর, মুরারই, বোলপুরওলাভপুরেরবাসিন্দারাউৎসাহিত হয়ে এই আন্দোলনে যোগ দিতে শুরু করেছিল। সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাথে পান্নালালদাসগুপ্তার নাম কৃষক সংগঠনের সাথে জড়িত

---

4. *বীরভুম জেলা সংখ্যা,*(সাপ্তাহিক পত্রিকা), পশ্চিমবঙ্গ পত্রিকা, ৫ইএপ্রিল, ১৯৬৮,পৃ. ১৪৩-১৪৫

5.মিশ্র. গৌরহরি, *বীরভূমের ইতিহাস,*সিউড়ি, রতন লাইব্রেরী, ২য় খণ্ড, ১৯৩৬, পৃ. ১২২-১২৭

ছিল।[6]তিনিউৎসাহিতহয়েছিলেন সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুরেরসংগঠনেরদ্বারা।এইআন্দোলন মূলত ছিলজমিদারদেরবিরুদ্ধে। স্বাধীনতা পূর্ববর্তী ১৯৪৪ সালে কমিউনিস্টলিগ দ্বারা 'ধান উৎপাদনকে' ধরে রাখার জন্য পুনরায় গঠিত হয়েছিল আন্দোলন। এই আন্দোলনে সাধারণ মানুষদের পাশপাশি আদিবাসী সাঁওতালদের স্বার্থরক্ষা হয়েছিল। কমিউনিস্টদেরলক্ষ্যছিলকৃষকদেরস্বার্থরক্ষাকরা, আরজমিদারদের অত্যাচারেরহাতথেকেমুক্তিদেওয়া। অবাক করার বিষয়ছিল যে, টেগোর কোম্পানি একাধারে খনি শিল্প প্রতিষ্ঠানে আদিবাসী শ্রমিকদের সুবিধার জন্য সাহায্যের হাত বৃদ্ধি করেননি অথচ স্থানীয় জমিদারদের বিরুদ্ধে কৃষক আন্দোলনে বিরোধিতা প্রকাশ করেছিলেন।[7]

গ্রামের বাসিন্দাদের মধ্যে আদিবাসীরা কৃষির ক্ষেত্রে যথেষ্ট শ্রম প্রদান করতে পারেনি কারণ তাদের সাথে জমির বিছিন্নতা দেখা দিয়েছিল। পরিশোধযোগ্য পরিমাণ অর্থ শোধ না করা পর্যন্ত ঋণদাতারা কৌশল করে সময়ের অপেক্ষা করত। আসলে মহাজনরা নিশ্চিত করে জানত যে, আদিবাসী কৃষকরা এই পরিমাণ অর্থ পরিশোধ করতে পারবে না, তারপর প্রায় সব দিক দিয়েই বিক্রি করে ঋণ নিষ্পত্তির জন্য আদিবাসীদের পীড়াপীড়ি করা হত। এইভাবে আদিবাসীদের সাথে অন্যায় অবিচার করে, প্রতি বছর মহাজনরা সুবিধা ভোগ করে চলত।প্রাকৃতিক কারণে বীরভূমের অর্থনীতি দুর্বল হওয়ার পাশপাশিভূমির সাথে বিচ্ছিন্নতার মধ্য দিয়েই আদিবাসীদের অর্থনীতি দুর্বল হয়ে পড়েছিল। সমগ্র প্রক্রিয়ায় শুধু অর্থ-ঋণদাতা জড়িত ছিল না বরং রাষ্ট্র-সৃষ্ট দেশমুখরাও জড়িত ছিল। এই পুরো শোষণ পদ্ধতি সম্পর্কে মাধব রাও সঠিকভাবে বর্ণনা করেছেন যে, প্রত্যেকই সমৃদ্ধ আইনজীবী, ধনী বণিক,সচ্ছল কর্মকর্তা, উচ্চাকাঙ্ক্ষী চাষী-সবাই প্রতিনিধিত্ব করেছিল কৃষক রাজস্ব আইনের জন্য। উন্নত জনগোষ্ঠীর স্বার্থ এবং রাষ্ট্রীয় স্বার্থ সম্মিলিত জমির বৃহৎ আকার ছিল আদিবাসীদের সাথে জমির সম্পর্কের বিচ্ছিন্নতার মূল কারণ। বীরভূমের কিছু গ্রামে জমির সাথে আদিবাসীদের বিচ্ছিন্নতা তৈরি হয়েছিল জমি বন্ধক রাখার মাধ্যমে। তবে জমির মূল পরিমাণ ও পরিসংখ্যানের হেরফের থাকায় আদিবাসীরা, মহাজনদের স্বার্থ বুঝে উঠতে পারেনি।বর্ণ হিন্দুদের এতটাই সমাজে

6.*বীরভূম জেলা সংখ্যা,*(মাসিক পত্রিকা), পশ্চিমবঙ্গ পত্রিকা, ৫ইএপ্রিল, ১৯৬৮,পৃ. ১০১- ১০৫

7.*বীরভূম বার্তা,* (মাসিকপত্রিকা) বর্ষ-২১, সংখ্যা-৪৬, সিউড়ি, বীরভূম, অগ্রহায়ন ১৩২৩ সাল, (১৯২৫)।

আধিপত্য ছিল যে,জমি সংক্রান্ত এক বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের মাধ্যমে জানা যায় যে, জমিদারির হিসেব নিকেশপ্রভৃতি কাজে অভিজ্ঞ এক ব্রাহ্মণ ব্যক্তির সন্ধান করা হয়েছিল। সেই ক্ষেত্রে স্পষ্ট হয় তৎকালীন পরিস্থিতির জাত বৈষম্যতা।[৪] এ প্রসঙ্গে মন্তব্য করা যায়, তৎকালীন ভারতবর্ষ কৃষি প্রধান দেশ হলেও মূলত বিদেশী ও কর্পোরেট পুঁজির আধিপত্যের কারণে এদেশের কৃষি সমুচিত বিকাশ লাভ করেনি। এই পর্যায়ে সাঁওতালদের ধীরে ধীরে দামিন- ই- কোহের অরণ্যভূমিতে প্রবেশ পাহাড়িয়াদের মধ্যে বৈরিতার বোধ তৈরি করেছিল। যদিও আদিবাসীদের মধ্যে এই অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব, উপজাতি এবং বর্ণ হিন্দুদের মধ্যে স্বার্থের সংঘর্ষের তুলনায় অনেক কম তাৎপর্যপূর্ণ ছিল। এই প্রক্রিয়াটি বর্ণ রাজ্যের মধ্যেই সক্রিয় ছিল যার ফলে নিম্ন বর্ণের আদিবাসীদের শুধু বর্ণ হিন্দুই নয় বরংমুসলমান, মারোয়ারি, বিহারি, সিন্ধি এবং পাঞ্জাবি সম্প্রদায়ের উচ্চ বর্ণের সদস্যদের দ্বারা সংঘর্ষপ্রসারিত হয়েছিল। পাকুড়ের রাজ পরিবার এবং সমতলের মুসলিম কৃষকদের মধ্যে একটি সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক ছিল। আদিবাসীরা নিম্ন বর্ণের হওয়ায় সমাজের উচ্চ স্তর থেকে প্রায় বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল এবং অভিভাবকহীন ভাবে নিজেদেরকে রক্ষা করতে হয়েছিল। সুতরাং উৎপাদনের পদ্ধতি, সামাজিক সম্পর্কের মধ্যে একটি তীক্ষ্ণ বিভাজন- পাহাড় এবং সমতলের মানুষের মধ্যে ঔপনিবেশিক পর্যায় থেকে লক্ষ করা গিয়েছিল। ঔপনিবেশিক বীরভূমের অর্থনীতি লক্ষ্য করলে বস্তুতপক্ষে, অবরুদ্ধ অর্থনীতি ও সামাজিক বিক্ষোভ পাশাপাশি যুক্ত হয়ে শতাধিক বছরের ঔপনিবেশিক শাসনের প্রকৃত চরিত্রকে উদ্ঘাটিত করেছিল।ঐতিহাসিক ভাবে বীরভূম ও আশেপাশের অঞ্চলটিকে একটি প্রাক- পুঁজিবাদী উৎপাদন পদ্ধতির মধ্যে রাখা হয়েছিল। প্রথমে জমি থেকে রাজস্বের ঔপনিবেশিক নীতির মাধ্যমে এবং পরবর্তিকালে পাথর উত্তোলনে বিকাশের মাধ্যমে তার নিদর্শন পাওয়া যায়।[9]

---

৪. *তদেব*।

9. Das. Bela,*Economic and ecological implication of Pakur Basalt Quarries,* Unpublished Research paper, Department of Geography, University of Burdwan, 1993, P. 124-128.

শিল্প

কৃষি অর্থনীতির সহায়ক হিসাবে শিল্প উৎপাদন ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল ঔপনিবেশিক বীরভূমে।[10]রুগ্ন বা নিস্তেজ কৃষির অনিবার্য পরিণতি,অভ্যন্তরীণ বাজার আর শীর্ষ গ্রামীণ শিল্প স্থায়ী অর্থনৈতিক সংকটের মধ্যে নিছক টিকে থাকার প্রয়াসে ঝুঁকি নেওয়া শুরু হয়েছিল। এই জেলায় আদিবাসী সাঁওতালরা কৃষির উপরে নির্ভরযোগ্য হলেও কৃষির সহায়ক হিসাবে গ্রামীণ শিল্প উৎপাদন ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল ঔপনিবেশিক বীরভূমে। এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, কৃষি অর্থনীতির সাথে শিল্পের যোগাযোগ এবং তার সাথে আদিবাসী সাঁওতালদের যোগাযোগ ছিল অবিচ্ছেদ্য।ঔপনিবেশিক পর্যায়ে বীরভূমে শিল্প বলতে ভারী শিল্প লোহা ছিল উল্লেখযোগ্য।[11]লোহারকারবারেঅবনতিদেখাদিলেপরেউনবিংশশতাব্দীরশেষভাগেলোহাসংক্রান্তব্যব সালুপ্তহয়েযায়। লোহার কারবার বন্ধ হয়ে গেলে শ্রমিক ও কারিগরগুলি ছিন্ন ভিন্ন হয়ে এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তেঅন্যকাজেজীবিকানির্বাহেরচেষ্টাকরেছিল।এ পর্যায়ে শিল্প উৎপাদনে আদিবাসীদের অর্থনীতি এক সংকটের পর্যায় লক্ষ করা যায়।অষ্টাদশ শতাব্দীর শুরু থেকেই কাপড়, কাঁচা রেশম, গুড়, চিনি, নীল, লোহার মত শিল্পে আন্তর্জাতিক ব্যাবসা লক্ষ করা যায়।[12]১৮২৮সালেরদিকেলাক্ষা শিল্পের জন্যঅনেকগুলিকুঠিতৈরি হয়েছিল।এটিএকটিবেশলাভজনকব্যবসাছিল।বীরভূমে আরস্কাইনকোম্পানিইলামবাজারেলাক্ষাশিল্পকেউন্নীতকরেছিল।মহম্মদবাজারেরসন্নিকটে ও সিউড়িরনিকটক্ষয়রাসোলেরগ্রামেখড়িমাটির সন্ধানপাওয়াগিয়েছিল।যেখানে আদিবাসী শ্রমিকদের ভূমিকা ছিল উল্লেখযোগ্য। এইখড়িমাটিদু- তিনপয়সামণহিসাবেবিক্রিহত।[13]লাক্ষা উৎপাদনে আদিবাসীদের ব্যবহার করা থেকে মজুত বৃদ্ধি, ছোট প্রাণী পালন, বনায়ন, কাঠ কাটা, মাছ ধরা

---

10. গুপ্ত. সত্যেশ চন্দ্র,*বীরভূমের খনিজ সম্পদ,*বীরভূম, টেকনিক্যালআইবিএমপ্রকাশিত,১৮৮২, পৃ. ২৬-৩৪

11. Malley. L.S.S.O, *Bengal District Gazetteers Birbhum,* Calcutta, Bengal Secretariat Book Depot, 1951, P. 272.

12. Mitra. A,*Census 1951 west Bengal (Birbhum),*Kolkata, printed by Sree Saraswati Press Ltd, 1954, p. 87.

13. *Report of the List of mines other than coal mines worked under the Indians mines act*, Bengal and Bihar, 1951, P. 111-120.

ইত্যাদিতে যোগদান ছিল উল্লেখ্য। সাতের দশকের শেষের দিকে তৎকালীন শাসনতান্ত্রিক কাঠামোর মধ্যে ভূমি সংস্কারের অগ্রগতি ও গ্রামীণ বিকাশের গণমুখী কর্মসূচিগুলি রুপায়নে গণ উদ্যোগ লক্ষ করা যায়। সমাজের আর্থিক ও সামাজিক দিক থেকে পিছিয়ে থাকা মানুষের সাথে আদিবাসী শ্রমিকদের অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্তন শুরু হয়েছিল পাথর খাদানের হাত ধরে। বেলা দাস, ঔপনিবেশিক যুগে আদিবাসী জনগোষ্ঠী দ্বারা গৃহীত সম্পদ প্রক্রিয়াগুলি সংগ্রহ, স্থানান্তরিত চাষ, এবং কারিগর কারুশিল্পের ন্যায়বিচারপূর্ণ মিশ্রনের উপর ভিত্তি করে জীবিকা নির্বাহের কথাকে স্বীকার করেছেন। খনন শিল্পের মধ্যে ঔপনিবেশিক যুগে বীরভূমের কিছু ক্ষেত্রে কয়লা খনির অস্তিত্ব ছাড়াও বীরভূমের বিস্তৃত এলাকার ভূগর্ভে যে বাণিজ্যিক অমূল্য কালো পাথরের স্তর সঞ্চিত ছিল তা অনেকেরই অজানা ছিল। পশ্চিমবঙ্গের বীরভূমে ও বীরভূম সংলগ্ন ঝাড়খণ্ডের বৃহৎ অংশ জুড়ে যে পাথরের খাদানের অস্তিত্বের সাথে ঔপনিবেশিক বীরভূমের আদিবাসী শ্রমিকদের অর্থনীতির বড় যোগসূত্র ছিল।মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অ্যাপলাচিয়ান, যুক্তরাজ্যের ল্যাঙ্কাশায়ারের মতো ছোটনাগপুর মালভূমি অঞ্চল, ভারতে খনিজ সম্পদের স্টোর হাউস বা গুদাম ঘর নামে পরিচিত ছিল। ১৯১০ এর জেলা গেজেটিয়ার লক্ষ করলে পশ্চিম বীরভূমে লোহা, কয়লা, চুনাপাথরের অস্তিত্ব ছিল বলে জানা যায়। অন্যান্য পরিসংখ্যান থেকে বীরভূম জেলার মধ্যে গ্রানাইট পাথর সন্ধানের কথা উঠে এসেছিল।[14]ঔপনিবেশিক পর্বে পাথর খনন কার্যক্রমের প্রাথমিক সূচনাকারীদের মধ্যে, কাশিমবাজারের তৎকালীন মহারাজা এবং পাকুড়ের তৎকালীন মহারানি ছিলেন উল্লেখ্য। যারা তাদের জমিদারী ও সম্পত্তির উপার্জন থেকে পর্যাপ্ত পরিমানে বিনিয়োগ করেছিলেন।[15] ব্রিটিশ আমলে বীরভূম জেলার রাজগ্রাম ও সিউড়ি অঞ্চলে প্রথম পাথর খাদান চালু হয়েছিল। ছোটনাগপুরমালভূমিরঅন্তর্গতবীরভূমওবিহারেরহাজারীবাগ, মানভুমওসিংভূমে বড়পরিমানেপাথরখাদানেরঅস্তিত্বছিল।পাথর খাদানগুলি ছোটনাগপুর মালভূমির অর্ধেক অংশ

14. Malley. L.S.S. O, Bengal Distric Gazetteers (Birbhum), Calcutta, Government of West Bengal, 1910, P. 68-75.

15. Das. Bela, *Economic and ecological implication of Pakur Basalt Quarries,* Unpublished Research paper Department of Geography, University of Burdwan, 1993, p. 124.

জুড়ে অবস্থান করেছিল।তাছাড়া BENGAL MS RECORD এ হান্টারের লেখা থেকে ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানির সাথে বীরভূমের বানিজ্যিকরণের পরিষ্কার চিত্র লক্ষ করা যায়।[16] ১৯০১ সালে গভীর গর্ত খুড়তেই বীরভুমের অন্তর্গত রামপুরহাট ও নলহাটি থানার পশ্চিম সীমান্তে কয়েকটি খাদানের কথা জানা যায় যেখানে বৃহৎ পরিমানে রেললাইনের ব্যাসল্ট হিসাবে পাথর রপ্তানি করার কথা উঠে এসেছিল।[17] পাথর শিল্প উন্নয়নের প্রসঙ্গে বলা যায় রামপুরহাটে রেল বন্দোবস্ত এই শিল্পকে প্রসারিত করেছিল। স্থানীয় বাজারে প্রতিবন্ধকতা ও বিশ্ব বাজারে পৌনপুনিক দুর্যোগ একে একে বীরভূমের বিভিন্ন শিল্পে বিপর্যয় ডেকে এনেছিল। অতীতে পাথর উত্তোলন শিল্পের আকস্মিক উত্থান স্থানীয় অর্থনীতিতে ব্যাপক পরিবর্তনের ফলস্বরূপ, নতুন ধরনের স্বার্থ গোষ্ঠীর উদ্ভব, সামাজিক ওসাংস্কৃতিক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে একগুচ্ছ পরিবর্তন ঘটেছিল।সময়ের সাথে সাথে দ্রুত গতিতে শিল্পপুঁজির শক্ত নিগড়ে বাধা পড়েছিল সর্ব শ্রেণির মানুষ বিশেষ করে আদিবাসী শ্রমিক সম্প্রদায়।দীর্ঘদিন ধরে আদিবাসী কৃষকরাকয়লা খনিতেসমস্যায় পর্যুদস্ত হলে, কয়লা খনির বিকল্প হিসাবে রোজগারের পথ খুঁজতে থাকে,এবং বড় ভারী শিল্পের সাথে যোগ দেয়। মুনফা কেন্দ্রিক পাথর খাদানের খনিতে শ্রমিকের প্রয়োজন হয় ও চাহিদা বৃদ্ধি পেতে থাকে।[18] এই পর্যায়ে একটিশ্রেণিরসবাইকেবেকারকরেশ্রমেরযোগান হিসাবে আদিবাসী শ্রমিকের সংখ্যাবিপুলভাবে বৃদ্ধি পেয়েছিল। কৃষি থেকে নিম্ন বর্ণের উচ্ছেদ প্রধানত আদিবাসীদের খনি ও খাদান শিল্পের কাছাকাছি নিয়ে এসেছিল।[19]

---

16. Hunter.W. W, *The imperial Gazetteer of India*,Vol-1, Alpha Edition India, 20 January 2020, p. 133.

17. মন্ডল.অজিত(সম্পা.), *পশ্চিমবঙ্গ সংখ্যা*,ফেব্রুয়ারি ২০০৬, বীরভূম জেলা, পৃ. ৩৩

18.Robertson. P. M, *Report of the Survey and settlement operations,* Birbhum, (1909-1914), Calcutta, Bengal secretariat book depot, 1915, Pp. 20-25.

19.Bates. Crispin,*Race, Caste and Tribe in Central India: The early origins of Indian Anthropometry,* Centre for South Asian Studies, School of Social & Political Studies, Oxford University Press, 1995, Pp. 219-259.

স্বাধীনতা পরবর্তী যুগে বীরভূমের পাথর খাদান অর্থনীতিতে আদিবাসী শ্রমিক

ঔপনিবেশিক বীরভূম অর্থনীতির ইতিহাসে লোহা, কয়লা গুরুত্বপূর্ণ হলেও ঔপনিবেশিক পরবর্তী কালে পাথর খাদান অর্থনীতিতে আদিবাসী সম্প্রদায় পুনরায় সম্পৃক্ত হয়ে উঠেছিল। ঔপনিবেশিক পর্যায়ে যে খনিজ শিল্পের উদ্ভব হয়েছিল তার প্রসার ঔপনিবেশিক পরবর্তী যুগে বীরভূম ও ঝাড়খন্ডের ভিন্ন ভিন্ন স্থানের অর্থনৈতিক ইতিহাস থেকে বিস্তারিত জানা যায়।স্বাধীনতা পরবর্তী বীরভূমের অর্থনীতিকে কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য এই তিন ভাগে ভাগ করলেও এই বিশাল জেলার ভূপৃষ্ঠের দুই- তৃতীয়াংশের বেশি ছিল শিলাময় অঞ্চল। বীরভূমেরবিস্তৃতএলাকারভূগর্ভে লক্ষ করা যায় বাণিজ্যিক- অমূল্যকালোপাথরেরস্তর, কয়লা, লৌহআকর, চুনাপাথর, চায়নাক্লে, অল্পবিস্তরআরওঅনেকধরনেরসম্পদ।[20]পাথর খাদান তৈরির পশ্চাতে ইতিহাসটি ছিল বেশ সংগ্রামপূর্ণ। ১৯৫০ এর দশকের শেষের দিকে বারামোশিয়ায় দ্বিতীয় খুঁটি হিসেবে ব্যাসল্ট খনন শুরু হয়। রামপুরহাট ব্লক-১-এর অন্তর্গত বড়মোশিয়া ও নলহাটি এলাকায় পাথর উত্তোলনের তথ্য সম্পর্কে অবগত হওয়া যায়।[21] ১৯৫০ এর পর থেকে বীরভূমের নলহাটি, বাহাদুরপুর, রামপুরহাট, পাঁচামি, মল্লারপুর ও ঝাড়খণ্ডের দুমকা, পাকুড়, সাহেবগঞ্জ, বারহেট, দানাপুর এলাকায় প্রায় ১৭০০ এরও অধিক পাথর ভাঙ্গার মেশিনের অস্তিত্ব লক্ষ করা যায়। স্বাধীনতা পরবর্তী রামপুরহাট অঞ্চলে পাথর খাদান খনির প্রথম ব্যবসা শুরু করেন ১৯৫৮ সালে শ্রী শান্তি কুমার জৈন। রামপুরহাট অঞ্চলে তথা তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে খাদান ও ক্রাশারের অস্তিত্ব লক্ষ করা যায়। স্বাধীনতাপরবর্তীকালে বীরভূমের মহারাজাএসসিনন্দীর অনুমতিতে খননেরমধ্য দিয়েবাহাদুরপুরওলক্ষনপুরগ্রামেপাথরখাদানেরঅস্তিত্বেরসন্ধানপাওয়াযায়।বিহারেরমুঙ্গেরেগিরহিন্ডা নামকওসাঁওতালপরগণায়অলইন্ডিয়াস্টোন, পাকুড়ের মজুরকোলা, ঘোড়াপাহাড়ি, পাথরপাড়া, বাঘাজুলি (মালিকমঙ্গলহাসদা), মালপাহাড়ি, তালঝারি,

---

20. *Report of the List of mines other than coal mines worked under the Indians mines act*, Bengal and Bihar, 1951, P. 111-112.

21. *File of Land Transfer and alienation in Tribal economy,* Government of West Bengal, 1945, P. 35

বাকুড়িতেপাথরখাদানগড়েউঠেছিল।[22]বীরভূমের সিউড়ির অন্তর্গত মহম্মদ বাজার ও রামপুরহাট ব্লক -১ এবং বারামোশিয়ায় (রামপুরহাট ব্লক-১) ব্যাসল্ট খনন দেখা যায় প্রধানত স্বাধীনতার পর। এছাড়াও পাকুড়ের সংলগ্ন পাথরের বিস্তর খাদান রাজমহল পাহাড় এলাকায় লক্ষ করা যায়। পাকুড়ে পাথর ভূপৃষ্ঠের উপরে টিলার আকারে পাওয়া যায়। সেই একই পাথর পাওয়া যায় বারমোশিয়া, রামপুরহাট ব্লক-১ এবং নলহাটি ব্লক-১ এর নিচের দিকে। স্বাধীনতা পরবর্তীকালে দুবরাজপুর এবং ব্রক্রেশ্বরেও পাথরের খাদানের সন্ধান পাওয়া গিয়েছিল।পর্যবেক্ষিত এলাকায়, ১৯৬০ এর পূর্বে শুধুমাত্র দুটি ব্যাসল্ট খনন বিভাগ ছিল। বীরভূমে নতুন সম্পদ প্রক্রিয়ায় পাথর উত্তোলন শিল্পের প্রাধান্য ছিল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কলকাতা ও দক্ষিণবঙ্গের শহুরে চাহিদা মেটাতে, তৎকালীন সময়ে বীরভুম সংলগ্ন পাকুড় ছিল বিখ্যাত পাথর খাদান এলাকা। নির্মাণ কাজের জন্য পাকুড় নামক স্থানের পাথর এশিয়ার সবচেয়ে উৎকৃষ্ট মানের পাথর বলে গণ্য করা হয়েছিল। পাথর খাদানে দ্রুত বিনিয়োগ বৃদ্ধির জন্য, যৌথ মালিকানার ব্যবস্থাব্যক্তিগত মালিকানাধীনে পরিণত হয়। হিন্দু মালিক শ্রেণি বা পুঁজিপতি শ্রেণির পাথর ব্যবসায়ে আগ্রহ দেখা দিলে,বীরভূমে পুনরায় সন্ধান শুরু হয় পাথর খাদানের। ঔপনিবেশিক পর্যায় থেকে পরবর্তীকালে বীরভূমের তৎকালীন অর্থনৈতিক অবস্থা বিশেষ ভাবে লাভজনক হলেও তা মালিক শ্রেণির মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। আদিবাসী কৃষকরা পাথর শিল্পমালিকদের সাথে আবদ্ধ হয়ে পড়েছিল এবং পাথর খনিতে শ্রমশক্তি সরবরাহের সহায়ক হয়ে উঠেছিল।

স্বতন্ত্র খাদান মালিকদের উদ্যোগে অধিকাংশ খাদান তৈরি হলেও আদিবাসী শ্রমিকদের শ্রমের মধ্য দিয়ে খাদান মালিকদের মুনফা আদায়ের প্রক্রিয়া চলেছিল। ঔপনিবেশিক পরবর্তী কালে বেসরকারি উদ্যোগে বীরভুমের বিভিন্ন স্থানে পাথর খাদান ও ক্রাসার তৈরি হয়েছিল।পাথর খনির মালিক ছিল অসংখ্য হিন্দু, মুসলমান, মাড়োয়ারি সম্প্রদায়ের পুঁজিপতি মালিকরা।[23]বাঙালী ও বিহারিদেরবসতি স্থাপনের পর থেকেই ব্যবসার তাগিদে তারা তাদের

---

22. *List of Mines other than coal mines,*Delhi, Government of India, Delhi, 1921- 1950, P.98-113.

23.*Report on the Activities of the labour department,*Labour Vol-1, West Bengal, West Bengal Government, (January to April) 1948, P. 32

নগদ অর্থ নিয়ে, সহজ সুবিধা গ্রহণ করে পাথর উত্তোলন ও বিনিয়োগ করার কাজে যুক্ত হয়ে পড়েছিল।[24]তিনটি স্বতন্ত্র সামাজিক গঠনের মাধ্যমে পাথর উত্তোলন শিল্পের সাথে যুক্ত ছিল পুঁজিপতিগোষ্ঠীরা। এই ধরনের ব্যক্তিগত মালিকানাধীন খনির জন্য মূলধনের প্রয়োজন ছিল অপরিহার্য।

পাথর খনন কাজ এবং খাদান কেনার জন্য বিপুল পরিমাণ পুঁজির প্রয়োজন ছিল যা একমাত্র বড় বড় ব্যবসায়ীদের পক্ষে সম্ভব ছিল। বীরভূম সংলগ্নপাকুড় অঞ্চলে জমিদার তার সমস্ত দাপ্তরিক ক্ষমতা সহ পাথর শিল্প ও ব্যবসায় বিনিয়োগ করতে শুরু করেছিল। এই বিনিয়োগের মাধ্যমে ঘনিষ্ঠ বিকাশ ঘটায় জেলার বহির্ভাগে অন্যান্য ব্যবসায়ী, শিল্পপতি এবং মহাজনদের সাথে সংযোগ স্থাপন বৃদ্ধি পেয়েছিল। এই উৎপাদন প্রক্রিয়ার প্রথম ভাগে ছিল খাদান মালিক অর্থাৎ ব্যবসায়ী[25] যারা ছিল মূলত খাদানের একক প্রভাবশালী প্রতিনিধি। অন্যদিকে জমিদার শ্রেনির কথা উল্লেখ করা যায় যারা প্রায় দ্বৈত সুবিধা ভোগ করত। এই শ্রেণিবিন্যাসের মধ্যে শিক্ষিত এবং ধনী ব্যক্তিরা, যারা সাধারণত খাদান ও ক্রাশার অ্যাসোসিয়েশনের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই বিভাগের সাথে জড়িত মোট শ্রমশক্তির ৫% এরও কম।তৃতীয়ত হল আদিবাসী বা নিম্ন সম্প্রদায়ের শ্রমিক শ্রেণিযারাপাথর উত্তোলন শিল্পে কাজের অংশগ্রহণের ক্ষেত্রেও আদিবাসী সাঁওতাল শ্রমিকরা একেবারে প্রান্তিক উপাদান হিসাবে বিবেচিত হত।

বীরভূমের অর্থনীতিতে পাথর খাদান শিল্পের প্রতিষ্ঠার সাথে আদিবাসীদের সংযোগ দুটি পর্যায়ের মধ্যে লক্ষ করা যায়। জমিদারি অবলুপ্ত হতে থাকলে হিন্দু পুঁজিপতিদের ব্যক্তিগত মুনফা সঞ্চয়ের উদ্যোগে পাথর খনন ও উত্তোলন প্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছিল। ব্যাসল্ট পাথর উত্তোলন সাধারণত তিন ধরনের জমি থেকে নির্গত হত। পাথর খনন ও উত্তোলনের জন্যও প্রয়োজন হয়েছিল সর্বাগ্রে ব্যাসল্টের বিশাল আমানত সহ সস্তা জমি, দ্বিতীয়ত নিষ্পেষণ স্থান এবং তৃতীয়ত, ব্যবসা করার জন্য বিভিন্ন আকারের পাথরের উৎসস্থান।পাথর ব্যবসায়ে মুনফা

---

24. Das. Bela,*Economic and ecological implication of Pakur Basalt Quarries,* unpublished Research paper, Department of Geography, The University of Burdwan, 1993, P. 128-135.

25. তদেব।পৃ.১৪৪

উৎপাদনের অধির আগ্রহে হিন্দু মালিক শ্রেণি ঔপনিবেশিক শক্তিদের সাথে জোটবদ্ধ হয়ে পাথুরে মালভূমির অংশগুলি কেটে কেটে পাথর খাদান তৈরি করা শুরু করেছিল। টিলা সহ জমি খননের জন্য প্রয়োজন হয়েছিল আদিবাসী শ্রমিকদের। এই জমিগুলিতে খাদান ও ক্রাসার করার জন্য কিছু নিয়ম পূর্ব নির্ধারিত ছিল। বর্জ্য জমি থেকে বালি, বড় পাথর নির্গত হলে সেই জমি থেকে যথেষ্ট পরিমাণ ইজারা সরকার সংগ্রহ করত। খনির ইজারাগুলির জন্য স্থানীয় সরকার কর্তৃক লাইসেন্সের অনুমতি নেওয়া হত। খনির প্রস্পেক্টিং লাইসেন্সের জন্য বিশেষ কিছু নিয়ম ছিল। ১৯০১ সালের খনি আইন দ্বারা এই নিয়ম কার্যকরী হয়েছিল। চুনাপাথর ও পাথর উত্তোলনের জন্য জমি ইজারা নেওয়ার অনেক নিয়ম ছিল। কোন স্থান থেকে উত্তোলন হচ্ছে বা কোথায় সংগ্রহ করা তা খতিয়ে দেখা হত কারন সেই পরিমানে ইজারা ধার্য করার নিয়ম ছিল।[26] বর্জ্য জমি শুধু যে খনিজ শিল্পের জন্য নেওয়া হত তা নয় অনেক সময় প্রশাসনের কাজে ব্যবহৃত হত। খনির জন্য জমির দাবীস্বত্ব করা হয় বিশ বছরেরও বেশি সময় ধরে ও শ্রমের অধিকারের উপর ভিত্তি করে। জমির আসল মালিকেরা সরকারী নথি ছাড়াই সার্বজনীন ভাবে ভাড়াটে হিসাবে বিবেচিত হতেন।[27] সেই জমির উপর খাদান মালিকের আধিপত্য লক্ষ করা যেতপাথর খাদান তৈরির জন্য। পাথর খাদানগুলি বেসরকারি ও বেআইনি ভাবে তৈরি হত কারন, পাথর খাদান তৈরি বা জমি অধিগ্রহণের জন্য Project report, Mining plan, Approved commerece and industries department থেকে প্রাপ্ত রিপোর্ট, Document of capital investment, site map, Documentes constant to established and constant to oparate[28] এই সব তথ্যের প্রয়োজন হত যা মালিককে খাদান বা ক্রাসার প্রতিষ্ঠার পূর্বে অনুমতি নেওয়ার নিয়ম ছিল। এই সমস্ত সরকারি নথি ছাড়াই অধিকাংশ পাথর খাদান মালিকরা বীরভূমের মালভূমির প্রান্তে খাদান ও ক্রাসার গড়ে তুলেছিল। জমি ইজারা নেওয়ার প্রসঙ্গে একটা তথ্য উল্লেখ করাপ্রয়োজন ছিল যে, ঔপনিবেশিক পর্যায়ে

26.*The Bihar and Orissa Waste Lands Manual (1926),*Bihar, Published under the authority of the Board of Revenue Bihar and Orissa, 1918, Pp. 11-25.

27. Robertson. P. M, *Report of the Survey and settlement operations,* Birbhum, (1909-1914), Calcutta, Bengal secretariat book depot, 1915, Pp. 32-37.

28. List of mines and Mining Leases (other than Coal), Nagpur,Director Indian Bureau of Mines, 1960, P. 15-25.

শুধুমাত্রও যারা ব্রিটিশ হবেন বা ব্রিটিশ ফার্মে চাকরি করবেন তাকেই শুধুমাত্রও খনির লিজ বা লাইসেন্স দেওয়ার নিয়ম ছিল। খাদান প্রতিষ্ঠার লাইসেন্স দেওয়ার নিয়ম ছিল আইনি প্রতিনিধিদের বিচার করার মাধ্যমে।যদিও স্লেট, বিল্ডিং পাথর, চুনাপাথরের মত গৌণ খনিজের ক্ষেত্রে একই নিয়ম প্রযোজ্য ছিল না। স্থানীয় সরকার নির্ধারণ করতে পারে এর জন্য পৃথক নিয়ম বরাদ্দ ছিল। অনাবাদি জমি ও অসংরক্ষিত জমিগুলি সরকারের নামে বা সরকারের সম্পত্তি বলে গণ্য হয়েছিল। স্থানীয় সরকারের অনুমোদন ছাড়া কোন রকম খনি ও খাদান তৈরিতে লাইসেন্স দেওয়ার নিয়ম ছিল না।[29]সেক্ষেত্রে খনি ক্ষেত্রের লাইসেন্স তৈরিতে আবেদনকারীর পেশা, নাম, বাসস্থান উল্লেখ করা প্রয়োজনীয় ছিল। খাদান তৈরির প্রতিটি আবেদনকারিকে লাইসেন্স করার আগে নিরাপত্তা বাবদ কিছু অর্থ জমা দেওয়ার নিয়ম ছিল। এই নিয়মের আওতায় থাকলেও এক প্রকার পাথর খাদানগুলি বেআইনি বলে গণ্য হত না।[30]এতদ নিয়ামাবলি থাকা স্বত্বেওতৎকালীন সময়ে পাথর খনি ও খাদানগুলি, মালিকেরা কোনো নিয়ম মান্য না করে অসংগঠিত পদ্ধতিতে তৈরি হয়েছিল।[31]

দ্বিতীয়ত পাথর খাদান তৈরিতে জমি অধিগ্রহণ ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ। অধিকাংশ পাথর খাদান আদিবাসী গোষ্ঠীর জমির উপর তৈরি হয়েছিল।পাথর খাদানগুলি ব্যক্তিগত ভাবে গড়ে উঠতে থাকলে আদিবাসী এলাকায় কৃষি জমির সাথে বিচ্ছিন্নতা তৈরি হয়েছিল। এই অঞ্চলগুলিতে আদিবাসীদের সাথে জমির বিচ্ছিন্নতা শুধুমাত্রও ব্যক্তিগত সম্পত্তির আধারে তৈরি হয়েছিল।

---

29. List of Mines other than Coal mines worked under the Mines act, 1952 in India, Calcutta, Government of Indian Press, 1956, P. 5-7.

30. *Small scale Industries Organization report for 1957-58/ 1958-59/ 1960-61,* Development commissioner Ministry of commerce and industry, New Delhi, Government of India.

31. এই ক্ষেত্রগুলিকে অসংগঠিত বলার কারন হল যে, এই ক্ষেত্রে কোন রকম নিয়ম পালন করা হত না। অর্থাৎ শ্রমিকদের শ্রম সম্পর্কিত কোন নিয়ম নীতি ছিল না। অবৈধ ভাবে জমির পাশাপাশি অবৈধ শ্রম উৎপাদনকে খাদান মালিকেরা উৎসাহ জুগিয়েছিল। তারা তাদের মুনফা আদায়ের জন্য আদিবাসী শ্রমকে হাতিয়ার করেছিল ভারী শ্রম সাধ্য কাজের জন্য।

বৃহৎ জমির মালিক, ব্যবসায়ী এবং ক্রাশার মালিকদের নতুন সংঘের দ্বারা আদিবাসীদের সাথে স্থানীয় ও ক্ষণস্থায়ী সৌহার্দ্য বেশিদিন টিকিয়ে রাখা সম্ভব হয়নি কেননা[32] আদিবাসীরা যে জমিতে বসতি গড়ে তুলেছিল সেই জমিগুলি জবরদস্তি মূলক ভাবে গোমস্তা, উপবৃত্তিদাতা, মাড়োয়ারি ব্যবসায়ী এবং ধনী মুসলিম ব্যবসায়ীরা গ্রহণ করেছিল।পাথর খাদান অর্থনীতির মধ্য দিয়ে সমাযে পরিলক্ষিত হয়েছিল একটি পুঁজিপতি শ্রেণির উত্থান যেখানে যুক্ত ছিলবাঙালী ভিন্ন অন্যান্য পুঁজিপতি শ্রেণি।অ- হস্তান্তরযোগ্য আদিবাসী সাঁওতালদের জমিতে খনন কার্যক্রমের ফলে অমূল্য কালো পাথরের স্তর লক্ষ করা গেলে, জমি দখলের প্রয়োজনে স্থানীয় আদিবাসী বাসিন্দাদের উপর আর্থ-সামাজিক শোষণ লক্ষ করা যায়। পাথর খাদান প্রতিষ্ঠায়জমি আদায়ের জন্য সাঁওতাল মহিলাদের উপর শারীরিক অত্যাচার করতে কোম্পানি ও হিন্দু জমিদাররা দ্বিধাবোধ করত না। আদিবাসীরা তাদের জমি,খাদানের জন্য দিতে অস্বীকার করলে ভয় দেখিয়েও সেই জমি অধিগ্রহণ করার কথা উল্লেখিত হয়েছিল।[33] একইভাবে পাথর খাদানের জন্য জমি দখল বীরভুম সংলগ্ন অন্যান্য এলাকায় লক্ষ করা যায়। মাটির মালিকরা পাথর অপসরণ করে জমির অবস্থার উন্নতি ঘটাবেন এই রকম মিথ্যা অজুহাতের মধ্য দিয়ে জমির মালিকের থেকে জমি হস্তান্তরিত করে নেওয়া হয়েছিল। কার্যকর পরিমাণ পাথর উত্তোলনের পরে জমিগুলি বর্জ্য পদার্থের ঢিবির মতধ্বংসপ্রাপ্ত একটি জমিতে পরিণত হয়েছিল। মালিকশ্রেণি ও অন্যদিকে আদিবাসীদের মধ্যে জমির ইজারা নিয়ে যারা চুক্তিগুলি সম্পাদিত করেছিল তারা আদিবাসীদের নিরক্ষরতার সুযোগ নিয়ে জমির দাম ও মূল্যে হেরফের করেছিল। বীরভুমে পাথরের ক্রাসারের সংখ্যা দ্রুত হারে বৃদ্ধি পেতে থাকার ফলে কয়লা খনির মত আদিবাসীদের জমিগুলি জোরপূর্বক পাথর খাদান মালিকরা গ্রহণ করেছিল স্বল্প মূল্যের বিনিময়ে।[34]আদিবাসী সাঁওতালদের গ্রাম এবং পুনরোদ্ধার করা জমির উপর একে একে তৈরি

32. Malley. L.S.S.O, *Bengal District Gazetteers Birbhum,* Calcutta, Bengal Secretariat Book Depot, 1996, P. 76-78.

33. Das. A, B Adhikary, Black stone Qurrying- A Resource process to be examined, Viswa Bharati press, Wesr Bengal, 2001, Pp. 35-47.

34. Final Report on the Survey and Settlement of the Santali Villages of Rampurhat and several other villages in the Rampurhat and Suri subdivisions, 1935,Calcutta, Bengal secretariat Book Depot, 1915, P. 7-14.

হয়েছিল পাথরের খাদান।[35] এই পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে ছোটনাগপুরের অঞ্চলগুলিতে খনি শিল্প গঠনে আদিবাসীদের স্বার্থ রক্ষা বন্ধ করে পাথর খাদানের মালিকরা আর্থিক দিক থেকে মুনফা উৎপাদনে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি করার চেষ্টা করেছিল। স্বাধীনতা পরবর্তীকালে ছোটনাগপুর মালভূমির অভ্যন্তরে রাজ্য গুলিতে আর্থিক সংকট আদিবাসীদের জীবনকে অতিস্ট করে তুলেছিল বলে তৎকালীন পত্রিকাগুলিতে উল্লেখিত হয়েছিল।[36] আদিবাসীদের নিজস্ব জমি একের পর এক হিন্দু পুঁজিপতি বা মালিকদের হাতে করায়ত্ত হতে থাকলে আদিবাসী ও হিন্দু জমিদারদের মধ্যে সম্পর্ক তিক্ততায় পৌছায়। এই তিক্ততা বৃদ্ধি পেলে সরকার ১৯৫০ সালে সরকার, আদিবাসীদের থেকে হিন্দুদের অবাধ জমি ক্রয় বন্ধ করে দেওয়ার বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছিল। এটি একটি নিছক কাঠামোবাদী আইন ছিল না, বরং দ্বন্দ্বে পূর্ণ বিদ্যমান আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার সাথে সম্পর্কিত একটি মুনফা উৎপাদনের পদ্ধতি ছিল।

পাথর খাদান অর্থনীতি ও আদিবাসী শ্রমিক

১৯৫৬ সাল থেকে জমিদারি প্রথা বিলুপ্তির সাথে সাথে বীরভূমের অর্থনীতি একটি নতুন উচ্চতায় পৌঁছেছিল। কয়লা, লোহা আকরিক বা অন্যান্য মূল্যবান সম্পদ আহরণের ক্ষেত্রগুলির মতো বৃহৎ শহরের উন্নয়নে পাথর খাদানের ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ। বীরভুম অঞ্চলে ক্রাশার ও খাদানকে কেন্দ্র করে জেলার অর্থনীতির বিকাশ হয়েছিল ঠিকই কিন্তু পাথর খাদানগুলি আদিবাসীদের জীবনকে বিঘ্নিত করেছিল ঠিকই। এ প্রসঙ্গে বলা ভালো পুঁজি যে সর্বদাই আদিবাসী জনজাতির উপর আধিপত্যবাদের একটি কাঠামো তৈরি করে,তাঁদের অর্থনীতিকে পরিবর্তিত করেছিল। তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ ছিল খনি ও খাদান অর্থনীতি।বীরভূম জেলার অর্থনীতি অগ্রসর হলেও জেলার আদিবাসী শ্রমিকদের অর্থনীতি ক্রমশ ক্ষতিগ্রস্থ হতে শুরু করেছিল। তিন দশকের আদমশুমারি প্রতিবেদন থেকে জানা যায় যে, আদিবাসীদের শ্রমিকদের চারটি শ্রেণিতে কৃষি, গৃহস্থালি, শিল্প ও অন্যান্য শ্রমিক হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছিল।[37]স্বাধীনতা

35.Basu.R. P(Ed), P. Saha, *Social area analysis of urban slum dwellers a case study of Rampurhat town,* Birbhum district, IASSI QUART 26, Pp. 79-95.

36.*বীরভুম বার্তা,* সাপ্তাহিক পত্রিকা, সংখ্যা- স্পেশাল, সিউড়ি বীরভূম,বর্ষ- ১৯৫৪।

37. Talib.Mohammad, *Writing labour Stone quarry workers in Delhi,* Oxford University Press, 2010, Pp. 24-27.

পরবর্তী পর্যায়ে ছোটনাগপুর মালভূমি অঞ্চলে অসংগঠিত পাথরের খনি ও খাদানে আদিবাসীদের শ্রম বিশ্লেষণ ছিল গুরুত্বপূর্ণ।এই অর্থনীতির মধ্যে পাথর খাদান শ্রমিকদের ভূমিকা ছিল বেশ গুরুত্বপূর্ণ। কালো পাথরের খাত বা খাদানের কাজে স্থানীয় পল্লী অঞ্চলের হাজার হাজার স্থানীয় উপজাতি সাঁওতাল শ্রমিকরা ঔপনিবেশিক পর্যায় থেকেই এই কাজে যুক্ত হয়ে পড়েছিল। বীরভূমের আদিবাসী জনজাতির মধ্যে ১২.৯০ শতাংশই বীরভূমের শহরে পাথর শিল্প উৎপাদনে যুক্ত ছিল।

দিলিপসিমনতারলেখায়ঔপনিবেশিকভারতবর্ষেঝরিয়াকয়লাখনিশ্রমিকদেরনিয়েআলোচনাক রতে গিয়েমূলততাদেরজীবনকাহিনীওকঠোরসংগ্রামের মধ্য দিয়ে শ্রমিক ও পুঁজির মধ্যে আন্তঃ সম্পর্ককে নির্মাণ করেছিলেন। সেই একই সম্পর্ক পাথর খাদান শ্রমিক ও দেশীয় পুঁজিপতিদের মধ্যে লক্ষ করা যায়। তিনিস্বীকারকরেনযে, “Capitalism is less active than acted upon by existing forms of social stratification, quoted in Cain and Hopkins”, and also capitalism is one kind relationship that adapts toexisting form of Society”।[38]খনি শ্রমিকদেরবাদদিয়েরেলওয়েওবড়বড় খনিকারখানাএকেবারে অচল ছিল ঠিক তেমনই পাথর খাদান শ্রমিকদের বাদ দিলে উন্নত ইমারত গঠিত সভ্যতাও স্তব্ধ হয়ে যেত।

মার্কসের মতে, খনির মত নতুন ধরনের সংস্থান প্রক্রিয়ায়, উৎপাদন সম্পর্ক পরিবর্তিত হয়েছিল বন্টন মূলধন বিনিয়োগের উপর ভিত্তি করে। সমাজে লাভ- ক্ষতি বন্টনের পদ্ধতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে বিভিন্ন ধরনের স্বার্থ গোষ্ঠীর উদ্ভব হয়েছিল। মুনফা উৎসের ভিত্তিতে সমাজে তিনটি শ্রেণি দেখা যায়।[39]এরা মূলত সম্পদ প্রক্রিয়া থেকে সর্বাধিক সুবিধা অর্জনকারী সবচেয়ে শক্তিশালী দল ছিল। এই প্রসঙ্গে ড. ভীম রাও আম্বেদকর বলেছেন—

---

38. Simeon.Dilip, *Work and Resistance in the Jharia coalfield,* Vol-33, issue-1-2, first published February 1999, Pp. 43-47.

39.লিয়নটিয়েভ.এ, *মারক্সীয় অর্থনীতি,*কলকাতা, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি, দ্বিতীয় পরিমার্জিত মুদ্রন, ১৯৭৯ পৃ.৭৫-৮০

'The caste is not merely the 'division of Labour' but 'division of Labourers' based upon the graded inequality.'[40]

অর্থৎ জাত বর্ণের বিভাজন কেবল শ্রম বিভাজন নয় বরং সেটা অসাম্যের উপর ভিত্তি করে ক্রমানুসারে শ্রমের বিভাজন হয়েছিল।

মহম্মদ তালিব মহারাষ্ট্রের পাথর খনন শ্রমিকদের নিয়ে বিস্তর আলোচনা করেছেন। তিনি পাথর খাদান কর্মক্ষেত্রে, শ্রমিকদের স্বাধীনতা হীনতার এই অনুভূতি ব্যবহারিক মূল্যের ন্যায় পরিমাপ হত তা তিনি স্বীকার করেছিলেন। অর্থ ব্যতীত আদিবাসী শ্রমিকদের গ্রামে নিয়মিত যাওয়া, ধর্মীয় ও প্রথাগত পারিবারিক বাধ্যবাধকতাগুলি সম্পাদন করা, নির্ভরশীল শিশু এবং বৃদ্ধ পিতামাতার চাহিদা পূরণ করা, গৃহস্থালির সাহায্য প্রদান এবং সহায়ক পেশা নৈমিত্তিক মজুরী কাজের মাধ্যমে পারিবারিক আয়ের পরিপূরক হওয়া সম্ভব ছিল না।[41] অধিকাংশ আদিবাসী শ্রমিক যে পাথর খাদান অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বাধ্য হয়ে এক প্রকার অংশগ্রহণ করেছিল তা তিনি উল্লেখ করেছেন। জ্যান ব্রেম্যানের মতে, এই বিশ্বে কর্মরত জনসংখ্যার ৭৫% কাজে যুক্ত হয়েছিল অসংগঠিত অর্থনৈতিক ক্ষেত্রের উপর।

বেলা দাসের বক্তব্যের মধ্যে বীরভূমের পাথর উত্তোলন শিল্পের প্রভাবের প্রকৃতি এবং মাত্রা নিয়ে আলোচনা করেছিলেন। পুঁজিবাদী উৎপাদনে নতুন সংযোজন এবং পুঁজিবাদী উৎপাদন সম্পর্কের নতুন স্থানীয় রুপের উত্থান ছিল অর্থনৈতিক পুনর্ঘটনের মূল উপাদান।[42]যদিও তাঁর সামাজিক প্রভাব প্রতিফলিত হয়েছিলকর্মক্ষেত্রের চুক্তিভিত্তিক শ্রমে। গ্রামীণ জনগণের জীবনে এবং অর্থনীতিতে খননের গুরুত্ব ছিল ইতিবাচক মন্তব্য তুলে ধরেন

---

40. Jaffrelot. Christophe, Dr. Ambedkar and Untouchability: analysing and fighting Caste, London, Hurst & Company,2005, P. 38-42.

41. Talib.Mohammad, *Writing labour Stone quarry workers in Delhi,* Oxford University Press, 2010, P. 61.

42. Das. Bela, *Economic and ecological implication of Pakur Basalt Quarries,* unpublished Research paper, Department of Geography, University of Burdwan, 1993, P. 267-275.

অভিজিৎ দাস।[43] কয়লার মত বড় খনি ভিন্ন পাথর উত্তোলন এবং নিষ্পেষণ কর্মসংস্থানকে আদিবাসীদের উপার্জনের একটি বিকল্প উৎস তৈরি হয়েছিল বলে তিনি স্বীকার করেন।দারিদ্র্য বা অপর্যাপ্ত আয়, কৃষি উন্নয়নের অভাব, দুর্বল কৃষি উৎপাদনশীলতা, বিকল্প অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের অনুপস্থিতি, অশিক্ষা এবং বেকারত্ব এমন কিছু সহায়ক ছিল যা স্থানীয় আদিবাসী শ্রমিকদেরকে এই হস্তচালিত বিভাগে নিয়োজিত করতে বাধ্য করেছিল দৈনিক স্বল্প বেতনে।

কৃষির ক্ষেত্র থেকেই ঔপনিবেশিক বীরভূমে আদিবাসীদের প্রতি অবহেলা লক্ষ্য করা যায়[44] বলে শমিত কর স্বীকার করে নেন।আদিবাসী শ্রমিকদের শ্রম ব্যবহারে কোনো নিয়ম নীতি পালন করা হত না বলেই, গ্রামীণ আদিবাসী শ্রমিকরা স্বরাজ্য বা ভিন রাজ্যে অন্য পেশার সাথে যুক্ত হওয়ার কথা ভাবত না।পাথর খাদান অর্থনীতির সাথে আদিবাসী শ্রম জড়িয়ে ছিল শ্রেণি চেতনার ভিত্তিতে।[45] এই অর্থনীতি ক্ষেত্রে যোগদানের জন্য জীবন ও জীবিকা পুনর্বাসনের অপ্রতুল ব্যবস্থা সাঁওতাল মহিলা, পুরুষ ও শিশুদের ছেড়ে যেতে বাধ্য করেছিলএবং কালো পাথরের খাত বা খাদানের কাজে স্থানীয় পল্লী অঞ্চলের হাজার হাজার স্থানীয় আদিবাসী সাঁওতাল সম্প্রদায়রা এই কাজে যুক্ত হয়ে পড়েছিল।

পাথর উত্তোলনের পুরো ক্রিয়াকলাপটিকে মূলত দুটি ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথমত যে জমি বা স্থান থেকে বড় ব্যাসল্ট পাথরগুলিকে ব্লাস্টিং এর মাধ্যমে উত্তোলন করা হত সেটি খাদান বলে পরিচিত।এই পর্যায়ে বড় পাথরের বিস্ফোরণ করা হত। দ্বিতীয়ত খাদান থেকে তুলে নিয়ে আসা বড় ব্যাসাল্ট পাথরগুলিকে বিভিন্ন আকারে কাটার ও ভাঙার জন্য বড় বড় যন্ত্রপাতির প্রয়োজন হয় তাকে ক্রাসার বলা হয়। আসলে পাথর ক্রাসিং বা কাটার জন্য এই ক্ষেত্রটি ক্রাসার নামে পরিচিত ছিল। পাথর খাদানের দুটি ক্ষেত্রই জমির বৃহৎ অংশ জুড়ে অবস্থিত ছিল। এই বৃহৎ ক্ষেত্র গুলিতে বড় ব্যাসল্ট গুলি উত্তোলন থেকে বিভিন্ন আকারে কাটার

43. Mondal. Priyabrata, suvankar Paul and Abhijit Das,*Impacts of stone crushing work on the Tribal Labourers of Birbhum District, West Bengal- A Socio- cultural Anthropological study,*Journal of Humanities and Social Science vol- 27, Issue-2, series 5 (February 2022).

44.কর. শমিত কুমার,*'সিলিকোসিস মৃত্যুর ঢল',*চার নং প্ল্যাটফর্ম একটি ব্যাতিক্রমী ওয়েব পত্র, ২০০৪।

45.গোকুলমন্ডল (৬৫), পাথরখাদানওক্রাসারমালিক,নলহাটি,(স্বাক্ষাৎকার১২/০৫/২০১৮, দুপুর২:৩০)

পদ্ধতির জন্য শ্রমিক শ্রেণির চাহিদা ছিল অমূল্য।[46]বড়মোশিয়া বা পাকুড়ে খাদান বিস্ফোরক বিভাগের সংখ্যা বেশি ছিল তাই এখানে আদিবাসী শ্রমিকদের প্রয়োজন এই চাহিদা পূর্ণ করেছিল। রামপুরহাট ব্লক- ১ এর বারামোসিয়া ক্লাস্টারের জন্য খাদান মালিক এবং ক্রাশার বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই মালিকরা ছিল ভিন্ন ব্যক্তি। একজন খাদান মালিকের একাধিক ক্রাসার বা খাদান থাকার চিত্র ও তথ্য পাওয়া যায় যা ছিল বেআইনি।কিছু পাথর খাদান কোম্পানির নামের সাথে তৎকালীন সরকারী রিপোর্টে কোম্পানি গুলির নামের সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায় না। অনুমান করা যেতে পারে সেই ফ্যাক্টারিগুলির অস্তিত্ব মানব অধিকার কমিশনে থাকা রিপোর্টের তথ্যে উল্লেখ ছিল না[47] অর্থাৎ প্রথম থেকেই পাথর খাদান খনি গুলি বেআইনি ভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফলাফল এইরুপ ছিল।[48]খাদান ও ক্রাশারের অর্থাৎ এই দুই বিভাগের মধ্যে কার্যকলাপ ছিল একে অপরের সাথে সম্পর্কিত।

অনিয়ন্ত্রিত ভাবে তৈরি হওয়া পাথর খাদান শিল্প ছিল বীরভূমের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ শিল্প খাত। পাথর খাদান শিল্প ছিল এমন একটি শিল্প যেখানে কয়লা খনির মত অবাধ শ্রমিক ও শ্রমের প্রয়োজন ছিল অধিক পরিমানে।এ প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজনীয় যে, পাথর খাদান ক্ষেত্র গুলিতে আদিবাসী সাঁওতাল, মুণ্ডা,কোল ভিন্ন অন্যান্য হিন্দু সম্প্রদায়ের দারিদ্র্য, আর্থিক এবং সামাজিক ভাবে পিছিয়ে পড়া শ্রেণির মানুষ এই কাজে যুক্ত ছিল।[49]এই কাজের সাথে যুক্ত বীরভূম জেলায় প্রায় এগারোটি বিভিন্ন ধরণের তফসিলি উপজাতির কথা জানা যায়। বীরভূমের আদিবাসী জনগোষ্ঠীর মধ্যে শ্রমের অংশগ্রহণ অধিক প্রকট হয়ে উঠেছিল।আদিবাসী অথচ এমন মানুষ যে এই কাজের সাথে যুক্ত ছিল না, সে কথা নিশ্চিত করে বলা যায় না।[50]এই দলের

46.Das. A, B Adhikary, Black stone Quarrying- A Resource process to be examined, Viswa Bharati Press, West Bengal, 2001, P. 25-36.

47. ছোট খনি পরিদর্শনকারী ও রাজ্য প্রদুশন নিয়ন্ত্রন পর্ষদ এবং জেলা প্রশাসনের বিশেষ করে জেলার ডি এম যিনি ফ্যাক্টারির ১৯৪৮ এর নিয়ম অনুযায়ী কারখানার পরিদর্শকদের দেওয়া তথ্য থেকে জানা যায়।

48.*The West Bengal Mining settlement,* (Health and Welfare bill, 1964), published by the report of joint committee, 30th July 1964, P. 125-130.

49. Ray. B,*Census 1961 West Bengal (Birbhum),*Calcutta, Published by the superintendent, 1966, P. 149.

50.*তদেব*পৃ.১৪৯.

মধ্যে মুসলিম সম্প্রদায়ের শ্রমিকদেরও লক্ষ করা যায়।ভিন রাজ্যের পরিযায়ী শ্রমিকদের প্রলভন দেখিয়ে এই খনিগুলিতে শ্রম প্রয়োগের জন্য ব্যবহার করা হয়েছিল। বিভিন্ন সরবরাহকারী মারফৎ ঐ খনিগুলিতে বিহারের মুঙ্গের, পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়া ও ঝাড়খণ্ড থেকে পাথরের সরবরাহ করা হত। কারখানার শ্রমিকদের দেওয়া তথ্য থেকে জানা যায় যে, মুর্শিদাবাদের কিছু মুসলমান পরিবারের ১৪-১৭ বছর ছেলেরা, দালাল মারফৎ এক বা দুই বছরের চুক্তিতে বীরভূমের সিউড়ি শহরের পাথর খাদান এলাকা গুলিতে একচেটিয়া ভাবে কাজ করত।[51]খননের মোট শ্রমশক্তির মধ্যে ৬১.৫০ শতাংশ আদিবাসী সম্প্রদায় থেকে এসেছিল এবং বাকি অংশ অন্যান্য সম্প্রদায়ের অন্তর্গত ছিল।[52] বিভিন্ন সামাজিক বৈশিষ্ট্য শ্রমিকদের দুর্দশার প্রত্যক্ষ কারন হিসাবে খাদান শ্রমিকদের দ্বারা উত্থাপিত হয়েছিল। এখানকার শ্রমিকদের দরিদ্র্য পরিবারে জন্ম হওয়া খনি খাতে অংশগ্রহণের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য ছিল। বেশিরভাগ খাদান শ্রমিকদের কথায় উঠে এসেছিল যে, তাদের গরীব পরিবারে জন্ম ও দুর্বল অর্থনীতির কারণে এই পেশার সাথে যুক্ত হতে হয়েছিল।[53] আদিবাসীরা নিচু জাতের হওয়ার জন্য খাদানের মত অসংগঠিত স্থানে কাজ করতে বাধ্য ছিল। খননকারী শ্রমিকদের তাদের পেশা থেকে বেরিয়ে আসার সম্ভবনা ছিল নাকারণ, তারা একাধারে ছিল সংখ্যালঘু ও অন্যদিকে নিচু সম্প্রদায়ের জন্য সমাজে অবহেলিত।অন্যান্য শিল্প শ্রমিকদের তুলনায় আর্থ- সামাজিকভাবে পশ্চাদপদ ছিল কারন অধিকাংশ শ্রমিকই ছিল অশিক্ষিত।[54]মহম্মদ তালিবের অনুসন্ধান ও তদন্ত কমিটির

51.কর.শমিত কুমার,*'সিলিকোসিস মৃত্যুর ঢল'*,চার নং প্ল্যাটফর্ম একটি ব্যাতিক্রমী ওয়েব পত্র, ২০০৪।

52. Ray. B,*Census 1961 West Bengal (Birbhum),*Calcutta, Government of India, 1966, P. 151-153.

53.সাক্ষাৎকার: টুডু. বুধু, সময় দুপুর ২:৩০, ২০১৯, সিউড়ি। (পাথর খাদান শ্রমিক)।

54.১৯৫১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী বীরভূম জেলার আদিবাসীদের সাক্ষরতার হার ছিল মাত্র ৩.৪০ শতাংশ। সাঁওতালদের বসতি প্রধানত সদর মহকুমার বোলপুর, মহম্মদ বাজার থানা এবং রামপুরহাট মহকুমার রামপুরহাট থানায় লক্ষ্য করা হয়। বোলপুর থানায় সাঁওতালদের সংখ্যা ১৭.৭৩ শতাংশ, রামপুরহাটে ১৪.০৬ শতাংশ এবং মহম্মদ বাজার থানায় জেলার মোট সংখ্যার ১৩.৩১ শতাংশ। এই জেলার প্রায় দশ ভাগ আদিবাসী সাঁওতাল সাঁইথিয়া থানায় অধিক পরিমানে লক্ষ্য করা গিয়েছিল। গ্রাম থেকে মফস্বলের ক্ষেত্রে সাক্ষরতা আরও কিছুটা প্রসার হয়েছিল মোট আদিবাসী জনসংখ্যার এক হাজারের মধ্যে ৭০ জন ব্যাক্তি সাক্ষর ছিল। বীরভুমের মফস্বল অঞ্চলে বসবাসকারী পুরুষ জনসংখ্যার মধ্যে সাক্ষরতার শতাংশ পাওয়া গেছে ১২.০২%। এই জেলার লিঙ্গ অনুপাতে আদিবাসী মহিলাদের সংখ্যা পুরুষদের চেয়ে অধিক ছিল। জেলায় প্রতি

মাধ্যমে পাথর খাদান শিল্পে কর্ম সংস্থান ১৯৪৮-৪৯ সালের তুলনায় ১৯৫০ সালে বৃদ্ধি পেয়েছিল।খাদান শ্রমিকদের মধ্যে পাওনাদারদের সাথে শ্রমিকদের অসম ক্ষমতার সম্পর্ক সম্পূর্ণরূপে ঋণের অস্তিত্ব দ্বারা নির্মিত হয়েছিল।[55] একজন দেনাদার কর্তৃক প্রদত্ত সুদের হার সমগ্র বিষয়গুলির মধ্যে সবচেয়ে জটিল বিষয় ছিল। গ্রামের আদিবাসী শ্রমিকরা কোনো মহাজনের (পাওনাদার) কাছ থেকে ঋণ নিলে, ঋণ পরিশোধ না হওয়া পর্যন্ত ঋণগ্রহীতাদের সহজে ঋণের জাল থেকে বেরিয়ে আসা সম্ভব ছিল না। সেক্ষেত্রে সমস্ত ঋণগ্রস্ত আদিবাসী পরিবারগুলি তাদের এই জীবিকা পরিবারের প্রাথমিক পেশায় পরিনত হয়েছিল।প্রকৃতপক্ষে আর্থিক সঙ্কট এই দীর্ঘস্থায়ী ঋণের মাধ্যমে ঋণগ্রস্ত শ্রমিককে দুর্বলে পরিনত করে বিভিন্ন উপায়ে পাওনাদারের অধীনস্থ করে রেখেছিল। আদিবাসীরা বেশিরভাগই নিরক্ষর থাকার ফলে পাওনাদারদের কপটতা বোঝার মতো সামর্থ্য ছিল না। ঋণগ্রস্ততার অন্যান্য কারণগুলির মধ্যে ছিল দীর্ঘায়িত বেকারত্ব, উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত দায় এবং গুরুতর অসুস্থতা ইত্যাদি। এইভাবে আদিবাসী খনি শ্রমিকদের স্বাধীনতা ধীরে ধীরে হারিয়ে গিয়েছিল।[56]

এক হাজার পুরুষ আদিবাসী জনসংখ্যার মধ্যে ১০০১ জন মহিলাদের লক্ষ্য করা গিয়েছিল। বীরভূমের গ্রামাঞ্চলে লিঙ্গ অনুপাত ওরাওঁরা জেলার সবচেয়ে বেশি শিক্ষিত সম্প্রদায় বলে মনে হয়। জেলার গ্রামীণ এলাকায় বসবাসকারী ৮.৯১% ওরাওঁ নামক আদিবাসীরা শিক্ষিত ছিল। পুরুষ জনসংখ্যার মধ্যে সাক্ষরতার হার ছিল ১৮.৬৪। তাদের পরেই কোরাস অর্থাৎ গ্রামাঞ্চলে ৪.১৫ শতাংশ ছিল কোরা। সাঁওতাল জনসংখ্যার ৩.৩৩ শতাংশ।[54] তাদের পুরুষদের মধ্যে ৬.৩৬ শতাংশ গ্রামীণ এলাকায় সাক্ষর এবং ওরাওঁরা হল সবচেয়ে নিষ্ক্রিয় উপজাতির জেলা, যেখানে ওরাওঁ জনসংখ্যার ২৭.২৭ শতাংশ ৮.৮৫ শতাংশ কোরা শহরে শিক্ষিত তাদের পুরুষ জনসংখ্যার মধ্যে ১৪.১৭ শতাংশ প্রতি ৫.৯১ শতাংশ সাঁওতালদের মধ্যে জেলার যখন এলাকায় ব্যবহার করা হয়। তাদের মধ্যে পুরুষ জনসংখ্যার ১০ শতাংশ শিক্ষিত, আর এই হারে তাদের মহিলারা জেলার শহরাঞ্চলে ছিল ১.৫০ শতাংশ।

55. Talib.Mohammad,*Writing labour Stone quarry workers in Delhi,* Oxford University Press, 2010, P. 63.

56. *Report on an enquiry into the living conditions of workers employed in the Factories at Ranigunj- Asansol area,* Government of West Bengal Labour Directorate, IAS Labour Commissioner, 1955, File No.: G.P.339.42 (5415) W52rds.

১৯৫১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী বীরভূমের জনসংখ্যা ছিল ১৮,৪৪০।[57]সংখ্যাগতভাবে কোরাস এই জেলার দ্বিতীয় বৃহত্তম আদিবাসী এদের এক- চতুর্থাংশের বসবাস ছিল বোলপুর থানায়। অন্যদিকে রামপুরহাট মহকুমার ময়ুরেশ্বর এবং মুরারই থানার এক- অষ্টমাংশ এই আদিবাসীদের বসবাস লক্ষ করা গিয়েছিল। সাঁওতাল পরগণার ১৯৫১ সালের আদমশুমারির তথ্যের উপর ভিত্তি করে এলাকায় বিদ্যমান জীবিকা নির্বাহের ধরণ সন্ধান করার চেষ্টা করা হয়েছিল। এই আদমশুমারি অনুযায়ীআদিবাসী জনজাতির জীবিকা পদ্ধতির একটি বিশদ ক্ষুদ্র-স্তরের শ্রেণিবিভাগের মধ্যে আবদ্ধ ছিল। বীরভূমের আদিবাসীদের সাক্ষরতা এবং শিক্ষা অর্জনের ক্ষেত্রে খুব একটা উন্নত পরিসংখ্যান পাওয়া যায় না। এ মিত্রের মতে পশ্চিমবঙ্গের আদিবাসীদের ১৯৫১ সালে ঘটনাক্রমে 'হতাশাগ্রস্ত' এবং 'তফসিলি' উপজাতি নামে নামকরণ করা হয়েছিল।[58] খাদান শ্রমিকদের অধিকাংশই তফসিলি উপজাতির (যেমন সাঁওতাল, কুর্মি, হো, ওরাওঁ, মুণ্ডা ইত্যাদি) এবং তফসিলি জাতি (যেমন বাগদি, বাউরি ইত্যাদি) শ্রেণির পরিচয় পাওয়া যায়।[59]এই কাজের সাথে যুক্ত বীরভূম জেলায় প্রায় এগারোটি বিভিন্ন ধরণের আদিবাসীদের কথা জানা যায়।

বীরভূমের আদিবাসী জনগোষ্ঠীর মধ্যে খাদানে অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পেয়েছিল।পাথর উত্তোলন শিল্প ছিল একটি অত্যন্ত শ্রমঘন ও সস্তা শ্রমে পরিপূর্ণ। পাথর কাটা থেকে অপসারণ ও পাশাপাশি শ্রম সাধ্য কাজ যেমন অতিরিক্ত বোঝা, পাথর কাটা, ডাম্পার লোড করা এবং ক্র্যাশারের পরিবহনে আদিবাসী শ্রমিকের যোগদান ছিল গুরুত্বপূর্ণ। পাথর ভাঙ্গা, ট্রাকে পাথর ভর্তি ও খালি করা, ক্রাশার মেশিন পরিচালনা করা এবং পাথর কাটার পর অবশিষ্ট অংশ অপসরণ ইত্যাদির মতো কঠিন কাজকর্মে আদিবাসী শ্রমিকরা নিয়োজিতথাকত।সোলান দিয়ে গাড়ি ভর্তি করার পাশাপাশি পাথর মেশিনের মাধ্যমে বিভিন্ন আকারে ভেঙ্গে ফেলার কাজ করত

---

57. Mitra. A,*Census 1951 west Bengal (Birbhum),*Kolkata, printed by Sree Saraswati Press Ltd, 1954, P. 49-56

58. তদেব।পৃ. ৪৯-৫৬

59.Mondal. Priyabrata, suvankar Paul and Abhijit Das,*Impacts of stone crushing work on the Tribal Labourers of Birbhum District, West Bengal- A Socio- cultural Anthropological study,*Journal of Humanities and Social Science vol- 27, Issue-2, series 5 (february-2022), P. 11.

আদিবাসী শ্রমিকরা। পাথর খাদানে কর্মরত কর্মচারীরা চারটি বিভাগে বিস্তৃতভাবে বিভক্তছিল। প্রথম শ্রেণি হল খনন শ্রমিক, যারা শুধু পাথর খনন করে ও উত্তোলন করত বড় ধরনের পাথরগুলি। দ্বিতীয় বিভাগে ছিল পেষণকারী শ্রমিক, যারা যান্ত্রিক ক্রাসার সম্পর্কিত কাজে যুক্ত ছিল।তৃতীয় বিভাগে পরিবহন শ্রমিকদের লক্ষ করা গিয়েছিল। পরিবহন শ্রমিক অর্থাৎ পাথর খাদান গর্ভে ট্রাক ড্রাইভারের দায়িত্বে থাকা শ্রমিকরা এই বিভাগে অন্তর্ভুক্ত ছিল। অন্যদিকে চতুর্থবিভাগেপাথর দিয়ে ট্রাক লোড করার জন্য ভিন্ন ধরনের শ্রমিক ছিল যারা 'লোডার' নামে পরিচিত ছিল। ট্রাক ভর্তি ও খালি করার জন্য যে শ্রমিকদের প্রয়োজন হত, তারা একটি ভিন্ন শ্রেণির শ্রমিক ছিল।লোডিং অর্থাৎ ভর্তির লাইনগুলিএকটিবিভাগ দ্বারা নিয়ন্ত্রিতহত।লোডিংএর কাজে এক একটি ক্রাশারে৬০থেকে৭০জন আদিবাসীশ্রমিকনিযুক্তথাকত।একজনকর্মীদ্বারাএকটিগাড়িলোডকরতেপ্রায়আধঘন্টাকরেসময়লাগত ।এক একটি গাড়ি মালবাহী পূর্ণ করতেদিনে প্রায়২৬থেকে৩২টিঝুড়িপাথর লোড করত লোডার শ্রমিকরা। লোডিং করার জন্য যে ঝুড়ি ব্যবহার করা হত তার ওজনছিল৮২টিবি।[60]মহিলা শ্রমিকরা বেশিরভাগই ক্রাসারের সাথে অর্থাৎ পাথর কাটাই, বাছাই সম্পন্ন কাজের সাথে জড়িত ছিল। এই খাদানে কর্মরত শ্রমিকরা ছিল অসংগঠিত ও অস্থায়ী।পাথর উত্তোলনের কাজে শ্রমিকরা সারা বছর শ্রম প্রদান করলেও, স্থানীয় গ্রামের সাথে সংযোগ বজায় রাখত অর্থাৎ বর্ষাকালে শিথিল কর্মসংস্থানের সময় কৃষি ক্ষেত্রের কাজে যোগ দিত।একজনকর্মী পাথর খাদানেকোনশ্রেণিতেঅন্তর্ভুক্ত হবেতানির্ধারণকরারএকমাত্রমাপকাঠি ছিলতারকাজেরপ্রকৃতি।এক্ষেত্রে যদি নিয়োগকর্তা মনে করতেন যে, কর্মীদের উপযুক্ত পদ দেওয়া যুক্তিসঙ্গত নয় তাহলে তা বাতিল করা হত।কয়লা খনির মত কিছু শ্রমিক 'সাধারণ' ছিল না বরং এখানে কর্মরত সকল শ্রমিক 'সাধারণ' বা দৈনিক শ্রমিক নামে পরিচিত ছিল। পাথরের খাদানের শ্রমিকরা শ্রম অনুযায়ী দুই শ্রেণিতে বিভক্ত ছিল। ১) মজদুর নামে পরিচিত পিস বারকরা, যারা অদক্ষ, তাদের কাজের গতি অনুসারে মজুরী উপার্জন করত এবং ২) সময় হার শ্রমিক, যারা তিনটে পর্যায় অনুযায়ী কাজ করত।[61] এই অদক্ষ কর্মী বাহিনীতে 'হো'

60তদেব।পৃ. ২-৬

61.*West Bengal Labour Gazettee,* Department of Labour,Vol-1, No-3, Government of West Bengal, June 1957, P. 290-315.

আদিবাসী সম্প্রদায়ভুক্ত নারী শ্রমিকদের সংখ্যা অধিক ছিল। ‘হো’ ছাড়াও ‘ওঁরাও’, ‘তাম্রিয়া’ ও ‘সাঁওতাল’ আদিবাসী শ্রমিক ছিল এই দলে।পাথর উৎখনন করার কাজে যেমন আদিবাসী পুরুষেরা যুক্ত ছিল, অন্যদিকে নারী ও শিশু শ্রমিকরা পাথর ভাঙার পাশাপাশি পিষে ফেলার কাজে যুক্ত থাকত।[62]এই পরিবেশ যে অস্বাস্থ্যকর ছিল তা জেনেই তাঁদেরকে কাজে অংশগ্রহণ করতে হত। দক্ষতা,বিপত্তি, কঠোরতা, দায়িত্বএবংঅন্যান্যপ্রাসঙ্গিককারণে পাথর খাদান খনিতে শ্রমিকদের বিভাজন করা হয়েছিল।

১) ফিটার, ড্রাইভার, ম্যানেজার, ছিদ্রকারী।

২) অর্ধ দক্ষ শ্রমিক, মুকাদম, পাথর ভাঙ্গার শ্রমিক।

৩) অদক্ষফলকামান, মজদুরওঅন্যান্যশ্রমিক।[63]

পাথর খাদানের মত খনিতে আদিবাসী মহিলারা যুক্ত থাকলেও পুরুষদের সংখ্যা অধিক ছিল। ১৯৫০ থেকে ১৯৫২ সালের কয়েকটি পাথর খাদানের শ্রমিকের তালিকায় ৩৭১ টি পুরুষ ও ৩০০জন মহিলা শ্রমিকের পরিচয় পাওয়া গেছে।[64] আদিবাসী পুরুষ ও মহিলা উভয়েই এই কাজের সাথে যুক্ত পাথর উৎপাদনের প্রতীক হিসাবে নিজ শ্রম সর্বদা বিনিয়োগে ব্যস্ত ছিল। পাথর উত্তোলন শ্রমিকরা ‘অসংগঠিত’ ভাবে খাদানে বা ক্রাশারে কাজ করত।বীরভূমের পাথর খাদানে যুক্ত ছিল ৫৩,৩৩৯ থেকে ৬৪,৪৯০ [65]জন শ্রমিক। আদিবাসী মহিলা ও পুরুষের পাশাপাশি ১৮ বছর বয়সের নিচে থাকা আদিবাসী নাবালক ও নাবালিকেরা এই কাজের সাথে যুক্ত ছিল। অধিকাংশ ক্ষেত্রে লক্ষ করা যায়, যে সমস্ত আদিবাসী নাবালক বা নাবালিকারা এই পাথর খাদানে কাজ করত তাদের অধিকাংশই ছিল স্কুল ছুট। তবে অত্যাধিক সংখ্যায় কাজ করত মহিলা আদিবাসী শ্রমিক শ্রেণি। তারা সাধারণত খাদানের থেকে ক্রাসারে পাথর ভাঙার কাজ ও গাড়ি লোডিং করার কাজে যুক্ত ছিল।

62.মানিকসোরেন, (৪৬), পাথরখাদানশ্রমিক, বারোমাসিয়া, সকাল৯:৪৫, বীরভূম, ১২/১২/২০২১।

63. *Report of the (stone breaking or stone crushing committee appointed under Minimum Wages act, 1948),* Bombay, Governmental Central Press, 1951, P. 2-6.

64. Mitra. A,*Census 1951 west Bengal (Birbhum),*Kolkata, printed by Sree Saraswati Press Ltd, 1954, P. 50-55.

65.*Directorate of small scale Industries,* Government of west Bengal, 1956, P. 36.

১৯৬১ সালের গণনা অনুযায়ী বীরভূমের জনসংখ্যা ছিল ১,৪৪৬,১৫৮ জন, যার মধ্যে পুরুষ ও মহিলা ছিল যথাক্রমে ৭,৩২,৯২২ জন ও ৭,১৩,২৩৬ জন।[66] এই আদমশুমারিতে অল্প সংখ্যক আয়ের ভাগীদার হিসাবে আদিবাসী সম্প্রদায়ের শ্রমিকদের হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছিল। বীরভূম জেলায় গ্রামীণ আদিবাসী জনসংখ্যার মধ্যে পাথর খাদানে শ্রমের অংশগ্রহণ ছিল অধিক।[67] ১০০০ জন জনসংখ্যার মধ্যে ২৯৩ জন ছিল পাথর খাদান শ্রমিক। বীরভূমের সিউড়ির মহাম্মদ বাজার থানায় ৩৬% নলহাটিতে ২৯% এবং রামপুরহাটে ছিল ৩২% আদিবাসী শ্রমিক।[68] আদিবাসীদের মধ্যে খননকারী শ্রমিকের অধিকাংশ বীরভূমের খয়রাসোল, নলহাটি, রামপুরহাট, মুরারই থানার অন্তর্গত ছিল। এই সময় খনির কাজে যুক্ত ছিল ৮৩৬ জন।[69] অধিকতর ভাবে শিশুদের যোগ দিতে দেখা যায় খাদানের কাজে।[70] ১৯৬১ সালের বীরভূমের পাথর খাদান শিল্প কাজে নিযুক্তদের সংখ্যা অধিক লক্ষ করা যায়। ১৯৬১ সালের আদমশুমারি অনুসারে জেলায় আদিবাসী জনসংখ্যার মধ্যে পুরুষ শ্রমিক ছিল ৯৯.২২% এবং মহিলা ছিল ৪০.৬১%। গ্রামীণ এলাকায় ৪৯.৮১% আদিবাসী জনসংখ্যা শ্রমিকদের মধ্যে পুরুষ শ্রমিক ছিল ১৯.১৪% এবং মহিলা শ্রমিক ছিল ৪০.৪৯%। পাথর খাদান ছাড়া বালি ও ইটের খনিতে ৩৮.১৬% শতাংশ তফসিলি উপজাতি শ্রমিকরা কর্মরত ছিল। গ্রামীণ আদিবাসীদের মধ্যে কাজ করত না এমন সংখ্যা গ্রাম ও শহর মিলিয়ে ছিল ৬৮.৭৯%।[71]এদের মধ্যে সিংহভাগ সাঁওতাল শ্রমিকও একইসাথে শিল্পে ও কৃষি খাতে যুক্ত ছিল। পাথর খাদানসংলগ্ন গ্রামাঞ্চলের অন্যান্য শ্রেণির দারিদ্র্য পীড়িত, অশিক্ষিত, পদদলিত মানুষ এই বিভাগে নৈমিত্তিক শ্রমিক হিসেবে কাজ করার কথা জানা যায়।লোডিং ও পাথর ভাঙ্গা প্রধানত কায়িক শ্রম দ্বারা পরিচালিত হওয়ার ফলে বছরের কিছু সময়ে শ্রমিকের সমস্যা দেখা দিত। আদিবাসী সাঁওতালদের অন্যান্য ধরনের

---

66. Ray. B,*Census 1961 West Bengal (Birbhum),*Calcutta, Government of India, Published by the superintendent, 1966, P. 149-153.

67.Mitra. A,*Census 1951 west Bengal (Birbhum),*Kolkata, printed by Sree Saraswati Press Ltd, 1954, P. 66.

68.তদেব।পৃ.৬৮

69.তদেব।পৃ.৭২

70.তদেব।পৃ.৭৩

71. Ray. B,*Census 1961 West Bengal (Birbhum),*Calcutta, Government of India, Published by the superintendent, 1966, P. 160-175.

কর্মসংস্থানে কাজের সুযোগ কম ছিল তাই খনি শ্রমিকদের প্র্যাপতা পাথর খাদান মালিকদের কাছে কোনও সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়নি। আদিবাসী এই কর্মচারীদের কাজের সুযোগ অপর্যাপ্ত থাকায় গ্রামীণ শুহুরে পরিধিতে সামাজিক পার্থক্য তীব্র হয়ে উঠেছিল। এই ক্ষেত্রগুলি আসলে অশিক্ষিত, দরিদ্র্য এবং পাথর খনির কাজের অনভিজ্ঞ শ্রমিকদের উপার্জনের উৎস ছিল।শ্রম-নিবিড় অর্থনীতিতে শ্রমের সরবরাহ প্রবল ছিল তাদের কাজের জন্য কর্মীদের প্রাপ্যতা সহজসাধ্য হয়ে পড়েছিল।

খাদান ও আদিবাসী শ্রমিকদের মজুরী

আদিবাসী শ্রম বিতর্কমূলক হয়ে উঠেছিল ধীরে ধীরে শ্রম বিশ্লেষণের পটভুমিকায় কেননা খনি ও খাদান ক্ষেত্রে যুক্ত হওয়া নয় বরং আদিবাসীরা নিজেদের অস্তিত্বের সংগ্রামের জন্য স্বল্প মজুরির বিনিময়ে এই জীবিকা গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছিল।পাথর উত্তোলন থেকে বিভিন্ন আকারের পাথর ছাঁটাই ও কাটিং এর কাজে অসংখ্য শ্রমিকের দৈনন্দিন জীবিকা নির্বাহ হত। খাদান ক্ষেত্রে মজুরিরন্যনুতমহারতাদেরকাজেরদক্ষতা, অদক্ষতার উপর নির্ভর করত।[72] এই ক্ষেত্রে দৈনিককাজের ক্ষেত্রে দক্ষ, অদক্ষ, আধাদক্ষশ্রমিক নিয়োজিতছিল।[73]কিছু শ্রমিক যারা চুক্তির বিনিময়ে কাজ করত তাদের কাজের সময় ছিল সকাল ৯ টা থেকে বিকেল ৫ টা পর্যন্ত।পাথর উত্তোলনে নিয়োজিত শ্রমিকদের কাজের সময়ের ভিত্তিতেও মজুরী দেওয়া হত। পিস বরকরা খাদান শ্রমিকদের মজুরী সময়ের উপর নির্ভরশীল ছিল। খাদান ও ক্রাসার শ্রমিক উভয় বিভাগের জন্য দৈনিক কাজের গণনার ভিত্তিতে মজুরী প্রদান করা হত।খাদানের মত অসংগঠিত ক্ষেত্রগুলিতে শ্রমের তুলনায় মজুরির হার সর্বনিম্ন ছিল।এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে প্রথাগত শ্রমিকের নীচে, অর্থাৎ পিস রেটের ভিত্তিতে মজুরী পেতেন। যে সমস্ত শ্রমিকরা পাথর ভাঙ্গার বিভাগে কাজ করতেন তাদের পর্যাপ্ত পরিমাণ মজুরী প্রাপ্য হত না।[74] তারা খোলা আকাশের নিচে পাথর ভাঙ্গার কাজ করতেন। উপযুক্ত প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা তাদের ছিল না।

---

72. *Directorate of small scale Industries,* Government of west Bengal, 1960, P. 33.
73. *Report of the (stone breaking or stone crushing committee appointed under Minimum Wages act, 1948),* Bombay, Governmental Central Press, 1951, Pp. 1-6.
74. *Coal mine Bonus scheme, 1948 and SISTER Schemes,* Ministry of Labour Employment and Rehabilitation, publication Government of India, Delhi,1970, P. 10-14.

বীরভূমের প্রান্তিক এলাকা এবং কাছাকাছি রাজ্যগুলিতে পাথর খাদান ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পেয়েছিল, যার ফলে মজুরিতে অতিরিক্ত হতাশার পাশাপাশি প্রতি মাসে কাজের দিনের সংখ্যা আরও হ্রাস পেয়েছিল।খনি ক্ষেত্রে শ্রমিক অধিকার ও ন্যায্য মজুরী সম্পর্কে আদিবাসীদের ধারণা ছিল না। এমনকি তাদের ধারণা, তাদের ব্যয়কৃত শ্রমের পরিমাণ এবং প্রাপ্ত মজুরির পরিমাণের মধ্যে পার্থক্য উপলব্দধি করতে তারা সক্ষম ছিল না। উপযুক্ত মজুরী প্রাপ্য না হওয়ার ফলে শ্রমিকদের ঋণের দারস্থ হতে হত। ঋন পরিশোধ ও কম মজুরিতে কাজ তাদের সামাজিক জীবনের পাশাপাশি অর্থনৈতিক জীবনকে বিঘ্নিত করেছিল। একজন পাথর খাদানের শ্রমিকের জীবনে শ্রমের মুহূর্তটি প্রাথমিকভাবে শ্রমশক্তি হিসাবে শুরু হলেও শারীরিক শক্তির ব্যয় হত পাথর উৎপাদনের বিভিন্ন প্রক্রিয়ায়।মালিক পক্ষের কাছে শ্রম ছিল নিছক একটি বিক্রিত পণ্যের ন্যায়।

মজুরী শ্রমের জগতের বাইরে, শ্রমিকদের প্রতিকগুলি তাদের জীবনের সাথে সম্পর্কিত ছিল। কাজের বিভাগের আকার অনুযায়ী মজুরির হার পরিবর্তিত হয়েছিল[75]।কিছুতথ্যদ্বারা স্পষ্ট হয় যে, পিসরেটেরসাথে মজুরির হারসংকলিতহয়েছিল।পাথরের ছোট খাদানে ১৯৪১ সালে এবং ১৯৪৮ ও ১৯৫০ এ মজুরী নিয়মের খসরা অনুযায়ী যে নিয়ম নীতি নির্ধারণ করা হয়েছিল তার প্রতিফলন এই পাথর খাদান গুলিতে লক্ষ করা যায়নি।[76]পাথর খাদানশিল্পেরক্ষেত্রেনিযুক্তশ্রমিকদের মজুরিরপাশাপাশিপরিষেবার জন্যশর্তাবলীপ্রযোজ্যছিল।১৯৪৮সালেন্যূনতমমজুরীআইনেরধারাপ্রকাশিতহলেবিষয়টিস্পষ্টহয়েউঠে ছিল।[77]খনি শ্রমিকদেরন্যূনতমমজুরিরহার আইনেসুপারিশকরাহলেও, তা তারা অর্জন করতে পারত না মালিক শ্রেণির নিয়ন্ত্রণে।নির্ধারিতন্যূনতমপ্লেসরেটতাদেরমজুরীদেওয়াহতবিজ্ঞাপিতদরেরচেয়েকম।ছোট খনি বা খাদানেনির্ধারিতকর্মস্থানেপ্রত্যেকনিয়োগকর্তাকেতারকর্মচারীদেরযথাযথ বিজ্ঞাপিতহারের সমানহারেঅর্থপ্রদানেরআইনিবাধ্যবাধকতানির্দেশকরা হয়েছিল।১৯৫৬এরখসড়ারঅধীনে পাথর

75. Gupta. Pranab Kumar Das, *Impact of Industrialization on a Tribe In South Bihar,* Calcutta, Anthropological survey of India, February 1978, P. 47.
76.*Annual Report of the Administration of the factories act,* West Bengal, 1962, Pp. 4-7.
77.তদেব।পৃ . ৭-১০

খাদানের শ্রমিকদেরঅতিরিক্ত সময়েরহারনির্ধারণকরাহয়েছিল।প্রাপ্ত বয়স্ক, শিশু, কিশোরদের ভাঙ্গা বা পাথর চূর্ণ করার কাজে নিয়োগের জন্য পৃথক সময় নির্ধারণ করার কথা বলা হয়েছিল।কিশোর,কিশোরিদের৮ঘন্টাকরেকাজকরিয়ে নেওয়া হত।এইপ্রতিবেদনেমহার্ঘভাতাসহএকত্রিতমজুরীসাধারণতএইশিল্পেনিযুক্তশ্রমিকদেরদেওয়ারকথাউ থ্যাপিত হয়েছিল।এইপরিস্থিতিতে, শ্রমিকদেরজীবনযাপন ওভাতারখরচসহএকত্রিতমজুরিরসুপারিশকরারসিধান্তনেওয়ারকথাবলাহয়েছিল যদিও তা বাস্তবায়িত হয়নি।[78]এইআইনেরঅধীনেবিধানলক্ষ্যকরেতারকর্মচারীদেরবেতন বন্ধ হলে বা নির্দিষ্ট হারে নাদিলেসেই মালিকের বিরুদ্ধেশাস্তিমূলকব্যবস্থা নেওয়া যাবেএবংজরিমানাদিতেহবেযা ২২নংধারায়নির্ধারিত ছিল।২০ নং ধারা অনুযায়ীএইধরনেরকর্মচারীদেরআইনেরঅধীনেনির্ধারিতহারেরআইনসঙ্গত ভাবে মজুরীদাবিকরারক্ষমতা শ্রমিকদের প্রদান করা হয়েছিল।[79]

পাথর খাদান খনন ও ক্র্যাশার বিভাগে আদিবাসী শ্রমিকরা প্রতিদিন ১২০ টাকা আয় করত, যা থেকে পরিবারের আয় বৃদ্ধি পেয়েছিল বলে পাথর খাদান শ্রমিক পরিবারগুলির একাংশ মনে করত।[80]এইআইনেগৃহ- বাসস্থানেরমূল্যবাঅন্যান্যসুযোগ-সুবিধা, তহবিলেঅবদান, গ্রাচুইটি, ভ্রমনভাতাএবংকর্মসংস্থানেরপ্রকৃতিরকারণেকর্মচারীকেপ্রদত্তঅর্থ প্রদানের কথা বলা হলেও বেসরকারি উদ্যোগে গঠিত খাদান ও ক্রাশার বিভাগে শ্রমিকদের প্রতি এই নিয়মাবলী মান্য করা হত না। ঔপনিবেশিক প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে দেশীয় পুঁজিপতি ও ব্যবসায়ীরা নিজেদের মত করে কিছু নিয়ম তৈরি করে খনিতে কর্মরত শ্রমিকদের উপর জবরদস্তি মূলকভাবে চাপিয়ে দিয়েছিল। বীরভূম এবং পাকুড়ের পাথর খাদানগুলি মুনফা লাভের এক

---

78. *Report of the minimum wages Committee for the Stone breaking or Stone Crushing,* Government of West Bengal, 1964, P. 23-35

79. *Report of an enquiry into the living conditions of the workers employed in the Factory of Stone industry,* Birbhum, West Bengal, 1955, P. 40-55.

80. Mondal.Priyabrata, suvankar Paul and Abhijit Das,*Impacts of stone crushing work on the Tribal Labourers of Birbhum District, West Bengal- A Socio- cultural Anthropological study,*Journal of Humanities and Social Science vol- 27, Issue-2, series 5, february-2022, P. 10 -16.

একটি উৎসে পরিণত হওয়ার পাশপাশি আদিবাসী শ্রমিক শোষণের কেন্দ্রে ধীরে ধীরে পরিণত হয়েছিল।সমাজ বিশ্লেষণে,পাথর খাদান শ্রমিকরা একটি সস্তা পণ্যে পরিণত হয়েছিল পরবর্তীকালে যা উল্লেখযোগ্য ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছিল।[81]

ছোটনাগপুর মালভূমির অন্তর্গত বাংলার বাইরে মহারাষ্ট্রের পাথর খাদান নিয়ে মহম্মদ তালিব একটি চিত্র প্রকাশ করেন। তাতে তিনি দেখান যে, মহারাষ্ট্র সরকার ১৯৬০ তারিখের ৯ই ফেব্রুয়ারি শিল্প ও শ্রম বিভাগে ন্যূনতম মজুরী আইন প্রনয়নের ব্যবস্থা করার কথা উল্লেখ করেছিলেন। যদিও ১৯৪৮ এর এর ধারা অনুযায়ী ন্যূনতম মজুরী আইন প্রনয়ণের জন্য প্রয়োজনীয় কমিটি পুনরায় নিয়োগ করার কথা বলা হয়েছিল। মহারাষ্ট্রের পাথর খাদান অঞ্চলে ‘খাদান শ্রমিক’ নিয়োগের ক্ষেত্রে মজুরির ন্যূনতম হারের সংশোধন করা হয়েছিল।[82] সরকারীনিয়ম অনুযায়ী কমিটির সাথে দীর্ঘ আলোচনার পর পাথর ভাঙ্গা শ্রমিকদেরন্যূনতম মজুরির হার সংশোধনের বিষয়ে তদন্ত করার কাজ সরকারের দায়িত্ব ছিল। কমিটির সিধান্তে, কর্মচারীদের মধ্যেন্যূনতম মজুরির পুনঃপরীক্ষা করা হয়েছিল, যান্ত্রিকীকরণ এবং অন্যান্য প্রযুক্তিগত উন্নতির আবির্ভাবের কারণে শিল্পের সম্প্রসারনের মত পাথর খাদান শিল্পাঞ্চলে মজুরির উপর সরাসরি পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। দেশের পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনা এবং মুদ্রাস্ফিতির সাথে শ্রমিকদের সম্পর্কিত জীবনযাত্রার পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। তদানুসারে, শিল্প কমিটি সমস্ত রাজস্ব বিভাগীয় সদর দপ্তর পরিদর্শন ও অনুসন্ধান করে নিয়োগকর্তা ও কর্মচারী সংগঠন, সমিতি, ইউনিয়ান এবং শিল্পের সাথে জড়িত কিছু ব্যক্তির রেকর্ডের মাধ্যমে শ্রমিকদের সুবিধা ও অসুবিধাগুলির দিকে পুনরায় চিন্তা ভাবনা করার কথা ভাবনার মধ্যে আনা হয়েছিল।[83] কমিটিগুলি অনুসন্ধানের মধ্য দিয়ে প্রদত্ত মজুরির পরিমাণ বিচার বিবেচনা করে একটি সঠিক

---

81. *Report of the minimum wages Committee for the Stone breaking or Stone Crushing,* Government of West Bengal, 1964, P. 24.

82. তদেব।পৃ. ৩৬

83. Talib.Mohammad, Writing labour Stone quarry workers in Delhi, Delhi, Oxford University Press, 2010, P. 70-78.

সিধান্ত নেওয়া হয়েছিলযদিও স্থানীয়মালিকদের তাতে আপত্তি ছিল।মালিক শ্রেণি ন্যূনতম মজুরি আইনের ধারাবাহিকতাকে অস্বীকার করেছিল।[84]

পাথরখাদানেবাক্রাসারেযুক্তকর্মচারীওশ্রমিকদেরবেতনেরতালিকা

দক্ষ শ্রমিক[85]				
শ্রম প্রকারভেদ	১৯৫০	১৯৫৫	১৯৫৮	১৯৬০
প্রকৌশলী	৭৫০	৮৩৩	৯০০	১০০০
সুপারভাইজারের (খাদান)	৭০০	৯০০	১০০০	১০০০
ম্যানেজার (খাদান এবং ক্রাসার)	৮০০	১০০০	১২০০	১২৫০
ডাম্পারের চালক	-	-	-	১১০০
খনন শ্রমিক	৭৫	১০০	১২০	-
ব্লাস্টিং শ্রমিক	-	১০০	১২০	১৫০
অদক্ষ শ্রমিক				
পাথর ভাঙ্গা পুরুষ শ্রমিক	১২০	১০০	১২০	২২৫
পাথর ভাঙ্গা আদিবাসী মহিলা শ্রমিক	৮৫	৭৫	১২০	১২০
পাথরলোডিংকাজেসাথেযুক্তশ্রমিক	৮৫	১০০	১০০	১৫০

84.তদেব, পৃ.৯৩

85.সাক্ষাৎকার- দত্ত. ইন্দ্রজিৎ, রামপুরহাট,সময় দুপুর ৩;৩০।গোকুল মন্ডল,সময়দুপুর ২;৩০ নলহাটি, ২০১৮, (পাথর খাদান ও ক্রাসার মালিক)।

আদিবাসীশ্রমিকজীবনেরউপরক্রাসারওখাদানেরপ্রভাব

পাথর খাদানগুলি বীরভূমের আদিবাসীদের কাছে একমাত্র অর্থনৈতিক উৎস ছিল। ছোটনাগপুর মালভূমির অনেকটা অংশ জুড়ে যে পাথর খাদান খনির উদ্ভব হয়েছিল তাতে খাদান অর্থনীতির সাথে সাথে শ্রমিকদের জীবনের উপর সরাসরি প্রভাব প্রতিফলিত হয়েছিল। বিশ্লেষণের পটভূমিকায় পাথর খাদান অর্থনীতির আলোচনার সাথে আদিবাসী শ্রমিক জীবনের শ্রমের সাথে আর্থিক অনগ্রসরতার মত কারণকে সামনে রেখে ধনতন্ত্রের সার্বিক শোষণ ব্যবস্থার কথা উল্লেখ করা হয়েছিল। এই শোষণের পরিপ্রেক্ষিতেই ছোটনাগপুরের আদিবাসী জনগণ অর্ধেকেরও বেশি দরিদ্র্যে নিমজ্জমান ছিল। ধনতান্ত্রিক উন্নতির মূল লক্ষ্য যে শোষণ ছিল তা খনি অর্থনীতির শ্রমিক শোষণের মধ্য দিয়ে লক্ষ করা গিয়েছিল।

সাংস্কৃতিকপরিবর্তন

কয়লা ও অন্যান্য বড় আকারের খনির সাথে আদিবাসী শ্রমিকদের যুক্ত থেকে যেভাবে সংস্কৃতি পরিবর্তিত হয়েছিল ঠিক একইভাবে পাথর খাদানের মত অসংগঠিত ক্ষেত্রে জীবিকায় অংশগ্রহণ করে সামাজিক, অর্থনীতির পাশাপাশি আদিবাসী সাংস্কৃতি পরিবর্তিত হয়েছিল। সাঁওতালওমুণ্ডা আদিবাসীদের নৃত্য ছিল বীরভূমের লোক সংস্কৃতির একটি প্রধান রূপ। সাঁওতালদের যেমন পরিশ্রমী বলে বর্ণনা করা হয়েছে ঠিক একইভাবে তারা আমোদপ্রিয় ছিল,[৪৬]কিন্তু সেই আমোদপ্রিয়তা তাদের জীবনে হ্রাস পেতে শুরু করেছিল অধিক ও অবৈধপাথর খাদান শ্রমে ব্যবহারের জন্য। আদিবাসী সাঁওতালদের খ্যাদাভাস থেকে তাদের মধ্যে ভাষার বদল ঘটেছিল। দীর্ঘদিন ধরে বীরভূমের পাথর খাদান ক্ষেত্রে পরিযায়ী শ্রমিকদের কর্মরত অবস্থায় থাকার ফলে কথ্য ও শিক্ষা জগতে নিজেদের ভাষার বদলে বাংলা[87] ও হিন্দি ভাষার প্রাদুর্ভাব ঘটেছিল।[88]

৪৬.*বীরভূম বার্তা,* (সাপ্তাহিক পত্রিকা), বর্ষ -৫৩; সংখ্যা- বিশেষ, সিউড়ি, বীরভুম,আগস্ট ১৫, ১৯৫৬।

87. Khubchandani. Lachman Mulchand, *Tribal identity a language and communication perspective,*New Delhi, Indus Publishing Company, 1992, P. 20-36.

৪৪. কর.শমিত কুমার, *'সিলিকোসিস মৃত্যুর ঢল',*চার নং প্ল্যাটফর্ম একটি ব্যাতিক্রমী ওয়েব পত্র, ২০০৪।

জীবিকা নির্বাহের উৎসে বনজ সম্পদের উপর নির্ভরতা বিলোপ

উন্নত কৌশলের মাধ্যমে অল্প সময়ের মধ্যে তাদের প্রাকৃতিক সম্পদকে অধিক পরিমাণে কাজে লাগানোর জন্য পুঁজিপতিদের ক্রমাগত প্রচেষ্টা ছিল। স্থানীয় সম্পদ সংরক্ষণ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল।[89]যে সমস্ত আদিবাসী সাঁওতালরা বনজ সম্পদের উপর ভিত্তি করে দৈনন্দিন জীবনের কিছু অংশ অতিবাহিত করত তা পুরোপুরি নির্মূল হয়ে গিয়েছিল। বনজ দ্রব্যের উপর আদিবাসীদের জীবিকা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল।বনভূমি ধংসের কারণে, বীরভুম এর মত রাঢ় এলাকায় অনুকূল আবাসস্থল এবং লক্ষাধিক চাষাবাদ ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল।

পুঁজি কেন্দ্রিক অর্থনীতির কারণে বন উজাড়ের ফলে, বনজ পণ্য সংগ্রহ, রেশম পালনএলাকার বন সম্পদের উপর নির্ভরশীলতা আদিবাসীরা কাটিয়ে ফেলেছিল। প্রাথমিকভাবে, আদিবাসী সাঁওতালরা প্রাসঙ্গিক স্বায়ত্তশাসন, অপর্যাপ্ত বাজারের সুবিধা না পাওয়ার ফলে যথাযথ প্রণোদনার অভাবের কারণে রেশম কীট পালনে অনাগ্রহ দেখা গিয়েছিল। ক্ষেত্র সমীক্ষার অঞ্চলগুলিতে আদিবাসীদের জীবিকা নির্বাহের উপায় বলতে খনি অঞ্চলগুলি একমাত্র উপায় ছিল। আদিবাসী শ্রমিকরা তাদের আর্থিক সমস্যার দ্রুত সমাধান হিসাবে কঠিন নগদ উপার্জনের জন্য পাথর উত্তোলন শিল্পের কর্মসংস্থানে যোগদান করতে শুরু করেছিল।[৯০]বীরভূমের পাথর উত্তোলন শিল্পের দ্রুত বৃদ্ধি আঞ্চলিক অর্থনীতির পুনর্গঠন প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে উপজাতিদের বস্তুগত সংস্কৃতিকে প্রভাবিত করেছিল। যার ফলে তারা জীবিকা উপার্জনের পাশাপাশি তাদের জীবিকা নির্বাহের উপায় হারিয়েছিল।

সিলিকোসিস ও পাথর খাদানের শ্রমিক স্বাস্থ্য

পাথর খাদান বীরভূমের অর্থনীতিকে উন্নত করলেও আদিবাসী শ্রমিকদের জীবনকে দূষিত করে তুলেছিল। শ্রমিকদের শারীরিক ক্ষতি বৃহত্তর ভাবে প্রকাশ পেয়েছিল এই পাথর খাদান

89.Roy.Piyali Basu, Sukanta Das, *Population Growth,Socio Economy and quality of life in Birbhum district,*Research Journal of Social Sciences, 3(5), West Bengal,India,Septembar 25,2011, P.412-418.

90. *Report on the Birbhum Employment for Quarter 1960,* Calcutta, Government of West Bengal, October 1960, P. 20-36.

অর্থনীতিতে। আদিবাসী শ্রমিক শরীরের অত্যধিক পরিশ্রমী চিত্রটি পাথর খাদান খনিতে দেখা গিয়েছিল। তাদের শরীরের উপর অতিরিক্ত কায়িক শ্রমের বোঝা চাপানো হয়েছিল এর ফলে তাদের স্বাস্থ্যের ব্যাপক অবনতি ঘটে।[91] ভিন্ন ভিন্ন উদ্দেশ্য সাধনের তাগিদে পাথর উৎপাদনের সাথে সম্পর্কিত ব্যবসায়িক কার্যকলাপ এই এলাকায় বৃদ্ধি পেয়েছিল যা অর্থনীতিতে ইতিবাচক প্রভাব ফেললেও বিভিন্ন আকারের পাথর ভাঙ্গনের ফলে উৎপন্ন ধূলিকণা পাথর খাদানে কর্মরত শ্রমিকদের জীবনকে দুর্বিষহ করে তুলেছিল।[92]অর্থনীতির অগ্রগতির সাথে সাথে পাথর খাদান অর্থনীতির সাথে যুক্ত শ্রমিকের জীবনকে বিপন্ন করে চলেছিল। আদিবাসী শ্রমিকরা প্রথম থেকেই নিজেদের জমি হারিয়ে ও জোরপূর্বক উচ্ছেদিত হয়ে পরিণত হয়েছিল সস্তা শ্রমিকে। বেঁচে থাকার তাগিদে দারিদ্র্যতার ভারে তারা নিজের এলাকা ছেড়ে শিল্পাঞ্চলের পার্শ্ববর্তী এলাকায় গিয়ে বসতি গড়ে তোলে এবং প্রায় বঞ্চিত হয়ে অত্যন্ত নিম্নমানের সামাজিক জীবন কাটাতে বাধ্য হয়েছিল।খনির কাজ শ্রমিকদের স্বাস্থ্যকে সরাসরি প্রভাবিত করেছিল। বিপজ্জনক অবস্থায় কাজ এবং বিষাক্ত বায়ুর সংস্পর্শে থাকার মধ্য দিয়ে শ্রমিক শ্রেণির শরীরকে ক্ষতিগ্রস্থ ও দুর্বল করে তোলে, যার প্রভাব ধীরে ধীরে তাদের সামাজিক থেকে অর্থনৈতিক জীবনকে ক্ষতিগ্রস্থ করে তুলেছিল।কয়লাখনির শ্রমিকদের নিয়ামোকোসিস,[93] আসবেস্টোসিসের মত আদিবাসী শ্রমিকরা নানা পেশাজনিত রোগে জর্জরিত ছিল। ঠিক একইভাবে পাথর খাদানের শ্রমিকেরা আক্রান্ত হয়েছিল সিলিকোসিস[94] নামক একটি রোগে। বিশেষজ্ঞদের কথায়, সিলিকোসিস হল একটি পেশাগত রোগ। পাথর খাদানে কাজ করতে গিয়েই শ্রমিকেরা মূলত এই রোগে আক্রান্ত হয়। বীরভূম ও পাকুড়ের বেশ কয়েকটি এলাকা ছাড়াও পশ্চিমবঙ্গের উত্তর ২৪ পরগনার সন্দেশখালি, মিনাখাঁ, এবং পশ্চিম মেদিনিপুরের নয়াগ্রাম, সাঁকরাইল, কেশিয়াড়ি

---

91. Breman. J,*Footloose Labour: Working in India's informal economy,*NewYork, Cambridge University Press, 1996, P. 4-10.

92.Mondal.Priyabrata, suvankar Paul and Abhijit Das,*Impacts of stone crushing work on the Tribal Labourers of Birbhum District, West Bengal- A Socio- cultural Anthropological study,*Journal of Humanities and Social Science vol- 27, Issue-2, series 5, february-2022, P. 10-16.

93.*First Report of the coal dust committee,* Simla, Government of India, 1924, Pp. 2-6.

94(১৯৩২ সালে জোহানেসবার্গ সম্মেলনে 'সিলিকোসিস' রোগটিকে 'পেশাগত রোগ' হিসাবে অভিহিত করা হয়)।

ও দাঁতনের শ্রমিকরা পাথর খাদানে কাজ করতে গিয়ে এই রোগে আক্রান্ত হওয়ার কথা জানা যায়। সিলিকোসিস রোগের মূল কারণ হল, 'ক্রিস্টালাইজড সিলিকা' বা স্ফোটাকাকৃতি বালি বা পাথরের কণার উপস্থিতিতে যারা দিনের পর দিন ধরে সময় অতিবাহিত করলে পাথরের কণা ফুসফুসের উপরি ভাগের উপর জমতে থাকে এবং ধীরে ধীরে শরীরে মারাত্মক ক্ষতি হয়ে সিলিকোসিস রোগের জন্ম হয়।[95] এই রোগের উপসর্গ মূলত বুকে ব্যাথা, শ্বাসকষ্ট, জ্বর এর মধ্য দিয়ে দেখা যায়। রোগের শেষ দিকে শরীর নীলাভ হয়ে যায় এবং হাত-পা শুকিয়ে যাওয়ার প্রবনতা দেখা যায়। চিকিৎসকদের থেকে প্রাপ্ত তথ্য দ্বারা জানা যায়, সিলিকা ফুসফুসের স্বাভাবিক রোগ প্রতিরোধকারী কোষের কার্যক্ষমতা নষ্ট করে ফেলে। যার ফলে মানব দেহের ফুসফুসে এক ধরনের ক্ষতের সৃষ্টি হয় এবং ফুসফুসের স্বাভাবিক কার্যক্ষমতা হারিয়ে যায়। এছাড়া যে সমস্ত শ্রমিকরা যক্ষ্মা অথবা অন্যান্য ব্যাকটেরিয়া ঘটিত রোগে রোগগ্রস্থ তাদের ফুসফুস সহজেই এই রোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভবনা থাকে।'সিলিকোসিস' এমন একটি রোগ যা প্রথমে, যক্ষ্মা ও টিবির মত আকার ধারন করে নোডলগুলি বড় হয়ে গেলে টিউমারে পরিণত হয়। পাথরের কারখানা নামক এই ধুলোয় ঢাকা ধুলোর চেম্বারগুলি আসলে এক একটি হত্যাপুরীবা বলা ভালো পুঁজিবাদীদের গণহত্যা ঘটানোর বিশেষ ক্ষেত্র নামে পরিচিত হয়ে উঠেছিল। সাদা ধুলোর আস্তরনের কর্মক্ষেত্রে বৃদ্ধ থেকে শিশুরা সবার আক্রান্ত হওয়ার তথ্য পরিলক্ষিত হয়েছিল।ভারতবর্ষে ১৯৫১ সালের শ্রম আইনে এই রোগটিকে 'নোটিফায়েড ডিজিজ' হিসেবে চিহ্নিত করা হলেও এই সর্বনাশা রোগকে প্রতিরোধ করার জন্য প্রয়োজনীয় দৃঢ় এবং মানবিক পদক্ষেপ নিয়ে বিশেষ আলোচনা লক্ষ করা যায়নি বা সচেতনতা তৈরী হয়নি।[96]খাদানে যুক্ত শ্রমিকেরা এই রোগের ব্যাপারে সচেতন ছিলেন না। তাদের মধ্যে সিলিকোসের পরিবর্তে টিবি রোগে আক্রান্ত হওয়ার কথা উল্লেখিত হয়েছিল। সিলিকোসিসের কথা সরকারি রিপোর্টে উথাপিত হলেও শ্রমিকদের মধ্যে তা অজানা ছিল।তাই তাদের, পাথর খাদান মালিকদের বিরুদ্ধে এই বিষয় নিয়ে ক্ষোভ বা উদ্বেগ প্রকাশ করতে দেখা যায়নি।১৯৫৫ এর পর থেকে

95.*A Preliminary work on Assessment of Dust hazard in Indian mines,* Dhanbad,Central mining research station, Nov 1961, Pp. 3-10.

96.ঘোস. শিবদাস (সম্পা.),*গণদাবী,* সোশ্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া, (বাংলা সাপ্তাহিক পত্রিকা), কলকাতা,৭৪ বর্ষ ৪১ সংখ্যা ৩ রা জুন, ২০২২, পৃ. ৩

৫৫শতাংশ বীরভূমের ক্রাশার শ্রমিকদের মধ্যে সিলিকোসিসে আক্রান্ত হওয়ার কথা জানা যায়।[97]সিলিকোসিসে আক্রান্ত হওয়া শ্রমিকের গড় আয়ু সাধারণত ৩৩ বছর পর্যন্ত হয়।পাথর খাদানের শ্রমিকরা সাধারণত ৭-৮ ঘন্টা কোনো বিরতি না নিয়ে কাজ করতে থাকলে এই রোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে অধিক। কখনো কখনো ১০ ঘন্টার বিরতি না নিয়ে কাজ না করার ফলে তাদের শরীরে পাথরের ধুলো জমত।ক্রাশার বিভাগের কাছাকাছি (০.৫ কিলোমিটারের মধ্যে) বসবাসকারী শ্রমিকেরা পাথরের ধুলো কণার দ্বারা সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিল।[98]এ রোগ যার বুকে বাসা বাঁধে সাধারণত তাঁর জীবনের নিশ্চয়তা থাকে না।[99]সিলিকোসিসেও মৃত্যু-মিছিলের বিরাম ছিল না পাথর খাদান কিংবা কোয়ার্টজ পাউডারের কারখানায়।স্থানীয় চিকিৎসকদের সাথে সাক্ষাৎ করে জানা গেছে,[100]এলাকায় ক্রাশার স্থাপনের পর ধূলিকণার ঘনত্ব বেশি হওয়ায় ফুসফুসের রোগ বা শ্বাসকষ্টে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা অধিক হয়েছে।[101] এই রোগের ফলে ভয়াবহ তথ্য লক্ষ করা যায় যে, পাথর কারখানার উৎপাদনকারী শিল্পে সিলিকোসিসে আক্রান্ত শ্রমিক বীরভুমে ৮০ শতাংশ ছিল।শ্রমিকদের মৃত্যুর হার বৃদ্ধি পেয়েছিল ১৯৫০ থেকে ১৯৬০ সালে ৪০%।[102]দীর্ঘকাল ধরে রোগে ভুগে তিলে তিলে শ্রমিকদের মৃত্যুর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছিল। আই এল ও'র এক পরিসংখ্যান থেকে দেখা যায় যে, বিশ্বে ২৪ লক্ষ মানুষ পেশাজনিত কারণে মৃত্যুর সম্মুখীন হয়েছিল। এর মধ্যে রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গিয়েছেন ২০.২ লক্ষ শ্রমিক এবং দুর্ঘটনায় শিকার হয়ে মারা গিয়েছেন ৩.৮ লক্ষ

---

97. *Report of Dust pollution from stone crushers,* Hariyana, India, 1899, P. 15-30.

98. *Study of Sidero- silicosis problem in an Iron Ore mine, Dhanbad,*Central mining research station (council of scientific and Industrial research), July1972, P. 11-13.

99. Tucker. D.M,W.K.C. Morgan, *Effects of silica exposure among workers, applied occupational and environmental hygiene*, 10(12): DOI 10.1080/1047322X. 1995.10389099.

100. সাক্ষাৎকার- মালিনী বেসরা, সময় ৪;০০, পাকুড়, ২০১৯, (পাথর খাদান শ্রমিক)।

101. Mondal.Priyabrata, suvankar Paul and Abhijit Das,*Impacts of stone crushing work on the Tribal Labourers of Birbhum District, West Bengal- A Socio- cultural Anthropological study,*Journal of Humanities and Social Science vol- 27, Issue-2, series 5, february-2022, P. 10-15.

102.*Study of Sidero- Silicosis problem in an Iron Ore mine, Dhanbad,*Central Mining research station (council of scientific and Industrial research), July1972, P. 13.

জন। বিশেষজ্ঞদের মতে, পাথর ভাঙা ক্রাশার এবং দূষণকারী শিল্পে সিলিকোসিসে আক্রান্ত শ্রমিকের সংখ্যা ছিল ২৫-৩০ লক্ষ।

পেশাগত মৃত্যুর কারণে কারখানার মোট উৎপাদনে ক্ষতি হতে থাকে একথা যেমন স্বীকার করা হয় না ঠিক তেমনই পাথর খাদান খনিতে পেশাজনিত রোগের অস্তিত্ব অস্বীকার করার মধ্য দিয়ে শ্রমিকদের স্বাস্থ্যের অধিকার নিয়ে আলোচনা সচেতনমূলক হয়ে উঠেনি।পাথর খাদান ক্ষেত্রে যেখানে হাজিরা খাতায় শ্রমিকদের নাম-ধাম-পরিচয়টুকু উল্লেখিত ছিল না সেখানে তাদের স্বাস্থ্য নিয়েও মালিকদের চিন্তা ভাবনায় কোনো নিয়ম নীতি লিখিত হয়নি। আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংস্থার পরিসংখ্যানে পাথর খাদান শ্রমিকদের স্বাস্থ্য পরিসংখ্যানের কোনো যোগাযোগ লক্ষ করা যায় না। ১৯১২ সালে বেঙ্গল মাইনিং সেটেলমেন্ট অ্যাক্ট দ্বারা খনির শ্রমিকদের নিরাপত্তা, স্বাস্থ্য বিষয়ক আদেশ যদি প্রদত্ত খনি মান্য না করলে খনির রেজিস্ট্রেশন বাতিল বলে গণ্য হত।[103]অন্যদিকে ১৯৪৮ এর ই. এস. আই. অ্যাক্ট অনুযায়ী বলা হয়েছিল পেশা সংক্রান্ত কারণে কার্যক্ষমতা হ্রাস পেলে কারখানার মালিক ও খনি পরিচালকদের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার নিয়ম অমান্য করে চলেছিল খাদান মালিকরা।[104] খাদান মালিকরা নিজেদের স্বার্থকেই অতিরিক্ত মাত্রায় প্রাধান্য দিয়েছিল। সেক্ষেত্রে বলা যায় ১৯৫১ সালে এই রোগ ধরা পড়ার অনেক আগেই এই আইন তৈরি হয়েছিল কিন্তু ছোট খনি বা খাদান মালিকেরা তা মান্যতা দেয়নি। ১৯৬০ সালের দিকে ছোট খাদান ক্ষেত্র গুলির জন্য আইন পুনরায় তৈরি হলেও তা অসংগঠিত শ্রমিকদের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়নি।ফ্যাক্টরি অ্যাক্ট ১৯৪৮, দ্য মাইনিং অ্যাক্ট ১৯৫২, সামাজিক সুরক্ষা সংক্রান্ত আইনি অধিকার ই এস আই ১৯৪৮ এবং ১৯২৩ সালের ওয়ার্কমেন কম্পেনসেশন অ্যাক্ট সহ অন্যান্য আইনে শ্রমিকদের পেশাগত নিরাপত্তা এবং স্বাস্থ্য বিষয়ক অধিকারের আইনবিধি ছিল তবুও এই সমস্ত আইনি রক্ষাকবচগুলিকে খাদান মালিকরা চূড়ান্ত অবহেলা করে পাথরের ক্রাসার ও খাদান পরিচালনা করার দিকে ব্যস্ত হয়েছিল। সরকার এবং শ্রমিক সংগঠনগুলির চরম উদাসীনতা ও নিষ্ক্রিয়তার কারণেই এই পদ্ধতি ও নিয়ম না

103.*The West Bengal mining settlements* (Health and Welfare bill, 1964), Published by the report of joint committee, 30th July 1964, P. 100-122.

104. *Coal mine Bonus scheme, 1948 and Sister Schemes,*Ministry of Labour Employment and Rehabilitation, Delhi, publication Government of India, 1970, P. 34, 56.

মানার দুঃসাহসিকতা তৈরি হয়েছিল ধীরে ধীরে।ফ্যাক্টারি অ্যাক্ট অনুযায়ী ১৯৫১ সালে সিলিকোসিস একটি চিহ্নিত রোগ হিসাবে পরিচিত হওয়ার পরেও, ১৯৫২ সালে খনি সংক্রান্ত কর্মীদের সুরক্ষা আইনে শ্রমিকদের মধ্যে ট্রেড ইউনিয়ানগুলি সচেতনতা তৈরি করেনি। এই সমস্ত তথ্য ছোট খনি পরিদর্শনকারী ও রাজ্য প্রদুশন নিয়ন্ত্রন পর্ষদ এবং ১৯৪৮ এর ফ্যাক্টারিরনিয়ম অনুযায়ী কারখানার পরিদর্শকদের দেওয়া তথ্য থেকে জানা যায়। বিশেষ করে পেশাগত সুরক্ষা ও সিলোকোসিস রোগে আক্রান্ত হলে সামাজিক সুরক্ষার অধিকারে মৃতের পরিবারকে আর্থিক সাহায্য প্রাপ্য ছিল। যদিও তাতে অনেক শ্রমিক পরিবার বঞ্চিত হয়েছিলেন। যে সব শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছিল তারা একাধারে অসংগঠিত ছিল বলে তারা সুরক্ষার আইন থেকে বঞ্চিত হয়েছিল। এই খনি উৎপাদন প্রনালীর কার্যক্ষেত্রে, শ্রমিক ও মালিক সম্পর্কে জীবন মরণের অসম দ্বন্দ্ব লক্ষ করা যায়। সামাজিক ক্ষেত্রে এই দ্বন্দ্ব লক্ষ করা যায় শ্রমিক সংগঠনগুলির মধ্যে। সংগঠনের তরফ থেকে সিলিকোসিস আক্রান্তদের জন্য কোনো ইস্তেহার বা বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়নি। তৎকালীন শ্রমিক সংগঠনগুলির, সিলিকোসিস কিংবা এই জাতীয় পেশাগত রোগের প্রতিরোধে বিশেষ ভূমিকার উল্লেখ ছিল না।বড় কোম্পানির যোগানদার হয়ে কাজ করতে যে প্রতিযোগিতার উপর টিকে থাকতে হয়েছিল সেটা মূলত নির্ভর করেছিল অর্থ উৎপাদনের প্রতিযোগিতা ও আইন বহির্ভূত ব্যবস্থা দিয়ে। এই একই কারণে শ্রমিকের স্বাস্থ্য ও জীবনের নিরাপত্তার স্বার্থে যে পুঁজি বিনিয়োগের প্রয়োজনীয়তা ছিল, তা মেনে চলতে খাদান মালিকদের একরাশ আপত্তি ছিল। এই ধরনের বিবরণগুলি থেকে পাথর উত্তোলনে আদিবাসী শ্রমিকদের দুর্দশার জন্য নিঃসন্দেহে দায়ী করা যায় মালিক শ্রেণি বা পুঁজিবাদী উৎপাদন পদ্ধতিকে।

পাথর খাদান থেকে নির্গত হওয়া ধুলোর পরিমাণ (৫০০মিটার/দৈনিক)[105]

পাথর ভাঙার ভিন্ন পদ্ধতি	অনিয়ন্ত্রিত ধুলোর স্তরের পরিমাণ (কেজি)	পাথর ভাঙ্গা চলাকালীন ক্রাশারের বাইরে ধুলোর মাত্রা	কেজি/দৈনিক	বাতিল ধুলো (কেজি)
প্রাথমিক ভাঙ্গন	০.২৫- ১২৫	০.২০	১০০	০.০৫- ২৫
গৌন ভাঙ্গন	০.৭৫-৩৭৫	০.৪৫	২২৫	০.০৩-১৫০
ক্ষুদ্র ভাঙ্গন	৩.০০-১৫০০	১.২০	৬০০	১.৮০-৯০০
পুনরায় ভাঙ্গন পর্ব	২.৫০-১২৫০	১.২৫	৬২৫	১.২৫-৬২৫
মিহি ধুলো	৩.০০-১৫০০	০.৭৫	৩৭৫	২.২৫-১,১২৫
মোট	৪,৭৫০	-	১,৯২৫	২,৮২৫

শ্রবণশক্তি হ্রাস

পাথর খাদান ও ক্রাশারে দীর্ঘদিন শ্রমিকদের কাজ করার ফলে শ্রমিকদের স্বাস্থ্যের বিভিন্ন ধরনের অবনতি লক্ষ করা গিয়েছিল। তারা যে শুধুই 'সিলোকোসিস' রোগে আক্রান্ত হয়েছিল তা কিন্তু নয়, 'সিলিকোসিস' সমস্যার পাশপাশি পাথর কাটা মেশিনের অত্যধিক শব্দ দূষণের ফলে মাথা যন্ত্রণা ও শ্রবন শক্তি হারিয়ে ফেলার তথ্য তৎকালীন স্বাস্থ্য রিপোর্ট ও ক্ষেত্র সমীক্ষার মধ্য দিয়ে উঠে এসেছিল। ক্ষেত্র সমীক্ষার মাধ্যমে খাদান শ্রমিকদের কথায়, তাদের পূর্ব পুরুষদের অনেকেই শ্রবণশক্তি হারিয়ে যাওয়া এবং চোখে ঝাপসা দৃষ্টির কারণ হিসাবে পাথর

105.*Report of the Dust pollution from Stone Crusher,* Hariyana and West Bengal, Government of India, 1899, Pp. 7-9.

খাদান ক্ষেত্রে কাজের উল্লেখ পাওয়া যায়।[106]শ্রমিকদের কাছে তাদের এই খনির পেশা যে ভয়াবহ আকার ধারন করেছিলতা তাদের সাথে সাক্ষাৎকারের মধ্যে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছিল। অর্ধেক খাদান শ্রমিকের আর্থিক দুর্বলতা থাকার ফলে ভালো চিকিৎসা করানোর ক্ষমতা তাদের ছিল না। তাদের এই পেশাগত রোগের বৃদ্ধির কারণ যে, স্বল্প মজুরী ছিল তা নিয়ে কোন দ্বিধা প্রকাশ করার স্থান ছিল না।[107] অন্য দিকে পরিবারের উপার্জন ক্ষম ব্যক্তির রোগাক্রান্ত হয়ে যাওয়া এবং তার চিকিৎসার খরচ বহন করতে গিয়ে সর্বস্বান্ত হয়ে যাওয়ার অর্থ হল পুরো পরিবারকে পঙ্গু করে দেওয়া তাই চিকিৎসার জন্য ব্যয় সাপেক্ষ খরচ তাদের পক্ষে করা সম্ভব ছিল না। সর্বস্বান্ত পাথর খাদানের আদিবাসী শ্রমিক পরিবারগুলি নিয়োগকারী সংস্থা বা মালিকের কাছে কোনো রকমের সাহায্য পেত না।[108] তাছাড়া এ ব্যাপারে খনি মালিক ও সরকারের তরফ থেকে কোনো সদর্থক উদ্যোগ ছিল না। খনি সংলগ্ন হাসপাতালের ব্যবস্থা না থাকার ফলে কর্মক্ষেত্রে শ্রমিকদের কাজ চলাকালীন দুর্ঘটনার প্রতিকার হিসাবে চিকিৎসার ব্যবস্থা নেওয়ার তথ্য উল্লেখিত হয়নি।

খনি ও খাদানে প্রানহানির আশঙ্কা ও মৃত্যুর পরিসংখ্যান

স্বাধীনতার পরবর্তীকাল থেকে ছোটনাগপুরের এলাকা বীরভূম সংলগ্ন এলাকায় ১২,০০০ পাথর খাদানের অস্তিত্ব লক্ষ করা যায়। মূলত এই ক্ষেত্র থেকেই অর্থ উৎপাদনের চেষ্টা করার পাশাপাশি শ্রমিকদের জীবিকা নির্বাহের ফলাফল ব্যক্তিগত নিরাপত্তার অভাব লক্ষ করা গিয়েছিল। খাদানের রিপোর্ট বিশ্লেষণ করার মধ্য দিয়ে সংশ্লিষ্ট স্বাস্থ্য ঝুঁকির পরিস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। স্বতন্ত্র মানব শক্তির উচ্চ চাহিদা আদিবাসী খাদান শ্রমিকদের আরও একটি বন্দী অবস্থার মধ্যে যুক্ত করেছিল। পাথর উত্তোলনের জন্য আদিবাসী শ্রমিকদের জীবনে ঝুঁকি সহ দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় বিছিন্নতা লক্ষ করা গিয়েছিল।পাথর উত্তোলনের কাজে অধিক পারিশ্রমিক পাওয়া

---

106. Tucker.D.M,W.K.C. Morgan, *Effects of silica exposure among workers.* Applied occupational and environmental hygiene 10(12): DOI 10.1080/1047322X, 10389099, 1995.
107. ব্যানার্জি. সুবোধ(সম্পা.), *গণদাবী,* সোশ্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া, (বাংলা সাপ্তাহিক পত্রিকা), ৭৪ বর্ষ, ৪১ সংখ্যা ৩রা জুন,কলকাতা, ২০২২, পৃ. ৩

108. Ganesan. Dr S, Mr V Marichamy, *Health Hazards of Stone Crusher Workers in Rajapalayam Taluk- A Case Study,*Vol- 5, Issue- 1, Dec 2016, P. 4-8.

যায় এই ভেবেই তারা এই কঠোর পরিশ্রমের কাজে যুক্ত হয়েছিল কিন্তু কাজে যোগ দেওয়ার পরবর্তীকালে নিরাপত্তা হীনতার সম্মুখীন হয়ে উঠেছিল। খাদান শ্রমিকদের নিরাপত্তা না থাকায় পাথর খাদান বৃদ্ধির সাথে মালিকদের মুনফা দ্বিগুণ হয়ে উঠেছিল। এই সমস্ত খাদানে আদিবাসী শ্রমিকরা বৈধ ও অবৈধ দুই ভাবেই কাজ করত নিয়ত। অবৈধভাবে পাথর উত্তোলনের ফলে একের পর এক প্রাণহানির ঘটনা হয়ে উঠেছিল উদ্বেগজনক। খনি ক্ষেত্র গুলি শ্রমিকদের জন্য যে বিপদের আশঙ্কা ছিল তা খাদানের রিপোর্ট থেকে প্রকাশিত হয়েছিল। পাথর খাদানমালিকরা, খাদানগুলি প্রতিষ্ঠার আইন অমান্য করে ইচ্ছেমত পাথর উত্তোলন করার সুযোগ বেআইনি ভাবে চলত। পাথর বা শিলা বিস্ফোরণের জন্য সম্পূর্ণ অদক্ষ শ্রমের ব্যবহারে মালিকরা মুনফা উৎপাদন করত।[109] যদিও এ প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজনীয় যে, পাথর বিস্ফোরেনের সময় যে বারুদ ব্যবহার করা হত তা অবৈধভাবে বাইরে থেকে আনা হতযার পর্যাপ্ত লাইসেন্স খাদান মালিকদের কাছে থাকত না।এই ঘটনার প্রাসঙ্গিক, ১৯৪০ সালে যুক্তরাষ্ট্রের এক খনি ক্ষেত্রে পারমাণবিক অস্ত্র তৈরি করতে গিয়ে দিনেহ নামক বিশেষ আদিবাসী জনগোষ্ঠীর অসংখ্য শ্রমিকের প্রান নিহত হওয়ার কথা জানা যায়। কিছু বছর পরে যদিও এই খনি বন্ধ করে দেওয়ার তথ্য উঠে এসেছিল।[110]

খাদানে পাথর উত্তোলনের সময় বিস্ফোরণের আওয়াজের তীব্রতায় শ্রমিকদের বাড়ি, ঘর কম্পন হত। কম্পনের ফলে খাদান এলাকারঅধিকাংশ বাড়ি গুলি খুব অল্প সময়ের মধ্যে ভেঙ্গে যাওয়ায় খাদান সংলগ্ন আদিবাসীদের বসতি উচ্ছেদ করা হয়েছিল। বসতি উচ্ছেদের আতঙ্কে শ্রমিকেরা এলাকা ছাড়া হয়ে অন্য স্থানে স্থানান্তরিত হয়ে বসতি স্থাপনের উল্লেখ পাওয়া যায়। খাদান সংলগ্ন বাড়িগুলিতে ধস নামার ফলে মৃত্যুর আশঙ্কার মধ্যে দিন কাটার কথা শ্রমিক পরিবারদের কথার মধ্যেই প্রকাশ পেয়েছে।[111] খনি সংলগ্ন এলাকাগুলিতে ধস নামার মত

109.Gurundy. Games, *Report of Inspections of Mines in India,* Government of India, 1894, 1901, P. 165-166.

110.*খনি থেকে সৃষ্ট স্বাস্থ্য সমস্যা,* পরিবেশ স্বাস্থ্য বিষয়ক জনগোষ্ঠীর জন্য একটি সহায়িকা, ২০১২।

111.*Report of the Accident Death-rates ratio of annual morality from different causes of accidents, Coal and other mines in India,* West Bengal, Government of India, 1946-1965, P. 20-27.

ঘটনার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। এক কথায় বলতে গেলে খাদান শ্রমিকেরা,পাথরখাদান এলাকায় প্রানহানীর আশঙ্কা করেই দিন অতিক্রান্ত করত।[112]

প্রাণহানির আশঙ্কা থেকেই এই অঞ্চলে শ্রমিকের মৃত্যু হয়ে উঠেছিল নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। পাথর উত্তোলনের জন্য নির্দেশিত সতর্কতা এবং পূর্ব অভিজ্ঞতার প্রয়োজন শ্রমিকদের মধ্যে না থাকায় মৃত্যুর সম্মুখীন হতে হয়েছিল৷ অদক্ষ শ্রমিক হওয়ার ফলে আদিবাসী খাদান শ্রমিকদের কর্মক্ষেত্রে অসাবধানতার কারণে মৃত্যুর কথা জানা যায়।[113]শিলা স্তরের কঠিন প্রকৃতির কারণে, খনন এবং বিস্ফোরন প্রায়শই ফলহীন প্রমাণিত হত৷ অধিকাংশ অদক্ষ শ্রমিক বিস্ফোরক সংরক্ষণ ও চালনার কৌশল সম্পর্কে খুব কমই সচেতন ছিলেন। তাদের অক্ষমতা দুর্ঘটনার ভিন্ন ভিন্ন কারণ তৈরি করত। অতিরিক্ত মূলধন উপার্জনের লোভে এই অবৈধ কর্মকাণ্ড বন্ধ না হওয়ার কারণে শ্রমিকদের জীবনে ঝুঁকি মৃত্যুর কারণে পরিনত হয়েছিল৷যুগান্তর পত্রিকায় প্রকাশিত তথ্য দ্বারা জানা যায় যে, পাথর খাদানে বিস্ফোরণের সময় শ্রমিকের একটু অসাবধানতার কারণে মৃত্যুর আশঙ্কা লক্ষ করা যায়।এই ঘটনার শিকার অনেক শ্রমিক পরিবার ভোগ করলেও খাদান বা ক্রাসার মালিকরা তার দায়বদ্ধতাকে গুরুত্ব দেওয়ার প্রয়োজন মনে করতেন না৷স্বল্পকিছু মূল্যের বিনিময়ে এই রকম মৃত্যুর ঘটনাগুলিকে বন্ধ করে দেওয়া হত৷ পাথর উত্তোলন থেকে ভাঙার কাজে ভারবাহী শ্রমিকদের প্রয়োজন ছিল অধিক৷ পাথর ক্রাশিং বা ভাঙ্গার মেশিনে শ্রমিকদের অদক্ষতা বা সাবধানতার অভাবে মৃত্যু বা হাত, পা বাদ দেওয়ার তথ্য জানা যায়। ক্রাসারগুলি যন্ত্রপাতি চালিত হওয়ার ফলে খাদান শ্রমিকদের দক্ষতার প্রয়োজন পর্যাপ্ত পরিমানে ছিল না৷ অদক্ষ শ্রমিকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা না থাকার ফলে দীর্ঘদিন এই কাজে যুক্ত ব্যক্তিদের কাছে প্রশিক্ষণ নেওয়ার কথা ক্ষেত্র সমীক্ষার মধ্যে উঠে এসেছিল। এই কাজগুলিতে অবাধ শ্রমের প্রয়োজনের জন্য আদিবাসীদেরকে বীনা দক্ষতায় কাজে নিযুক্ত করা হয়েছিল৷ খনি মালিকদের কাছে অর্থ উপার্জন এতটাই গুরুত্বপূর্ণ ছিল যে, দক্ষ ও অদক্ষ শ্রমিকদের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করার কথা গুরুত্বপূর্ণ ছিল না।পাথর

112. সাক্ষাৎকার-হেমব্রম.টিকু, সময় ৫;৫০, বুধবার, ২০১৯, রামপুরহাট পাথর খাদান। (পাথর খাদান শ্রমিক)।
113.*Report of unemployment and employment in West Bengal,* Kolkata, West Bengal, 1972, P. 34, 56, 66.

খাদানে পাথর ভাঙ্গার সময় কোন অসতর্কতার কারনে মৃত্যু হলে সেই পরিবারকে কয়েক হাজার টাকার বিনিময়ে দিয়ে সম্যসার সমাধান করে দেওয়া হত। কর্মীদের ক্ষতিপূরণ আইন বা (এমপ্লয়েড কম্পেন্সেশন অ্যাক্ট) ১৯২৩ পাশ হওয়ার পর স্বাধীনতা পরবর্তীকালে এই নীতির উপর জোর দেওয়া হয়নি। যার ফলে খনি ও ফ্যাক্টারির মালিকরা কর্মীদের ক্ষতিপূরণ নিয়ে খুব একটা চিন্তিত ছিলেন না।পাথর খাদানে কর্মচারীদের মৃত্যুতে ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ করত খাদান মালিকের কমিটির সদস্যরা অর্থাৎ সরকারী কোনো সাহায্য শ্রমিকদের পাওনা ছিল না। শ্রমের উপস্থাপনা এবং তার শর্তগুলি এমনভাবে খাদানে রূপরেখা দেওয়া হয়েছিল যেন এইগুলি সম্পূর্ণরূপে বিমূর্তভাবে জীবিত শ্রমের বাহ্যিক রূপ গঠন করেছিল। একজন শ্রমিকের জীবনে খাদানে ব্যয়িত শ্রমের মুহূর্তগুলি ছিল খুব শোচনীয়। প্রকৃতপক্ষে, খাদান শ্রমিকরা স্থানীয় মালিকানাধীনে নিয়ন্ত্রিত ছিল বলেই শ্রম জোরপূর্বক প্রয়োগ করানো হত। শ্রম আইন শিথিল করার লক্ষেছোটো খাদানে বা কারখানায় শ্রম সম্পর্কিত আইন ও নিয়মাবলী পরিবর্তনের জন্য সংসদে প্রস্তাব রাখা হয়েছিল।এছাড়াও কারখানা ও খনির শ্রমিকদের পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য সম্পর্কিত আইনগুলি যেমন, ১৯৪৮, ১৯৫২, ১৯৫৩ সালের ওয়ার্ক ম্যান কন্সম্পেশন অ্যাক্ট সহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ শ্রম আইনগুলি সংশোধন করার প্রস্তাব দিয়েছিল কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভা। বিভিন্ন শ্রম আইনে অজস্র ধারা ও উপধারা, সংশোধন আইনকে জটিল করে তুলেছিল। শিল্পপতিদের যে সব প্রস্তাব সরকারের কাছে প্রস্তাবিত ছিল তাতে সহজেই অনুমেয় হয় যে প্রস্তাবিত দাবিগুলি গুরুত্ব পেলেও শ্রমিক স্বার্থে রচিত হয়নি।[114]

114.কর. শমিত কুমার,*সিলিকোসিস মৃত্যুর ঢল,*চার নং প্ল্যাটফর্ম একটি ব্যাতিক্রমী ওয়েব পত্র, ২০০৪।

পাথর খাদানে বা ক্রাসারে যুক্ত আদিবাসী কর্মচারীদের মৃত্যুর তালিকা (১৯৫০-৬০)[115]

ব্যাক্তির নাম	কি কারণে মৃত্যু	কোনো রকম সাহায্য পেয়েছিলেন কিনা
বুলি সোরেন	মেসিনে হাত কেটে ক্ষতিগ্রস্ত	চিকিৎসার সাহায্য পেয়েছিলেন।
মানিক টুডু[116]	পাথর ব্লাস্টিং এর সময় মৃত্যু	আর্থিক সাহায্য পেয়েছিলেন ১ লক্ষ টাকা।
শিখর হাসদা	একই	আর্থিক সাহায্য পেয়েছিলেন ১.৫ লক্ষ টাকা
ঝিলিক হাসদা	ফুসফুস আক্রান্ত	কাজ ছেড়ে দেওয়ায় সাহায্য পাননি।
দুলু টুডু	একই	টিবি রোগের চিকিৎসার সাহায্য পান।
মনিকা হাসদা	একই	স্বল্প অর্থ সাহায্য পান।
রামু সোরেন	খাদানে অসাবধানতায় কাজ করার ফলে মৃত্যু	আর্থিক সাহায্য পান ৫০,০০০ টাকা।
সঞ্জীব হেমব্রম	পাথর ব্লাস্টিং এর সময় অসাবধানতায় মৃত্যু	আর্থিক সাহায্য পান ৫০,০০০ টাকা।
[117]**শিখা মানকি**	কিডনি সংক্রান্ত কারণে মৃত্যু	আর্থিক সাহায্য পাননি।
নলিন বেসরা	পাথর ধসের কারণে মৃত্যু	আর্থিক ক্ষতিপূরণ তার পরিবারকে দেওয়া হয়নি।
বুধু বোরা[118]	পাথর মেসিনে কাজ করতে গিয়ে অসাবধানতায় মৃত্যু	আর্থিক সাহায্য পায়নি।
সোনামনি কিস্কু	টিবি রোগে আক্রান্ত	আর্থিক সাহায্য পাননি।

115.সাক্ষাৎকার-দত্ত. ইন্দ্রজিৎ, রমেশ সোরেন, দুপুর ২:৩০, রামপুরহাট এবং বাহাদুরপুর, ২০১৯।

116.সাক্ষাৎকার-চক্রবর্তী.বীরেন, (খাদানম্যানেজার) দুপুর ২:৩০, দুমকা, ২০১৯।

117.*Report of the Showing the no of Employs and Deaths at Coal, Gold, Mica and Other mining,* Bihar and West Bengal, Government of India, 1970, P. 21-25.

118.সাক্ষাৎকার-মণ্ডল. শুভাশিস, রবি দাস, দুপুর ১:০০ টা, পাকুড়, ২০১৮।

পাথর খাদানে আদিবাসী মহিলা শ্রমিকের অবস্থান

কয়লা খনিতে আদিবাসী মহিলাদের উপর শোষণের ইতিহাস পূর্ববর্তী অধ্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে ঠিক তেমনই স্বাধীনতা পরবর্তীকালে পাথর খাদানের খনিতেও আদিবাসী নারী শ্রমিক শোষণের ইতিহাস পুনরায় পরিস্ফুটিত হয়েছিল। পাথর খাদানের অবস্থান, প্রকৃতি, প্রক্রিয়াজাতকরণ কৌশল, বিপণন ব্যবস্থা, স্থানীয় সামাজিক পরিবেশ, বিকল্প পেশার প্রাপ্যতার উপর ভিত্তি করে ছোট অসংগঠিত খাদান গুলি আদিবাসী শ্রমিকদের মধ্যে মহিলারা বঞ্চনার শিকার হয়েছিল।[119] খাদান ক্ষেত্রের মত ছোট ছোট খনি গুলিতে খনির প্রক্রিয়াকরণসম্পর্কিত পদগুলিতে, আদিবাসী মহিলাদের যোগদান ১০% থেকে ৫০% পর্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছিল।ছোটনাগপুর খনি অঞ্চলের বিপুল সংখ্যক মহিলা খনি শ্রমিক অসংগঠিত ভাবে খাদান ক্ষেত্রে শ্রম- নিবিড় ভাবে জড়িত থাকার প্রমাণ পাওয়া যায়। বীরভূমের মত খাদান ক্ষেত্রে পুরুষ শ্রমিক সহ খনন কার্যক্রমে নারী শ্রমিকদের অংশগ্রহণ ৪০% হার বৃদ্ধি উল্লেখযোগ্য ছিল। পাথর খাদানে বয়স্ক মহিলা শ্রমিকদেরও ভিড় লক্ষ করা যায়। সিউড়ি, রাজনগর এবং ইলামবাজার থানার প্রতিটি জেলার মোট সাঁওতালদের মধ্যে ৬ শতাংশেরও বেশি মহিলা শ্রমিক এই কাজে যুক্ত ছিল। আদিবাসী মহিলা শ্রমিকদের সাক্ষরতার পরিমাণ ছিল খুব নিম্ন অর্থাৎ এই জেলার উপজাতীয় জনসংখ্যার মধ্যে প্রতি এক হাজার আদিবাসী মহিলাদের মধ্যে মাত্র ৫ জন সাক্ষর হিসাবে ১৯৬১ সালের আদমশুমারির রেকর্ড থেকে জানা যায়। গ্রামীণ এলাকায় চিত্রটিও ছিল প্রায় সমান।

পাথর খাদান অঞ্চলে আদিবাসী মহিলা শ্রমিকদের নিয়োগ ছিল খুবই জনপ্রিয় কারণ, তারা বেশি নিয়মিত এবং নির্ভরযোগ্য এবং অতিরিক্ত মদ্যপানে লিপ্ত না হওয়ার তথ্য উঠে এসেছিল। পরিবারের খাদ্য নিরাপত্তাহীনতা, সন্তানদের খাবার যোগানোর দায়িত্ব তাদের উপরেই ছিল।[120]খাদান মালিকেরা আদিবাসী মহিলাদের উপর নিয়ন্ত্রণ বজায় রেখেছিল।প্রসূতি কালীন

---

119. Ofosu. George, David Sarpong, *Gender and Artisanal and small scale mining: Exploring women's livelihood and occupational roles in formalized settings,* journal of rural Studies, Vol-96, December 2022, Pp. 121-128.

120.Mondal.Priyabrata, suvankar Paul and Abhijit Das,*Impacts of stone crushing work on the Tribal Labourers of Birbhum District, West Bengal- A Socio- cultural*

অবস্থায় তাদের কোনো মজুরী প্রদান করা হত না তাই তাঁদেরকে বাধ্য হয়ে কাজ ছেড়ে দিতে হত। কাজের সঠিক সময় নির্ধারিত ছিল না এছাড়াও মহিলাদের গর্ভাবস্থায় সঠিক ছুটি দেওয়ার কোন ব্যবস্থা ছিল না।প্রসূতিদের কোনো সাহায্য মালিক বা সরকার থেকে দেওয়া হত না। মহিলা শ্রমিক শ্রেণি শোষণের পরিচয় স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল পাথর খাদানের যুক্ত কর্মরত সাঁওতাল মহিলা শ্রমিকদের যৌন হেনস্থার মধ্য দিয়ে।এই আসামাজিক কার্যকলাপে আদিবাসী শ্রমিক মহিলাদের হতে হত খাদান মালিকের বিলাসের সঙ্গি। যদিও ক্ষেত্র সমীক্ষার ভিত্তিতে যৌন নিগ্রহের কথা বারংবার মহিলা শ্রমিকদের কথায় উঠে এসেছিল। সেইপ্রেক্ষাপটথেকেসাঁওতালমহিলা শ্রমিকদেরবৈষম্যেরস্বীকার হওয়ার পাশাপাশি নারী শ্রমিকদের উপর ঘটে চলা শারীরিক অত্যাচার তাদের জীবনকে ছন্দহীন করে তুলেছিল।[121]শোষণের লেলীহানশিখাগ্রাসকরেছিলআদিবাসীমহিলা শ্রমিকদের জীবনকে।সামান্য কিছুঅর্থেরবিনিময়ে সাঁওতাল মহিলা শ্রমিকদের শরীরকে সস্তা পণ্যের ন্যায় সহজলভ্যকরে তুলেছিল।স্বল্প মজুরির কাজে শারীরিক প্রয়োজনীয়তার বিষয়টি মুখ্য হয়ে উঠেছিল।অশিক্ষিত সাঁওতাল মহিলাদের উপরে অত্যাচারের পরিমাণ বৃদ্ধি পেলে সাঁওতাল পুরুষেরা এর প্রতিবাদ করেছিল কিন্তু সমস্যার সমাধান হয়নি।তৎকালীন সময়েমালিকের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা ছিল অর্থহীন।[122]অর্থনৈতিকঅগ্রগতির করার নাম করে পাথর খাদান মালিকদেরঅত্যাচারবর্তমানেও ক্ষেত্র সমীক্ষার মধ্য দিয়ে প্রস্ফুটিত হয়েছিল।[123]এ প্রসঙ্গে হেইডি হার্টম্যানের কথা স্বীকার করা যায় যে, পুঁজিবাদীদের সাথে পিতৃতন্ত্র পুরুষ ও নারী শ্রমিকের শ্রেণিবদ্ধ সম্পর্ক তৈরি হয়েছিল যেখানে পুরুষেরা প্রভাবশালী এবং মহিলারা অধস্তন ছিল।[124]পুঁজিবাদের পূর্বে, পিতৃতান্ত্রিক

---

*Anthropological study,*Journal of Humanities and Social Science, Vol- 27, Issue-2, series 5 (february-2022), P. 13-25.

121. সাক্ষাৎকার- টুডু. বুধু, পাথরখাদানশ্রমিক,সিউড়ি, দুপুর২:৩০২৩/০৫/২০১৯এবং মানিকসোরেন, পাথরখাদানশ্রমিক, বারোমাসিয়া, সকাল৯:৪৫, বীরভূম, ১২/১২/২০২১।

122. Hartmann. Heidi,*Capitalism, Patriarchy and job segregation by sex, Women and the workplace: The implications of Occupational Segregation (Spring, 1976),*Vol.1, No. 3, Pp. 137-169.

123.সাক্ষাৎকার-দত্ত. ইন্দ্রজিৎ, এবং রমেশসোরেন,দুপুর ২;৩০, রামপুরহাট এবং বাহাদুরপুর, ২০১৯।

124.লিয়নটিয়েভ. এ,*মারক্সীয় অর্থনীতি,*কলকাতা, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি, দ্বিতীয় পরিমার্জিত মুদ্রন, ১৯৭৯, পৃ ২৬৫

ব্যবস্থায় পুরুষেরা তার পরিবারে নারী ও শিশুদের শ্রম নিয়ন্ত্রণ করতএবং পুরুষেরা সেই নিয়ন্ত্রণের কৌশলগুলি শিখেছিল। বৃহত্তর বিনিময় ও উৎপাদন বিভাগের উপর ভিত্তি করে বীরভূমের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উত্থানের দ্বারা শ্রমিকদের বিভাজন লক্ষ করা যায়।[125]এই প্রথাগত শ্রমকে ভিত্তি করে সামাজিক সম্পর্কের জটিলতা বৃদ্ধি করে আদিবাসী সমাজ ও বর্ণ হিন্দুদের মধ্যে ফাটল ধরেছিল।[126]এই পরিস্থিতিতে ব্যক্তিগত অবসাদ এবং পুরো আদিবাসী জনগোষ্ঠীর মধ্যে মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যা বৃদ্ধি করেছিল।[127]

পাথর খাদান ও ক্রাসার সংক্রান্ত প্রাকৃতিক পরিবেশ দূষণ

পাথর উত্তোলনে এই স্থানটি সর্ব ক্ষেত্রে আদিবাসী শ্রমিকদের পাশাপাশি পরিবেশের উপর বিরুপ প্রভাব ফেলেছিল। পাথর খাদান তৈরি হওয়ার পর বীরভূমের প্রাকৃতিক পরিবেশ দুষিত হয়েছিল অধিক পরিমাণে। খাদান ও ক্রাশারের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে দূষণের মাত্রা বৃদ্ধি পেয়েছিল। খাদানগুলি থেকে পাথর উত্তোলনের ফলে বিস্তীর্ণ গভীর খাতে পরিনত হয়েছিল। এক একটি জমি থেকে পাথর উত্তোলন সম্পূর্ণ হলে জমির অবশিষ্ট কিছু থাকত না। পাথরের মত কাঁচামালকে বাজারিকরণ করতে পাথর কাটার মেশিনে পাথর নিষ্কাশন এবং চূর্ণ করার ফলে প্রচুর পরিমাণে অজৈব ধূলিকণাক্রমবর্ধমান মাত্রায় নির্গমনের মাধ্যমে পরিবেশের বায়ুর গুণমানকে ক্ষতিকারক ভাবে প্রভাবিত করেছিল। দূষিত বায়ু খনি পরিবেশের সংস্পর্শে থাকা শ্রমিকদের যেমন স্বাস্থ্যের যেমন ক্ষতি যেমন হয়েছিল ঠিক তেমনই বায়ুমণ্ডলে ধূলিকণার অত্যধিক ঘনত্ব দৃশ্যমানতাকে হ্রাস করে প্রাকৃতিক পরিবেশ ও খাদান সংলগ্ন কৃষি জমিরও ক্ষতি সাধন করেছিল।[128]যে সমস্ত অঞ্চলে পাথর খাদান বা ক্রাসার লক্ষ করা গিয়েছিল সেই

---

125. Rioux. Sebastien, *Capitalism and the production of uneven bodies: women, motherhood and food distribution in Britain 1850-1914,* Transactions of the institute of British Geographers, Vol. 40, No-1, 2015, Pp. 1-13.

126. Talib.Mohammad, *Writing labour Stone Quarry workers in Delhi*, Delhi, Oxford University Press, 2010, Pp. 50-54.

127. *খনি থেকে সৃষ্ট স্বাস্থ্য সমস্যা,* পরিবেশ স্বাস্থ্য বিষয়ক জনগোষ্ঠীর জন্য একটি সহায়িকা, ২০১২।

128. *The west Bengal mining settlements (Health and Welfare Bill, 1962- 1964),*The Report of the joint Committee with the bill embodying amendments, 30th July, 1965, P. 10-14.

সমস্ত স্থানে মালভূমি এলাকার ভূমিরুপ পরিবর্তিত হয়ে কৃষি জমিতে উর্বরতা হ্রাস পেয়েছিল। পাথর এর চাহিদা ক্রমশ বৃদ্ধির ফলে গ্রামগুলি নগর পরিকল্পনার ভাবনায় নিমজ্জিত হয়েছিল।[129]বীরভূমের রামপুরহাটের পশ্চিমে খাদান ও ক্রাশারের সংখ্যা বৃদ্ধি পেলে, পশ্চিম দিক থেকে ক্রাসারের পাথর কুচির কালো ধুলো গোটা শহরে পাতলা কালো রঙের আস্তরন পার্শ্ববর্তী শহরকে ঢেকে রেখেছিল।[130]ধুলোর অন্ধকারে সেখানকার পরিবেশকে ও শুদ্ধ বাতাসকে কলুষিত করে তুলেছিল।ধুলোর আস্তরণে পরিবেশ দুষিত হওয়ার পাশাপাশি স্থানীয় জল দুষিত হওয়ার পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছিল ও পানীয় জলের স্তর হ্রাস পেয়েছিল।[131] পার্শ্ববর্তী নদীগুলিতে বিশেষত নদী প্রবাহের বেগ এবং নদীর জলের গুণমানতাকে হ্রাস করেছিল। জলস্তর নিচে নেমে যাওয়ার ফলে কৃষিজীবী বীরভুমের চাষ আবাদের অবনতি ঘটার উল্লেখযোগ্য তথ্য উল্লেখ করা যায়।জলের ঘাটতি জমিকে পতিত এবং পশুপালনের অনুপযোগী করে তুলেছিল। প্রবাহিত জলের মধ্য দিয়ে সালফায়েড যুক্ত আয়রন ও বীরভূমেরপাথর খাদান অঞ্চলের মাটিতে আর্সেনিকের পরিমান বৃদ্ধির ফলে চাষের ক্ষতি করেছিল।[132]অর্ধেকেরও বেশি (৮৩%) স্থানীয়জনমত থেকে অবগত হওয়া যায় যে, ধুলো কণার মিশ্রণ স্থানীয় পরিবেশকে দূষিত করার কথা।[133]বায়ুমণ্ডলে ধূলিকণার ঘনত্ব বৃদ্ধি ও পরিবেশের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পরিবেশকে অস্বাস্থ্যকর করে তুলেছিল। এই ধরনের ধূলিকণার বর্ষণ মাটিকেও দূষিত করেছিল এবং এলাকার উদ্ভিদ প্রজাতির অনেকাংশে বিলুপ্ত প্রায় ছিল। সমস্যার ভিন্নতা দেখা দিলেও পাথর খাদান মালিকদের কোনো ভ্রূক্ষেপ ছিল না। স্থানীয় মালিক বা পুঁজিপতিরা ক্ষমতাবান পাথর খাদান মালিকদের স্বার্থের কাছে শ্রমিকদের স্বার্থ ক্ষুন্ন হয়েছিল। কালেক্টরের অনুমতি পত্র খাদান

129.সাক্ষাৎকার- ঘোষ.বিপুল, সময়- ১১.০০, নলহাটি (গ্রাম বাহাদুরপুর), ২০১৯।

130.বাগদী.শ্যামচাঁদ,*রামপুরহাটের ইতিহাস,*কলকাতা, কাঞ্চীদেশ প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ ২০১৩, পৃষ্ঠা সংখ্যা-৭২।

131. *Report of the Ground water pollution studies in India,* West Bengal,Government of India, May 1980, P.10-15.

132. Singh.Umesh Kumar, *Pathway of Arsenic and other toxic metals in water and soil around Rakha and Mosabani mines of Jharkhand and Alluvial belt of West Bengal,* Unpublished Research, Delhi, Jawaharlal Nehru University, 2007. Pp. 270-275.

133. Singh.Dr. B, *Environment pollution in mines and mining area, Dhanbad,* Government of India, 1986, P. 5-7.

ও ক্রাশার গঠনে ছাড়াও কোনো রকম গাছ কাটা যাবে না বলে নিয়মাবলীতে উল্লেখ করা হয়েছিল।[134]এই নিয়ম অমান্য করে অবাধে গাছ কাটা চলেছিল খাদান তৈরির জন্য। বীরভুম রাঢ় মালভূমির অন্তর্গত হলেও মালভূমিকে দ্রুত গ্রাস করতে শুরু করেছিল পাথর খনি গুলি। পাথর খনি বা খাদানে ধুলো হ্রাস করার যন্ত্রপাতি না থাকায় ক্রাসারের সংখ্যা ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাওয়ার সাথে সাথে ধুলো উৎপাদনের পরিমাণ ও বৃদ্ধি পেয়ে চলেছিল। পাথর নিষ্পেষণ বিভাগের প্রভাব, সমীক্ষার মধ্য দিয়ে ঝুঁকিপূর্ণ অঞ্চলগুলি পরিস্ফুট হয়ে উঠেছিল।[135]

পাথর খাদান আদিবাসী শ্রমিক সংগ্রাম

পাথর খাদান ও ক্রাশারের নীতি কাঠামো অনুসরণ করে যৌথ উদ্যোগে বিদেশী কোম্পানি থেকে স্থানীয় পুঁজিপতিদের প্রতিনিধিত্ব করার মধ্য দিয়ে পাথর উত্তোলনে আদিবাসী শ্রম শোষণ অবাধে চলেছিল। পুঁজিবাদী ব্যবস্থার আওতায় সংগঠিত ও অসংগঠিত ক্ষেত্রগুলিতে ৯৫ শতাংশের অধিক আদিবাসী শ্রমিক অর্থনীতির দমন পীড়ন থেকে মুক্ত হতে পারেনি। তারা তাদের স্বল্প মজুরী, স্বাস্থ্য ও জীবনের সুরক্ষার কথা না ভেবেই খাদানের মত মারনক্ষেত্রে যোগ দিতে এক প্রকার বাধ্য হয়েছিল। জাতি- বর্ণব্যবস্থার অন্তরদ্বন্দ্বে দলিত হয়ে অধিকাংশ আদিবাসী শ্রমিককে তাদের শ্রমশক্তি বিক্রিতে বাধ্য করা হয়েছিল। পাথর খাদানের মত পুঁজিবাদী সংগঠনের উৎপত্তির পশ্চাতে রাজ্য সরকার গুলির সচেতনতা লক্ষ করা যায়নি তা না হলে অতিরিক্ত মুনফার লোভে কয়লা খনির মত খাদান শিল্পের বিকাশ অসম্ভব ছিল। শিল্পের উৎপাদন খরচ বাদ দিয়ে যে মুনফা অবশিষ্ট থাকত তা একমাত্র মালিকের প্রাপ্য ছিল। এই উৎপাদন বৃদ্ধির সাথে ধনতান্ত্রিক শোষণ বৃদ্ধি পেয়ে চলেছিল। এই সমস্ত সমস্যাকে কেন্দ্র করে খাদানের আদিবাসী শ্রমিকরা সংগঠিত হয়েছিল। পুঁজিপতি শ্রেণির উৎপাদন ব্যবস্থায় অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতির ব্যবহার শ্রমিকদের কাজ থেকে বিতারিত করা হয়েছিল। এই সমস্ত কারণে আদিবাসী শ্রমিকদের১৯৫০-৬০ সাল থেকেই কাজ বহাল রাখার জন্য প্রতিবাদে অগ্রসর হওয়ার ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায়।খাদান ক্ষেত্রগুলির জমি আদিবাসীদের থেকে জবরদস্তিমূলক

134.*The Bihar and Orissa Waste Lands Manual (1918),* Published under the Authority of the Board of Revenue Bihar and Orissa, 1918, P. 9-11.

135. *Ground water pollution studies in India,*West Bengal, Government of India, May 1980, P. 20-25.

নেওয়ার ফলে আদিবাসী শ্রমিকরা তাদের দাবী ধর্মঘটের মধ্য দিয়েই প্রকাশ করেছিল। অন্যায়ভাবে শাস্তি দেওয়ার বিরুদ্ধেও শ্রমিকেরা শুধু প্রতিবাদ জানাতে পারত। বাংলা ও বিহারের উড়িষ্যার ম্যাঙ্গানিজ, চুনাপাথর, লোহা খনিতে শ্রমিক উপযোগী আইনগুলি প্রসিদ্ধ হলেও ছোটনাগপুরের পাথর খাদান এলাকাতে কোন নিয়ম প্রচলিত না হওয়ায় শ্রমিকরা প্রতিবাদে যুক্ত হয়েছিল।খাদান বা ছোট খাদান সম্পর্কিত আইন তৈরি হলেও তা অমান্য করা হয়েছিল। বেআইনি ভাবে খাদানের বৃদ্ধিতে ক্ষেত্রগুলি নিয়ন্ত্রিত হত পুরোপুরি ভাবে বেসরকারি বা পুঁজিপতিদের মালিকানাধীনে।[136]খনি শিল্প আইনে বলা হয়েছিল যে, শিল্প বিরোধের পর্যায়ভুক্ত নয় এমন ক্ষেত্রে শ্রমিক ছাঁটাই এর বিরুদ্ধে ধর্মঘট করা বেআইনি বলে গণ্য হবে। শ্রমিক সংক্রান্ত বিলে পরিষ্কার ভাবে উল্লেখিত ছিল যে, কোন শ্রমিককে উপযুক্ত কারণ দেখিয়ে চাকুরি হতে অপসরণ করলে তা শিল্প বিরোধের পর্যায়ে আসবে না। এই নিয়মের ফলে, যে কোন সময়ে শ্রমিককে কাজ থেকে নির্গত করলেও মালিকদের বিরুদ্ধে শ্রমিকদের অভিযোগ বা যেকোন প্রতিবাদ রাজনৈতিক ভাবে বেআইনি বলে ঘোষিত হত"।[137]খাদান শ্রমিকেরা তাদের চাহিদা পূরণের জন্য সংগ্রামের সম্মুখীন হয়েছিল। সামাজিক ও শ্রমিক সংগঠনগুলির কর্মক্ষেত্রে পেশাগত সুরক্ষা, স্বাস্থ্য এবং শ্রম অধিকার সুনিশ্চিত করার লক্ষ্যে কিছু ধর্মঘট ও প্রতিবাদের উল্লেখ পাওয়া যায়।বীরভূমে ১৯৩৮-৪৭ সালের প্রেক্ষাপটে গড়ে উঠা কমিউনিস্ট আন্দোলনে লক্ষণ মুরমু ছিলেন একজন উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব।এছাড়াও খনি ও খাদান এলাকায় শ্রমিকদেরক্ষতি, নিজেদেরকে রক্ষা করার অধিকার ও খনি ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য শ্রমিকরা দাবি সোচ্চার হয়েছিল। খাদান শ্রমিকরা বিশেষ করে আদিবাসী জনগোষ্ঠীর নিরাপত্তা সুযোগ কিছু ছিল না।খাদান ও ক্রাশার কর্মীদের খনির বিপদ থেকে রক্ষার জন্য প্রশিক্ষণের প্রয়োজন ছিল তা করা হয়নি।[138]জমি পুনরুদ্ধার কর্মসূচির ব্যবস্থাপনার প্রশ্নে স্থানীয় আদিবাসীদের উপর হুমকি দেখা দিত। অনেক্ষেত্রে ১০ বছরের চুক্তিতে মালিকানা মূল

136. *List of Mines other than coal mines worked under the Indian Mines act, 1901,*British Government India, 1915, Pp. 5, 6.

137. ব্যানার্জি, সুবোধ(সম্পা.),*গণদাবী,* সোশ্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া, (বাংলা সাপ্তাহিক পত্রিকা), প্রথম বর্ষ ১২ সংখ্যা, কলকাতা,১লা এপ্রিল ১৯৫০, পৃ.৫

138. *Report of the Development needed of the Tribal People,*West Bengal, National council of educational research & training,1971, P. 5-10.

মালিকদের কাছে ন্যাস্ত করা হত। এইরকম খাদান মালিকদের অনুসন্ধানপশ্চিমবঙ্গের বীরভূম জেলার নলহাটি ব্লক ও বাহাদুরপুর গ্রামে তা লক্ষ্য করা গিয়েছিল।

খাদান শ্রমিকদের মধ্যে, দারিদ্র্য দূর করার জন্য সংগঠিত সংগ্রামের একটি আপেক্ষিক অনুপস্থিতি ছিল।খনি শ্রমিকদের প্রতি খনি মালিকদের নির্যাতন এবং সম্পদের উপর নিয়ন্ত্রণের জন্য সংগ্রামের সম্মুখীন করে তুলেছিল।শ্রমিকদের সংগঠিত প্রতিবাদে বা ধর্মঘটের মাত্রা সবচেয়ে অধিক ৬ মাস পর্যন্ত চলত। এই ক্ষেত্রে ৬ মাস বীনা কাজে বসে থেকে ধর্মঘট চালিয়ে যাওয়া আদিবাসী শ্রমিকদের জীবনকে বেকারে পরিনত করার দিকে এগিয়ে গিয়েছিল।[139]পাথর শিল্প অর্থনীতিতে ধর্মঘটের ফলাফল বীরভূম জেলার আদিবাসী সাঁওতালদের সাথে অ- আদিবাসীদের দ্বন্দ্ব লক্ষ করা গিয়েছিল। এই দ্বন্দ্ব প্রথম থেকে থাকলেও পরবর্তীকালেতা বৃদ্ধি পেয়েছিল। খাদান শ্রমিকদের সংগঠিত ইউনিয়ান গঠন লক্ষ করা যায়নি। J. Stone& B.I.C. Employees Union নামে একটি ট্রেড ইউনিয়ানের সন্ধান পাওয়া যায়, যার সদস্যসংখ্যা ছিল ১৩ জন পুরুষ ও ৪৭ জন ছিল মহিলা আদিবাসী শ্রমিক।[140] ১৯৬০ সালের পর পাথর খাদান ট্রেড ইউনিয়ানের সংখ্যা ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পেয়েছিল ঠিক তেমনি খাদানে ও ক্রাশারের শ্রমিকদের ধর্মঘটের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছিল। খনি ক্ষেত্রে একের পর এক ধর্মঘট সংগঠিত হওয়ার ফলেপাথর খনি শ্রমিক ইতিহাসে গতি তরান্বিত হয় যা পরবর্তী অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

পর্যবেক্ষণ

ছোটনাগপুর মালভূমিতে ১৯৪০ সালের সময় থেকে ভিন্ন ভিন্ন খনিজ খনির সন্ধান পাওয়া গেলেও কয়লার পাশাপাশি পাথরের মত বড় অসংগঠিত দ্বিতীয় ক্ষেত্র লক্ষ করা গিয়েছিল।

139.চৌধুরী.অরুন,*বীরভূম জেলার কমিউনিস্ট আন্দোলনের গঠন ও ব্যক্তিত্ব,*কলকাতা, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি, পৃ. ১২৪-১৩৫

140. *Government of West Bengal Labour Directorate Annual report on the working of the Indian trade Unions act 1926,* for the ending 31st march 1954, Alipore, West Bengal Governmental press, 1956, P. 10-15.

বীরভুম অঞ্চলের পাথর খাদানে আদিবাসী ‘খাদান’ শ্রমিকদের জীবন ঔপনিবেশিক যুগে কয়লা খনির সাথে সাযুজ্যকরণ খুঁজে পাওয়া যায়।আসলে আদিবাসী জনজাতিদের উপর স্থানীয় পুঁজিপতিদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে একইভাবে পাথর খাদানগুলি প্রসারিত হয়েছিল। জাতীয় ও স্থানীয় অর্থনীতিতে বারংবার পুঁজিপতিদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা হয়েছিল সেই চিত্র এই ইতিহাস বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে প্রতিভাত হয়েছিল। তাই উপরিক্ত আলোচনার মধ্য দিয়ে বীরভূমের বিস্তারিত পাথর খাদানের শ্রমিক নিয়ে আলোচনা স্পষ্ট করার চেষ্টা করা হয়েছে।এই অধায়টি ১৯৪০ থেকে ১৯৬০ সাল পর্যন্ত ২০ বছরের পাথর খাদানে আদিবাসী শ্রমিক শোষণের ইতিহাস তুলে ধরা হয়েছিল। এই অধ্যায়ে বীরভূমের পাথর খাদানের ইতিহাস ১৯৬০ সাল পর্যন্ত করা হয়েছে কারণ উক্ত সরকারি রিপোর্টের মাধ্যমে জানা যায়, পাথর খাদানের ইতিহাসে আদিবাসী শ্রমিকদের পাশাপাশি হিন্দু ও মুসলিম শ্রমিকদের অংশগ্রহণ ১৯৬০ সালের পর ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পেতে শুরু করেছিল। আদিবাসী শ্রমিকদের পাশাপাশি হিন্দু ও মুসলিম শ্রমিকদের অংশগ্রহণ ভিন্ন ইতিহাস তৈরি করেছিল। বাঙালিভিন্ন অন্যান্য পুঁজিপতি শ্রেণি অর্থাৎ মারোয়ারি ব্যাবসায়ী শ্রেণির উদ্ভব হয়েছিল ১৯৬০ সালের পর থেকেই যার ফলে আদিবাসী শ্রমিকদের অবস্থান আরো শোচনীয় করে তুলেছিল। স্বাধীনতা লাভের পর দেশে শাসন পরিচালনায় গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলির কাঠামো তৈরি হলেও গণতান্ত্রিক দেশে মৌলিক অধিকারগুলি শ্রমিক শ্রেণির জন্য গ্রহণযোগ্য হয়নি। পাথর খাদান ও ক্রাশার আদিবাসী শ্রমিকদের সামাজিক অবস্থানকে তুলে ধরেছিল। আদিবাসী শ্রমিকদের কাছে গণতন্ত্র অর্থহীন হয়ে পড়েছিল তাঁর নমুনা এই অধ্যায়ে লক্ষ করা গিয়েছিল।

পঞ্চম অধ্যায়

উন্নয়নের প্রেক্ষিতে আদিবাসী ও আদিবাসী শ্রমিক প্রতর্ক (১৯৪০-১৯৬৫)

ঔপনিবেশিক শক্তি ও জাতীয়তাবাদী নেতাদের অন্তর্ভুক্তিতে খনি অর্থনীতিকে কেন্দ্র করে যেমন মুনফা উৎপাদিত হয়েছিল ঠিক তার পাশাপাশি আদিবাসী শ্রমের বাজার খনি অর্থনীতিকে উন্নত করেছিল। এই অর্থনীতিতে আদিবাসী শ্রমিকদের সংগ্রাম ও জীবিকা সম্পর্কে যে চিত্র পরিস্ফুটিত হয়েছিল তাতে উন্নয়ন শব্দটি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। ছোটনাগপুর মালভূমি এলাকার আদিবাসী কৃষক থেকে শ্রমিক হওয়ার প্রক্রিয়ার মধ্যে আদিবাসী শ্রমিকদের জীবন সংগ্রাম ও জীবিকা সম্পর্কিত যে চিত্র উঠে এসেছিল তা অনেকাংশে ছিল হতাশাজনক। স্বাধীনতা পূর্ব এ চিত্র আদিবাসী শ্রমিকদের জীবনে উন্নয়নের প্রসঙ্গে ধর্মঘট ও আন্দোলনের সম্মুখীন করে তুলেছিল। স্বাধীনতা পূর্ববর্তী দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতিতে আদিবাসী শ্রমিকদের যে অবস্থান তৈরি হয়েছিল তাতে 'উন্নয়ন' ছিল গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। স্বাধীনতা পরবর্তীকালে ছোটনাগপুরের খনি অর্থনীতিতে উন্নয়নের যে প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল তাতে আদিবাসী শ্রমিকদের উন্নয়ন নিয়ে ঐতিহাসিকদের থেকে রাজনৈতিক ব্যাক্তিদের প্রতিক্রিয়া এই অধ্যায়ের প্রথম ভাগে বিস্তারিত আলোচিত হয়েছে। স্বাধীনতা পরবর্তীকালে খনিতে শ্রমিকদের জন্য নিয়ম নীতিতে বিভিন্ন পরিবর্তন সংযোজিত হয়েছিল। সেই উন্নয়ন আদিবাসী শ্রমিকদের জীবনকে কতটা পরিবর্তিত করেছিল তা উন্নয়নের প্রেক্ষিতে বিচার করা এই অধ্যায়ের দ্বিতীয়তম মূল আকর্ষণ। ছোটনাগপুরের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অসমতার অবস্থানে যে সমস্ত ধর্মঘট সংগঠিত হয়েছিল তাতে ছোটনাগপুরের আদিবাসী শ্রমিকদের উন্নয়ন নিয়ে যে পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেছে তা এই অধ্যায়ের তৃতীয় ভাগে আলোচনা করা হয়েছে। এই অধ্যায়টি উন্নয়নের প্রেক্ষিতে আদিবাসী শ্রমিকদের পরিবর্তন নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলি বিশ্লেষণের মধ্যে আদিবাসী শ্রমিক শ্রেণির অর্থনৈতিক করুন অবস্থার কথা ঐতিহাসিক কৃষক সংগ্রামে[1] লক্ষ করা গেলেও উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগ থেকে একাধিক খনিজ খনি গড়ে উঠার মধ্য দিয়ে আদিবাসী শ্রমিকদের জীবন নতুন সংগ্রামের পথে অবতীর্ণ হয়েছিল। ছোটনাগপুর মালভূমি অঞ্চলের বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যায় কয়লা ভিন্ন তামা, লোহা,

---

1. রায়. সুপ্রকাশ, *ভারতের কৃষক- বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম,* কলকাতা, র‍্যাডিক্যাল প্রকাশন, প্রথম প্রকাশ জুলাই, ১৯৬৬, পৃ. ১০-১৭

ম্যাঙ্গানিজ, অভ্র, চুনাপাথর ও পাথর খাদানের সংখ্যা ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পেয়েছিল।[2] কয়লা ভিন্ন অন্যান্য খনি অঞ্চলে আদিবাসী শ্রমজীবীদের ভিড় বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং খনিজ শিল্প অর্থনীতিতে অধিকাংশ শ্রমিক নির্ভরশীল হয়ে উঠেছিল।[3] এই ক্ষেত্রে নির্ভরশীল হয়ে উঠার ফলে তারা অস্থায়ী শ্রমিক হিসাবে পরিচিত হতে থাকে কিন্তু খনি অঞ্চলের সমস্ত সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হওয়ার ফলে অসংগঠিত অবস্থানে আদিবাসী শ্রমিকদের উপর যে ক্রমাগত শোষণ চলেছিল তার ফলে ধর্মঘটের জন্ম হতে থাকে একের পর এক। এই ধর্মঘটে ট্রেড ইউনিয়ানের ভূমিকাও ছিল উল্লেখযোগ্য। স্বাধীনতা পরবর্তীকালে আদিবাসী শ্রমিকদের জীবনে ভিন্ন সংগ্রামের পথ উন্মোচিত হয়েছিল। একের পর এক আদিবাসী শ্রমিকদের সংগ্রাম ঐতিহাসিক থেকে রাজনৈতিকদের আলোচনায় চর্চিত হতে থাকে। অগণিত সরকারী অফিস ও সরকারী রেকর্ড থেকে প্রান্তীয় আদিবাসী শ্রমিক শ্রেণির অর্থনৈতিক জীবনের নানা তথ্য খুঁজে পাওয়া যায়। স্বাধীনতা পরবর্তীকালে অর্থনৈতিক উন্নয়ন নিয়ে যে ধরনের চিন্তা ভাবনা শুরু হয়েছিল সেই পর্যায়কে লক্ষ্য করে আদিবাসী শ্রমিকদের মত সাধারন মানুষের জীবনে পরিবর্তন নিয়ে একাধিক প্রশ্ন উঠেছিল। স্বাধীনতার স্বাদ ভারতবাসীর জীবনে পরিবর্তন এলেও ছোটনাগপুর মালভূমির আদিবাসী শ্রমিকদের নতুন নতুন সংগ্রামের পর্যায় পরিলক্ষিত হয় এবং এর প্রভাব তাদের জীবনধারাকে ঔপনিবেশিক যুগ থেকে আদৌও পরিবর্তিত করেছিল কিনা তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে এই অধ্যায়ে।

স্বাধীনতা পরবর্তী ছোটনাগপুর আদিবাসী শ্রমিক ইতিহাস চর্চা

আদিবাসীদের শ্রমিক ইতিহাস তৈরি হয়েছিল অনেকগুলি সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তনের মাধ্যমে। সমাজের কাঠামোগত রুপ থেকে অসংগঠিত শ্রমিক ও মজুর তৈরি হয়েছিল, তাঁদের সামাজিক ও আর্থিক পরিস্থিতির বিচার করতে গিয়ে দেখা যায় যে, গত চার দশকে ছোটনাগপুর মালভূমির শ্রমের বাজারের রুপান্তর ঘটেছিল। অসংগঠিত ক্ষেত্রে সামাজিক নিরাপত্তা যেমন ছিল না ঠিক সেইরকম সামাজিক স্বীকৃতি না থাকায় আদিবাসী শ্রমিক ইতিহাস স্বাধীনতা পরবর্তীকালে গতি পেয়েছিল। ঐতিহাসিকদের দৃষ্টিকোণে খনিক্ষেত্রে শ্রমিকদের অধিকার সম্পর্কীয় চিন্তা ভাবনা শুরু হয়েছিল। ঔপনিবেশিক যুগে খনির ইতিহাসের মধ্য দিয়ে

---

2. *List of non coal mine in India worked under the mines act,* Maneger of Publication, Delhi, Government of India, Delhi, 1952, P. 111-121.

আদিবাসী শ্রমিকদের শ্রম যেভাবে উন্মোচিত হয়েছিল স্বাধীনতা পরবর্তীকালে সেই ইতিহাস নিয়ে প্রশ্ন উঠতেই শ্রমিক বিশেষজ্ঞ ঐতিহাসিকদের মধ্যে সচেতনতা লক্ষ করা যায়। আদিবাসী শ্রমিক সম্পর্কিত ভিন্ন ভিন্ন নতুন সমস্যা উদ্ভাসিত হওয়ার ফলে ঐতিহাসিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। আদিবাসীদের সম্পর্কে প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে প্রচলিত ধারণাকে খন্ডন করা হয়নি সেই কারণেই আদিবাসী শ্রমিকদেরকে ইতিহাসের পাতায় নির্মাণ করতে অনেকটা সময় অতিক্রান্ত করতে হয়েছিল। ঐতিহাসিকদের রচনায় বা ইতিহাসের পাতায় আদিবাসী গোষ্ঠীর ইতিহাস আলোচিত হয়েছে কখনো প্রান্তিক জাতিকে কেন্দ্র করে, কখনো বা প্রান্তিক জাতির সংস্কৃতিক ভাবধারাকে কেন্দ্র করে। ছোটনাগপুরের সীমান্ত জেলায় জাতিগত ভেদাভেদ ক্রমাগত সমাজে তিক্ততা সৃষ্টির মধ্য দিয়ে নবাগত আদিবাসী শ্রমিকদের সমাজ থেকে দূরবর্তী করে রেখেছিল। একইভাবে সন্নিহিত সাঁওতাল আদিবাসীদের উচ্চ সম্প্রদায়ের ঘৃণা ভরা অবজ্ঞার লিখিত ইতিহাসে বারংবার আদিবাসী গোষ্ঠীর বুদ্ধিবৃত্তি নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়েছিল। স্বাধীনতা পরবর্তীকালে গণতান্ত্রিক দেশে শিল্প বিকাশের সাথে অর্থনীতির যেমন উন্নতি হয়েছিল ঠিক একইরকম ভাবে আদিবাসী শ্রমিকদের উন্নয়ন নিয়ে ধর্ম, বর্ণ, জাতি নিরপেক্ষ সর্বহারা শ্রেণির বিকাশ ঘটবে এই আশা করা হয়েছিল। স্বাধীনতা পরবর্তী যুগে আদিবাসী শ্রমিকদের ধর্মঘট নিয়ে ঐতিহাসিকদের আলোচনায় ভিন্নতা খুঁজে পাওয়া গিয়েছিল। স্বাধীনতা পরবর্তীকাল উপজাতি গোষ্ঠীর আন্দোলন ও রাজনৈতিক ক্ষমতায়নকে ঔপনিবেশিক শাসনের পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া, অস্পৃশ্যতা, জাতপাত, ইত্যাদির আলোকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করা হয়েছিল।[4]

খনি শিল্পের জন্য কর্মসংস্থান সমাজ ব্যবস্থার বহির্মুখী ছিল, তাই খনি শিল্প শ্রমিকরা সামাজিক বৃত্তিমূলক দ্বন্দ্বের পরিস্থিতিতে নিক্ষিপ্ত হয়েছিল। ছোটনাগপুরে কর্মক্ষেত্রের বিভিন্ন বিভাগে আদিবাসী শ্রমিকরা গ্রামছাড়া হয়ে শহরের সাথে যুক্ত হয়ে উঠেছিল।[5] তারা যে গ্রাম থেকে উঠে এসেছিল, সেই পরিচিতি শুহুরে পরিচিতির সাথে যুক্ত হয়ে নিজস্ব সংস্কৃতি থেকে বিচ্যুত হওয়ার প্রভাব ঐতিহাসিকদের লেখায় লক্ষ করা যায়। বলা যেতে পারে, labour

4. Barman. Rup Kumar, *Caste, Politics, Casteism and Dalit Discourse: The Scheduled Castes of West Bengal.* New Delhi, Abhijeet Publications, 2020, P- 120-133.

5. *Report of the Bihar and Orissa Labour enquiry Committee,* (1961), Ministry of Labour and employment, 1963, Pp. 7-9.

migration is actually labour circulation[6], কিন্তু অভিবাসনের ইতিহাসের সাথে জড়িত কর্মক্ষেত্রের ইতিহাসে তাঁদের নতুন পরিচয় ও ইতিহাস রচনা শুরু হয়েছিল। আদিবাসী শ্রমিক শ্রেণির ইতিহাস মূল ধারার ইতিহাসের সাথে এক করে দেখা হয়নি। আদিবাসী সংস্কৃতির সুরক্ষার জন্য বহিরাগত আধিপত্য ও ভিন্ন রাজ্য গঠনকে কেন্দ্র করে আরেক ইতিহাস নির্মিত হয়েছিল।[7] সমস্ত আর্থ-সামাজিক প্রতিকূলতার বিপরীতে, একটি সমান্তরাল ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে মূলধারার বাইরে আদিবাসী শ্রমিকদের জীবনধারাগুলিকে পরিচালনা করার চেষ্টা করা হয়েছিল তার চিত্র পরিলক্ষিত হয়েছিল স্বাধীনতা পরবর্তী শ্রমিক ইতিহাস চর্চার মধ্য দিয়ে। ছোটনাগপুর মালভূমি অঞ্চলে আদিবাসী সম্প্রদায়ের থেকে অ-আদিবাসী সম্প্রদায়ের বিচ্ছিন্নতা সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির দিকে পরিচালিত করেছিল এবং বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে একত্রীকরনের একটি ধীর প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল বলে মনে করেন একাংশ ঐতিহাসিকেরা। তাই তাঁর নজির হিসাবে এই আদিবাসী গোষ্ঠীকে খনিজ শিল্পের স্তরে কর্ম নিয়োগের যুক্ত করা হয় বলে ঐতিহাসিকরা মনে করেন। স্বাধীনতা পরবর্তী তথাকথিত নিম্নবর্গীয় ঐতিহাসিকেদের গবেষণায় এই চিত্র বিশেষভাবে লক্ষ করা যায়।

আদিবাসী জাতির শ্রমিকরা আপামোর জনগণের অংশ হিসাবে চিহ্নিত হতে পারেনি বা সামাজিক স্থান করে নিতে অক্ষম হয়েছিল এই প্রসঙ্গের ভিত্তিতেই জন মুর এবং কের[8] মনে করেছিলেন যে, অর্থনৈতিক সমাজের অগ্রগতির মধ্যে আদর্শগত জটিল চুক্তি ছিল যার ফলে আদিবাসী শ্রমিকরা সামাজিক ইতিহাসে স্থান করতে পারেনি। সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনে তারা এই চুক্তিতে আবদ্ধ হয়ে তারা নিজেদের জীবনের গতিকে স্তব্ধ করে দিয়েছিল। আদিবাসী শ্রমিকদের প্রতি বিরক্তির অনুভূতি এবং প্রত্যাখ্যান তাদের ভবিষ্যতের বিষয়ে অনিশ্চয়তা,

---

6. Chattopadhyaya. Haraprasad, *Internal Migration in India (A case study of Bengal),* Calcutta, K.P. Bagchi & company, First Published- 1987, P. 60-88.

7. Heredia. Rudolf C, *Taking sides Reservation Quotas and Minority Rights in India,* India, Penguin books limited, 15 October 2012, Pp. 40-65.

8. Highland. Chris, *Ancoutahan: John Muir among natives peoples,* Published by Sierra Club, 2014. https:// Valut. Sierra club. Org/ john- muir_ exhibit/ life/ ancoutahan- John- muir- among- native- peoples, aspx, acsess date, 13.02.2024.

অসহায়ত্বের অনুভূতি নির্দেশ করেছিল।[9] জাতি ভিত্তিক সচেতনতা তাদের মধ্যে তৈরি না হওয়ার ফলে লিখিত ইতিহাসে তাদের স্থান করে নিতে অনেকটা সময় অতিক্রান্ত হয়েছিল।

সামাজিক বৈষম্য

সামাজিক অবস্থানে আলোচনার প্রসঙ্গ থেকেই আদিবাসীদের অর্থনৈতিক জীবনের ইতিহাস পর্যালোচিত হয়েছিল। আদিবাসী ইতিহাস চর্চা ও আদিবাসী শ্রমিক ইতিহাস চর্চার সমান্তরাল ধারাগুলি ছোটনাগপুরের খনি অঞ্চলের ইতিহাস উন্মচিত হওয়ার পর আদিবাসী শ্রমিক ইতিহাস চর্চার ধারাকে পরিবর্তিত করেছিল। শ্রমিক ইতিহাসের প্রেক্ষাপট তৈরি হয়েছিল খনি ক্ষেত্রে কালো চামড়ার উপর বৈষম্যতা প্রদর্শন করার মধ্য দিয়ে। বৈষম্যগত শ্রম ছোটনাগপুরের বিভিন্ন প্রান্তে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে প্রকাশ পেয়েছিল। জাতিগত পার্থক্য তীব্রতর হয়ে উঠেছিল গাত্রবর্ণের পার্থক্যের কারণে তাছাড়াও আদিবাসীদের ধর্মকে কেন্দ্র করে এই ইতিহাস রচনা সামাজিক বৈষম্যের আকার ধারণ করেছিল। এটা সত্য যে স্বাধীনতা পরবর্তীকালে ছোটনাগপুর মালভূমি অঞ্চলে জাত ব্যবস্থার ফলে সামাজিক স্তরবিন্যাসে ব্যাপক পরিবর্তনকে ভিত্তি করে আদিবাসী গোষ্ঠীর রাজনীতিতে পরিবর্তন ঘটেছিল। উচ্চবর্ণ নিজেদের সামাজিক মর্যাদা অর্জনের জন্য নিম্ন বর্ণ গোষ্ঠীর উপর তাদের আকাঙ্ক্ষাগুলিকে জোরপূর্বক চাপিয়ে দিয়েছিল। প্রথাগত সামাজিক ব্যবস্থা, সুবিধা বঞ্চিত জাতি গোষ্ঠীগুলি সামাজিক ভাবে বিভক্ত হওয়ার ফলে সামাজিক বৈষম্যতা লক্ষ করা গিয়েছিল। উচ্চবর্ণের জাতিগোষ্ঠী, সামাজিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে আদিবাসীদের উপর নিয়ন্ত্রণের ফলে তারা সৃষ্ট সুযোগের সুবিধা গ্রহণ করেছিল।[10] সমাজ থেকে রাজনৈতিক ক্ষেত্রগুলিতে উচ্চবর্ণের বিচরণের ফলে আদিবাসী শ্রমিকদের প্রতি বৈষম্য প্রদর্শিত হয়েছিল। খনি শিল্পাঞ্চলগুলি আদিবাসী বনাম অ-আদিবাসীর মত সাম্প্রদায়িক অস্থিরতার উত্তেজনা বৃদ্ধি করেছিল।[11] হিন্দু মালিকের পাশাপাশি মুসলিম মালিক গোষ্ঠীর সাথে আদিবাসী মজুরদের সাম্প্রদায়িক বিভাজন রেখা স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। এই পরিস্থিতিতে সামাজিক বৈষম্য

9. আগরয়াল. প্রদীপ, *শ্রম নীতি ও কল্যাণ* , যোজনা পত্রিকা, (মাসিক পত্রিকা) কলকাতা, এপ্রিল ২০১৭, পৃ. ১৭-২০

10. Kothari. Rajni (Ed), *Caste in Indian Politics,* Hyderabad, Orient Longman Limited, First published June, 1970, Pp. 228-238.

11. Sekh, Nurmahammad, & Samina Nasrin, *An Observation on Birbhum Adibasi Gaonta Movement and its failure in protecting the Santal Womens honour*, International Research Journal of Management Science & Technology, Vol-7, Issue 5, 2016, Pp. 10-22.

অধিকার আদায়ের জন্য 'শ্রমিকের' মত একটি পরিচয়কে ব্যবহার করেছিল।[12] Myron Weiner[13] তাঁর Sons of the soil (১৯৭৮) এ ছোটনাগপুরের আদিবাসী জনজাতিকে একদিকে মাটির সন্তানের সাথে তুলনা করলেও মাটির সন্তানদের সাথে সামাজিক বৈষম্যকেও তুলে ধরেছিলেন। শিল্পায়নের ফলে "অ- আদিবাসীকরণ" বা detribalization হয়েছিল বলে মনে করেন। এছাড়াও পণ্য উৎপাদনকারী শ্রমিক শ্রেণির ভিন্ন পরিচয়ও সমাজে বহন করে চলেছিল। যার মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছিল আদিবাসী গোষ্ঠীর সামাজিক দাসত্ব। দাসত্ব নিয়ে Orlando Patterson[14] ব্যাখা করেছেন, দাসত্ব ও শ্রমিক এই দুটি শব্দকে একই ধারণায় আবদ্ধ করে আদিবাসী শ্রমিককে, সামাজিক বৈষম্য থেকে শুরু করে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বৈষম্য প্রান্তিক জাতিতে পরিণত করার কথাকে স্বীকার করেছেন।

এইরকম একটি সামাজিক আধিপত্যবাদকে কেন্দ্র করে শ্রমিক ইতিহাসের ধারায় বিশেষত গ্রামাঞ্চল ও বৃহত্তর জনসমাজে অবশ্যম্ভাবীরুপে প্রকট হয়েছিল সামাজিক ও রাজনৈতিক বৈষম্যের দ্বৈত ধারা। ছোটনাগপুর মালভূমির আদিবাসী শ্রমিকদের অবস্থা আর্থ-সামাজিক কাঠামোর নিম্ন পর্যায়ে অবস্থান করার ফলে, রাজনীতিতে নিজেদের পরিচয়ের ক্ষেত্র তৈরি করতে সক্ষম হয়নি। তৎকালীন পরিস্থিতিতে অস্পৃশ্য শ্রেণির মানুষদের মধ্যে আদিবাসী শ্রেণির পাশাপাশি দলিত সমাজের অধিকার নিয়ে প্রশ্ন উঠেছিল। দলিতদের ঐক্যবদ্ধ করার এবং রাজনৈতিক অধিকার আদায়ের চেষ্টার উপর জোর দেওয়া হয়েছিল। দলিত শ্রমিকদের স্বার্থে ইন্ডিপেন্ডেন্ট লেবার পার্টি নামে ভিন্ন রাজনৈতিক সংগঠন গড়ে উঠেছিল।[15] সংখ্যালঘু অধিকার সংক্রান্ত প্রথম রিপোর্ট, ১৯৪৭ সালের আগস্টের শেষের দিকে প্রকাশ করা

---

12. *Representation of disadvantage Sctions in West Bengal Panchayats*, 1980, state Institute of Panchayats and Rural Development, Kolkata, Government of West Bengal, 2000. Pp. 40-45.

13. Weiner. Myron, *Sons of the soil (Migration and Ethnic conflict in India),* Princeton, Princeton University Press, 1978, Pp. 27-48.

14. Patterson. Orlando, *Freedom in the making of Western Culture*, The University of Michigan, 17 Jul, 1991, P. 215-220.

15. Ambedkar. Dr. B, R, *Independent Labour Party: 19th July (1937) in Dalit History*, took oath as the member of Bombay Legislative Council, Retrieved 9 Nov 2018.

হয়েছিল।[16] অস্পৃশ্যদের সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছিল কিন্তু তাতে আদিবাসী শ্রমিকরা ব্রাত্য হয়ে পড়েছিল। এ প্রসঙ্গে বলা যায় যে, ছোটনাগপুরের একজন মুণ্ডা নেতা জয়পাল সিং গণপরিষদে সমগ্র ভারতের উপজাতিদের প্রতিনিধিত্ব করলেও আদিবাসী শ্রমিকদের সমস্যার সমাধান হয়নি।[17] আদিবাসী উপজাতিরা তখনও 'তপসিলি উপজাতির' স্বীকৃতি পায়নি। সামাজিক গতিশীলতার দিকে নজর দিয়ে দলিত সমাজের মানুষের অধিকার অর্জন নিয়ে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছিল। শোষিত নির্যাতিত দলিত জনগণের স্বার্থে ইতিহাস রচিত হয়েছিল। যদিও দলিত সমাজের কৃষক, শ্রমিক বা সর্বহারা নিম্ন শ্রেণির মধ্যে তুলনামুলকভাবে সামাজিক স্বাতন্ত্র্যতা ছিল বলে ঐতিহাসিকরা মনে করতেন। গণতান্ত্রিক চিন্তা ভাবনায় দলিত শ্রেণির সংগ্রাম নিয়ে ভিন্ন ভিন্ন ইতিহাস রচিত হলে আদিবাসীদের সংগ্রাম গৌণ হয়ে পড়েছিল।[18] অর্থনৈতিক ও সামাজিক বৈষম্যের বাস্তব অবস্থার গুরুত্ব বিশেষভাবে বিবেচনা করেই আম্বেদকর দলিত বর্ণ ও শ্রেণি দ্বন্দ্বের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন এবং সেই ভিত্তিতেই- অস্পৃশ্যতা বিরোধী সংগ্রাম, কৃষক ও শ্রমিকদের অধিকার রক্ষার সংগ্রামে ত্রিবিধ পথে পরিচালিত হয়েছিল। অধিকারবোধ, বর্ণবৈষম্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, জাতিসত্তাবোধের সঞ্চার ও সর্বোপরি জাতীয়তাবাদ এবং রাজনৈতিক ও ব্যক্তি স্বাধীনতার উন্মেষ বিষ শতকের প্রথম দিকে ব্যাপ্তি লাভ করায় শ্রমিক ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে নতুন দিক উন্মোচিত হয়েছিল।

মালিক শ্রমিক শ্রেণির মধ্যে দ্বন্দ্ব

স্বাধীনতা পরবর্তী ঐতিহাসিকদের রচনায় আদিবাসী শ্রমিক ইতিহাস রচিত হয়েছিল খনিতে, মালিক বনাম মজুর শ্রেণির দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে। সামাজিক স্তরবিন্যাস পদ্ধতিতে পুঁজিপতি ও উচ্চবর্ণের রাজনৈতিক আধিপত্যের ফলে একটি কাঠামো তৈরি হতে থাকে যেখানে আদিবাসী শ্রমিকদের ভূমিকা নগণ্য হয়ে পড়েছিল। স্থানীয় পুঁজিপতি মালিকদের আধিপত্য বিভিন্ন সময়ে

16. Census of India 1951, Primary Census Abstract, scheduled castes and scheduled tribes, office of the register general & Cencus commissioner, Government of India, 1956.

17. Guha. Ramchandra, *India after Gandhi: The History of the World Largest Democracy,* New Delhi, Picador India, p. 115.

18. Ghandhi. Rajmohan, *India after 1947: Reflections & Recollections,* India, Aleph Book Company, 2022, Pp. 45-73.

প্রকট হয়ে আদিবাসীদের উপর আঘাত তৈরি করেছিল। পুঁজিবাদী যুগের শুরু থেকেই খনি কারখানায় সকল শ্রমিকদের মধ্যে বিভাজন দেখা দিয়েছিল প্রকটভাবে। এই বিভাজন থেকে ধর্মঘট, আন্দোলন ও ক্ষোভ সমাজ কাঠামোয় ছড়িয়ে পড়েছিল। ঐতিহাসিক চর্চায় এই পর্যায়ে শ্রমিক ইতিহাসে 'সাপ্লাই ডিমান্ড'[19] এর তত্ত্বের কথাকে উল্লেখ করা যায়। এই তত্ত্বের মূল বক্তব্য হল শ্রমিকদের সরবরাহ বেশি থাকলে স্বভাবতই চাহিদা কমবে এবং তারা কম মজুরি পাবে। পুঁজিবাদের এই তত্ত্বের বিরুদ্ধে কার্ল মার্কস দাস ক্যাপিটালের কথা স্পষ্ট করে বলা যায়, শ্রম সরবরাহের মত প্রক্রিয়াকে মালিকদের স্বেচ্ছাচারিতা বলে উল্লেখ করেছিলেন।[20] মালিক শ্রেণির কাছে আদিবাসী শ্রমিকরা খনির উৎপাদনের উপকরণ ছিল মাত্র। মার্কসের সুনির্দিষ্ট অর্থনৈতিক ব্যাখার স্পষ্ট প্রতিফলন মালিক ও শ্রমিক শ্রেণির দ্বন্দ্বে লক্ষ্য করা যায়। স্বাধীনতার পর থেকে পৃথিবীব্যাপী দেশগুলোর মধ্যে যখন উন্নয়নের ধারার জন্ম হতে থাকে তখন উন্নত দেশগুলি অপেক্ষা কম উন্নত দেশে পুঁজি কেন্দ্রিক অর্থনীতিতে শ্রমিকদের স্থানে প্রযুক্তিকে ব্যবহার করা হয় সুবিধাজনক মাধ্যম হিসাবে। অনুন্নত অর্থনীতির অভ্যন্তরীণ গঠন পরিবর্তনের জন্য অধিক মুনফাজনিত শিল্পাঞ্চলের রীতিতে পরিবর্তন হয়েছিল। এই ব্যবস্থায় ক্রমাগত সমাজের উৎপাদন বৃদ্ধি পেলে মালিক শ্রমিক শ্রেণির মধ্যে দ্বন্দ্ব ফুটে উঠেছিল। ঔপনিবেশিক পর্যায়ের মত মালিক ও শ্রমিক শ্রেণির দ্বন্দ্বে মালিক শ্রেণির শোষণের ইতিহাসে স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। স্বাধীনতা পরবর্তী ঔপনিবেশিকদের মত স্থানীয় পুঁজিপতিদের আধিপত্য ও দ্বন্দ্ব আদিবাসী মজুরদের দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রামে অবতীর্ণ হওয়ার পথে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করা হয়েছিল বলে সম্মতি জ্ঞাপন করেন অমিতা ভাবিস্কার।[21]

স্বাধীনতা পরবর্তীকালে দেশে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা থেকে মুক্তি পাওয়ার কথা সকল মজুর শ্রেণির মধ্যে উচ্চারিত হয়েছিল। খনি কলকারখানা ও জমি থেকে শুরু করে প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যক্তিগত মালিকানার উপর ভিত্তি করে মুনফা আদায়ের স্বার্থকে পরিবর্তন করতে

---

19. মার্কস. কার্ল, *পুঁজি,* প্রথম খন্ড (দ্বিতীয় খণ্ড),*কলকাতা,* প্রগতি প্রকাশন, পৃ. ১৬৯

20. *তদেব।* পৃ. ১৭০-১৭১

21. Amita Baviskar, *In the Belly of the River: Tribal Conflicts over development in the Narmada Valley,* 2nd edition, Delhi, Oxford University Press, 1st December, 1995, P. 470-475.

পুনরায় ‘গণ অভ্যুরথানের” প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছিল।[22] ঔপনিবেশিক শাসনের বিরোধিতা আদিবাসী কৃষক বিদ্রোহের মধ্যে স্তব্ধ না থেকে স্বাধীনতা পরবর্তী পুঁজিবাদী যুগের ইতিহাসে শ্রমিক আন্দোলন ও সংগ্রামী ধর্মঘট ঐতিহাসিকদের লেখায় স্পষ্ট পরিলক্ষিত হয়েছিল। সহিংস বিদ্রোহ থেকে নির্দিষ্ট ভাবে পরিচালিত আন্দোলন ও ধর্মঘটে উত্তরণ ছিল আদিবাসী কৃষক থেকে মজুর শ্রেণির আন্দোলনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য যা স্বাধীনতা পরবর্তী সকল ঐতিহাসিকদের লেখায় স্পষ্ট পরিলক্ষিত হয়েছে। উনিশ শতকের বাংলায় সমাজ ও রাজনৈতিক চেতনায় গতি সঞ্চারিত হলেও ছোটনাগপুরের সমাজকে কলুশমুক্ত করার বীজ বহুশাখাযুক্ত মহীরুহে পরিণত হয়েছিল বিশ শতকের প্রারম্ভে। সামাজিক বৈষম্য ও খনি ক্ষেত্রে মালিক ও শ্রমিক শ্রেণির দ্বন্দ্ব ধীরে ধীরে শ্রমিকদের মধ্যে ক্ষোভের সঞ্চার বৃদ্ধি করেছিল এবং ভিন্ন সংগ্রামের ইতিহাসের পথ প্রস্তুত করেছিল। শ্রমিক ইতিহাসের ভিন্ন ভিন্ন ধারা এই পর্যায়ে লক্ষ করা গিয়েছিল।

১৯৪৭- ১৯৬৪ পর্যন্ত নেহেরু যুগে শ্রমিক আন্দোলনে কমিউনিস্ট শ্রেণির ভূমিকা ছিল বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। ১৯৪৯ থেকে ১৯৫৩ সাল পর্যন্ত ৪,৬৬,৬০৭ জন খনি কর্মচারী এই আন্দোলনে যুক্ত ছিল। মালিক ও শ্রমিক শ্রেণির দ্বন্দ্বকে কেন্দ্র করে শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাস পরিবর্তিত হয়েছিল। শ্রমিক ইতিহাসের নতুন ধারাকে সুকোমল সেন স্বাধীনতা পরবর্তী জনগণের সম্মুখে তুলে ধরেছিলেন খুব যত্ন করে। ১৯৫০-১৯৬০ এর দিকে শ্রমিক আন্দোলনে মার্ক্সবাদের বিকাশ আন্দোলনে নতুন একটি ধারার সঞ্চার করেছিল।

ঐতিহাসিক রচনায় ঝাড়খন্ড অঞ্চলের আদিবাসীদের ‘ভূমি ও বন বিছিন্নতার’ মৌলিক কারণ দেখার পাশাপাশি দীর্ঘদিন ধরে আদিবাসীদের সামাজিক অধিকারকে অবহেলা করার কথা উল্লেখ করে সাদৃশ্য টানার চেষ্টা করেছেন। এই একই কথাকে সমর্থন করে ঐতিহাসিক পি কে শুক্লা দাবী করেছিলেন যে, আদিবাসীদের সামাজিক বিক্ষোভের চিত্র সম্পূর্ণরূপে বিছিন্নতাবাদী ছিল না যে ধারায় শুধুমাত্রও একটি উপজাতীয় রাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ ছিল।[23] তাঁরা তাদের নিজস্ব রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিল একথা ঠিকই তবে এই সিধান্তে ঔপনিবেশিক বিরোধী সংগ্রামের কাঠামো থেকে মালিক বিরোধী আদিবাসী শ্রমিকদের প্রতিবাদ এবং পরিচয়

---

22. ব্যানার্জি, সুবোধ (সম্পা.), *গণদাবী,* সোশ্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া, (বাংলা সাপ্তাহিক পত্রিকা), ৯ বর্ষ, ২ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, *কলকাতা,* ১৫ই নভেম্বর, ১৯৫৬, পৃ. ৭

23. *পশ্চিমবঙ্গ পত্রিকা,* সংখ্যা-১২, কলকাতা, ৫ই এপ্রিল, ১৯৬৫।

লক্ষ করা যায় ঐতিহাসিকদের লেখায়। এছাড়াও প্রশাসনের প্রতিশ্রুতির সাথে আদিবাসী মজুরদের যে সংঘর্ষ ভারতের বাইরেও যে একই অবস্থা ছিল তাও তিনি উল্লেখ করেছিলেন। সুনীল সেন, খনি অঞ্চলে সমস্ত শ্রমিকদের অবস্থানকে এক করে দেখেছেন কিন্তু অন্যান্য শ্রমিকদের সাথে আদিবাসী শ্রমিকদের যে বিস্তর পার্থক্য ছিল তা নিয়ে বিস্তারিত ব্যাখা করেছেন।

দেবশ্রী দে[24] তার গ্রন্থে স্বীকার করেন যে, স্বাধীনতা পরবর্তী পুঁজিবাদ বিরোধি শ্রমিক আন্দোলন গুলির মধ্যে আদিবাসী শ্রমিকদের ধর্মঘটের মধ্যে গান্ধিজির আদর্শের ছাপ লক্ষ করা যায়। গান্ধিজির আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে আদিবাসী সহ অন্যান্য শ্রমিকরা বজ্র পাতের মত আন্দোলন করেছিল। সেই সংগ্রামের মধ্যে সমাজের প্রান্তিক স্তরের মানুষের আত্মমর্যাদার লড়াই এর সাথে কৃষক ও শ্রমিকদের অধিকার রক্ষা, গণতন্ত্র বিকাশের দাবি উঠে এসেছিল। ঔপনিবেশিক সময়কালে, ছোটনাগপুরের আদিবাসী অঞ্চলের জনজাতিরা স্বাধীনতা সংগ্রাম ও স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য এলাকার রাজকীয় শাসকদের নিপীড়ন ও শোষণের বিরুদ্ধে আন্তঃজাতিগত বা সংহতি গড়ে উঠার কথা তিনি ব্যাখা করেন। ছোটনাগপুরের আদিবাসীরা তাদের নিজ স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করার জন্য ছোটনাগপুর আদিবাসী মহাসভার সংগঠন করেছিল। সমাজের যে ভাগ থেকে অসংগঠিত শ্রমিক ও মজুর তৈরি হয়েছিল, তাঁদের সামাজিক ও আর্থিক পরিস্থিতির বিচারে বিচার করতে গিয়ে দেখা যায় যে, গত চার দশকে আদিবাসী শ্রম বাজারের কাঠামোগত রূপান্তর ঘটেছিল এবং পরিবর্তিত হয়েছিল। কৃষি মজুরেরা খনি শিল্পাঞ্চলের পাশাপাশি নির্মাণ শিল্পে কম দক্ষতার পরিষেবা দিতে অসংগঠিত ক্ষেত্রের কর্মী হিসাবে যুক্ত হওয়ার ইতিহাস রচিত হয়েছিল।[25] অসংগঠিত ক্ষেত্রে সামাজিক নিরাপত্তার সাথে স্বীকৃতির অভাব অভিযোগ নিয়ে আদিবাসী মজুরদের নিরাপত্তাহীনতার ইতিহাস স্বাধীনতা পরবর্তীকালে রচিত হয়েছিল।

গবেষক ধীরাজ কুমার নিতে, বিংশ শতাব্দির মাঝামাঝি সময়কালে পূর্ব ভারতের ঝরিয়া কয়লাক্ষেত্রে খনি শ্রমিকদের নতুন একটি দিক উল্লেখ করেছিলেন যেখানে খনির আদিবাসী

---

24. দে. দেবশ্রী, *পূর্ব ভারতের আদিবাসী বৃত্তান্ত (১৯৪৭-২০১০),* কলকাতা, সেতু পাবলিকেশন, প্রথম সংস্করণ ২০১২, পৃ. ১২৮

25. *West Bengal Labour Gazette, (1957),* Calcutta, Department of Labour, 1958, P. 474-475.

মহিলা শ্রমিকদের কাছে প্রজননের অর্থ ছিল খনি অর্থনীতিতে যোগ দেওয়ার সমতুল্য। সেই প্রজনন খনিতে রাজনৈতিক মানচিত্র পরিবর্তিত হয়েছিল। খনি শ্রমিকদের পরিবার ও মহিলার প্রশ্নে যে আন্দোলনগুলি রচিত হয়েছিল তাতে পারিবারিক আন্দোলন সকলের দৃষ্টি গোচর হয়েছিল। আদিবাসী খনি মজুরদের পারিবারিক ইতিহাসের প্রচলিত ধারনাকে বহন করা তাদের পারিবারিক জীবনের একটি আখ্যান তৈরি করেছিল। প্রতিরক্ষামূলক আইনের যুগেও প্রজনন সম্পর্কের পুনর্গঠনের পরে খনি শ্রমিক, নিয়োগকর্তা এবং রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার মধ্যে রাজনৈতিক ও আদর্শিক সম্পর্কের তাৎপর্যকে বিশ্লেষিত করেছিল। খনিগুলিতে শ্রম শাসন কেবলমাত্র সেই ধরনের পারিবারিক ব্যবস্থার গঠনকে সমর্থন করেছিল বলে তিনি মনে করেন।[26] ছোটনাগপুরের খনি অঞ্চলের ইতিহাসে কয়লা ভিন্ন অন্যান্য খনি অঞ্চলে আদিবাসী মহিলা শ্রম ও প্রজননের ইতিহাস স্বাধীনতা পরবর্তীকালে জোরদার হয়ে উঠেছিল। স্বাধীনতা পরবর্তীকালে আদিবাসী শ্রমিকদের খনিতে যোগদান বিশেষ একটি পর্ব হয়ে উঠেছিল।[27]

ক্রিস্পিন বেটস যুক্তি দেন যে, আদিবাসী শ্রমিক হিসাবে ঔপনিবেশিক যুগে উৎপাদনের পদ্ধতির সাথে জড়িত হয়েছিল এবং তাদের দারিদ্র্যতার পাশাপাশি দেশের মধ্যে ও বাইরে ঔপনিবেশিক উদ্যোগতাদের জন্য সস্তা শ্রমের একটি উৎপাদন ক্ষেত্র প্রসারিত হয়েছিল স্বাধীনতা পরবর্তীকালে।[28] এক্ষেত্রে বলা যায় কয়লা খনির মত ছোটনাগপুর অঞ্চল জুড়ে যে পাথর খাদান ক্ষেত্র তৈরি হয়েছিল তাতে আদিবাসী শ্রম প্রয়োগের নতুন ক্ষেত্রকে প্রস্তুত করেছিল। উৎপাদন পদ্ধতির মধ্যে পুঁজিপতি উত্থান এবং আদিবাসী শ্রম নিয়ে জ্যান ব্রেম্যান অন্তর্দৃষ্টিপূর্ণ আলোচনা করেছেন।[29] শ্রমিক সংগ্রামের ইতিহাসে লক্ষ করা যায় আদিবাসীরা

---

26. *Report of Labour Enquary Commision Bengal,* West Bengal Labour Department, Government of India, 1930-40, P. 20-26.

27. Nite. Dhiraj Kumar, *Faminist Movement and social Mobility: The Indian Colliers (Jharia) 1895-1970,* Indian Historical Review 41, New Delhi, Sage Publication, Pp. 298-306.

28. Bates. Crispin, Marina Carter, *Tribal and Indentured Migrants in Colonial India: Modes of recruitment and forms of incorporation, Oxford,* Oxford University Press, January 1993, Pp. 160-172.

29. Breman. Jan, *Peasants, migrants and paupers: Rural labour circulation and capitalist* production in west India, University of Minnesota, Oxford University Press, 1985, P. 326-345.

জীবিকার প্রয়োজনে শুধু সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়নি বরং টেকসই উন্নয়নের জন্য আন্দোলনে যোগ দিয়েছিল। সম্পদ বন্টনের প্রশ্ন যখন রাজনৈতিক হয়ে উঠেছিল সেই প্রাসঙ্গিকতাকে কেন্দ্র করে আদিবাসী শ্রমিকদের মধ্যে সম্পদ বন্টন সুনির্দিষ্ট ভাবে প্রসারিত হয়নি তা লক্ষ করা গিয়েছিল। শ্রমিক সুরক্ষাকে কেন্দ্র করে মালিক ও পুঁজিপতিদের আধিপত্য খর্ব করা নিয়ে জ্যান ব্রেম্যান অন্তর্দৃষ্টিপূর্ণ আলোচনা করেছেন।[30] জ্যান ব্রেম্যান স্বীকার করেছেন যে, শ্রমের গতিশীলতার মধ্যে স্বাধীনতা ও অধিকার উপস্থিত ছিল না। খনি শ্রমিকদের জন্য যে নিয়মগুলি প্রণয়ন করা হয়েছিল তা খনি ক্ষেত্রে সকলের জন্য প্রচলিত ছিল না। শ্রমিকদের অধিকার পুনরায় ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য শ্রমিক ধর্মঘটের বিস্তারিত ইতিহাস তৈরি হয়েছিল।

সন্তোষ ও কুমার রাণা তিনি আদিবাসী শ্রমিক ও কৃষকদের নিয়ে ভিন্ন ভিন্ন গবেষণা করেছেন। দলিত ও আদিবাসী নামক গ্রন্থ পরিসংখ্যানের বাইরে আদিবাসীদের মধ্যে বিশেষ কয়েকটি উপজাতিদের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনায় তিনি ব্যাখ্যা করেছেন যে, শ্রমিকদের ঘামে ও শ্রমে সমাজের বৈচিত্রকে নির্মাণ করলেও আদিবাসীদেরই পরস্পরাগত ভাবে বঞ্চিত করে রাখা হয়েছিল সমাজের বিভিন্ন অংশ থেকে।[31] নগর সভ্যতা সৃষ্টির পিছনে আদিবাসী শ্রমিকদের যোগদান থাকলেও তথ্য সমৃদ্ধ রচনা তেমন ছিল না সেই কারণে তারা ইতিহাসের পাতায় সমাদৃত হতে পারেনি। অন্যদিকে বর্ণগত বহুত্ববাদ ও ভারতীয় সমাজের জাতপাতের বেড়াজ্বালে আবদ্ধ হয়ে শ্রেণি সচেতনতার ইতিহাস তৈরি হয়েছিল।[32] তিনি আরো স্বীকার করেছেন যে, স্বাধীনতা পরবর্তীকালে বাংলা ও বিহারের নির্মাণ শিল্প থেকে খনি শিল্পাঞ্চলে আদিবাসীদের বিস্তর ভাবে অংশগ্রহণ ভারতবর্ষ তথা জাতীয়তাবাদী অর্থনীতিতে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছিল। ছোটনাগপুরের কেন্দ্রীভূত অঞ্চলগুলিতে বসবাসকারী মুণ্ডা ও ওঁরাওরা একই সংস্কৃতির তরঙ্গের মুখোমুখি হয়েও স্বতন্ত্র সাংস্কৃতিক পরিচয় রক্ষা করে চলেছিল। বিশ শতকের প্রথম দশকের দিক থেকে, আদিবাসী মজুর শ্রেণি গোষ্ঠীর পরিবারতন্ত্রকে ভঙ্গুর করে তোলার একটি নতুন দিক নির্ধারিত করেছিলেন। রাঁচি এবং ধানবাদের কয়লা সহ অন্যান্য খনি অঞ্চলগুলি একটি ছিন্নমূল এবং দারিদ্র্য গ্রামীণ আদিবাসী জনগোষ্ঠীর মধ্যে সস্তা এবং অদক্ষ

30. তদেব। পৃ. ৩২৬-৩৪৫

31. রাণা. সন্তোষ, কুমার রাণা, পশ্চিমবঙ্গে দলিত ও আদিবাসী, কলকাতা, গাংচিল পাবলিকেশন, ২০১৮, পৃ. ১০৬-১৩৩

32. তদেব। পৃ. ১০৬-১৩৩

শ্রমশক্তিকে ব্যবহার করা পুঁজিবাদী সমাজের অংশ হয়ে উঠেছিল।[33] স্বাধীনতার পর উন্নয়নের জন্য শিল্প পদ্ধতিকে গ্রহণ করে আদিবাসীদের উপর অ-আদিবাসীদের নিম্নমানের আচরণ খনি ক্ষেত্রে জটিল পরিস্থিতি তৈরি করেছিল।[34] ঔপনিবেশিক থেকে স্বাধীনতা পরবর্তীকালে দেশীয় পুঁজিপতিদের প্রভাব আদিবাসী শ্রমিক সংগ্রামের ইতিহাস রচনা করেছিল।

স্বাধীনতার পর থেকে শিল্প উন্নয়ন সম্পর্কে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ বৃদ্ধি পেলে অবাধ ও সস্তা শ্রমের ভূমিকা নিয়ে আলোচনা শুরু হয়েছিল। ভারতে শ্রম সম্মেলন একটি গুরুত্বপূর্ণ ফ্যাক্টর হয়ে উঠেছিল যার সাথে সরকার কার্যকরী ভূমিকা পালন করেছিল। যেখানে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রী ভি ভি গিরি, শিল্প বিরোধ নিস্পত্তিকরন নিয়ে আলোচনা এবং শ্রম সমস্যা সমাধানে বরখাস্ত শ্রমিকদের কথা, শ্রমিকদের বেতন ও ভাতা প্রদানের ব্যবস্থার কথা আলোচিত হয়েছিল। এই আলোচনায় শ্রমিকদের জন্য নির্দিষ্ট মজুরী ও বাসস্থানের জন্য নির্ধারণের ব্যবস্থা করার কথা বলা হয়েছিল।[35] শ্রম ইন্সটিউট গঠনের জন্য ১০ লক্ষ টাকার প্রকল্পের ব্যবস্থা গ্রহণ করার পরিকল্পনা নেওয়া হবে তথ্যের উল্লেখ পাওয়া গিয়েছিল।[36] বোম্বের টেক্সটাইল শ্রমিকদের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার দ্বারা পারিবারিক বাজেট ও শ্রমিকদের মজুরী সংক্রান্ত সমস্যা কমিটির সুপারিশের সাথে সামঞ্জস্য করে বানানো হয়েছিল। শ্রমিক ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে আদিবাসী শ্রমিকদের কথা তখনও উচ্চারিত হয়নি। এ প্রসঙ্গে বলা যায় যে, আদিবাসী সমাজকে সমাজবিজ্ঞানীরা স্থবির হিসাবে দেখেছিলেন তার ধারণা ভঙ্গুর করেছিল কল্যাণী বন্দোপ্যাধায়। স্বাধীনতা পরবর্তীকাল থেকে ঐতিহাসিক রচনায় আদিবাসীদের সামাজিক পরিচিতি তৈরি না হওয়ার পশ্চাতে রাজনৈতিক ক্ষেত্রকে এক অংশে তিনি দায়ী করেছেন। ক্ষমতায়নের নব

---

33. *Historical narratives of Tea plantation in India especially in Assam are available in works of Griffiths (1967), Antrobus (1957), Bose (1954), Buchanan (1966), and Guha (1977).* These are specific theme based studies and hence are often disconnected. Through which thousands of Tea workers were recruited in the period between 1840-1908, exposing its inhumanity and scant regard for human life.

34. Baviskar. Amita, W*ho speaks for the victims of Development,* Seminer representation, 1997, P. 59-61.

35. "*Estimate of a Living wage? For cooton Textile Workers in Bombay City",* Economic and political weekly, Vol-6 Isssue 27, 3rd July 1954, P. 1 -4.

36. *Labour cost and Productivity,* Economic and political weekly, Vol-6, Isssue 4-5, 26 Jan 1954, P. 1-2.

দিগন্তে কল্যানী বন্দোপাধ্যায় আদিবাসীদের গণতান্ত্রিক অধিকার চর্চা প্রসঙ্গে ভোটাধিকার না থাকার কথা উল্লেখ করেছেন।[37] রাজনীতিতে আদিবাসীদের সংরক্ষিত আসন নিয়ে বিভিন্ন নিয়ম আবর্তিত হলেও কিন্তু আসন সংখ্যা ছিল না। গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার প্রথম দিকে সাধারন জনগণ গণতান্ত্রিক অধিকারের গ্রহণযোগ্যতা সমান ভাবে পায়নি। আর্থ- সামাজিক ও রাজনৈতিক উন্নয়ন ব্যতিত গণতন্ত্রই মূল্যহীন হয়ে পড়েছিল, সেখানে সামাজিক ন্যায়বিচার ও সমান অধিকারের কথা যে প্রাসঙ্গিকতা পায়নি তা এই আলোচনার মধ্যে স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। জাতীয় অর্থনীতির উন্নয়নে আদিবাসী শ্রমিকরা প্রান্তিক থেকে গিয়েছিল। সেক্ষেত্রে খনির মত শিল্পাঞ্চলে জড়িত আদিবাসী শ্রমিকদের ইতিহাস ব্রাত্য হয়ে থেকে যায়। ভারতীয় গণতন্ত্রের প্রতিনিধিত্বমূলক এবং অংশগ্রহণমূলক রাজনীতিতে আদিবাসীদের নেতৃত্ব ছিল বিতর্কিত বিষয়। ভোটাধিকার ক্রমান্বয়ে সম্প্রসারণ হয় ১৯৫০ সালে এবং গণতন্ত্রীকরণের প্রক্রিয়াটি সামাজিক ভাবে পরিবর্তনের পথ তৈরি করেছিল। এই চেতনা থেকে সামাজিক শ্রেণিবিন্যাসে তাদের নিজেদেরকে উন্নীত করার তাগিদ জন্মেছিল। সংবিধানের ১৬ (৪) ধারা অনুযায়ী অনুন্নত শ্রেণির সংজ্ঞা নির্ধারণের জন্য ১৯৫৫ সালের রিপোর্টে সমগ্র আদিবাসীদের 'অনগ্রসর' এবং 'উপজাতির' তকমা দেওয়া হয়েছিল।[38] 'আদিবাসী' থেকে 'উপজাতি' নামকরণের ফলে তাদের রাজনৈতিক পরিচিতির পরিবর্তন ঘটেছিল। স্বাধীনতার কাল থেকে শুরু করে রাজনীতির বিভিন্ন স্তরে উপজাতিদের অবদান বিশেষ বিশেষ সময়ে রাজনীতিকে কেন্দ্র করে তাদের ক্ষমতায়নের বিষয়ে আলোচনা ঐতিহাসিকদের রচনায় চর্চিত হয়েছিল।

স্বাধীনতার পর আদিবাসীদের আন্দোলনগুলি উপজাতীয় আন্দোলন নামে পরিচিতি পেয়েছিল। এই আন্দোলনের পশ্চাতে ছিল ভারসাম্যহীন উন্নয়ন। ৯০ এর দশকে উড়িষ্যার কেউঞ্ঝরের আদিবাসীরা শ্রমিকরা বিশেষ করে খনির বিরুদ্ধে একটি আন্দোলন শুরু করেছিল। ভৌগলিক ও আর্থ- সামাজিক কারণে অভিবাসন বৃদ্ধি পেয়েছিল যা সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের হুমকির দিকে নিয়ে গিয়েছিল। খনি মালিকদের বিরুদ্ধে আন্দোলন ভুইয়া, জুয়াং, মুণ্ডা, সাঁওতাল

37. বন্দ্যোপাধ্যায়. কল্যাণী, *রাজনীতি ও নারিশক্তি ক্ষমতায়ণের নব দিগন্ত,* কলকাতা, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, জুন ২০০৯, পৃ. ৫৪-৬০

38. *Towards equality: Report of the Committee on the status of women in India,* Government of India, Department of social Welfare, Ministry of Education and Social Welfare, December 1974, P. 304.

ও কন্ধের[39] মত আদিবাসীরা এই আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছিল। খনির বিরুদ্ধে আন্দোলনের প্রথম স্লোগান ছিল "আমাদের জমি, আমাদের খনিজ এবং আমাদের অধিকার"[40] অর্থাৎ আদিবাসীরা তাদের অধিকারের প্রতি সচেতন হয়ে উঠেছিল। সভা- সমাবেশ, অনশন কর্মসূচির জন্য গ্রামবাসীদের পুলিশ দ্বারা নির্যাতনের শিকার হতে হয়েছিল। এই আন্দোলনের ইতিহাসের ধারা আদিবাসী শ্রমিক ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ দিক নির্ধারিত করেছিল।

১৯৬০ সালে কেন্দ্রীয় শ্রমিকদের আন্দোলন রাজ্যের শ্রমিকদের আন্দোলনের সাথে যুক্ত হয়েছিল।[41] মধ্যপ্রাচ্য, উত্তর আফ্রিকা, এবং দক্ষিণ এশিয়ার কর্মক্ষম বয়সের এক তৃতীয়াংশের কম উপজাতি মহিলা যেখানে অংশগ্রহণ করেছিল, সেখানে পূর্ব এশিয়া এবং সাব সাহারান আফ্রিকায় প্রায় দুই তৃতীয়াংশে পৌঁছেছিল।[42] খনি শ্রমিক আন্দোলন আন্তর্জাতিক স্তরে বিবেচ্য হয়ে উঠলে, কয়লা খনির ক্ষেত্র অর্থাৎ ঝরিয়াতে শ্রমিক অধিবেশন শুধুমাত্র জাতীয় ক্ষেত্রে নয় আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যথেষ্ট গুরুত্ব লাভ করেছিল। সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী ভারতীয় শ্রমিকদের বক্তব্য আন্তর্জাতিক স্তরে পৌঁছেছিল। আন্তর্জাতিক আন্দোলনে যোগ দেবার আহ্বান জানানো হয় সকল শ্রেণির শ্রমিকদের। শ্রমিক শ্রেণির আন্তর্জাতিক ও বিপ্লবী দৃষ্টিভঙ্গি স্বাধীনতা পরবর্তী কালে ফুটে উঠেছিল।[43] আদিবাসী শ্রমিকদের অধিকার থেকে বঞ্চিত হওয়া ও দারিদ্র্যতার ইতিহাস আন্তর্জাতিক স্তরে পৌছলে শ্রমিক ইতিহাস ভিন্ন ধারায় রচনা শুরু হয়েছিল।

---

39. *Report of the Tribal and Rural welfare work in Orissa in 1964,* Orissa, Tribal and Rural welfare department, 1970, P. 60-68.

40. Ahemed. M, *Census of India, Orissa, (1961),* VOL-XII, Orissa, Director of Census operations, 1964, Pp. 100-164.

41. Sen. Sunil Kumar, *Working class movement in India 1885-1975,* Delhi, Oxford University Press, 1994, p. 127.

42. Weldegiorgis. Fitsum, Lynda Lawson and Hannelore Verbrugge, *Women in Artisanal and Small scale mining: Challenges and opportunities for greater participation,* Published by the International Institute for Sustainable Development, April 2018.
(Report prepared by the International Institute for Environment and Development (IIED) for the Intergovernmental Forum on Mining, Minerals and Sustainable Development IGF).

43. Sen. Sukomal, *Working class of India: History of Emergence and movement,* 1830-1970, Columbia, MI: South Asia books, 1977, Pp. 258-261.

ইতিহাসের বিভিন্ন সময়কালে, বিভিন্ন ভাবে শ্রমিক ইতিহাস পরিবর্তিত হয়েছে। শ্রমিক আন্দোলনে শ্রেণি সংগ্রামের তীব্রতা বৃদ্ধি পেয়েছিল। এই সংগ্রামের মধ্যে ভিন্ন রাজনৈতিক রঙ মিশ্রিত হলেও রাজনৈতিক ঐক্য লক্ষ করা যায়নি। মিশ্র বংশজাত বিভিন্ন প্রকারের জনসাধারণের উপস্থিতির কারনেই মূলত স্বীকার করা যায় যে, সামাজিক ঐক্য সম্ভব না হলে রাজনৈতিক ঐক্য অর্জিত হতে পারে না। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রের কর্মবিভাজন মানুষে মানুষে ভেদাভেদকে প্রসারিত করেছিল। এই তাত্ত্বিক আলোচনার মধ্য দিয়ে সংশোধনবাদী ও সংস্কারবাদী কৌশল প্রয়োগ হয়েছিল। শ্রমিকশ্রেণির একটা অংশকে পুঁজিপতিরা দুর্নীতিগ্রস্থ ও চরিত্রভ্রষ্ট করে তুলেছিল যা ১৯৬০-৬৫ এর সালে লক্ষ্য করা যায়। এই পর্যায়ে উৎপাদনের বৃদ্ধি ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সংকট সৃষ্টি করার ফলে[44] আধুনিক ধনতন্ত্রের অত্যধিক শক্তি ও দারুন কৌশল শ্রমিক শ্রেণির অসন্তোষ, ক্ষোভ ও ক্রোধকে ভোতা করে দিয়ে শ্রমিক শ্রেণির বৈপ্লবিক চরিত্রই নষ্ট করে দেওয়ার চিত্র স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। উৎপাদন শক্তির উন্নতি ও বিকাশ এমন সংকটপূর্ণ স্থানে পৌছেছিল যে, ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার কাঠামোয় তাকে আটকে রাখা সম্ভব ছিল না। এই পরিস্থিতিতে ছোটনাগপুরের খনি অঞ্চলের আদিবাসী শ্রমিকরা নিজেদের প্রতিনিধিত্ব করার জন্য ছোটনাগপুর আদিবাসী মহাসভার সংগঠন করার কথা জানা যায়। এই পরিস্থিতিতে খনির আদিবাসী মজুরদের ন্যূনতম মজুরী বৃদ্ধির দাবি গুরুত্বহীন হয়ে পড়েছিল। কেন্দ্র ও রাজ্যের শ্রমিকদের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন ইউনিয়ান সংঘ তৈরি হতে দেখা গিয়েছিল। এই পরিস্থিতিতে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা ও পুঁজিপতিদের বিরুদ্ধে শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ান, কর্মচারীদের ইউনিয়ান ইত্যাদি গণসংগঠনের মধ্য দিয়ে খনির শ্রমিক ইতিহাসে ট্রেড ইউনিয়ানের ইতিহাস রচিত হয়েছিল।

ছোটনাগপুর আদিবাসী শ্রম ইতিহাস চর্চায় ট্রেড ইউনিয়ানের ভূমিকা ও রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ

ছোটনাগপুর মালভূমি ছিল সেই প্রদেশ যেখানে আদিবাসী কৃষক ও শ্রমিকদের নিয়ে আধুনিক সস্তা শ্রম রাজনীতির প্রথম সূচনা লক্ষ করা গিয়েছিল।[45] 'লীগ অফ নেশানে' শ্রমজীবী

---

44. ভট্টাচার্য. জ্যোতি, *শ্রমিকদের দর্শন,* কলকাতা, ন্যাশানাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, সেপ্টেম্বর ২০১৫, পৃ. ৫৫

45. মিত্র. মুরারি, *পার্টি চিঠি, ১৯৮৪,* কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি, ২৫ সে জুন, ১৯৮৫।

প্রতিনিধিদের বৈঠকে ভারতীয় কৃষকদের পাশাপাশি শ্রমিকদের শোচনীয় অবস্থার উন্নততর কিছু করা যেতে পারে কিনা এই নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়েছিল। আদিবাসী কৃষকের সাথে শ্রমিকের সম্পর্ক ছিল পরস্পর সম্পর্কিত তাই কৃষকের সাথে শ্রমজীবীর প্রসঙ্গ নিমিষেই উঠে এসেছিল। কৃষি সম্পর্কের উপর আলোকপাত করে রাজনৈতিক দলগুলি কৃষক সমিতি যেমন রায়ত সভা, কৃষক প্রজা সমিতি, কৃষক ওয়াকারস পার্টি এবং বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষক ফ্রন্ট গঠনের মত শ্রমিকদের জন্য ট্রেড ইউনিয়ান গঠন হয়েছিল। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার শ্রমিক অর্থনীতি পরিবর্তিত হওয়ার সাথে সাথে রাজনৈতিক সচেতনতার কিছু দিক উন্মোচিত হয়েছিল। খনি কর্মক্ষেত্রে আদিবাসী শ্রমিকদের কণ্ঠরোধ করার ভয় ও হত্যার হুমকি এইসব বিষয় ও তাদের বাস্তব প্রয়োগ নিয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করেছিল।[46] সামাজিক গণতন্ত্রের পথ সংকীর্ণ হয়ে পড়লে পিছিয়ে থাকা সুবিধাহীন মানুষের সংস্কৃতিকে গুরুত্ব দেওয়া নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়েছিল। খনি ক্ষেত্রে যুক্ত হওয়ার পর, শ্রমিকদের অর্ধেক জীবনটা কর্মক্ষেত্রকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছিল। সেই কর্মক্ষেত্রকে ভিত্তি করে আদিবাসী শ্রমিকরা দিনের পর দিন শোষিত হতে হতে দেশীয় পুঁজিপতি শক্তির প্রতি তাদের আস্থা হারিয়ে ফেলেছিল। অর্থনৈতিক দিক দিয়ে খনি সমৃদ্ধ অঞ্চলে শ্রমিক শ্রেণির নির্ভরশীলতা গড়ে উঠতে থাকলে তারা নিজেদের দাবী দাওয়া নিয়ে বিভিন্ন আন্দোলনে ও ধর্মঘটে একত্রিত হয়েছিল। শত শত আন্দোলনে আদিবাসী কৃষক ও খনির শ্রমিকরা আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে চলেছিল। খনি বিভাগের মধ্যে শোষণ ও দমনের বেদনাদায়ক সম্পর্ক থেকে অব্যাহতি পেতে গ্রামাঞ্চল ও খনি খাতের মধ্যে প্রতিরোধ দেখা দিয়েছিল চরমে। খনি ক্ষেত্রে যেন, 'শোষণ এবং নিপীড়নহীন কর্মসংস্থান' গড়ে উঠে তার দাবি তোলে খনি শ্রমিকরা। খনি মালিকের ব্যবস্থাপনা প্রায়ই শ্রমিকদের দাবি চেপে রাখতে বাধ্য করত। ক্ষোভের প্রতিফলন ঘটানো ও বারবার অভিযোগে নিয়োগকর্তাদের শ্রমের উপর কোন নিয়ন্ত্রণ ছিল না।[47] শ্রমিকরা সরকারি নিয়মের মধ্য দিয়ে তাদের প্রতিবাদ প্রকাশ করলেও কোনো উপকার হয়নি। এই প্রতিরোধ যুক্ত সংগ্রাম তুচ্ছ বা কোনো তাৎপর্য বর্জিত ছিল না। এই ধর্মঘটগুলি শুরু হয়েছিল মজুরি বৈষম্য ও শ্রমিকদের চাহিদাগুলিকে কেন্দ্র করে।[48] শ্রমিকদের নিরাপত্তার জন্য শৃঙ্খলা ও মজুরী আইন ধার্য হওয়া ও অন্যায়ভাবে

---

46. *আম্বেদকর প্রান্তের প্রত্যাশা ও দলিতের প্রত্যয়,* পরিচয়, ৬৯ বর্ষ, কার্ত্তিক- পৌষ, কলকাতা, ১৪০৬, পৃ. ৫১

47. *পশ্চিমবঙ্গ পত্রিকা,* ৩২ সংখ্যা, কলকাতা, ৫ই এপ্রিল, ১৯৬৮, পৃ. ৪৯০

48. তদেব। পৃ. ৪৯৫

শ্রমিকদের বরখাস্ত করা এইসব সমস্যা সমাধানে ট্রেড ইউনিয়ানের ভূমিকা ছিল বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। জীবিকা নির্বাহের তাগিদে অর্থনীতির এই পরিস্থিতিতে শ্রমিকদের ধর্মঘটকে কেন্দ্র করে ট্রেড ইউনিয়ানের ভিত্তি স্থাপিত হয়েছিল। শ্রম পর্যালোচনায় ছোটনাগপুর মালভূমি খনি ক্ষেত্রে স্বাধীনতা পূর্ব ট্রেড ইউনিয়ানে আদিবাসীদের সম্পর্কিত বিশেষ তথ্য ছিল উল্লেখযোগ্য। শ্রমিক সংগঠনে ট্রেড ইউনিয়ান গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছিল।

ট্রেড ইউনিয়ান ও আদিবাসী শ্রমিকদের ইতিহাস

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে কলকাতা, বোম্বে ও সুরাটে কাপড়ের মিল স্থাপন হলে কর্মশক্তির সূচনায় মিল শ্রমিকদের ধর্মঘট হয়েছিল। মিল শ্রমিকদের একাধিক ধর্মঘট শুরু হলে ১৯২০ সালে অল ইন্ডিয়া ট্রেড ইউনিয়ান কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার পর একাধিক শিল্প ক্ষেত্রে শ্রমিকের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে ও ইউনিয়ানের সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছিল। ১৯২০ সালের দিকে ট্রেড ইউনিয়ান কংগ্রেস গঠন হলেও সংগঠন তৈরির অনুপ্রেরণা শুরু হয়েছিল ১৯১৭ সালে রাশিয়ায় সোভিয়েত বিপ্লবের পর।[49] ১৯১৭ এর বিপ্লবের প্রভাব এবং যুদ্ধোত্তর আর্থিক দুরাবস্থা শ্রমিকদের সংগঠিত হতে উৎসাহ দিয়েছিল। ১৯২৩ সালে ট্রেড ইউনিয়ান কংগ্রেস গঠিত হওয়ার পর প্রথম নিখিল ভারত শ্রমিকদল সম্মেলনের সমিতির সভাপতি ব্যারিস্টার পি ডিন্ডা, অভিবাসনের প্রেক্ষাপটে বাংলার শ্রমিকদের সৌভাগ্যের কথা বলেন। ঠিক সেইরকম স্বামী বিশ্বানন্দ এবং স্বামী দর্শনানন্দ বিহার ও বাংলার কয়লা ক্ষেত্রে শ্রমিক আন্দোলনে বিশেষ ভূমিকা নিয়েছিলেন।[50] অর্থনৈতিক দুর্দশার মুখে শ্রমিক চেতনার আন্দোলনে কোলিয়ারিগুলিতে ট্রেড ইউনিয়ানের কর্মকাণ্ড যুক্ত হয়েছিল। I.N.T.U.C এর প্রতিটি শিল্পে কর্মরত সকল শ্রমিক শ্রেণির একটি দেশব্যাপী সংগঠন সুরক্ষিত করার চেষ্টা করেছিল। এটি শ্রমিকদের কাজের অবস্থা ও জীবনের উন্নতির জন্য কাজ করবে এটাই ধারণা করা হয়েছিল।[51] যার ফলে ট্রেড ইউনিয়ন গঠন বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। শ্রমিকদের সংগঠিত করার এবং তাদের দাবীগুলিকে প্রকাশ করার বড় মাধ্যম ছিল ট্রেড

---

49. *শ্রমজীবী ভাষা,* ভলিউম-১২, ইস্যু- ৭-৮, কলকাতা, পৃ. ১৩

50. *Report of the Indian Mining Federation 1960,* Calcutta, Government of India, 1969, P. 34.

51.*Annual report on the working of the Trade Union act 1966,* Bihar, Patna, Secretariat Press, 1954.

ইউনিয়ান।[52] পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে লালা লাজপত রায় সংগঠিত শ্রমের ভূমিকার উপর জোর দিয়ে শ্রমিকদের সংগঠিত ও শ্রেণিবদ্ধ করার কথা বলেছিলেন।

সি সি ডব্লু ট্রেড ইউনিয়ানে কর্মচারীদের মধ্যে যুক্ত বাঙালি কমিউনিস্ট নেতার আবির্ভাব হয়েছিল। নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ান কংগ্রেস মণ্ডপের কাজ নির্বাহক সমিতির অধিবেশন গঠিত হয়েছিল। এই অধিবেশনে ভারতের সর্বত্র থেকে শ্রমিক সঙ্ঘের প্রতিনিধিরা যেমন শ্রীযুক্ত এন এম জোশী; এআইটিইউসির প্রথম সম্পাদক দেওয়ান চমনলাল, রায় সাহেব চন্দ্রিকা প্রসাদ এবং শ্রীযুক্ত মৃণাল কান্তি বসু প্রভৃতি নিখিল ভারতীয় নেতৃবৃন্দের যোগদানের তথ্য উঠে এসেছিল। সমগ্র ছোটনাগপুর মালভূমিতে আদিবাসী শ্রমিকদের জীবনে ট্রেড ইউনিয়ানের ভূমিকা এক নতুন অধ্যায় ও ইতিহাসের সূচনা করেছিল।

১৯২০ সালে ঠিকাদারদের অধীনে শ্রমিকদের সাথে খনিতে বিতর্কের পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল। সেই ঘটনাকে কেন্দ্র করে শ্রমিক সংগঠনে নির্ধারিত হয় যে, ধানবাদ রেল স্টেশনে, নির্বাচিত সভাপতির সাথে কোলিয়ারির শ্রমিকদের একটি অধিবেশন করার কথা জানা যায়।[53] ১৯২০ সালে ধর্মঘটে ৫,৩০০ জন খনি শ্রমিক জড়িত ছিল। কয়লা খনির শ্রমিকদের ধর্মঘটে জোয়ার এলেও আদিবাসী শ্রমিকদের আশু আর্থিক উন্নতির বিষয় ব্যতীত বৃহত্তর রাজনৈতিক বিষয়গুলিতে দৃষ্টিপাত করেছিল। ১৯২১ সালে বিহারের ধানবাদে ঝরিয়া শহরে এআইটিইউসির দ্বিতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল যা শ্রমিক শ্রেণির কেন্দ্রের অস্তিত্বকে বিপন্ন করে তুলেছিল। এছাড়াও ১৯২৮ সালে ডিসেম্বরে AITUC এর নবম অধিবেশনে আয়োজন করেছিল যেখানে ভারতকে একটি সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রে রুপান্তর করার আহ্বান জানিয়েছিল।[54] এই অধিবেশন থেকেই অধিকাংশ কয়লা খনি শ্রমিক পরিবারের সদস্যরা অংশগ্রহণ করেছিল। পশ্চিমবঙ্গে ১৯৩২ সাল পর্যন্ত কয়লা খনিতে ট্রেড ইউনিয়ানে কোনো উন্নয়ন লক্ষ করা যায়নি। জাতীয় নেতৃবৃন্দরা, আদিবাসী শ্রমিকদের বিষয়ে খুব একটা উৎসাহী ছিলেন না কারন, তাদের ভয় ছিল আদিবাসী শ্রমিকদের সংগঠিত করার চেষ্টা করলে দেশীয় পুঁজিপতি মালিক থেকে

---

52. *অমৃতবাজার পত্রিকা,* (দৈনিক পত্রিকা), কলকাতা, ১৯৪৯, পৃ. ৪

53. *বাংলার কথা,* কলকাতা, সোমবার, ২৩ সে মাঘ, ১৯৫২।

54. *অমৃতবাজার পত্রিকা,* (দৈনিক পত্রিকা), কলকাতা, ১৬ই মে, ১৯২৮, পৃ. ৬

ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে তাদের অংশগ্রহণ করতে হবে।[55] ১৯৪৬ সালের আগের ৫ বছর ঝরিয়াতে শ্রমিকদের কোনো ধর্মঘট দেখা যায়নি।

১৯৪৭ সালে দেশের স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর ট্রেড ইউনিয়ান আন্দোলনের রাজনৈতিক বিভাজন ঘটেছিল। একদিকে সমাজতান্ত্রিক ও অন্যদিকে কমিউনিস্ট ভাবাদর্শে ট্রেড ইউনিয়ানের সম্প্রসারন হয়েছিল। ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে ট্রেড ইউনিয়ানের কেন্দ্র গড়ে উঠেছিল। দেশ বিভাজন পরবর্তী সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা এবং উদ্বাস্তুদের বৃহৎ পরিসরে আন্দোলন বেশ কিছু সময়ের জন্য শ্রমিকদের জীবনকে অচল করে দিয়েছিল। ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট স্বাধীনতার আবির্ভাবকে জনগণের সমস্ত অংশ স্বাগত জানায় এবং একই বছরে শিল্পাঞ্চলে শান্তি বজায় রাখার জন্য ট্রেড ইউনিয়ানের সহযোগিতা গ্রহণ করা হয়েছিল। ১৯৪৮ থেকে ১৯৫৫ পর্যন্ত ছয়জন ব্যক্তি ছোটনাগপুরের শ্রমিক ইউনিয়ানে বিভিন্ন মেয়াদে সাধারণ সম্পাদকের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন যাদের মধ্যে একজন হো এবং বাকিরা অ- উপজাতীয় বাঙালী বা বিহারি ছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ছোটনাগপুরের অন্তর্গত বিহার কয়লা ইউনিয়ান শ্রমিকদের কঠিন অর্থনৈতিক সমস্যার কারণে ট্রেড ইউনিয়ানের কার্যক্রম বৃদ্ধি পেয়েছিল। এটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল যে ট্রেড ইউনিয়ান আন্দোলনে প্রথমদিকে আদিবাসী নেতৃত্ব ছিল না বরং অধিকাংশ কমিউনিস্ট এবং কংগ্রেস রাজনৈতিক নেতাদের দ্বারা শুরু ও সংগঠিত হয়েছিল। ট্রেড ইউনিয়ান তখনও বিহারের সিংভুম জেলায় প্রবেশ করেনি এবং ট্রেড ইউনিয়ান সংগঠনে কোনো সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেননি।

বীরভূমে ১৯৩৮-৪৭ সালের প্রেক্ষাপটে গড়ে উঠা কমিউনিস্ট আন্দোলনে লক্ষণ মুরমু ছিলেন একজন উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব।[56] তিনি কমিউনিস্ট মতাদর্শে বিশ্বাসী হয়ে শ্রমিক ও কৃষকদের জন্য বীরভূমে স্বাধীনতার পূর্ববর্তী পর্যায় থেকে সংগঠন একত্রিত করেছিলেন। শ্রমিক ও কৃষকদের ধর্মঘটগুলিকে একত্রে সংগঠিত করে শ্রমিক শোষণ বিরোধী শক্তিগুলির বিরুদ্ধে গর্জে উঠেছিলেন।

55. *লোকজনবাদ পত্রিকা, (সাপ্তাহিক পত্রিকা)*, তৃতীয় সংখ্যা, বিহার, ১৬ই মে, ১৯৪৮, পৃ. ৭

56. চৌধুরী. অরুন, *বীরভূম জেলায় কমিউনিস্ট আন্দোলনের গঠন ও ব্যাক্তিত্ব*, কলকাতা, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি, ২০১৫, পৃ. ১২৪-১৩৫

১৯৪৯ সালে ভারতে খনি শ্রমিকদের প্রতিনিধিত্বকারী (INMF) ট্রেড ইউনিয়ান গড়ে উঠেছিল। শ্রীখান্দু ভাই দেশাই এর সভাপতিত্বে নয়াদিল্লীর মোদিনগরে ভারতীয় জাতীয় ট্রেড ইউনিয়ান কংগ্রেসের সাধারণ পরিষদের যে বৈঠক হয়েছিল তাতে বিহারের শ্রমিক নেতা মিঃ মাইকেল জুন এবং শ্রী হরিহরনাথ শাস্ত্রী যথাক্রমে সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছিলেন। ট্রেড ইউনিয়ানের যে পরিষদ গঠিত হয়েছিল তাতে আম্বেদকরও ছিলেন।[57] শ্রমের একটি নতুন কেন্দ্রীয় সংগঠন যা "ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস" নামে পরিচিত ছিল তা কংগ্রেস পার্টির বল্লভভাই প্যাটেলের সভাপতিত্বে খুব অল্প সময়ের মধ্যে সিধান্ত গ্রহণ করে হিন্দুস্তান মজদুর সেবক সংঘের কেন্দ্রীয় বোর্ডের তৃতীয়তম বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এই সভায় যারা উপস্থিত ছিলেন তাদের মধ্যে ছিলেন সংঘের কেন্দ্রীয় বোর্ডের সদস্য, শ্রী জগজিওয়ার রাম, শ্রম সদস্য ড. রাজেন্দ্র প্রসাদ এবং কংগ্রেস প্রদেশের কিছু শ্রমমন্ত্রী। মিঃ গুলজারীলাল নন্দা, বোম্বের শ্রম মন্ত্রী এবং সংঘের অন্যান্য সেক্রেটারিরা সাংবাদিক বৈঠকের মাধ্যমে বোর্ড কর্তৃক গৃহীত রেজুলেশনের শর্তাবলী ব্যাখ্যা করেছিলেন। নবগঠিত ভারতীয় ন্যাশনাল ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের সংবিধান, সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়েছিল শ্রমিকদের সম্মেলনে যা সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের সভাপতিত্বে তৈরি হয়েছিল। এই নতুন সংস্থার প্রতিষ্ঠার পর সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক শোষণ বন্ধ এবং সাম্যের প্রগতিশীল নির্মূলতা, ক্ষমতার সমাজবিরোধী কেন্দ্রীকরণ, শিল্পকে রাষ্ট্রীয় মালিকানার নিয়ন্ত্রণে রাখা, খনিতে পূর্ণ কর্মসংস্থান নিশ্চিত করা স্থির হয়েছিল। এই ইউনিয়ানে আদিবাসী শ্রমিকদের প্রথমদিকে সংগঠিত করার প্রয়াস লক্ষ করা যায়নি। শ্রমিক সংগঠনের বিভিন্ন ফ্রন্টে বা দলে আদিবাসী শ্রমিকদের যোগদানও সক্রিয়ভাবে চোখে পড়ার মত ছিল না। স্থান ভেদে কিছু চিত্র পরিলক্ষিত হলেও তা ছিল স্বল্প। খনি শিল্প বৃদ্ধির সাথে সাথে শ্রমজীবী শ্রেণীর সংহতিও বৃদ্ধি পেয়েছিল ও শ্রমিকদের শ্রেণীর ধর্মঘটও বৃদ্ধি পেয়েছিল।

খনি শিল্পে কাজের অসন্তোষজনক পরিবেশ আদিবাসীদের একাংশকে সংগ্রামে অংশগ্রহণ করতে বাধ্য করেছিল। এমনকি তাদের রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের ব্যবস্থা করে রাষ্ট্র

57. *New central organization of Labour Decision to from Indian National trade Union Congress,* Government of India, 1952.

বিরোধী জাতীয় আন্দোলন থেকে বিরত রাখা হয়েছিল।[58] রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রের সংকোচন, প্রাইভেটাইজেশান, উদার আমদানি এরই একটা অংশ ছিল যার ফলে খনিজ খনিতে জড়িত আদিবাসী শ্রমিকরা বিপন্ন ছিল। অতীতের র‍্যাট হোল মাইনিং নতুন ভাবে প্রবর্তিত হলে খনিগুলির শ্রমদপ্তর আদিবাসীদের কাছে অসহনীয় হয়ে উঠেছিল। স্বাধীনতা পরবর্তীকালে সরকারী বিভাগ এই খনিগুলির সাথে অন্তর্ভুক্ত হলে খনিতে কর্মরত শ্রমিকরা বিক্ষুব্ধ হয়েছিল। ছোট ছোট বিক্ষোভকে মিলিত সংগ্রামে রূপান্তরিত করার চেষ্টা করেছিল যা, সুনীল বসু রায়ের[59] খনি শ্রমিক সংক্রান্ত গ্রন্থে ফুটে উঠেছিল। খনি এলাকায় গ্রামাঞ্চলের মধ্যে ঘন ঘন স্বল্পকালীন ধর্মঘটের মধ্য দিয়ে গ্রামীণ জনসংখ্যার মধ্যে খনি শ্রমিকদের বিচ্ছুরণ ঘটেছিল। দেশে যে ধর্মঘটগুলি দেখা গিয়েছিল তার পশ্চাতে বলশেভিকদের প্ররোচনা ছিল বলে ভুল তথ্য প্রচার করা হয় শ্রমিক জনসমাজে।[60] জামুরিয়ার এক সভায় ধনি ও দারিদ্র্যের মধ্যে সমতার 'বলশেভিক নীতি' প্রচার করার মাধ্যমে এই তথ্য উঠে এসেছিল।[61] ১৯৫০ সালে ব্রিটিশদের দেওয়া অধিকার, কংগ্রেস সরকার অস্বীকার করেছিল অর্থাৎ যদি কোনো শ্রমিককে উপযুক্ত কারণ দেখিয়ে চাকুরি থেকে অপসারণ করা হয় তাহলে তা শিল্প বিরোধের পর্যায়ে যাবে না অর্থাৎ শ্রমিক ছাঁটাই নিয়ে ধর্মঘট করা আইনত নিষিদ্ধ বলে ঘোষিত হয়েছিল।[62] ধর্মঘট করার অধিকার শ্রমিকদের হরন করা হয়েছিল। ছোটনাগপুর অঞ্চলে শুধু কয়লা খনিকে ভিত্তি করে ট্রেড ইউনিয়ান গঠন হয়নি বরং আদিবাসী শ্রমিকদের যোগদান অন্যান্য খনিজ খনি ক্ষেত্রেও যথেষ্ট ছিল। ট্রেড ইউনিয়ানের কর্মসূচী কয়লা ভিন্ন অন্যান্য খনিজ খনিতে বিক্ষিপ্ত ভাবে লক্ষ করা গিয়েছিল এবং খুব কম সময়ের ব্যবধানে শ্রমিকদের ধর্মঘটের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছিল।

---

58. Barman. Rup Kumar, *Caste, Politics, Casteism and Dalit Discourse: The Scheduled Castes of West Bengal.* India, Abhijeet Publications, 2020, P. 210-222.

59. রায়. সুনীল বসু, *রানিগঞ্জের কয়লা শ্রমিক,* পশ্চিমবঙ্গ, বর্ধমান জেলা সংখ্যা, তথ্য সংস্কৃতি বিভাগ, ১৪০৩।

60. ব্যানার্জি. সুবোধ (সম্পা), *গণদাবী,* সোশ্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া, (বাংলা সাপ্তাহিক পত্রিকা), ২ বর্ষ ১০ সংখ্যা, কলকাতা, ১লা এপ্রিল শনিবার ১৯৪৮, পৃ. ৫

61. Roy. Ratna, Rajat Ray, *European monopoly Corporations and Indian Entrepreneurships, 1913-22: Early Politics of coal in Eastern India,* Economic and political weekly, Vol-9, No.21, 1974, p. 55.

62. ব্যানার্জি. সুবোধ(সম্পা), *গণদাবী,* সোশ্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টারের বাংলা মুখপত্র, ২ বর্ষ ১০ সংখ্যা, ১লা এপ্রিল শনিবার ১৯৫০, পৃ. ৫

১৯৫১ সালে ঝরিয়ায় কেন্দ্রীয় সরকারের অধিনে থাকা সমস্ত কয়লা খনির শ্রমিকদের রেশন থেকে চাল ও গম প্রদান বন্ধ করার সার্কুলার জারি করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। ২সের ১০ ছটাকের পরিবর্তে শুধু ২ ছটাক করে চাল দেওয়া হবে। তবে বলা যায় যে চালের বাজারের চোরাবাজারিতে শ্রমিকরা ২ সের ১০ ছটাক করে চাল পেত না তার উপর হ্রাস পাওয়ার ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে কয়লা খনির শ্রমিকদের মধ্যে বিক্ষোভ শুরু হয়েছিল। সোশ্যালিস্ট ইউনিট সেন্টারের কোল্ডফিল্ড কমিটি শ্রমিকদের এই আন্দোলনে একত্রিত করার আহ্বান জানিয়েছিল।[63] শ্রমিক ঐক্য প্রতিষ্ঠার জন্য ট্রেড ইউনিয়ান বিল ও শ্রমিকদের দাবিগুলি আদায়ের জন্য জঙ্গি ইউনিয়ান গঠিত হয়েছিল। শ্রমিকদের দাবিগুলির মধ্যে ছিল ১) রেশন নির্দিষ্ট পরিমাণে দিতে হবে ২) শ্রমিকদের মাইনে ১০ আনা থেকে ১টাকা করতে হবে ৩) ১ বছর কাজ করা হলে খনিতে সেই শ্রমিকদের স্থায়ী করতে হবে। ৪) বছরে ১৪ টি ছুটি দিতে হবে।

১৯৫১ সালে ঝরিয়ায় টাটা কয়লা খনি শ্রমিকদের মধ্যে বিক্ষোভের দাবি উঠেছিল যে, কয়লা খাদ থেকে অসংগঠিত আদিবাসী শ্রমিকদের বিতাড়িত করা নিয়ে। কম বেতনে শ্রমের ব্যবহার এবং শ্রমিক ছাঁটাই করার ফলে শ্রমিকরা ধর্মঘটের মাধ্যমে গর্জে উঠেছিল। এই ঘটনার পাশাপাশি ১৯৫১ সালে নেহেরু যুগে ঝরিয়ার কয়লা খনি অঞ্চলে শান্তি আন্দোলন শুরু হয়। এই আন্দোলনের বৈশিষ্ট্য ছিল যে, চিত্র প্রদর্শনীর সাহায্যে যুদ্ধ পরিস্থিতি বন্ধ করা। একই সাথে এই চিত্র প্রদর্শনীতে তাপস দত্তের অঙ্কিত কয়লা খনি মজুরদের জীবন সম্পর্কিত চিত্র ও প্রদর্শন হয়েছিল। যদিও মালিক ও শ্রমিকদের মধ্যে বিভিন্ন দ্বন্দ্ব থাকার ফলে শান্তি আন্দোলন শ্রমিকদের মধ্যে প্রচার করা ছিল অবান্তর। গণতান্ত্রিক কেন্দ্রীয় আন্দোলনকে শান্তি আন্দোলনের পরিপোষক রুপে গড়ে তোলার চেষ্টা করা হয়েছিল। নেহেরু সরকারের পুলিশি ব্যবস্থা বেশ সক্রিয় ভাবে এই কাজে অংশগ্রহণ করেছিল। কমরেড প্রীতিশ চন্দ ও অন্যান্য শান্তি কর্মীরা কয়লা খনির শ্রমিকদেরকে নিয়ে আন্দোলনে সরব হয়েছিল।[64] এই কমিটিতে অন্যান্য সদস্যরাও ছিলেন রমেশ ভট্টাচার্য, অমল উপ্যাধায়, শ্রী কানাই লাল পাল প্রমুখেরা ছিলেন।

আদিবাসী শ্রমিকদের শতকরা প্রায় ৮৭% শোচনীয় রূপে শোষিত হতে থাকলে ১৯৫২ সালের ডিসেম্বর মাসের ২১, ২২ ও ২৩ তারিখে বাংলার কলিকাতায় ১৫ নং কলেজ স্কোয়ারের

63. তদেব। ৩ বর্ষ ১০ সংখ্যা, ১৬ই ফেব্রুয়ারি ১৯৫১, পৃ. ৯

64. তদেব। পৃ. ৬

এল্বারট হলে সমগ্র ছোটনাগপুরের কৃষক ও শ্রমিক দলের সম্মেলন এর প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়েছিল।[65] বঙ্গ, বিহার, পাঞ্জাব এবং উড়িষ্যা, অযোধ্যা প্রদেশের 'কৃষক ও শ্রমিক দল' সমূহের প্রতিনিধিগণ এই সম্মেলনে একত্রিত হয়ে নির্যাতিত ও অত্যাচারিত শ্রমিকদের ধর্মঘট চালাবার জন্য একটা সুচিন্তিত কাজের তালিকা প্রস্তুত করেছিল। শোষিত ও নিপীড়িত খনি শ্রমিকদের পাশাপাশি কৃষক, ছোট দোকানদার, অফিসের কেরানী, কারিগর ও অপরাপর নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণির বিভিন্ন দল একীভুত হয়েছিল। তাদের আশা ছিল সমগ্র ছোটনাগপুরের শ্রমিক দল সংগ্রামের পথে এগিয়ে যাবার চেষ্টা করেছিলেন। উপজাতি শ্রমিকরা শোষিত হয়ে শোষকগণের বিরুদ্ধে কৃষক ও শ্রমিক দল গঠন করা হয়েছিল।

১৯৫২ সাল থেকে অনুষ্ঠিত পূর্বতন নির্বাচনগুলিতে জয়লাভ করার পর ১৭ টি প্রান্তিক আদিবাসী শ্রমিকদের জন্য আসন রাখা হয়েছিল। দুই মাসের আদিবাসী শ্রমিকদের ব্যাপক অভিযানের পরও শোষিত হওয়ার পর্যায়কে বন্ধ করা যায়নি। আদিবাসী শ্রমিকদের শতকরা প্রায় ৮৭% শোচনীয় রূপে শোষিত হতে থাকলে ১৯৫২ সালের ডিসেম্বর মাসের ২১, ২২ ও ২৩ তারিখে বাংলার কলিকাতায় ১৫ নং কলেজ স্কোয়ারের এল্বারট হলে সমগ্র ছোটনাগপুরের কৃষক ও শ্রমিক দলের সম্মেলন এর প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়েছিল।[66] বাংলা, বিহার, পাঞ্জাব এবং উড়িষ্যা, অযোধ্যা প্রদেশের 'কৃষক ও শ্রমিক দল' সমূহের প্রতিনিধিগণ এই সম্মেলনে একত্রিত হয়ে নির্যাতিত ও অত্যাচারিত শ্রমিকদের ধর্মঘট চালাবার জন্য একটা সুচিন্তিত কাজের তালিকা প্রস্তুত করা হয়েছিল। শোষিত ও নিপীড়িত খনি শ্রমিকদের পাশাপাশি কৃষক, ছোট দোকানদার, অফিসের কেরানী, কারিগর ও অপরাপর নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণির বিভিন্ন দল একীভুত হয়েছিল।[67] তাদের আশা ছিল সমগ্র ছোটনাগপুরের শ্রমিক দল সংগ্রামের পথে এগিয়ে যাবে। উপজাতি শ্রমিকরা শোষিত হয়ে শোষকগণের বিরুদ্ধে তাদের সংগ্রাম পালন করবার জন্য কৃষক ও শ্রমিকদের নিয়ে দল গঠন করেছিল।[68] নিঃসন্দেহে শ্রমিকদের মধ্যে

---

65. Legislature, joint committee on the west Bengal mining settlement bill (1952), calcutta, West Bengal, Labour class Department, 1964, P. 15-20.

66. তদেব। পৃ. ১৫-২০

67. বিশ্বাস. অনিল (সম্পা), *বাংলার কমিউনিস্ট আন্দোলনের প্রাসঙ্গিক দলিল ও তথ্য* , দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড, কলকাতা, ন্যাশানাল বুক এজেন্সি, কলকাতা, ২০০৪।

68. *Report of the new central organization of Labour Decision to from Indian National Trade Union Congress,* Dhanbad, Government of India, 1952.

প্রভাব ও সংগঠন বৃদ্ধি পেয়েছিল। পার্টি কমিটি সমূহের যৌথ কর্ম তৎপরতা ও সমস্ত প্রশ্নে রাজনৈতিক অন্যান্য পার্টি গতিশীল হওয়ার ব্যাপার লক্ষ করা যায়। ছোটনাগপুরের বিভিন্ন স্থানে অভিযান, সভা, সমাবেশ, মিছিলের দ্বারা সংগঠন করা হয়েছিল। শ্রমিকদের মধ্যে বিশেষ করে অসংগঠিত শ্রমিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের উপর সুপরিকল্পিত অভিযান ও আন্দোলনের কাজ গুরুত্ব দিয়ে গ্রহণ করতে হবে এটাই তাদের লক্ষ ছিল। ট্রেড ইউনিয়ান, কৃষক সভা, মহিলা সমিতির লাগাতার কর্ম তৎপরতা পরিচালনা এই লক্ষ্যের অংশ ছিল।

১৯৫৪ সালে বিঘোষিত মজুমদার ট্রাইবুনালের রায় বাংলার সমস্ত খনির অসংগঠিত কর্মচারীদের প্রতাশা ধুলিসাৎ হয়েছিল এবং নিরাশ করার তথ্য উল্লেখিত হয়েছিল। প্রথমত নিম্নতম মজুরী যারা পেত তাদের এককথায় প্রতারণা করা হয়েছিল। মাগী ভাতা বৃদ্ধির কথা বলা হলেও তা বৃদ্ধি পায়নি। বোনাস সম্পর্কে সমস্ত কর্মচারীদের যোগ্যতা খতিয়ে দেখার কথা বলা হয়েছিল। এছাড়াও সদ্য গণতান্ত্রিক দেশের খনি অঞ্চলে নারী ও পুরুষদের বেতন সমান পাওয়ার কথা মেনে নেওয়া হয়নি।[69] খনি অঞ্চলের শ্রমিকদের রেশন ব্যবস্থা ৩ মাসের মধ্যে তুলে দেবার ব্যবস্থা ঘোষণা করা হয়েছিল। এতে সাধারন শ্রমিকদের জীবনযাত্রার মানের অবনতি ঘটেছিল। লোডিং কর্মীদের বেতন কম করা ও ধাউর নামক শ্রমিকদের ঘর ভাড়া বাবদ টাকা কেটে নেওয়ায় শ্রমিকদের বিক্ষোভ দেখা গিয়েছিল।[70]

১৯৫৪ সালে বিহারের কয়লাখনিতেও একইভাবে মাগী ভাতা নিয়ে আদিবাসী মহিলা শ্রমিকদের মধ্যে দাবি উঠেছিল। একইভাবে এই ট্রাইবুনালের রায় বিহারে পুঁজিপতি ও মালিক পক্ষে রায় হয়েছিল বলে ১৫,০০০ শ্রমিক বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছিল ও ট্রাইবুনালের রায়ের বিরুদ্ধে দরখাস্ত জমা দিয়ে বিরোধিতা করেছিল।[71]

১৯৫৫ সালের জানুয়ারি মাসে প্রতিটি জেলা, জোনাল ও লোকাল কমিটিতে আদিবাসী কর্মীদের স্থান সুনির্দিষ্ট হয়েছিল। সি সি ডবলু দল ১৯৫৫ সালে কয়লা ভিন্ন চুনাপাথর খনির স্থানীয় আদিবাসী শ্রমিকদের সহায়তায় তিন মাসের ধর্মঘটকে কার্যকর করেছিল। ধর্মঘট অনেকটাই আদিবাসী ও অসংগঠিত শ্রমিকদের সুবাদে আছন্ন ছিল। তাদের ধর্মঘটে পুরুষ ও

---

69. *কালান্তর পত্রিকা,* বিশেষ সংখ্যা, পশ্চিমবঙ্গ, ২৮ জুন, ১৯৫৪, পৃ. ৪

70. ব্যানার্জি. সুবোধ (সম্পা), *গণদাবী,* সোশ্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টারের বাংলা মুখপত্র পাক্ষিক সম্পাদক- সুবোধ ব্যানার্জি, ৯ বর্ষ ১ সংখ্যা, কলকাতা, ২৫সে জুলাই ১৯৫৬, পৃ. ৮

71. *লোকজনবাদ পত্রিকা,* বিহার, সংখ্যা- ১৫, ২৫ই আগস্ট ১৯৫৪, পৃ. ৮

মহিলারা ঢোল ও বাঁশির তালে কারখানার গেটের সামনে নাচ এবং গান করে প্রতিবাদ জানানোর কথা জানা যায়। ধর্মঘট সফল হওয়ার মধ্য দিয়ে চুক্তি প্রথা বিলুপ্ত হয় এবং খাদান শ্রমিকরা সি সি ডবলু এর শ্রম তালিকার মধ্যে আবদ্ধ হয়েছিল।[72]

১৯৫৬ সালে ২০সে সেপ্টেম্বর মেসার্স বার্ড এন্ড কোম্পানির কয়লা খনি অঞ্চলে একটি শক্তিশালী ইউনিয়ান গঠন করা হয়েছিল। হীরেন সরকার ও অমৃতেশ্বর চক্রবর্তী যথাক্রমে এই ইউনিয়ানের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক মনোনীত হয়েছিলেন। শ্রীকৃষ্ণা চৌবে, শ্রীচারু কিলু, শ্রীহ্রিশি অধিকারী প্রভৃতি শ্রমিক ইউনিয়ানের বিভিন্ন পদে ছিলেন। বিগত ২০ বছরে এই খনিতে আদিবাসী শ্রমিকরা কর্মরত থাকা স্বত্বেও তাঁদের কোনো সদস্য পদে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। কোম্পানি থেকে পুঁজিপতিদের প্রচুর মুনফা অর্জন করার ফলে মজুরদের কোন দিকেই লাভ হয়নি। কুলি ও মহিলা শ্রমিকদের কাজের স্থায়িত্ব, ভাতা, দৈনিক মজুরির হার বৃদ্ধি হয়নি।[73] বিগত ১ বছর যাবত শ্রমিকদের মধ্যে চরম অসন্তোষ সৃষ্টি হয়ে চললেও কোম্পানি বা সরকারের তরফ থেকে কোন প্রকার সাহায্য পাননি বলে দাবী জানিয়েছিলেন আন্দোলনকারী আদিবাসী শ্রমিকরা। এ প্রসঙ্গে শ্রমিকেরা শক্তিশালী ইউনিয়ান গঠন করে আন্দোলন পরিচালিত করবার সঙ্কল্প গ্রহণ করেছিল। শ্রমিকদের মূল দাবীর মধ্যে কুলির দৈনিক মজুরির হার ও স্ত্রী মজুরের দৈনিক হার মোট ১০% বৃদ্ধি, কেরানী প্রভৃতির বেতন ও দৈনিক মজুরির হার বৃদ্ধি, কাজে স্থায়িত্ব ও প্রসবকালে স্ত্রী মজুরের তিনমাস বেতন সহ ছুটির দাবী ছিল অন্যতম।[74] ১৯৫৬ সালের ৭ই অক্টোবরের মধ্যে কোম্পানি বা লেবার কমিশনারের নিকট থেকে কোন প্রকার উত্তর না পেয়ে গত ৮ তারিখের কর্মসভায় গৃহীত প্রস্তাবে ম্যানেজার ও শ্রম কমিশনারের কাছে পুনরায় চিঠি প্রেরিত হয়েছিল। যদিও শ্রম কমিশনের তরফ থেকে কোনো উত্তর না পাওয়া গেলে সক্রিয় আন্দোলনের মারফৎ দাবী আদায়ের জন্য সঙ্কল্প গ্রহণ করেছিল।

---

72. *শ্রমিক কৃষক খেতমজুর ঐক্য,* শ্রমজীবী মহিলা পত্রিকা, কলকাতা, সিআইটিইউ পাবলিকেশন, ১৯৬৫, পৃ. ১১

73. *কালান্তর পত্রিকা,* বিশেষ সংখ্যা, পশ্চিমবঙ্গ, ২রা মে, ১৯৫৬, পৃ.- ৩

74. Gupta. Pranab Kumar Das, *Impact of Industrialization on a tribe In South Bihar, Vol-48,* Calcutta, Anthropological survey of India, February 1978, Pp. 100-110.

শোষক কোম্পানির নিষ্ক্রিয় মনোভাবে স্থানীয় আদিবাসী মজুরেরা উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল এবং নিজেদের মধ্যে বিভেদ ভুলে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তুলবার জন্য দৃঢ়সঙ্কল্প হয়ে উঠেছিল"।[75]

১৯৫৬ সালে ছোটনাগপুর অঞ্চলে তামার খনির বানালপা বিভাগে আদিবাসী শ্রমিকদের অত্যধিক শ্রম ব্যয়ের মধ্যে শ্রমিকদের বিশ্রামের জন্য অবসর সময়ের আবেদন দাবি করেছিল। শ্রমিকদের অবসর সময় দাবি করার ফলে কিছু জনকে এই কাজ থেকে বরখাস্ত করা হয়েছিল।[76] এদিকে একই বছরে ২৪ সে ফেব্রুয়ারী গয়া সেন্ট্রাল জেলে ধর্মবাঁধ খনি শ্রমিক নেতা মহাবীর তেলী, দুঃখিত দোসাদ ও গুপ্তেশ্বর পাঠককে ফাঁসির খবর পাওয়া যায়। মৃত্যুদণ্ড মকুবের জন্য A. I. T. U. C ও হিন্দু মজদুর সভা যুক্তভাবে সরকারের নিকট আবেদন জানালেও কিন্তু রাষ্ট্রপতি সমস্ত আবেদন অগ্রাহ্য করেছিল বলে জানা যায়।[77] স্থানীয় ইউনিয়ান আই- এন- টি- ইউ- সির অধীনে ইউনিয়ানের নেতাদের অহেতুক এইসব অত্যাচারের কথা জানালেও শ্রমিকদের তারা কষ্ট করে আরও দশ বৎসর এই কাজে যুক্ত থাকার উপদেশ দিয়েছিলেন।[78] বিদেশী কোম্পানি এদেশ থেকে যাওয়ার পর দেশীয় কর্তৃত্বাধীনের নিয়ন্ত্রণে সকল দুঃখের নাকি অবসান ঘটবে বলে শ্রমিকদের আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল কিন্তু চেষ্টা করা হয়নি।

উড়িষ্যার কেউওঞ্জর কয়লা খনি শ্রমিকরা ১৯৫৭ সালে ৩রা আগস্ট ৪৪০ জন শ্রমিককে নিয়ে সাধারন ধর্মঘটের আয়োজন করেছিল।[79] ১৯৫৯ সালের জুন মাসে কেউঞ্জর খনির ইউনিয়ান শ্রমিকেরা ৩৫৪ জনের সাধারন ধর্মঘট সংগঠিত হয়েছিল যার মধ্যে আদিবাসী শ্রমিকদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছিল।[80] এই খনির আদিবাসী শ্রমিকেরা ন্যূনতম মজুরী ও বোনাস

75. ব্যানার্জি. সুবোধ (সম্পা), *গণদাবী,* সোশ্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টারের বাংলা মুখপত্র, প্রথম বর্ষ ১২ সংখ্যা, কলকাতা, ১৫ই ফেব্রুয়ারি ১৯৫৬, পৃ. 8

76. তদেব। প্রথম বর্ষ ১২ সংখ্যা, ১৫ই ফেব্রুয়ারি ১৯৪৯, পৃ. ৮

77. তদেব। প্রথম বর্ষ, ১২ সংখ্যা, ১৫ই ফেব্রুয়ারি ১৯৫৬, পৃ. ৬

78. *Tribal Affairs Conference, (Paper received connection with and speeches delivered at Tribal affairs conference)*, New Delhi, 4th and 6th December, 1964, P. 10-15.

79. *সাম্যবাদী পত্রিকা,* সংখ্যা- ১৬, উড়িষ্যা, ৫ জুলাই, ১৯৫৮, পৃ. ৭

80. *Office of the Regional Labour Commissioner, (Central) Bhubaneswar,* Sample Survey 1969, P. 55-61.

বৃদ্ধির জন্য ধর্মঘট করেছিল। কাজের সুযোগের ব্যবস্থা করা হলেও মজুরী প্রশ্ন সন্তোসজনক ভাবে সুরাহা হয়নি।

মজুরী হ্রাস প্রশ্নকে কেন্দ্র করে একইভাবে ১৯৫৮ সালে উড়িষ্যার সম্বলপুর জেলার কয়লা খনি অঞ্চলে শ্রমিকদের ধর্মঘট দেখা গিয়েছিল। এই ধর্মঘটে আদিবাসী শ্রমিকদের দাবি ছিল মজুরী বৃদ্ধি। এই ধর্মঘটে মোট ১২২ জন আদিবাসী শ্রমিকের অংশগ্রহণ লক্ষ্য করা যায়। ইউনিয়ানের নেতৃত্বের কথায় সাম্যবাদী ভাবনা প্রতিফলিত হয়েছিল। উড়িষ্যায় আদিবাসী শ্রমিকদের পাশাপাশি আদিবাসী ভিন্ন শ্রমিকদের বেতন বৈষম্যের তীব্র প্রতিবাদ জানানোর কথা উঠে এসেছিল।[81]

১৯৫৮ সালের ২৮সে সেপ্টেম্বর বিহারের সিংভুমের কয়লা খনি ছাড়া মুসাবনি তাম্র খনিতে আদিবাসী তামার খনি মজুরদের বিরাট জনসভা তৈরি হয়েছিল নূরজাহান খানের সভাপতিত্বে। তামার খনির মজুরদের ঐক্যবদ্ধ করে তোলার জন্য তাঁরা আহ্বান জানিয়েছিলেন।[82] স্থানীয় পুঁজিপতিদের অত্যাচার এই মজুর শ্রেণির উপর লক্ষ করা যায়। শ্রমদিগকে বরখাস্ত, জরিমানার কথাও দাবিতে উল্লেখ করা হয়েছিল। ইউনিয়ানের নেতাদের এইসব কথায় সাধারণ শ্রমিকেরা ক্ষোভ প্রকাশ করেছিল এবং নেতৃত্বের প্রতি তারা আস্থা হারিয়ে ফেললেও তাদের বিশ্বাস ছিল যে, প্রকৃত মজুর শ্রেণির দল পরিচালিত ইউনিয়ানই সফল পরিণতিতে পৌছাতে পারবে।[83]

পশ্চিমবঙ্গের গিরিমেন্ট কোলিয়ারিতে ১৯৫৯ সালের ২৪ সে নভেম্বর ধর্মঘট দেখা দিলে দুই দলের শ্রমিকের মধ্যে অন্তরদ্বন্দ্ব হয় এবং ১ জন আদিবাসী শ্রমিকের মৃত্যুর উল্লেখ পাওয়া যায়।[84] ১৯৬০ সালের ২২ সে জানুয়ারি একই কোলিয়ারিতে এক দল অন্য দলের সমর্থকদের

---

81. *সাম্যবাদী পত্রিকা,* সংখ্যা- ১৬, উড়িষ্যা, ৫ জুলাই, ১৯৫৮, পৃ. ৪

82. *ব্যানার্জি.* সুবোধ (সম্পা.), *গণদাবী,* সোশ্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টারের বাংলা মুখপত্র, ১১শ বর্ষ ৩য় সংখ্যা, কলকাতা, ৬ অক্টোবর, ১৯৫৮, পৃ. ৮

83. *মজদুর মাসিক পত্রিকা,* সিআইটিইউ পাবলিকেশন, পশ্চিমবঙ্গ, ১৯৫৮, ৮ই আগস্ট, পৃ. ৫

84. *Report of the Central Wage Board for the Coal Mining Industry,* Vol- I, Department of Labour and Employment, (Government of India, Ministry of Labour Employment and Rehabilitation, P. 127.

উপর হামলা চালানোর ফলে ২৬ জন অসংগঠিত কর্মী নিহত হয় ও লুট হয় নয়টি বাড়ি।[85] ১৯৬২ সালের ৮ই আগস্ট শীতুল্পর কোলিয়ারিতে পুনরায় শ্রমিকদের দুই গ্রুপের মধ্যে সংঘর্ষ হলে ৩ জন আদিবাসী শ্রমিকের মৃত্যু হয় এবং বেশ কয়েকটি বাড়ি লুট হওয়ার তথ্য উল্লেখিত হয়েছিল। শ্রমিকদের মধ্যে অবিরত শৃঙ্খলহীনতা শ্রমিকদের ধর্মঘটকে দীর্ঘায়ীত করেছিল। ছোট ছোট কোলিয়ারি যেমন সালানপুর কোলিয়ারিতে ইউনিয়ানের স্বীকৃতি ছিল না। তারা ইউনিয়ানের 'স্বীকৃতি' শব্দটি সম্পর্কে খুব বেশি অবগত ছিলেন না তাই সেই সমস্ত কোলিয়ারিতে আদিবাসী শ্রমিকদের দাবিকে বিশেষ গণ্য করা হয়নি। বড় খনি অঞ্চলে ১০০০ জনের বেশি শ্রমিক নিয়োগ হলেও, স্বীকৃতি ইউনিয়ানের সংখ্যা নিশ্চিত ছিল না। ইউনিয়ানের সদস্যপদে অন্তত ১৫% আদিবাসী শ্রমিককে নিয়ে তৈরি করতে হবে ও স্বীকৃত ইউনিয়ানের সদস্য পদ দুই বছরের বেশি পরিবর্তন করা যাবে না একথা নিশ্চিত করে বলা হলেও তা বাস্তবায়িত হয়নি। পশ্চিমবঙ্গের কোলিয়ারিতে ইউনিয়ানের মূল উচ্চপদগুলি বহিরাগতদের[86] জন্য মুক্ত করে দেওয়া হয়েছিল। এই রাজ্যে কয়লা খনন ব্যক্তিগত খাতে সীমাবদ্ধ ছিল প্রথম দিকে আসলে, জাতীয় কয়লা উন্নয়ন মন্ত্রক দ্বারা নিয়ন্ত্রিত কোনো খনি ছিল না। কয়লা ভিন্ন অন্যান্য খনিজ খনিতেও তাদের অবস্থান বৃদ্ধি পেয়েছিল। প্রতিটি বছরের সাথে শ্রমিকদের ধর্মঘটের পরিমাণ যেমন বৃদ্ধি পেয়েছিল ঠিক তেমনি তারা তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠেছিল।

১৯৫৫ সালে চুনাপাথর খনিতে ধর্মঘট সফল হওয়ার পর ১৯৬০ সালে, চুনাপাথর খনির শ্রমিকদের মজুরি বোর্ড একদিনের টোকেন ধর্মঘটকে সংগঠিত করেছিল।[87] ১৯৬০ সালে বীরভুমের বলরামপুরে রাজগাও পাথর খাদানে ২৬ সে অগস্ট রহিম বক্স শেখের সভাপতিত্বে ৮০০ জন পাথর খাদানের শ্রমিকদের নিয়ে সভার আয়োজন হওয়ার কথা জানা যায়। ১৯৩৫ সালে খনি আইন প্রযোজ্য হলেও শ্রমিকরা কোনো সুবিধা পায়নি বলে দাবি জানিয়েছিল। খনি আইনের প্রবর্তন থেকে পানীয় জলের ব্যবস্থা, অসুস্থ শ্রমিকদের সুচিকিৎসা, চিকিৎসকের ব্যবস্থা, শ্রমিকদের মজুরী বৃদ্ধি, পৃথক শৌচাগার নিয়ে বৃহৎ আন্দোলনের জন্য শ্রমিকদের

---

85. *Report of the West Bengal Trade Union regulation 1957,* Alipore, Kolkata, 1960, Pp. 25-34.

86. বহিরাগত বলতে রাজনীতিতে যুক্ত ব্যাক্তিদের কথা বলা হয়েছে।

87. Das Gupta. Pranab Kumar, *Impact of Industrialization on a tribe In South Bihar,* Calcutta, Anthropological survey of India, February 1978, Pp. 100-110.

সমাবেশ গড়ে তোলা হয়েছিল। এই সভায় ছিলেন ব্রজদুলাল সাহা, জয়নাল আবেদিন, রমাপ্রসন্ন দত্ত এবং আদিবাসীদের মধ্যে মানসী হেম্ব্রম নামক এক মহিলা নেতৃত্ব ছিলেন।[88] ১৯৬০ সালে বিহার ও বাংলার খনি অঞ্চলে বারংবার আন্দোলনের ফলে শ্রমিক ও কৃষকদের মধ্যে দৃঢ় শ্রেণিগত ঐক্য গড়ে উঠেছিল। এই সাফল্যে দেশজুড়ে কৃষি ও শিল্পে শ্রমিক ও কৃষকদের যৌথ সংগ্রাম রাজনৈতিক দিশা দেখিয়েছিল এবং ভিন্ন ভিন্ন বিক্ষোভের সম্মুখীন হয়েছিল।[89] সিআইটিইউ দল আদিবাসী শ্রমিকদের জীবন ও জীবিকা রক্ষার লড়াইকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করেছিল।

১৯৫৬ সালে ২য় জুন মাসে সর্বভারতীয় ভিত্তিতে ৯৬০ টি কয়লা খনির শ্রমিকদের মজুরী হ্রাস নিয়ে বিরোধ লক্ষ করা যায়। কেন্দ্রীয় বেতন কমিশন মজুরী বৈচিত্রকে অস্বীকার করেছিল। শ্রমিকদের জীবনধারণের ন্যূনতম ক্ষমতাকে ক্রয় করে নেওয়া হয়েছিল। সর্বনিম্ন বেতন প্রাপ্ত শ্রমিকের সংখ্যা ছিল ৪০%।[90] শিল্প শ্রমিকদের মজুরী বৃদ্ধি হয়ে উঠেছিল প্রয়োজন ভিত্তিক। শ্রমিকদের জীবনযাপনের ধারণাকে এক প্রকার পাত্তা না দিয়ে মজুরী বৃদ্ধি হয়েছিল। প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তীকালে ক্লিয়ারেন্স আলওন্স বাবদ যে অর্থ ব্যয় করতে হত তা মজুরী হ্রাসের সমান হয়ে উঠেছিল, এর ফলে শ্রমিকদের কোনো লভ্যাংশ থাকত না।[91]

উড়িষ্যায় বোলানি লোহা আকরিকে আদিবাসী শ্রমিক সংঘের ১৯৬১ সালে ধর্মঘট করার কথা জানা যায়। এর মধ্যে কিছু ধর্মঘট সফল হলেও অনেকগুলি ব্যর্থ হয়েছিল। তথ্যানুসন্ধানে জানা যায় যে, আইনের বিধান লঙ্ঘন করে অধিকাংশ খনিজ খনিতে শ্রমিক কমিটির অস্তিত্ব দেখা যায়নি।[92]

বাংলা ও বিহারের কয়লা খনিতে ১৯৬৩ সালে খনি শ্রমিকদের সাধারন ধর্মঘট করার কথা জানা যায়। ছোটনাগপুরের খনি ক্ষেত্রের স্থানে স্থানে মার্কসবাদ ও লেনিনবাদ বিরোধী

---

৪৪. *ব্যানার্জি,* সুবোধ (সম্পা), *গণদাবী,* সোশ্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টারের বাংলা মুখপত্র, ১৩ বর্ষ ১ সংখ্যা, কলকাতা, ১৯সে সেপ্টেম্বর ১৯৬০, পৃ. ৭

89. *মজদুর মাসিক পত্রিকা,* সিআইটিইউ পাবলিকেশন, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ১৯৬০, পৃ. ৪

90. *Wage Award for Coal mine workers,* Economic and political weekly, Vol-8, Issue- 22, 1956, 2 June.

91. *Need Based Wage,* Economic and political weekly, Vol-12, Issue- 19, 1960, 7 may.

92. Tribal and rural welfare work in Orissa, (1950-51), Cuttack, 1952, P. 33.

কুৎসা ও অপপ্রচারে দেশহিতৈষী পত্রিকা খনি মজুর ও কৃষকদের সচেতন করার ভূমিকায় বিশিষ্ট অবদান রেখেছিল।[93]

বিহারে ১৯৬৪ তে কয়লা খনি ও তাম্র খনি আদিবাসী শ্রমিকদের মধ্যে ঐক্য গঠিত হওয়ার পর পর পর তিনটি ধর্মঘটের চিত্র উঠে এসেছিল। এই ধর্মঘটে শ্রমিকদের দাবি ছিল সমান বেতনের অধিকার ও কাজের সময় হ্রাসের দাবি। দাবির সংখ্যা বৃদ্ধি পেলেও ধর্মঘট দীর্ঘস্থায়ী হওয়ার পর একজন আদিবাসী শ্রমিকদের মৃত্যু খবর উঠে এসেছিল।[94]

ছোটনাগপুরের অন্তর্গত উড়িষ্যার ম্যাঙ্গানিজ খনিতে ১৯৬৫ সালের ১৯ সে অগস্ট এবং বারবিল খনি অঞ্চলে ৩২ টি শ্রমিক ধর্মঘট হওয়ার তথ্য পাওয়া যায় খনি শ্রমিকদের বাড়ি ভাড়া বৃদ্ধিকে কেন্দ্র করে। উড়িষ্যার বাউলা অঞ্চলে ক্রোমাইট খনি শ্রমিক ইউনিয়ানে কর্ম সংস্থানে সুযোগ বৃদ্ধি করার জন্য ট্রেড ইউনিয়ানের পক্ষ থেকে দাবি করা হয় যদিও সেই দাবি পরবর্তীকালে প্রত্যাহার করা হয়েছিল। কেউঞ্জর মাইনিং ওয়ার্কার্স ইউনিয়ান, ঠাকুরানী লৌহ আকরিক খনি, ম্যাঙ্গানিজ খনি ও বোলানি শ্রমিক সংঘের সমীক্ষায় দেখা যায়, বিভাগীয় চুক্তিবদ্ধ শ্রমিকেরা এবং নৈমিত্তিক শ্রমিকদের একটি বিশাল সংখ্যাগরিষ্ঠ সংখ্যা ব্যতীত ছিল খনি ইউনিয়ানের সদস্য। এই ইউনিয়ানের মধ্যে ৪৭% ছিল আদিবাসী শ্রমিক যারা নৈমিত্তিক ভিত্তিতে কাজ করত।[95] শ্রমিকদের দারিদ্র্য, অশিক্ষার পাশাপাশি ঠিকাদারদের স্বার্থও শ্রমিকদের সম্মিলিত পদক্ষেপের সুযোগ অস্বীকার করেছিল।[96] শ্রমিকদের জন্য ভালো আবাসন, মজুরী বৃদ্ধি, চুক্তিভিত্তিক শ্রমিকদের নিয়মিতকরণ এগুলি খুব কমই সুরক্ষিত ছিল যার ফলে বৃহত্তর শ্রম অসন্তোষ ও ধর্মঘট দীর্ঘদিন ধরে চলার তথ্য উঠে এসেছিল। এই অঞ্চলে তাঁদের দাবির মধ্যে খনি শ্রমিকরা যান্ত্রিক ডিভাইস গুলি প্রত্যাহারের কথা উল্লেখ করা হলেও সেই দাবি পূর্ণ হয়নি। বেশিরভাগ শ্রমিককে বেসরকারি সংস্থায় মিথ্যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল। যাইহোক,

---

93. মৈত্র. মোহিত(সম্পা), *দেশহিতৈষী,* (সাপ্তাহিক পত্রিকা), সি আই টি ইউ পাবলিকেশন, প্রথম সংখ্যা, কলকাতা, ১৬ই আগস্ট, ১৯৬৩, পৃ. ৫-৬

94. তদেব। প্রথম সংখ্যা, ১০জুন, ১৯৬৪, পৃ. ২-৪

95. *Tribal and Rural Welfare work in Orissa in 1950-1951,* Orissa, Department of Labour, 1952, P. 76-79.

96. তদেব।

অর্থনৈতিক প্রেরণা ইউনিয়ানবাদের বিকাশে সবচেয়ে সুসংগত এবং বাধ্যতামূলক ফ্যাক্টর তৈরি হয়েছিল।

১৯৬৫ সালে বীরভুমের ক্লে মাইন্স এবং ফায়ার ব্রিকস শিল্প শ্রমিক ইউনিয়ানের নেতৃত্বে ধর্মঘট শুরু হয়েছিল। ধর্মঘট চলাকালীন মালিক পক্ষ কর্তৃক প্ররোচনা, গুন্ডাদের প্রবেশ ও সমস্ত প্রকার চক্রান্ত চালানো স্বত্বেও শ্রমিকদের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের চাপে শেষ পর্যন্ত মালিক পক্ষ বিরোধ মিমাংসায় বাধ্য হয়েছিল। দীর্ঘ এক মাস আন্দোলন চলার পর শ্রম দপ্তরে আহুত ত্রিপাক্ষিক বৈঠকে বহু আলোচনার পর সমস্ত ছাঁটাই কর্মীদের পুনঃবহাল করা হয়েছিল বলে তথ্য উল্লেখিত হয়েছিল। ফ্যাক্টারি আইনের সমস্ত সুযোগ সুবিধা দেওয়া হবে এই আশা দিয়ে শ্রমিকদের আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল।[97]

97. *ব্যানার্জি.* সুবোধ(সম্পা), *গণদাবী,* সোশ্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টারের বাংলা মুখপত্র, ১৭ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, কলকাতা, ২৫সে মে, ১৯৬৫।

ছোটনাগপুর খনি অঞ্চলে স্বীকৃত ইউনিয়নগুলির তালিকা

রাজ্যের নাম	সাল	ট্রেড ইউনিয়ানের তালিকা
বিহার[98]	১৯৪৮	• মেটাল ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন, জামশেদপুর। • দ্য ইন্ডিয়ান কোলিয়ারি লেবার ইউনিয়ন, ঝরিয়া, • টাটা'স কোলিয়ারি লেবার অ্যাসোসিয়েশন, জেলগোড়া, • দ্য ইন্ডিয়ান মাইনার্স অ্যাসোসিয়েশন, ঝরিয়া।
বাংলা[99]	১৯৫৩-১৯৫৪	• কোলিয়ারি মজদুর কংগ্রেস (সদস্য সংখ্যা পুরুষ ১,৮৬৬ মহিলা ৩১৩ জন) • কোলিয়ারি মজদুর ইউনিয়ান (সদস্য সংখ্যা পুরুষ ৭৩ মহিলা ৫২ জন) • ইখ্রা নন্দী কোলিয়ারি (সদস্য সংখ্যা পুরুষ ৪৮ মহিলা ৫২ জন) • সেন্ট্রাল জামুরিয়া কোলিয়ারি ওয়ার্কার্স ইউনিয়ান (সদস্য সংখ্যা পুরুষ ১১৬ মহিলা ১২ জন) • সোদেপুর কোলিয়ারি মজদুর কংগ্রেস (সদস্য সংখ্যা পুরুষ ৪১২ মহিলা ৫২ জন) • কোলিয়ারি ওয়ার্কার্স ইউনিয়ান, আসানসোল (সদস্য সংখ্যা পুরুষ ৯৯৫ মহিলা ১৮ জন) • কোলিয়ারি মজদুর পঞ্চায়েত (সদস্য সংখ্যা পুরুষ ১৭২ মহিলা ৫৩ জন)

98. *Note on the working of the Indian Trade unions act, 1937-38,* Delhi, Government of India Press, published by the manager of publications, Delhi, 1939, P. 10-12.

99. *Government of West Bengal Labour Directorate Annual report on the working of the Indian trade Unions act 1954,* Alipore, West Bengal Governmental press, 1956, P. 23-34.

উড়িষ্যা[100]	১৯৬০-১৯৬৩ ১৯৬৩-১৯৬৫	• উড়িষ্যা মাইনিং ওয়ার্কার্স ইউনিয়ান, গুরুন্ডা কেউওঞ্জর। • সুন্দরগড় মাইনিং ওয়ার্কার্স ইউনিয়ান পুরুনাপানি। • পুরুনাপানি মজদুর ইউনিয়ান • কেউওঞ্জর মাইন্স আয়ন্ড ফরেস্ট ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন।

স্বাধীনতা পূর্ববর্তী থেকে পরবর্তীকাল পর্যন্ত আদিবাসীদের খনিতে অংশগ্রহণের রিপোর্ট

খনিজ খনি	১৯৩০-৪০[101]	১৯৪১-৪৭	১৯৪৮-১৯৫৭	১৯৫৭-৬৫
কয়লা	৩৫১.৯%	৫৩৭.৮%	৪৮৬.৬%	৪৩৩.৭%
লোহা	৩৭.৫%	৪৬.২%	৫৪.২%	৪৮.৭%
চুনাপাথর	১৬.৪%	৪৩.২%	৪৮.৫%	৪৮.২%
ম্যাঙ্গানিজ	৫২.২%	১৭.৪%	১৪.৪%	১৭.৪%
অভ্র	২৫.৩%	১২.৯%	১.৪%	১৯.৪%

কয়লা খনিতে ১৯৬৩ সালে মার্চ মাসের আদিবাসী শ্রমিকদের মোট কর্ম সংস্থান ছিল ১, ৩৮, ৭৪৫ জন। ১৯৬৪ সালে মার্চ মাসে ছিল ১, ৩৯, ৭৮৯ জন। মার্চ মাসের ১৯৬৫ সালে ছিল ১, ৩৩, ১৯২ জন।[102] শ্রমিকের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে পশ্চিমবঙ্গের কোলিয়ারিতে ট্রেড ইউনিয়ানে আদিবাসী শ্রমিকদের তালিকাবদ্ধ থাকার কথা জানা যায়। পশ্চিমবঙ্গের কোলিয়ারিগুলিতে সদস্যপদ গুলি ছিল অনিয়মিত প্রকৃতির। শ্রমশক্তি বৃদ্ধির সাথে ইউনিয়ানের সদস্যসংখ্যা বৃদ্ধি পায়নি। কয়লা খনিতে ট্রেড ইউনিয়ানের পরিচিতি বৃদ্ধি পাবার ফলে অন্যান্য খনিজ খনি অঞ্চলেও ট্রেড ইউনিয়ানের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পেতে থাকে। পশ্চিমবঙ্গের খনিতে ১৯৫৪-৫৫ সালে ১২টি ইউনিয়ান স্বীকৃত ছিল তার সদস্যসংখ্যা ছিল নারী ও পুরুষ মিলিয়ে ৩, ১৬৬ ও ২ জন। বিহারের খনিতে ছিল ৪৯৩ টি ট্রেড ইউনিয়ানের মধ্যে নারী ও পুরুষ শ্রমিক

100. *Annual Report on The working of the Indian trade unions act 1965,* Labour employment & Housing department, Government of Orissa, 1966, Pp. 4-10.

101. Prasad, S. D, *Census of India 1961,* Part- IX, Vol- IV, Bihar, Director of Census Operations, 1967, P. 34, 55, 74, 124.

102. *A study of Employment in coal- mining and manufacturing Industries,* West Bengal, 1963-1965, P. 2.

মিলিয়ে ২,২৯,৬৩৫ ও ৩২, ৪৬৫ জন। এছাড়াও উড়িষ্যার খনিতে ৯৫ টি ট্রেড ইউনিয়ানে শ্রমিক সদস্য সংখ্যা ছিল ২, ৭১১৫ ও ৫,৭৬৬ জন। কয়লা খনিতে পুরুষ সদস্য সংখ্যা ছিল ১,১৩,৩৮৮ এবং নারী ২১,০৯৭ জন। কয়লা ভিন্ন অন্যান্য খনিতে ছিল পুরুষ ৪৭,৮১০ ও নারী ১২,৭৪০ জন।[103]

পশ্চিমবঙ্গে ১৯৫৫-৫৬ সালে ১৬ টি ইউনিয়ান স্বীকৃত ছিল তার পুরুষ সদস্যসংখ্যা ছিল ১,২৭৪ জন কিন্তু মহিলা সদস্য সংখ্যা ছিল না। বিহারে ৫২১ টি ট্রেড ইউনিয়ানের মধ্যে নারী পুরুষ মিলিয়ে ছিল ২,৫৯,৬৪১ ও ৩২,৩০৪ জন। এছাড়াও উড়িষ্যাতে ছিল ৮৯ টি ট্রেড ইউনিয়ান তাতে ২৭,৬২২ ও ৬,৩৩৬ জন। কয়লা খনিতে পুরুষ সদস্য সংখ্যা ছিল ১, ০২, ৮৪১ এবং মহিলা শ্রমিক ছিল ১৪, ২৭৩ জন। কয়লা ভিন্ন অন্যান্য খনিতে ছিল পুরুষ ৪২, ৯৮৯ ও মহিলাদের সদস্য সংখ্যা ছিল ১২,০৩৯ জন।[104] ১৯৬২-৬৩ সালে সদস্যের পরিমাণ ছিল ২৫,০৬৫ জন।[105] ১৯৬৪ সালে ট্রেড ইউনিয়ানের সদস্যপদ ছিল ৬৮,৬৭০ জন। ১৯৬৫ সালে তা বৃদ্ধি পেয়ে হয় ৯৪, ৩৭৫ জন।

ট্রেড ইউনিয়ানে আদিবাসী যোগদান ও রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া

ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসকদের দেশের বিভিন্ন অঞ্চল দখল থেকে শাসন করার মধ্য দিয়ে আদিবাসী শ্রমিকদের ঐতিহাসিক সংগ্রাম চিত্রিত হয়েছিল স্বাধীনতার পূর্বে। স্বাধীনতা পূর্ববর্তী ঐতিহাসিক শ্রমিক সংগ্রামে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ভাবে আদিবাসী শ্রমিকদের পঙ্গু করে দেওয়া হয়েছিল। স্বাধীনতা পরবর্তীকালে সেই পঙ্গুত্ব যে কেটে গিয়েছিল তা নয় বরং ট্রেড ইউনিয়ানের উদ্ভব ও রাজনৈতিক তর্ক বিতর্কে আদিবাসী শ্রমিক গোষ্ঠীর অর্থনৈতিক জীবন উলটে পালটে দেখার চেষ্টা করা হয়েছিল। এছাড়াও গণতান্ত্রিক কার্যকলাপের দুটি অপরিহার্য অঙ্গ ছিল এক সম্পদের বিভাজন এবং অন্যদিকে সামাজিক ন্যায় বিচারকে সুনিশ্চিত করা। যে সমস্ত সামাজিক প্রতিষ্ঠান ধর্মীয় পরিচিতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হত স্বাধীনতা পরবর্তী, ধর্মনিরপেক্ষ

103. *Trade Unions in India 1954-55 and 1955-56, Labour Bureau,* Ministry of Labour and Employment: Publication by Government of India, 1958, Pp. 20-30.

104. তদেব। পৃ. ৩৪

105. তদেব। পৃ. ৩৫

সমাজব্যবস্থায় সকলের সব ধরনের অধিকারকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার সাহস দিয়েছিল ট্রেড ইউনিয়ান।[106]

১৯২০ এর সমস্ত দশক জুড়েই ট্রেড ইউনিয়ান ও শ্রমিক আন্দোলন দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছিল। সর্বহারা ও সাধারণভাবে মেহনতি মানুষের দারিদ্র্যতা ১৯২৯ সাল থেকে বৃদ্ধি পেলে, শ্রমিক শ্রেণির উপর তাঁর প্রভাব শোচনীয় হয়ে উঠেছিল। ছোটনাগপুর মালভূমিতে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক দ্বন্দ্বগুলিকে তীব্রতার চরমে প্রকাশ করেছিল। দীর্ঘস্থায়ী সংকট শ্রমিক জনসাধারণের অবস্থা শোচনীয় করে তুলেছিল পুঁজিবাদী শক্তি। বিরাট একটা আদিবাসী শ্রমিকদের বেকার সংখ্যা, নির্মম মজুরির হ্রাস, শোষণের তীব্রতা বৃদ্ধি শ্রমিক শ্রেণির নিয়তি ক্রমশ সংকট জনক হয়ে উঠেছিল। পুঁজিবাদী দেশগুলিতে যেমন খনি অঞ্চলের অভ্যন্তরীণ শ্রেণি বিরোধ এবং পুঁজিপতিদের শোষণের নিদারুণ চাপ একথাই প্রমাণ করেছিল যে, ইউনিয়ান গঠন ছিল খনি শ্রমিকদের জন্য প্রয়োজনীয়।[107]

এই পর্যায়ে আম্বেদকর ভারতের ঐতিহ্য ও ইতিহাসের পটভুমিকায় বিচার বিশ্লেষণ করেছিলেন এবং দেশ, কাল অনুযায়ী সাম্ভাব্য পথ ও পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন। তিনি সমাজের বিকাশের বৈশিষ্ট্য তথা সমাজপদ্ধতির দ্বন্দ্বের প্রকৃতিকে কিছুটা স্বতন্ত্র বলে মনে করেছিলেন। সামাজিক ভাবে নির্যাতিত ও অর্থনৈতিক ভাবে নিপীড়িত মানুষের স্বপক্ষে আম্বেদকরের আন্দোলন ছিল আদর্শ এক ইতিহাস। ইতিহাসের গতিপথ যেমন নানা উত্থান পতনের মধ্য দিয়ে প্রসারিত হয়েছিল ঠিক তেমনই আম্বেদকরের আন্দোলন কৃষক ও শ্রমিকদের নানা প্রকার দ্বন্দ্বময় পথে সমাধানের চেষ্টা করেছিলেন। আম্বেদকর নিজের মত করে সংগ্রামের পরিধি প্রসারিত করেন এবং সংগ্রামের কৌশল ও সাংগঠনিক রুপের পরিবর্তন ঘটিয়েছিলেন। যার ফলে বহিষ্কৃত হিতকারিণী সভা ১৯২৪ সাল থেকে শুরু করে রিপাবলিকান পার্টি অব ইন্ডিয়া প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী হয়েছিলেন। তিনি অস্পৃশ্য শ্রমিকদের নিয়ে আরও বলেছিলেন, "একজন অস্পৃশ্য শ্রমিকের কাজ পাওয়া, চাকুরি লাভ করা বা তার নিজের পেশায় উন্নতি করার সুযোগ পাওয়া অনেক কম ছিল"। অস্পৃশ্য বলেই তারা ভিন্ন ভিন্ন কর্মক্ষেত্রে

---

106. দাসগুপ্ত. সুধাংশু(সম্পা), *স্বাধীনতা,* (সাপ্তাহিক পত্রিকা), বীরভূম, পশ্চিমবঙ্গ, সংখ্যা-৫, ১৯৪৭।

107. লিয়ান্টিভ. এ, *মারক্সীয় অর্থনীতি,* কলকাতা, ন্যাশানাল বুক এজেন্সি, দ্বিতীয় পরিমার্জিত মুদ্রন, ১৯৭৯, পৃ. ২৬৯

নিয়োগ থেকে বঞ্চিত হত। এ প্রসঙ্গে আম্বেদকর সেই অসাম্যকে সামাজিক উন্নয়নের বাঁধা হিসাবে তুলে ধরেছিলেন। তিনি ভারতীয় সমাজ পদ্ধতির মূল দ্বন্দ্বকে উৎঘাটন করে সমাজকে ব্যাখ্যা করেছিলেন অগ্রগামী ও পশ্চাদপদের দ্বন্দ্বের মধ্যবর্তী পর্যায় হিসাবে। তিনি সমাজ প্রকৃতির দ্বান্দ্বিক রুপের প্রক্রিয়ায় সামাজিক ও অর্থনৈতিক দুই বৈষম্যের আধারে দ্বৈত ধারা বিশেষভাবে প্রত্যক্ষ করেছিলেন। তিনি শ্রমিক ও কৃষকদের অর্থনীতি সম্পর্কে মতামত প্রদান করেছিলেন যে, সামাজিক বৈষম্যকে গুরুত্ব না দিয়ে অর্থনৈতিক বৈষম্যের উপর গুরুত্ব অস্বীকার করা সঠিক হবে না বলে মনে করেছিলেন। তৎকালীন ধর্মীয় ও আর্থ- সামাজিক অবক্ষয়ের পটভুমিকায় তিনি ক্রমান্বয়ে সংযুক্ত করেছিলেন, শ্রমিক- কৃষকের শ্রেণি চেতনাজাত আন্দোলন এবং ব্রিটিশ বিরোধী জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনকে।[108]

কয়লা খনিতে শ্রমিক সংগঠন নিয়ে জহরলাল নেহেরুর নেতৃত্ব ১৯২৮ সালে ট্রেড ইউনিয়ান কংগ্রেসের এর সম্মেলন খনি শ্রমিকদের জন্য অনুষ্ঠিত করেছিলেন। এই অধিবেসনে স্থির হয় ১) শ্রমিক কর্মচারীদের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত অভাব ও অভিযোগ দূর করা ২) ক্ষতিপূরণ ও বকেয়া আদায়ের জন্য প্রয়োজনে ধর্মঘট করা এবং শ্রমিকদের স্বাস্থ্য ও পরিছন্নতা বিষয়ে শিক্ষা দান। জহরলাল নেহেরু পুঁজিবাদকে আক্রমন করে, সমাজতন্ত্রের মতাদর্শ প্রচার করেছিলেন বলে স্পষ্ট উল্লেখিত হয়েছিল।

এ প্রসঙ্গে তৎকালীন রাজনৈতিক বামপন্থী নেতা থেকে অন্যান্য সকল নেতাদের ট্রেড ইউনিয়ানে, আদিবাসী শ্রমিকদের যোগ দেওয়া নিয়ে নানা প্রতিক্রিয়া বা মতামত লক্ষ করা যায়। অবিচল ও চরম সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতা থেকে জমিদারি প্রথার বিরোধিতার মধ্য দিয়ে শ্রমিক ও কৃষকদের জন্য যথাক্রমে ট্রেড ইউনিয়ান নামক সমাজতান্ত্রিক কর্মসূচী গ্রহণ বামপন্থী নেতৃবর্গরা গ্রহণ করেছিল। তারা তাদের মতাদর্শ, সংগ্রামের নির্দিষ্ট পথে ও কংগ্রেসের সাথে বিরোধিতা করতে গিয়ে, সমাজের সংস্কারে সময় কম দিয়েছেন তবুও তাদের হাত ধরেই প্রথম শ্রমিকদের আন্দোলনের কথা ও অধিকারের প্রশ্ন নিয়ে নানা প্রসঙ্গ উঠে এসেছিল।[109] এ প্রসঙ্গে অনেকেই বামপন্থী নেতাদের সমালোচনা করেছিলেন। বামপন্থী নেতারা সশস্ত্র সংগ্রামের উপর

---

108. *আম্বেদকর প্রান্তের প্রত্যাশা ও দলিতের প্রত্যয়,* পরিচয়, ৬৯ বর্ষ, কার্ত্তিক- পৌষ, কলকাতা, ১৪০৬, পৃ. ২- ১৬

109. দাসগুপ্ত. সুধাংশু, *কমিউনিস্ট আন্দোলনের পাতা থেকে,* কলকাতা, এনবিএ প্রাইভেট লিমিটেড, ২০১৫, পৃ. ৫৫- ৫৭

বিশ্বাস তৈরি করতে পেরেছিলেন শ্রমিক শ্রেণির মধ্যে। কৃষক ও শ্রমিক শ্রেণির মনে অধিকার গ্রহণ ও গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগের জন্য সংগ্রামের কথা ভাবতে তারাই উৎসাহ দিয়েছিলেন। জাতীয় আন্দোলনগুলির উপর বামপন্থী নেতাদের প্রভাব প্রতিফলিত হয়েছিল ১৯৩১ এর করাচী অধিবেসনের পর থেকে। সেই একই সময়ে তাদের মধ্যে রাজনৈতিক ও মতাদর্শগত রুপান্তর হওয়ার ফলে ১৯৩০ এর দিকে বামপন্থীদের মধ্যে অনেকগুলি গোষ্ঠী ও ধারার উদ্ভব হয়েছিল। কৃষক ও শ্রমিকদের জন্য বিভিন্ন সংগঠন ও একত্রিত করার ডাক দিয়েছিল বামপন্থীদের মতাদর্শে গড়ে উঠা ভিন্ন ভিন্ন দলগুলি।

অল ইন্ডিয়া ট্রেড ইউনিয়ান কংগ্রেসের ২৪তম মিটিং এ ১৯৫১ সালে রিপোর্টে এস এ ডাঙ্গে শ্রমিকদের সুবিধার জন্য কয়েক নীতি বা নিয়ম প্রকাশের কথা তুলে ধরেছিলেন।[110] তিনি বলেছিলেন “Everyone to be in Union” এটাই তাদের স্লোগানের মূল চাবি ছিল। তিনি প্রত্যেক শ্রমিক বা মজুরদের ইউনিয়ানে যুক্ত হওয়ার কথা বলেছিলেন।

স্বাধীনতা পরবর্তীকালে শ্রমিকদের জন্য শ্রমজীবী সংগঠন গড়ে উঠলেও ট্রেড ইউনিয়ান আন্দোলনকে লালন পালনে তৎকালীন রাষ্ট্রের ভূমিকা ছিল উল্লেখযোগ্য। গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার মধ্যে যে দেশগুলিতে সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা হয়েছিল সেখানে সমানধিকারের ও সম মর্যাদার নীতি মেনে চলার কথা বলা হলেও ট্রেড ইউনিয়ানে আদিবাসী শ্রমিকদের অংশগ্রহণে ভিন্ন ভিন্ন প্রতিক্রিয়া লক্ষ করা যায়। নিরক্ষর আদিবাসীরা ট্রেড ইউনিয়ানের নেতাদের মধ্যে প্রথম সারিতে পৌছাতে পারেনি। ট্রেড ইউনিয়ানের বিভিন্ন শ্রম আইনে আলাপ আলোচনার মধ্যে ইংরেজি ভাষার প্রভাব বৃদ্ধি পেতে থাকায় দুটি প্রাচীর তৈরি হওয়ার পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল। সাংগঠনিক বুদ্ধি, সাহস, পরিচালনা করার দায়িত্ব থাকা স্বত্বেও তারা প্রথম সারির নেতা হয়ে উঠতে পারেননি।[111] শশীপদ ব্যানারজির মত সমাজবাদী বা দ্বারকানাথ গাঙ্গুলি- রামকুমার, বিদ্যারত্ন প্রচারবাদীদের মতে ট্রেড ইউনিয়ান প্রতিষ্ঠার সামগ্রিক পরিণতি ছিল খনি শ্রমিকদের প্রাতিষ্ঠানিক সামাজিক

---

110. Sen. Sunil Kumar, *Working class movement in India 1885-1975,* Delhi, Oxford University Press, 1994, P. 123.

111. রায়. মনোরঞ্জন(সম্পা), *শ্রমিক আন্দোলন পত্রিকা,* ৩য় বর্ষ, ২য় সংখ্যা, কলকাতা, সিআইটিইউ পাবলিকেশন, ডিসেম্বর ১৯৭৪, পৃ. ১২

জীবন থেকে বিছিন্ন করা। রুডলফ হেরাডিয়া বলে মনে করেন,[112]১৯৫২ সালের লোকসভার নির্বাচনে আদিবাসীদের রাজনৈতিক অভিব্যক্তি খন্ডিত করা হয়েছিল অশিক্ষার জন্য।[113]

বি আর আম্বেদকর এই সময়ের প্রেক্ষাপটে বিভিন্নভাবে কৃষক ও শ্রমিক স্বার্থে নানাপ্রকার কাজ করেছেন তা নিয়ে সন্দেহ নেই। তিনি বিশেষভাবে কৃষকদের স্বার্থে – ভূমি ব্যবস্থার পরিবর্তন, কৃষকের হাতে জমি প্রদান, যৌথ খামার স্থাপনার প্রস্তাব, শিল্প ও শ্রমিক স্বার্থে জয়েন্ট লেবার ম্যানেজমেন্ট কমিটি গঠন, শ্রমিক স্বার্থে কংগ্রেসের উত্থাপিত "শিল্প বিরোধী বিল" এর বিরোধিতা, দ্রুত শিল্প উন্নয়নের ব্যবস্থা, শ্রমিকদের ধর্মঘটের অধিকার প্রতিষ্ঠার দাবি প্রভৃতি বিষয়ে আম্বেদকরের উদ্যোগ উল্লেখযোগ্য ছিল। আর্থ- সামাজিক কাঠামোর মূলে আঘাতের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে দূরদৃষ্টি নেতা ছিলেন এবং[114] শ্রমিক কৃষকের অধিকারসহ সর্বপ্রকার গণতন্ত্রের ও নির্যাতিতের যুক্তির সপক্ষে তিনি ছিলেন সোচ্চার। তিনি সংগ্রাম করেছিলেন সামাজিক অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক জীবনের সকলক্ষেত্রে সকল মানুষের সমান অধিকারের জন্য। এছাড়াও লক্ষ করা যায় তিনিই একমাত্র কৃষকের পাশাপাশি শ্রমিকের উন্নয়নের মাধ্যমে দেশের অভ্যন্তরীণ বাজারের প্রসারন এবং তার ভিত্তিতে আধুনিক শিল্পায়নের পথ প্রশস্ত করা ও সামগ্রিকভাবে জাতীয় উন্নয়ন সাধন করার পরিকল্পনার কথা তিনি বিশেষভাবে ব্যক্ত করেছিলেন। এই সমস্ত শ্রমিক কৃষক শ্রেণির স্বার্থ আলোচনা ব্যতীত আম্বেদকর অস্পৃশ্যতা বিরোধী সংকীর্ণ আন্দোলনের দিকে অধিক মনোযোগ দিয়েছিলেন। শ্রমিক শ্রেণির সংগ্রামে তার ভূমিকা ইতিবাচক ছিল ও সাম্যবাদী আন্দোলনের সহযোদ্ধা ছিল বলে মনে করেছিল একাধিক জনমত। শ্রমজীবী নিপীড়িত মানুষের সংগ্রামে নিবেদিত আম্বেদকর ছিলেন মূলতঃ গণতান্ত্রিক সমাজবাদের পক্ষে, তাই পার্লামেন্টারি গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতেই বৈষম্যহীন গণতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠা ছিল তাঁর লক্ষ ছিল বলে উল্লেখ করা যায়।[115] তিনি তৎকালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে দলিতদের জন্য যেভাবে তিনি একা সংগ্রাম করে গিয়েছিলেন সেই একইরকম নেতৃত্ব ছোটনাগপুরের আদিবাসী শ্রমিকদের মধ্য থেকে গড়ে

---

112. Heredia. Rudolf C, *Taking sides Reservation Quotas and Minority Rights in India,* Penguin Random House India, 15 October 2012, P. 322-335.

113. তদেব। পৃ. ৩২২-৩৩৫

114. *INTUC - Proceedings of the Inaugural Conference,* May, 1947, P. 14.

115. *আম্বেদকরঃ প্রান্তের প্রত্যাশা ও দলিতের প্রত্যয়,* পরিচয় ৬৯ বর্ষ, কার্তিক- পৌষ ১৪০৬, কলকাতা, পৃ. ২-১৬

উঠার প্রয়োজন ছিল। সেটা সম্ভব হয়নি বলেই স্বাধীনতা পরবর্তীকালে আদিবাসী শ্রমিকদের আন্দোলনে ধর্মঘটের পথ আকড়ে থাকতে হয়েছিল। নিজ স্বার্থ ভিন্ন দেশের সকল বঞ্চিত ও নির্যাতিত জনগণের স্বার্থে বৃহত্তর সংগ্রাম ও আন্দোলনে অংশগ্রহণ করা উচিত ছিল বলে মনে করেছিলেন।[116]

১৯৫৯এ ৬ অক্টোবর, নিউ ইয়র্কের এক বক্তৃতায় মোরাজি দেশায় বিগত কয়েক বছরের ভারতের অর্থনৈতিক অগ্রগতি প্রসঙ্গে ভারতের সাথে বৈদেশিক বাণিজ্যের আগ্রহ ও যোগাযোগ বৃদ্ধির কথা প্রকাশ করেছিলেন। এই প্রসঙ্গের পাশাপাশি ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক উন্নয়নকে অবশ্যই একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল বলে মনে করেছিলেন। আসলে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যুক্ত বিস্তীর্ণ খনি অঞ্চলে শ্রমিকদের জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি করা তৎকালীন সময়ে বড় সমস্যা ছিল বলে তিনি মনে করেছিলেন। ১৯৫৯ সালে ভারতবর্ষের ৪০০ মিলিয়ন জনসংখ্যার মধ্যে বছরে প্রায় ২ শতাংশ হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে চলেছিল। তার মধ্যে কৃষির সাথে যুক্ত কৃষক ও শিল্পের সাথে যুক্ত শ্রমিকদের অবস্থা সংকটপূর্ণ ছিল ছিল। মোরাজি দেশাই মনে করেছিলেন, ভারতবর্ষের জনগণের জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি করতে জনসংখ্যার আকার বাঁধা প্রদান করেছিল বলে তিনি মনে করেন। তিনি বিগত নয় থেকে দশ বছরে বারংবার শিল্প বৃদ্ধি ও কৃষি থেকে আয় বৃদ্ধির কথা বলেছিলেন কিন্তু কৃষি বা শিল্পে আয়ের সাথে যুক্ত কৃষক ও শ্রমিকের সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনযাত্রা নিয়ে কোনো প্রসঙ্গ আলোচনা করেননি।[117] তিনি সামগ্রিক ভাবে অর্থনৈতিক দিক থেকে ভারতবর্ষের অগ্রগতিকে প্রাধান্য দিতে চাইলেও অনগ্রসর জাতির দিকে দৃষ্টিপাত করেননি।

ঝরিয়াতে ট্রেড ইউনিয়ান কংগ্রেসের নবম শ্রম অধিবেশনে সভাপতি দাউদ, সমবেত সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে তার অভিভাষণে ভারতের উপজাতি শ্রমিক সম্বন্ধে বলেন, পুরাকাল থেকেই ভারত ছিল কৃষি প্রধান দেশ। দেশের ২৩ কোটি জনগণের কাছে কৃষিই ছিল একমাত্র সম্বল এবং ১০ কোটি ৬ লক্ষ জমিতে কাজ করত। সব মিলিয়ে প্রায় ২৫ কোটি কৃষিজীবী মজুর এদেশে ছড়িয়ে ছিল।[118] এ সমস্ত ছাড়াও আরও খনি শিল্প ছিল উল্লেখযোগ্য।

---

116. তদেব। পৃ. ২-১৬

117. Desai. Moraji R, *Speeches on Economic Development in India,* Delhi, Ministry of Finance Department of Economic Affairs Government of India, Nov- 1959, P. 23.

118. বাংলার কথা, কলকাতা, শনিবার ৭ই পৌষ, ১৯৫২।

রেলপথ নির্মাণের সাথে সাথে শ্রমিকের প্রয়োজন ১৯৬০ সালে ভারতের সমস্ত রেলপথে ৩, ৫০, ১৭৭ জন শ্রমিক কাজ করত তার মধ্যে ২, ১৫,৩৩০ জন আদিবাসী শ্রমিক বৃদ্ধি পেয়েছিল।[119] প্রথমের দিকে অধিকাংশ বেসরকারি কোম্পানির অধীনে শ্রমিকদের দুরাবস্থার সীমা ছিল না বলে স্বীকার করেন। বিদেশ রাষ্ট্র কর্তৃক পরিচালিত রেলপথগুলির উন্নতি দেখে আদিবাসী শ্রমিকদের দুর্ভাগ্য ও হতাশার দিক নিয়ে আক্ষেপ করেছিলেন।

যতদিন পুঁজিবাদ আছে ততদিন 'উপজাতি'[120] সমস্যার সমাধান নেই[121] ১৯৬০ সালের উক্ত মন্তব্যের মধ্য দিয়ে পুঁজিবাদী শাসন ও শোষণে জর্জরিত জনসাধারণের অসন্তোষে শোষিত মানুষের সংগ্রামী ঐক্যে ফাটল ধরিয়ে গণআন্দোলনগুলিকে ব্যর্থ করে দিতে ধর্মগত, বর্ণগত অথবা প্রাদেশিক মনোভাবকে উস্কানি দিয়ে বিক্ষোভকে পরিচালিত করা হয়েছিল। এই গণ আন্দোলনগুলিতে তা ধীরে ধীরে বহিঃ প্রকাশিত হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল। রাজনৈতিক দলগুলি সাধারন সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রবর্তনের মারফৎ শ্রমিক শ্রেণির ভাগ্য পরিবর্তনের ও অধিকার আদায়ের আশায় উপজাতি শ্রমিক সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান সম্ভব বলে আশ্বাস দিয়েছিল।[122]

অর্থনৈতিক উন্নয়নের ধারায় স্বাধীনতা পরবর্তী খনি অঞ্চলে আদিবাসী শ্রমিক ও শ্রম সম্পর্কিত পরিবর্তন

আম্বেদকর অর্থনৈতিক উন্নয়নে রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনের পক্ষে ছিলেন। ধনতান্ত্রিক অর্থনীতিতে অসাম্য যে বর্তমান ছিল তা তিনি স্বীকার করেছিলেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেছিলেন যে, ব্যক্তিগত মুনফার জন্য পরিচালিত ও ব্যক্তিগত উদ্যোগের ভিত্তিতে যে অর্থনীতি গড়ে উঠেছিল তা রাজনৈতিক গণতন্ত্রের মৌলিক চাহিদাকে লঙ্ঘন করেছিল। গণতন্ত্রের মৌলিক চাহিদায় উন্নয়ন লক্ষ করা যায়নি। আদর্শ সমাজের উন্নয়ন বলতে তিনি বোঝাতে চেয়েছিলেন যে, সমাজে সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতা হবে তার ভিত্তি। তাঁর বক্তব্যের মধ্যে প্রকাশ পেয়েছিল

---

119. ব্যানার্জি. সুবোধ (সম্পা), গণদাবী, সোশ্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া, (বাংলা সাপ্তাহিক পত্রিকা), প্রথম বর্ষ ১২ সংখ্যা, কলকাতা, ১৫ই ফেব্রুয়ারি ১৯৬০, পৃ. ৪

120. স্বাধীনতার পর বিশেষ কয়েকটি আদিবাসী গোষ্ঠীকে উপজাতি তকমা দেওয়া হয়েছিল।

121. ব্যানার্জি. সুবোধ (সম্পা), *গণদাবী,* সোশ্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া, (বাংলা সাপ্তাহিক পত্রিকা), ১৩ বর্ষ ১ সংখ্যা, কলকাতা, ১৯সে সেপ্টেম্বর, ১৯৬০, পৃ. ৫

122. *দুর্নীতির রাজনৈতিক অর্থনীতি পত্রিকা,* কলকাতা, এনবিএ প্রাইভেট লিমিটেড, ২০১২, পৃ. ৭

ধনতন্ত্র ব্যবস্থা শ্রমিক ও কৃষক শ্রেণিকে মৃতপ্রায় করে তুলেছিল। তিনি প্রথমেই জাতভিত্তিক অবিচারকে ধ্বংস করতে চেয়েছিলেন কারণ তার প্রভাবে সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনে কাঠামো পরিবর্তিত হয়ে চলেছিল।[123] শ্রমিকদের ব্যাপকভাবে কারিগরি শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলার, শ্রমিকদের স্বার্থে আইন প্রণয়ন, বসবাসের জন্য স্বাস্থ্য সম্মত বাসস্থান প্রভৃতি বিষয়গুলি তার কর্মসূচীতে স্থান পাওয়ার কথাও ব্যক্ত করেছিলেন। শিল্প সম্প্রসারণ ও উন্নয়নমূলক কর্মসূচী রুপায়ন করার মাধ্যমে বেকার সমস্যা সমাধানের বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে তার কর্মসূচীতে রেখেছিলেন।[124] শ্রমজীবী মানুষের স্বার্থের বিরুদ্ধে আইন করার উদ্দেশ্যে শিল্প বিরোধ বিল উত্থাপন করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিলেন।

শ্রমজীবী মানুষের সমস্যা নিয়ে কয়লা খনির কমিটি (১৯৩৭), ভারতীয় কয়লাক্ষেত্র কমিটি (১৯৪৬), ধাতব কয়লা সংরক্ষণের কমিটি (১৯৫০) সহ মর্যাদাপূর্ণ কমিটিগুলি চিন্তায় মগ্ন হয়েছিল। সরকারী বাজেটে পুঁজিপতি শ্রেণিদের মুনফা আদায় করার সুযোগ দেওয়া হয়। এ কথা বলার অর্থ হল ১৯৫০ সালে যে সমস্ত পুঁজিপতি ২ লক্ষ টাকা আয় করত তাদের উপর আয়কর হ্রাস করা হয়েছিল। আয় থেকে পুঁজিপতিদের মুনফা ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পেয়েছিল।[125] অনেকেই এই খনি শিল্প টিকিয়ে রাখার জন্য জমিদারীকে মজবুত রেখেছিলেন।

স্বাধীনতা পরবর্তীকালে অনুন্নত শ্রেণির কল্যাণের জন্য কেন্দ্রীয় ও রাজ্য স্তরে কিছু পরিকল্পনা নেওয়ার কথা উঠে এসেছিল। অস্পৃশ্যতা বর্জনের কথা বলা হয়েছিল। আদিবাসীরা ট্রেড ইউনিয়ানে অংশগ্রহণ করার পর একের পর এক ধর্মঘটে যোগদান করতে থাকলে খনি অঞ্চলের শ্রমিক সম্পর্কিত শ্রমের নিয়ামাবলীর পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। স্বাধীনতা পরবর্তীকালে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার প্রধান খনি অঞ্চলগুলিতে খনি শ্রমিক ও ট্রেড ইউনিয়ানদের উদ্যোগে বেশ কিছু নিয়মে পরিবর্তন ও সংযোজন লক্ষ করা যায়। ট্রেড ইউনিয়ানের শ্রম ব্যুরোর সাথে নতুন কিছু কার্যাবলী অভিযুক্ত করা হয়েছিল। খনি শ্রম পরীক্ষা সংক্রান্ত পরিসংখ্যানের পাশাপাশি শ্রমিকদের জীবনযাত্রার মান উন্নত করতে ভিন্ন ভিন্ন আইন প্রণয়নের মধ্যে লক্ষ করা গিয়েছিল, শ্রম কোড ও প্রণীত সংবিধিবদ্ধ নিয়ম- এর অধীনে দেশের শ্রম বিষয়ক রেফারেন্স ফোল্ডার তৈরি করা, ন্যূনতম মজুরী আইন, কারখানা আইন

123. তদেব। পৃ. ১০

124. তদেব। পৃ. ১২।

125. আহমেদ. মুজাফফর (সম্পা), গণবানী পত্রিকা, পাক্ষিক, ১লা এপ্রিল শনিবার, ১৯৫০, পৃ. ১-৩

ইত্যাদি কাজের উপর বার্ষিক প্রতিবেদন তৈরি করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল।[126] ইউনিয়ান পার্টির অন্যান্য সদস্যদের মধ্য থেকে দেখা যায় যে, রাজনৈতিক অভিযানের দুর্বলতা প্রকাশ পেয়েছিল নিয়মিত বুলেটিন প্রকাশিত না হওয়ার মধ্য দিয়ে। দৈনিক থেকে মাসিক বুলেটিনগুলি চালু করা হয়েছিল।[127] এই পরিবর্তনে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য উভয় সরকারের হস্তক্ষেপ লক্ষ করা যায়। জনসংখ্যা, মানব মূলধন, সামাজিক মূলধন, প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান সমূহ ও রাজনৈতিক অর্থনীতি প্রভৃতি অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্পর্কে সম্যকভাবে অবগত হওয়ার ক্ষেত্রে স্পষ্ট ভূমিকা লক্ষ করা যায়।[128] শ্রম প্রসঙ্গে বলা যায় যে, স্বাধীনতা পূর্ব ১৯৪১ সালে খনি শ্রমিকদের সুযোগ সুবিধার জন্য কিছু আইন নতুন করে সংযোজিত হয়েছিল। শ্রম সমস্যার নিস্পত্তির জন্য ১৯৪৬-৪৮ সালে শ্রম আইনে পুনরায় ভিন্ন ভিন্ন শর্তাবলী প্রযোজ্য হয়েছিল। শিল্প শ্রমিকদের জন্য প্রাথমিক শিক্ষা অভিযান ও শ্রম সম্পর্কে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নেওয়ার কথা আলোচিত হয়েছিল। শিল্প শ্রমিকদের জন্য প্রভিডেন্ট ফান্ড, স্কিম, বীমা, নিরাপত্তা ব্যবস্থা, স্বাস্থ্য, কল্যান সম্পর্কে নিশ্চিত করার কথা উল্লেখ করা হয়েছিল।[129] ১৯৪৭ এর পর থেকেই গণতান্ত্রিক অধিকারের সাথে নেহেরু যুগে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় শ্রমিক, কলকারখানা ও খনি অঞ্চল নিয়ে বেশ কিছু নতুন নিয়ম ১৫% বৃদ্ধি পেয়েছিল।[130] ১৯৬০ সালে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় শিল্পায়ন ও শিল্পায়নের সাথে জড়িত সমস্যাগুলিকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল। ট্রেড ইউনিয়ানের লক্ষ্যে ও শ্রমিকদের সংগঠনের দাবিতে পুনরায় স্বাধীনতা পরবর্তীকালে ১৯৬১ সালে খনিতে কর্মরত শ্রমিকদের সুযোগ সুবিধা ও অধিকারের জন্য পাশ হয়েছিল। স্বাধীনতার পর প্রথম ও দ্বিতীয় পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনার শিল্প খাতে পশ্চিমবঙ্গে ২২

---

126. *Estimate Committee (1959-60) Eighty- Eight Report (second Lok Sabha),* Ministry of Labour and Employment Part-II, New Delhi, Lok Sabha Secretariat, April 1960, P. 22-31.

127. *দেশহিতৈষী,* (সাপ্তাহিক পত্রিকা), প্রথম সংখ্যা, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি, ১০ জুন, ১৯৬৪, পৃ. ২-৪

128. *প্রস্তাব ও সংগঠন সম্পত্রিকা,* কলকাতা, সিপিআইএম প্রকাশনা, ১৯৭৬, পৃ. ৩৪

129. *Labour in the Second Plan,* Economic and political weekly, Vol- 7, Issue No. 4-5, 26 Jan, 1955, P. 149-150.

130. *Copy of the speech delivered by Shri S.K. Sen, Joint Chief controller, Imports & Exports,* Calcutta & Chairman, Mica export promotion council at the meeting of Mica Exporters & Mine Owners convened by the Fedaration of Mica Associations, Bihar, Mica miners & Dealers Association and the Mica mining Association, 23 Sept. 1960.

থেকে ২৩ কোটি টাকা[131] উন্নয়নের জন্য যে ব্যায় করা হয়েছিল তাতে খনি ও খাদান ক্ষেত্রগুলিতে আদিবাসী শ্রমিকদের অবস্থান অপরিবর্তিত ছিল।

খনি শিল্প শ্রমিকদের জন্য ভর্তুকিযুক্ত আবাসন প্রকল্প[132]

সমগ্র ট্রেড ইউনিয়ন ঐক্যবদ্ধ ভাবে শিল্প শ্রমিকদের উন্নত ধরনের আবাসন ব্যবস্থা প্রদানের লক্ষ্যে ভারত সরকার পূর্ত, আবাসন ও সরবরাহ মন্ত্রক তুলনামূলক ভাবে সস্তা ভাড়ায় "শিল্প শ্রমিকদের জন্য ভর্তুকিযুক্ত হাউজিং স্কিম" নামে প্রকল্প প্রনয়ণ করা হয়েছিল। যার অধীনে রাজ্য সরকার ও সংবিধিবদ্ধ হাউজিং বোর্ড, খনি আবাসন কর্মীদের জন্য গৃহ নির্মাণে সরকারের আর্থিক সহায়তার প্রকল্পে সাহায্য করার কথা বলা হয়েছিল। সেই প্রকল্পে দেওয়া শর্তাবলীর অধীনে ছোট দুই কক্ষ বিশিষ্ট ঘরের ঋন মঞ্জুর করার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। ভারত সরকারের এই সিদ্ধান্তে রাজ্য সরকার একমত প্রদর্শন করেছিল। সরকার কর্তৃক আর্থিক সহায়তা প্রদানের কথা প্রকাশ করা হয়েছিল খনির সাধারণ শ্রমিকদের গৃহ নির্মাণের জন্য। স্বাধীনতা প্রাপ্তির সাথে সাথে উন্নয়নের কাজ শুরু হলেও, খনি আইন শক্তিশালী করার সাথে নিয়োগকর্তাদের উপর দায়িত্ব অর্পিত করা হয়েছিল। খনিতে ‘শ্রম কল্যাণ তহবিল আইন’ ভাড়ার সাথে জড়িত ছিল। ১৯৫২ সালে ৫০% টাকা অনুমোদন করা হয়েছিল গৃহ নির্মাণের জন্য। এছাড়াও শ্রমিক আবাসনে ঋন দেওয়ার ব্যবস্থা করার কথা বলা হয়।[133] ১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত ৯৯ কোটি টাকা খরচ করা হয় এবং ১৯৫২-৫৩ সালে ২৮,৫০০ টি গৃহ নির্মাণের পরিকল্পনা আলোচনা করা হয়েছিল।[134] ১৯৪৮ সালের কেন্দ্রীয় সংশোধিত ১৩ এর ধারার খনি আইন এবং ১৯৫২ সালের কেন্দ্রীয় আইনে ৩৫এর ধারা অনুযায়ী কয়লা এবং অভ্র খনি ছাড়া অন্যান্য খনিজ খনি ক্ষেত্রে একই নিয়ম প্রচলিত ছিল। ১৯৫১ সালের পঞ্চবার্ষিকী অনুসারে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজে বাংলায় খরচ করা হয়েছিল ২২৮৪ কোটি টাকা। পঞ্চবার্ষিকীর খসরা তৈরি হওয়ার সময় রাষ্ট্র নেতাদের ব্যাখ্যায়, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সরকারী

---

131. *বীরভুম বার্তা,* (সাপ্তাহিক পত্রিকা), বর্ষ- ৫৩, সংখ্যা- বিশেষ, সিউড়ি, বীরভূম, ১৫ই আগস্ট, ১৯৫৬।

132. *Subsidized Housing Scheme for Industrial Worker Employers Projects,* Government of West Bengal Housing Department, Alipore, West Bengal Government press, 1960, P. 15, 39, 113.

133. *Labour in the Plan,* Economic and political weekly, Vol- 7, Issue No. 4-5, 26 Jan, 1955, 149-150.

134. *বীরভুম বার্তা,* (সাপ্তাহিক পত্রিকা), বর্ষ -৫৩; সংখ্যা- বিশেষ, সিউড়ি, বীরভূম, আগস্ট ১৫, ১৯৫৬।

পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ না হওয়ার কথা উঠে এসেছিল। এই ঘটনার পরবর্তি রাজ্য সরকার খনি কর্মচারীদের মধ্যে, এই প্রকল্পের অধীনে কোনও আর্থিক সহায়তা দেওয়া হবে না বলে ঘোষণা করা হয়েছিল। এমনকি ১৯৪৮ বা ১৯৫২ সালে পুনরায় এই আইন দ্বারা শ্রমিকদের সেই সহায়তা দেওয়া হবে না বলে ঘোষণা করা হয়েছিল। এই আইনে আরো শর্ত আরোপিত হয়েছিল যে, খনি কোম্পানিগুলি আংশিক বা সম্পূর্ণভাবে কেন্দ্রীয় সরকারের মালিকানাধীনে, আয়কর দিতে দায়বদ্ধ থাকে তবে, তাদের যোগ্য কর্মীদের বাসস্থানের জন্য প্রকল্পের অধীনে সহায়তা পাওয়ার অধিকারী বলে ঘোষণা করা হবে।[135] আদিবাসী শ্রমিকদের দাবিগুলি জাতীয় স্তরের সংগঠনগুলির দাবির সাথে পার্থক্য লক্ষ্য করা যায় কেননা ১৯৬৩ সালের ১৭ই ডিসেম্বরের দিকে জামশেদপুর, রাউরকেল্লা, কলকাতা শ্রমিকদের মধ্যে পুনরায় দাবি উঠে অধিক মজুরির পাশাপাশি ভালো বাসস্থানের।

মাতৃত্বকালীন আইনের সুবিধা

খনিতে কর্মরত আদিবাসী মহিলা দাবিদারদের তারা প্রদেয় মাতৃত্বকালীন সুবিধা গ্রহণ না করতে পারায় অভিযোগ স্পষ্ট হয়েছিল। স্বাধীনতা পূর্ববর্তী খনি মহিলা শ্রমিকদের মাতৃত্বকালীন ছুটির সুবিধা ছিল না তা পূর্বের অধ্যায়ে উল্লেখিত হয়েছে। স্বাধীনতা পরবর্তী ১৯৪৮ এর ধারায় ৫০৫ জন এই সুবিধা পেয়েছিলেন। মাতৃত্বকালীন ছুটি মঞ্জুর করা ৮৪ জন মহিলা শ্রমিকের মধ্যে ৬৪ জন মহিলা কর্মী তাদের মাতৃত্বকালীন ছুটির ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছিল। সংশ্লিষ্ট বাংলা ও বিহারে খনি অঞ্চলে ১৯৫২ সালে ও ১৯৫৩ সালের উড়িষ্যা রাজ্য প্রশাসনের বার্ষিক প্রতিবেদনে খনির মহিলা শ্রমিকদের জন্য মাতৃত্ব সুবিধা আইন পুনরায় পাশ করে উপযুক্ত পদক্ষেপ নেওয়া কথা জানা যায়। ১৯৬১ সালে এই আইন পুনরায় পাশ হলে উড়িষ্যায় মাতৃত্বকালীন সুবিধার নিয়ম ১৯৬২ সালে প্রযোজ্য মোট নিবন্ধিত কারখানার সংখ্যা ছিল ২০৩ এবং খনিগুলিতে নিযুক্ত থাকাকালীন মহিলাদের দৈনিক গড় সংখ্যা ছিল ৪,১৪০টি।[136] এই ৪,১৪০ জন মহিলা শ্রমিকের মধ্যে ৩,৬৩৫ জন মহিলা শ্রমিকরা মাতৃত্বকালীন ছুটিতে উপকৃত হয়েছিলেন। মাতৃত্বকালীন অবসরের আইনটি ছোট ফ্যাক্টরির ক্ষেত্রে প্রধান পরিদর্শকের নির্দেশে

135. *Annual Report on the working of the Industrial employment act, 1947 for the year of ending 1965,* Cuttack, Government of Orissa, 1968, P. 6-10.
136. *Annual report on the Administration of the Orissa maternity Benefit act 1953,* The State of Orissa, Government of Orissa, 1962, P. 24-26.

পরিচালিত হত। খনির মহিলা শ্রমিক এবং তাদের সন্তানদের সুবিধার জন্য রাজ্য সরকার কর্তৃক কল্যাণমূলক, শিক্ষামূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল বলে তথ্য উল্লেখিত হয়েছিল।[137]

পশ্চিমবঙ্গের খনির শ্রমিকদের স্বাস্থ্য ও কল্যাণ বিল (১৯৬২-৬৪)[138]

ওয়েস্ট বেঙ্গল মাইনিং সেটেলমেন্ট স্বাস্থ্য ও কল্যাণ বিল সংশোধন যৌথ কমিটি দ্বারা গৃহীত হয়েছিল ১৯০২ সালে। ১৯১২ সালে এটি খসড়া বিলের তুলনায় একটি স্বতন্ত্র ছিল যা বিধানসভায় উথাপিত হয়েছিল। এই আইন, বেঙ্গল মাইনিং সেটেলমেন্টস অ্যাক্ট নামে পরিচিত ছিল। সময়ের অগ্রগতির সাথে তাল মিলিয়ে চলতে ব্যর্থ হওয়ার ফলে খনি সংলগ্ন শ্রমিকদের জনবসতি এবং সংলগ্ন শিল্প এলাকায় যে দ্রুত পরিবর্তনকে মোকাবেলা করতে এই ধরনের কমিটি তৈরি করা হয়েছিল। পশ্চিমবঙ্গে খনি এবং শিল্প এলাকা একে অপরের কাছাকাছি এবং সংলগ্ন শিল্প এলাকায় একটি মহামারী রোগের প্রাদুর্ভাব খনির এলাকাগুলিকে রেহাই দেয়নি। তাই প্রস্তাবিত খনি বোর্ড, আশেপাশের শিল্প এলাকাগুলিকে পরিখার মধ্যে মহামারী রোগের প্রতিরোধ করার জন্য একটি বিল পাশ করেছিল। উল্লিখিত কারণে খনি বোর্ডকে স্বাস্থ্য ও কল্যাণ, বিশেষ করে খনিতে কাজ করা বিপুল সংখ্যক শ্রমিকদের দেখাশোনার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। এই বোর্ডে মালিক শ্রেণির পক্ষ থেকে তিন বা চারজন প্রতিনিধি এবং অ্যাসোসিয়েশনে প্রত্যেকে একজন করে সদস্য নির্বাচিত হয়েছিল। অন্যদিকে শ্রমিকদের প্রতিনিধিত্ব করার জন্য রাজ্য সরকারের অনুমোদনে খনি শ্রমিকদের প্রতিনিধিত্বকারী হিসাবে শুধুমাত্র একজনকে মনোনীত করা হয়েছিল। খনি শ্রমিকদের প্রতিনিধিত্বকারী ব্যক্তি সবসময় খনিতে কাজ করা শ্রমিকদের মধ্য থেকে খুঁজে নেওয়া হবে কিনা তা স্পষ্ট ছিল না। নির্বাচিত ও নিযুক্ত সকল সদস্যের জন্য চার বছরের মেয়াদ নির্ধারণ করা হয়েছিল। সংবিধানের অধীনে

137. *শ্রমিক কৃষক খেতমজুর ঐক্য,* শ্রমজীবী মহিলা পত্রিকা, কলকাতা, সিআইটিইউ পাবলিকেশন, ১৯৬৫, পৃ. ১১

138. *The west Bengal mining settlements (Health and Welfare bill, 1962- 1964),* The report of the joint Committee with the bill embodying amendments recommended by them annexed, Delhi, 30th July, P. 12-16.

প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকারের অধিকার ভোগ করা ও শ্রমিকদের নিজস্ব প্রতিনিধি নির্বাচনের সুযোগ স্বাধীনতা পরবর্তীকাল থেকে শুরু হয়েছিল।

১৯৪৮ সালে অভ্র খনি আইনে শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকদের কল্যাণের প্রচারের জন্য কার্যকলাপের অর্থায়নের একটি তহবিল গঠন করা হয়। এই আইনে উল্লেখ করা হয়েছিল—

১) অভ্র খনিতে শ্রমিকদের বোনাস দেওয়া হবে বলে উল্লেখ করা হয়েছিল।[139]

২) জনস্বাস্থ্য, রোগ প্রতিরোধ, চিকিৎসা ব্যবস্থার উন্নতি করা হবে বলে উল্লেখিত হয়েছিল।

৩) পানীয় জল, শিক্ষা ব্যবস্থা, বাসস্থান, কর্মস্থলে যাতায়েত ব্যবস্থার উন্নতি করা বলে জানানো হয়। এছাড়া নানা উপদেশ তহবিলের অন্যান্য সদস্যদের জন্য গৃহীত হয়েছিল। এই তহবিলে বলা হয়েছিল যে, তহবিলের কমিটিতে যতজন খনির মালিক থাকবে ঠিক ততজন শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিক প্রতিনিধিত্বকারী থাকবে। এছাড়াও কমিটিতে একজন মহিলা সদস্য থাকার কথা উল্লেখিত হয়েছিল।[140]

প্রাসঙ্গিক ভাবে ১৯৪৮ এবং ১৯৫২ সালে কর্মীদের জন্য রাষ্ট্রীয় বীমা আইন এবং প্রভিডেন্ড ফান্ড তৈরি করার নির্দেশ দান ও খনিতে নিষ্পত্তি তহবিল গঠন করা হয়েছিল। সরকারী রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রে তহবিলের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ ছিল।[141] রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রের কর্মীদের ক্ষেত্রে বছরের নির্দিষ্ট অংকের বেতন বৃদ্ধি ঘটেছিল এমনকি তারই মধ্যে অর্থনীতিতে জীবনযাত্রার একটি ন্যূনতম মান নিশ্চিত করা হয়েছিল। সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্য দূর করা প্রভৃতি ক্ষেত্রে বিনিয়োগের মধ্য দিয়ে অভিযোজন ব্যবস্থা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে সরকারী ও রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রে তহবিলের বিশেষ প্রয়োজন ছিল। তপশিলি জাতি এবং তফশিলি উপজাতির তালিকাভুক্ত চাকরির বর্ণ ভিত্তিক সংরক্ষণের নীতিটি আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশিত হলে তা স্পষ্টই লক্ষ করা যায়। ১৯৫০ সাল থেকে দেশটি নিচুবর্ণের স্বার্থরক্ষা ও উন্নতি করতে কিছু নতুন আইন ও সামাজিক উদ্যোগ নেওয়ার পরিকল্পনা করা হয়েছিল।

---

139. *The Mica Mines Labour Welfare Fund act,* Delhi, Government of India, 1946, (Act no. 22 of 1946, P 18.

140. তদেব। পৃ. ২৫

141. Labour Relations improve, Economic and political weekly, 21 Jan, 1952.

আদিবাসী শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ানের মাধ্যমে দীর্ঘকাল ধর্মঘট করার ফলে কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য সরকার তাদের কর্মসূচিতে শিল্পাঞ্চলগুলিকে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দেবার কথা ঘোষণা করেছিল। এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের সমস্যা সমাধানের জন্য গণপূর্ত বিভাগ খনি শিল্প অধিদপ্তরে বিশেষ পদ সৃষ্টি করেছিল। ১৯৫৭-৫৮ সালে গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পগুলির বিষয়ে সামগ্রিক পর্যালোচনা করে, ১৫ কোটি টাকা ব্যয় করার পরিকল্পনা হলে এই সংখ্যাটি কমিয়ে ১৯৫৮-৫৯ সালে ১২.২ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়েছিল। সারা দেশে মোট ১১০টি শিল্প রাষ্ট্র নির্মাণের পরিকল্পনা করা হয়েছিল। একই কাজের জন্য কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট ব্লক প্রত্যেক গ্রামীণ এলাকায় ৩ থেকে ৫ লক্ষ টাকা বিতরণ করার তথ্যও জানা যায়। এর মূল উদ্দেশ্য ছিল জনাকীর্ণ শহরগুলির যানজট দূর করা এবং ছোট শিল্প অঞ্চলগুলির জন্য আদর্শ কারখানার বাসস্থান প্রদান করা হয়েছিল। একইভাবে গ্রামীণ এলাকার ছোট খনি শিল্পাঞ্চলগুলি পরিকল্পিতভাবে শিল্প বৃদ্ধির প্রচারে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছিল।[142] পশ্চিমবঙ্গের খনির বসতিগুলির জন্য 'ওয়েস্ট বেঙ্গল মাইনিং সেটেলমেন্ট (স্বাস্থ্য ও কল্যাণ) বিল' ১৯৬২ সালে উল্লেখ করা হয়েছিল। পশ্চিমবাংলায় ১৬ ভাগই চিকিৎসার জন্য খরচ করা হয় বলে তৎকালীন সময়ে পশ্চিমবঙ্গকে প্রগতিশীল বলে আখ্যাও দেওয়া হয়েছিল। স্বাস্থ্য এবং পরিছন্ন বোর্ড অধিকর্তা কর্তৃক যথাযথ দায়িত্ব পালন করার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল।

142. *Small Scale Industries Organization Report for 1957-58/ 1958-59/ 1960-61,* Development commissioner Ministry of commerce and Industry, New Delhi, Government of India, Pp. 1-5

ন্যূনতম মজুরী নির্ধারণে পরিবর্তন

বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা রাজ্যের খনি অঞ্চলের নির্ধারিত প্রাপ্ত মজুরী হ্রাস ও বৃদ্ধি[143]

বছর	বাংলা			বিহার			উড়িষ্যা		
	কাজের মাত্রা	নির্ধারিত মজুরি	প্রাপ্ত মজুরী	কাজের মাত্রা	নির্ধারিত মজুরি	প্রাপ্ত মজুরী	কাজের মাত্রা	নির্ধারিত মজুরি	প্রাপ্ত মজুরী
১৯৩৯	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০
১৯৪০	১০৯	১১২	১০৭	১১১	১২০	৯৯	১১৩	৯৯	৯৫
১৯৪১	১১১	১১৪	১১১	১২১	১১৭	৯৯	১২০	১০৩	৯০
১৯৪২	১১০	১১২	১০২	১৩০	১২০	৯৯	১২২	১১৭	৭৬
১৯৪৩	১০৩	১১৪	৭১	১৩২	১০০	৯৫	১১৯	১৪৪	৫০
১৯৪৪	১০৬	১০৬	৮৯	১৪০	১০২	৯৬	১২৬	১৬৭	৬১
১৯৪৫	১১১	৯৫	৯৮	১৫৫	১২০	১০৩	১৩৫	১৭৯	৬৭
১৯৪৬	১১৫	৯৭	১০৭	১৬১	১২১	১০৪	১৪৫	২১৯	৭৬
১৯৪৭	১১৩	১২০	১২৭	১৫৬	১১০	১০০	১৪৬	৩১৬	৯৬
১৯৪৮	১০৬	১১২	১০৮	১৫৩	১০০	৯৬	১৪১	৩৩৩	৮৮
১৯৪৯	৯৯	১০৬	১০০	১৫০	১২৪	৯৫	১৩৫	৩৫০	৯০
১৯৫০	১০৮	১০৫	৯০	১৭১	১২০	১০২	১৫১	৩৭৩	৯১

ছোটনাগপুর মালভূমি অঞ্চলে স্বাধীনতা পরবর্তীকালে কৃষি সহ সমস্ত নির্ধারিত কর্মসংস্থানে ন্যূনতম মজুরী নির্ধারণ করার কথা উত্থাপিত হয়েছিল। প্রথমত মজুরী স্থিরীকরণ পদ্ধতি দুটি পদ্ধতি দ্বারা নির্ধারিত হয়েছিল। ন্যূনতম মজুরী প্রণীত আইন ১৯৪৮ সালে বিহার শ্রম তদন্ত কমিটি এ বিষয়ে গৃহীত পদক্ষেপগুলি চিহ্নিত করেছিল। ছোটনাগপুর মালভূমির খনি অঞ্চলে বেকারত্বের কারণ হিসাবে উল্লেখ করা যায় যে, খনি ক্ষেত্রে সমস্ত কর্মচারীদের মাইনে ১০০

143. Palekar. Shreekant A, *Causual Employment of a Bihar, Bengal, Orissa Labour,* Economic and political weekly, *Issue- 3-4-5,* 19 Jan, 1957, Pp. 7-8

টাকার কম ছিল। তাঁদের সেই কাজের ক্ষেত্র থেকে বরখাস্ত করা হয়েছিল কিন্তু ফ্যাক্টারি রেজিস্টার খাতায় তা অপরিবর্তিত ছিল। ১৯৪৯ সাল নাগাদ শিল্প শ্রমিকদের প্রকৃত মজুরী ধারাবাহিক ভাবে নির্দিষ্ট পরিমাণের নিচে ছিল। খনি কর্মসংস্থানে মজুরী বৃদ্ধির দাবী অসংগঠিত আদিবাসী শ্রমিকদের জন্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ছিল। এই বিষয়টি আদিবাসীদের অর্থনৈতিক জীবনে অগ্রগতির সাথে প্রাসঙ্গিক ছিল। স্বাধীনতা পূর্ববর্তী ১৯৩৯ সালে শ্রমিকদের মজুরী বৃদ্ধির দায়িত্ব শ্রম অধিদপ্তরের উপর দেওয়া হয়েছিল। খনি শিল্প শ্রমিকদের মজুরী এবং মহার্ঘ ভাতা সমান সংখ্যার পরিসংখ্যান সরবরাহ করার জন্য, শ্রম অধিদপ্তর ১৯৩৯ সালের আগস্টে সূচকটিকে অন্যভাবে প্রস্তুত করা হয়েছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তীকালে, আর্থ- সামাজিক দিক থেকে পরিবর্তন হলেও উচ্চ মূল্য ও জীবনযাত্রার ক্রমবর্ধমান ব্যয়ের অর্থনীতিতে, শ্রমিকদের মত সাধারণ জনগণকে তাদের জীবন যাত্রার মান বজায় রাখতে কঠোর সংগ্রাম করতে হয়েছিল। খনি মজুরদের বেতন খনিজ পণ্যের দাম ও মুনফা উভয়ই নির্ভর করত। ১৯৪৭ সালে কয়লার দাম বৃদ্ধি পেলেও মজুরদের মাইনের পরিবর্তনের কথা বলা হয়েছিল। এই একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হয়েছিল ১৯৫৬ সালে।[144] খনি অঞ্চলের শ্রম বাজারে ৯২% শ্রমিকের রুজি রোজগার জোটে অসংগঠিত ক্ষেত্রে কাজ করত। তৎকালীন সময়ে ভারতের জাতীয় আয় কম থাকায় রাজ্য স্তরে শিল্প শ্রমিকদের জীবন যাত্রার মজুরী নিশ্চিত হয়নি। সিলিং হল জীবিত মজুরির স্তর। ১৯৬১ সালে, খনি পরিদর্শকদের দ্বারা ৬৯৬ টি খনি পরিদর্শনে যে তথ্য উঠে এসেছিল তাতে লক্ষ করা গিয়েছিল যে, খনিতে আদিবাসী কর্মচারীদের নির্ধারিত মজুরির কথা বলা হয়েছিল। ন্যূনতম মজুরির হার বৃদ্ধিতে আদিবাসী কর্মচারীদের কার্যকর করার জন্য নিয়োগকারীদের বিরুদ্ধে আদালতে ৪১ টি মামলা দায়ের করা হয়েছিল।[145] ১৯৪৮ সালে বিহার শ্রম তদন্ত কমিটি, ন্যূনতম মজুরী প্রণীত আইনে গৃহীত পদক্ষেপগুলিকে চিহ্নিত করেছিল। কেন্দ্রীয় বেতন কমিশন, কর্মচারীদের উপর করের অতিরিক্ত বোঝা চাপিয়ে দেওয়া

---

144. ব্যানার্জি. সুবোধ(সম্পা), *গণদাবী,* সোশ্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া, (বাংলা সাপ্তাহিক পত্রিকা), ৯ বর্ষ, সংখ্যা-১, ২৬ সে জুলাই, কলকাতা, ১৯৫৬, পৃ. ৪

145. Report of The Bihar and Bengal *Mine Bonus scheme, 1965 and Sister Schemes,* Ministry of Labour Employment and Rehabilitation, Delhi, publication Government of India, 1970, P. 34, 56.

ন্যায় সঙ্গত অর্থ হবে না বলে মনে করেছিল। এ প্রসঙ্গে ১৯৬৫ সালে বোনাস[146] প্রদান আইন নির্ধারিত হয়েছিল। কমিটির অভিমত ছিল যে একটি শ্রমিকের সামঞ্জস্যপূর্ণ মজুরী তখনই নির্ধারণ করা যেতে পারে যখন এটি শিল্প অঞ্চলের ঋন পরিশোধের ক্ষমতা অর্জন করবে। এই নিয়ম বড় খনির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হলেও ছোট খনি অঞ্চলগুলি মজুরী প্রদানের নিয়ম পুঁজি মালিকদের হাতে নিয়ন্ত্রিত হত। কেন্দ্রীয় সরকারের দ্বারা অনুসৃত মজুরী নীতি পশ্চিমবঙ্গের খনি শিল্প উন্নয়নের জন্য শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণে স্থানীয় সুবিধাগুলি হ্রাস করা হয়েছিল। আদিবাসীদের খনিক্ষেত্রে চুক্তিবদ্ধ হয়ে কাজ করার আইন নিয়ে স্বাধীনতা পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী ১৯৬৫ সাল পর্যন্ত শ্রমিকদের দাবিগুলি প্রস্তাবিত হয়েছিল।

বেকার সমস্যা সমাধানে উদ্যোগ

ছোটনাগপুর মালভূমির শিল্পায়নের সমগ্র ইতিহাস শ্রমিক কেন্দ্রিক হলেও ‘বেকারত্ব’ বিতর্ককে সমাজতাত্ত্বিক থেকে ঐতিহাসিকরা অস্বীকার করেছিল। ১৯৪৮ সালে বর্ণ বৈষম্যের ভিত্তিতে আইন দ্বারা কর্মসংস্থানে প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হয়েছিল এবং আরও কিছু আইন ভারতীয় সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল, তবে এই পদ্ধতিটির ধ্বংসাত্মক সামাজিক প্রভাব চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর শ্রমনীতি প্রণয়নের জন্য প্রয়োজনীয় শ্রম ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট বিষয় সম্পর্কিত সঠিক তথ্য ও পরিসংখ্যান সংগ্রহ ও প্রচারের জন্য একটি কেন্দ্রীয় সংস্থার প্রয়োজন ছিল। ১৯৫৫ এর শেষের দিকে, খনি কারখানায় কর্মসংস্থান হ্রাস পেতে থাকে লক্ষাধিক আকারে। যদিও এই কর্মসংস্থান হ্রাসের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল ১৯৪৮ সালের শেষের দিকে ২.৪৬ মিলিয়ন থেকে ১৯৫২ সালে ২.৫৭ মিলিয়ন।[147] পশ্চিমবঙ্গে বেকারের তালিকায় আদিবাসী জনগণের সংখ্যা ১৯৫২ সালে ৬২,৩২১ থেকে ১৯৬৫ সালে ৩, ৫৭, ০০০ এ পৌছেছিল।[148] ১৯৬০ এর দশকের পশ্চিমবঙ্গে, কর্মসংস্থানের পরিবর্তে বেকারত্ব সৃষ্টির উৎস হয়ে উঠেছিল। খনি ক্ষেত্রে ছাঁটাইয়ের পরিমাণ নতুন কর্মসংস্থানের পরিমাণের চেয়ে অধিক

---

146 বোনাস শব্দটি কোনো আইন প্রণয়নে সংজ্ঞায়িত করা হয়নি। বোনাস প্রদানের উদ্দেশ্য হল প্রদত্ত মজুরী এবং প্রাত্যহিক মজুরির আদর্শের মধ্যে ঘাত্তি দূর করা। বোনাস প্রদান ভারতবর্ষে উদ্ভুত হয়েছিল ১৯১৭ সাল থেকে টেক্সটটাইল মিলের শ্রমিকদের জন্য। ১৯৬৫ সালের বোনাস রিপোর্টে প্রতিটি মিল ও খনি মজুরদের বোনাস নির্ধারিত করার কথা উল্লেখিত ছিল।

147. Labour in Second Plan, *Economic and political weekly,* 26 Jan, 1955, P. 1-3.

148. রায়. মনোরঞ্জন (সম্পা), *শ্রমিক আন্দোলন পত্রিকা,* সি আই টি ইউ, কলকাতা, ৩য় বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ডিসেম্বর ১৯৭৪, পৃ. ৯

হয়ে উঠেছিল। অন্যদিকে খনি অঞ্চলগুলি অধিক কর্মসংস্থানের দিকে পরিচালিত হওয়ার কথা বললেও, তা পর্যবেক্ষিত হয়নি।

তৎকালীন পর্যায়ে খনিকেন্দ্র সহ অন্যান্য ক্ষেত্রে দেশের তীব্র বেকার সমস্যা নিয়ে স্বাধীনতার পরবর্তীকালে আই. এন. টি. ইউ সভাপতি শ্রী এস আর বাসয়াড়া এক সাংবাদিক সম্মেলনে দেশের বেকার সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা করেছিলেন। এই আলোচনায় শ্রমিক ও কৃষকদের বেকারিত্ব অপেক্ষা অন্ধ বেকারদের সমস্যা, খাদ্য, বস্ত্র ও আশ্রয়ের ব্যবস্থা সম্পর্কে অধিক গুরুত্ব দেওয়ার কথা বলা হয়েছিল।[149] বিহার ও বাংলায় শ্রমিকদের জন্য যে সুরক্ষামূলক শ্রম আইন তৈরি হয়েছিল, তাতে বেকার সমস্যা থাকবে না বলে মনে করেছিলেন একাংশের রাজনীতিজ্ঞরা। ঔপনিবেশিক শক্তি খনি কেন্দ্রে কাজের জন্য ঠিকাদারদের উপর অধিক নির্ভরশীল ছিল। শ্রমিকদের কর্মসংস্থানের জন্য এক্সচেঞ্জের কার্যকারিতা ইংল্যান্ডে প্রচলনের পাশাপাশি স্বাধীন ভারতবর্ষে এই ব্যবস্থার প্রচলন লক্ষ করা গিয়েছিল। ১৯৫৩ সালে ধীরে ধীরে ভারতের 'এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জে' মহিলা নিবন্ধকারীদের নাম অধিক পরিমানে বৃদ্ধি পেয়েছিল। এ প্রসঙ্গে বলা যায় পুঁজিবাদের বিখ্যাত সমালোচক কার্ল মার্কস কর্মনিয়োগের স্বাধীনতাকে যুগান্তকারী অগ্রগতি বলে মনে করতেন।

কর্মনিয়োগের এই অগ্রগতিতে ও বেকারত্ব সমস্যা সমাধানের মধ্যেই গুরুতর সমস্যাও লক্ষ করা গিয়েছিল। মহিলাদের মধ্যে বৃত্তিমূলক শিক্ষা চারপাশে ভিড় করেছিল। আদিবাসী ভিন্ন মহিলাদের কেরানী, টাইপিস্ট, স্টেনোগ্রাফার, শিক্ষক এই কাজে নিয়োগের তথ্য লক্ষ করা যায়। শ্রেনীবিন্যাস সহজ করার জন্য নিবন্ধকারীদের অন্য ধরনের কাজেরও সুযোগ ছিল।[150] আদিবাসী ভিন্ন অন্যান্য মহিলাদের জন্য সঠিক ভাবে বৃত্তিমূলক দিকটিকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল। ১৯৫৩ সালের শেষের দিকে ২৩৮ টি কর্মসংস্থানে কর্মচারীদের অবস্থার পরিবর্তন দেখা দিয়েছিল। পঞ্চবার্ষিকী দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষে একমাত্র কয়লা খনিতে এক্সচেঞ্জ অফিসের পরিকল্পনা সহ অন্যান্য ক্ষেত্রে ৩২৫ টি এক্সচেঞ্জ অফিস লক্ষ করা গিয়েছিল। ১৯৫৭ সালের নভেম্বরে একটি প্রতিবেদনে বৃহৎ, মাঝারি, ছোট শিল্পের সম্প্রসারণ এবং প্রতিস্থাপনের চাহিদা মেটাতে ৬.৩৫ লাখে বিভিন্ন শ্রেণীর কারিগরের প্রয়োজনীয়তা লক্ষ্য করা গিয়েছিল।

---

149. চক্রবর্তী. নিস্তারন, *পশ্চিমবঙ্গের বেকার,* পশ্চিমবঙ্গ, ১৯৫৭, পৃ. ১৫-৩৭

150. *Unemployment among Women in West Bengal,* Alipore, Government Printing West Bengal Government Press, Nov (1958), P. 1-30.

কিছু শিল্প দক্ষ কর্মী তৈরির প্রশিক্ষণ কেন্দ্র প্রতিস্থাপন করেছিল। ১৯৫৭ সালের এক বৈঠক দ্বারা বাংলা, বিহার, উড়িষ্যায় বৃত্তি মূলক প্রশিক্ষণের জন্য ২ টি করে সভা আহ্বান করার তথ্য উল্লেখিত হয়েছিল। এই প্রশিক্ষণে আদিবাসী মহিলাদের যোগদানের কথা বলা হয় ও উৎসাহ দেওয়া কথা জানা যায়। এই কমিটির লক্ষ্য ছিল জেলায় জেলায় প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গড়ে তোলা। এই কমিটি শিল্প ও শ্রমিক উভয়ের প্রয়োজনীয়তা বিবেচনা করে জনশক্তির কার্যকর ব্যবহার জাতীয় গুরুত্বের ক্ষেত্রে বিবেচিত হয়েছিল। জনগণের জন্য কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা এবং খনি শ্রমিকদের প্রশিক্ষণ করার ব্যবস্থার প্রতি গুরুত্ব দেওয়ার কথা বলা হয়েছিল। সারা দেশে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল কর্ম সংস্থানের সংস্থা এবং প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান।

শ্রম ও আয়ের কর্মসংস্থান মন্ত্রী ১৯৫৯ সালে ২৫সে মার্চ প্রথম সভার বক্তৃতায় উৎপাদনশীল সমাজের পরিধিকে প্রসারিত করার অপ্রচলিত উপায়গুলি অন্বেষণ করাকে গুরুত্ব দিয়েছিলেন। দেশের কর্মসংস্থানে যারা সাধারণ পদ্ধতির কর্মসংস্থানের সুযোগে শোষিত হতে না হয় তার পরিকল্পনা সংগঠনের মাধ্যমে নেওয়া হয়েছিল। ১৯৫৯ সালে খনি কর্ম সংস্থানে শূন্যপদের বাধ্যতামূলক বিজ্ঞপ্তি আইন জারি করা হয়েছিল। ১৯৫৯ এ ১লা অক্টোবর 'জেনারেল অফ রিসেটেল্মেন্ট অ্যান্ড এমপ্লয়মেন্ট' দ্বারা প্রস্তুত করা নোটের ভিত্তিতে কিছু নির্দেশনা জারি করা হয়েছিল।[151] এই পরিকল্পনায় সুবিধাগুলির মধ্যে ছিল (ক) শ্রমের অবস্থার সমীক্ষা ও পরিকল্পনা প্রকল্পের অগ্রগতি। শ্রম অবস্থার সমীক্ষার উদ্দেশ্য হল ১৯৫৫ এবং ১৯৬০ সালে শ্রম তদন্ত কমিটি দ্বারা পরিচালিত সর্বশেষ শ্রমের অবস্থার পরিবর্তনগুলি নির্ধারণ করা হয়েছিল। এই প্রকল্পের জন্য দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ৫ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছিল। শ্রমশক্তির গঠন, নিয়োগ, প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা, মজুরী এবং উপার্জন, কাজের শর্ত, কল্যাণ সুবিধা, শিল্প সম্পর্ক ইত্যাদির বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল। এই প্রকল্পের আওতায় মোট ২,৯৫৫ সংখ্যক প্রধান কারখানা শিল্প, খনিগুলিকে আনার প্রস্তাব করা হয়েছিল।[152] (খ) মজুরির মাত্রা নির্ধারণ (গ) কর্মজীবী শ্রমজীবী শ্রেণির জীবনযাত্রার সূচক সংখ্যার খরচ। পারিবারিক বাজেট অনুসন্ধানের উদ্দেশ্য ছিল ৫০টি কেন্দ্রের জন্য শ্রমিক শ্রেণির জন্য ভোক্তা মূল্য সূচক সিরিজ তৈরি করা এবং তাদের জীবনযাত্রার স্তর অধ্যয়ন করা। তদন্তের পরিধি কারখানা

---

151. *Estimate Committee (1959-60) Eighty- Eight Report (Second Lok Sabha),* Ministry of Labour and Employment Part-ii, New Delhi, Lok Sabha Secretariat, April 1960, p. 98.

152. *বীরভূম বার্তা,* সাপ্তাহিক পত্রিকা, বর্ষ -৫৪, সংখ্যা বিশেষ, সিউড়ি, বীরভূম, আগস্ট ১৫, ১৯৫৭ ।

আইনের অধীনে নিবন্ধিত কারখানায় নিযুক্ত শ্রমিকদের, চা, কফি এবং রবার বাগানের শ্রম আইনের অধীনে ভারতীয় খনি আইনের অধীনে নিবন্ধিত খনি হিসাবে নিবন্ধিত শ্রমিকদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল।[153]

শ্রমনীতির পুনঃ প্রবর্তনে আদিবাসী শ্রমিকদের পরিবর্তন

বিংশ শতাব্দির মাঝামাঝি সময় থেকে পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থায় বৃহৎ পরিবর্তন দেখা দিয়েছিল তা হল প্রযুক্তিগত পরিবর্তন। ঔপনিবেশিক শাসনে জর্জরিত মানুষেরা ধর্মঘট ও আন্দোলনের মধ্য দিয়ে একটা আদর্শ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রয়োগের চেষ্টা করেছিল, কিন্তু সেই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা উপযুক্তভাবে তৈরি হয়নি সকলের জন্য।[154] আদিবাসীরা তাদের ঐতিহ্যগত জ্ঞান ও দক্ষতাকে উপেক্ষা করে, জোর করে চাপিয়ে দেওয়া বোঝাকে উন্নয়নের প্রথম ধাপ ভেবে খনি অঞ্চলে উৎসাহের সাথে যোগ দিয়েছিল। খনির সহজ সরল শ্রমিকরা বুঝতে অক্ষম ছিল যে, তাঁদেরকে ধবংসের মুখে ঠেলে দেওয়ার চেষ্টা শুরু হয়েছিল অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ থেকেই। স্বাধীনতা পরবর্তীকালে অনুন্নত শ্রেণির কল্যাণের জন্য কেন্দ্রীয় ও রাজ্য স্তরে পরিকল্পনা নেওয়ার কথা উঠে এসেছিল। অস্পৃশ্যতা বর্জনের কথা বলা হয়েছিল।[155] শিল্প শ্রমিকের কাজের ধরন, মজুরী, কাজের ঘন্টা, খনি ক্ষেত্রে বেঁচে থাকার পরিবেশ, ট্রেড ইউনিয়ান সংগঠনের চেহারা, তার শক্তি ও দুর্বলতা সবকিছুতেই বড় ধরনের পরিবর্তন দেখা দিয়েছিল। আই এল ও এর তথ্য অনুযায়ী খনি অঞ্চলে ৬১ শতাংশের বেশি ছিল অসংগঠিত কর্মে যুক্ত শ্রমিক। ছোটনাগপুর মালভূমির জনসংখ্যার এক তৃতীয়াংশ থেকে অর্ধেক সংখ্যক মানুষ দারিদ্র্যসীমার আশপাশে বাস করত। দারিদ্র্যক্লিষ্ট আদিবাসী শ্রমিকদের জীবনযাপন নিরাপত্তাহীন এবং ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত ছিল। স্বাধীনতার পর থেকে পুঁজিপতিরা দেশ ভাগ করার সাথে সাথে, অন্যদিকে শ্রমিক শ্রেণিকেও ভাগ করা শুরু হয়েছিল। সরকারের নয়া অর্থনৈতিক নীতি, নয়া শিল্পনীতি, প্রস্তাবিত দর নির্ধারণ নীতি, কেন্দ্রীয় শ্রম আইন প্রভৃতি দেশের আর্থ-সামাজিক জীবনে এবং স্বভাবতই রাজনৈতিক জীবনেও আদিবাসী শ্রমিকদের পরিবর্তন হবে

153. তদেব। পৃ. ৩৩

154. থাপার. রোমিলা, এ জি নুরানি, সদানন্দ মেনন, *প্রসঙ্গ জাতীয়তাবাদ,* কলকাতা, সেতু প্রকাশনী, প্রথম সংস্করণ ২০১৯, পৃ. ১৮

155. *পশ্চিমবঙ্গের দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা,* পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৯৫৬-৫৭, পৃ. ১৩

এই আশা করেছিল। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় স্বাধীন দেশে আদিবাসী শ্রমিকদের স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছিল।

স্বাধীনতা পরবর্তী সামাজিক কর্মক্ষেত্রে শ্রমিক সুরক্ষা আইন ১৯৫২ ও পরবর্তীকালে ১৯৬২ সালে পাশ হয়েছিল।[156] খনি ভিন্ন অন্যান্য ক্ষেত্র গুলিতে কর্মীদের জন্য সুরক্ষা, শিক্ষা দানের জন্য স্কুল ও কাজের জন্য প্রশিক্ষণ কেন্দ্র খোলা হয়েছিল।[157] সেই সুযোগ যদিও খনিতে কর্মরত আদিবাসী কর্মীদের জন্য তৈরি হয়নি। খনিতে আদিবাসী মহিলা শ্রমিকদের কাজের সময় বাচ্চাকে ক্রেসে রেখার ব্যবস্থা এক- দুটি খনিতে চালু হলেও সমস্ত খনিতে ছিল না। এই আইন সঠিকভাবে পরিচালিত হয়েছিল কিনা তা জানার কোনও পূর্ণকালীন পরিদর্শক ছিল না। পরিদর্শনকালে, এই আইনের অধীনে শিশুদের দেখার জন্য ক্রেসের ব্যবস্থা সঠিক ভাবে হয়েছে কিনা তা খতিয়ে দেখার ব্যবস্থা ছিল না। এই ব্যবস্থায় দরিদ্র্য আদিবাসী শ্রমজীবীদের কোনো উপকার হয়নি। শ্রমিক কল্যাণ সম্পর্কে সরকারের তরফ থেকে নতুন বাড়ি ও চিকিৎসা ব্যবস্থার কথা উল্লেখ করা হলেও আইনে সাধারণ আদিবাসী শ্রমিকদের প্রসঙ্গে তা স্পষ্ট করা ছিল না।[158] খনি ক্ষেত্রগুলিতে অসংগঠিত আদিবাসী শ্রমিকদের সঠিকভাবে কাজের প্রশিক্ষণের জন্য কোনো ব্যবস্থা দেখা যায়নি। যে সমস্ত খনি শ্রমিক নিয়মিত সংগঠিত কাজে যুক্ত ছিল এই ব্যবস্থা তাদের জন্য উপলব্ধ ছিল।[159]

আদিবাসী শ্রমিকদের শ্রমের প্রতি অন্যায় আচরন করে তার লাইসেন্স প্রত্যাহার করা এবং জরিমানা আরোপ করার মত চিত্র অধিকাংশ ক্ষেত্রে লক্ষ করা গিয়েছিল।[160] আমদানি কৃত শ্রমের সুরক্ষা করা প্রয়োজন ছিল যাতে শ্রমিকরা কাজ করার সাথে সাচ্ছন্দ্য হতে পারে কিন্তু সেই ব্যবস্থা লক্ষ করা যায়নি। বিহারে আদিবাসী শ্রমিকদের নিয়ে শ্রমিক ইউনিয়ান গুলির আলোচনা থেকে উঠে এসেছিল, খনি শিল্পাঞ্চলে হাজারের বেশি কর্মী নিয়োগ না করার কথা। বিহারের শ্রম কমিশন থাকা স্বত্বেও কয়লা খনি ভিন্ন অন্যান্য খনিজ খনিতে ঠিকাদারদের

---

156. *The Bengal Maternity Benefit Rules 1962,* Government of West Bengal Department of Commerce and Labour, Alipore, West Bengal Press, 1968, Statement 1-5.

157. *Trade Unions in India 1954-55 and 1955-56,* Labour Bureau Ministry of Labour and Employment, Government of India, 1958, P. 12, 14.

158. *বীরভুম বার্তা,* সাপ্তাহিক পত্রিকা, বর্ষ -৪৯, সংখ্যা বিশেষ, সিউড়ি, বীরভূম, নভেম্বর ৭, ১৯৫২।

159. তদেব।

160. তদেব।

মাধ্যমে শ্রমিক নিয়োগের ব্যবস্থা বন্ধ হয়নি। এ প্রসঙ্গে খনির মালিক ও এ্যাসোসিয়েশনে যুক্ত ব্যক্তিরা মনে করেছিলেন যে, এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জের হাত ধরে খনি শ্রমিক নিয়োগ করা আরও বেশি অসুবিধাজনক ছিল। তাদের নির্দিষ্ট করা প্রতিটি নিয়মাবলী শ্রমিকদের পালন করতে হলে খনির মালিকদের অসুবিধা হত অবৈধ শ্রম ব্যবহার নিয়ে।[161] নিয়োগ প্রক্রিয়ায় তাই বেসরকারী ভাবে বিপরীত পদ্ধতিগুলি স্থিতিস্থাপক ছিল অন্যদিকে ঠিকাদাররাও গ্রামীণ অর্থনীতিতে বর্ণ বৈষম্যের কারণে এই পদ্ধতিগুলিকে টিকিয়ে রাখতে সক্ষম হয়েছিল। কয়লা খনি ও খাদান সরকারী আওতায় বৈধতা পাওয়ার পর, সেখানে শুধুমাত্রও 'এমপ্লয়মেন্ট একচেঞ্জ' গঠন ও তার মাধ্যমে শ্রমিক নিয়োগ ন্যায় পূর্ণ ভাবে হবে বলে মনে করা হয়েছিল। শ্রমিকরা যে শর্তে চাকুরি করতেন তা যথেষ্ট ছিল না বরং গণতান্ত্রিক নীতির পরিচালনাকে সরকারের কাছে সীমাবদ্ধ করা এবং খনি কেন্দ্রে পুরনো ব্যবস্থাকে উচ্ছেদ করা গুরুত্বপূর্ণ ছিল। স্বাধীনতার পর থেকে পশ্চিমবাংলায় জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছিল অথচ সেই অনুপাতে নতুন কাজের সুযোগ বৃদ্ধি হয়নি। অগণিত আদিবাসী জনগণ স্বাধীনতার সাথে মৌলিক অধিকারগুলির অর্থ বুঝে উঠতে সক্ষম হয়নি। কৃষির প্রতি অবহেলার ফলে খনি শিল্পে অবশ্যই আদিবাসী শ্রমিকদের কর্মসংস্থান বৃদ্ধিতে যথেষ্ট অবদান রেখেছিল কিন্তু এই অবদান বিশেষ লাভজনক ছিল না। বিদ্যমান অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলির সাথে কৃষিতে পূর্ণ কর্মসংস্থানের সম্ভাবনা বড় অংশ অকার্যকর হয়ে পড়েছিল। বাংলায় অজস্র পরিমাণে খনি শ্রমিক বাইরে থেকে পরিযায়ী হয়ে খনি সংলগ্ন অঞ্চলগুলিতে বসতি শুরু করেছিল। পরিসংখ্যান লক্ষ করলে দেখা যাবে ভিন রাজ্যের শ্রমিকেরা প্রথমদিকে মূলত খনি অঞ্চল, বিড়ি, চরুট শ্রমিক, ঝাড়ুদার ও ধাঙ্গরের মত কাজে যোগ দিয়েছিল।[162] শ্রমিকদের সুবিধার্থে যে নিয়মগুলি তৈরি হয়েছিল তা এক তিমিরেই থেকে যায়।

সেকেলে শ্রম আইনগুলি এ দেশে শিল্পবান্ধব শ্রম বাজার গড়ে তোলার পথে বাঁধা ছিল বলে শ্রীরঙ্গা ঝাঁ মনে করেছিলেন।[163] শ্রম আইনগুলি জটিলতা, আমলাতন্ত্রের অকারণ হস্তক্ষেপ

---

161. এ. শ্রীজা, *ভারতে অসংগঠিত শ্রম বাজার,* ভারতে শ্রম সংস্কার, *যোজনা পত্রিকা,* (মাসিক) কলকাতা, এপ্রিল ২০১৭, পৃ. ১২-১৩

162. *Report on the Activities of the labour,* Labour Vol-1, Department Government of West Bengal, West Bengal Government, January to April, 1948, P. 17-22.

163. শ্রীরঙ্গ ঝাঁ, *ভারতে শ্রম সংস্কার ঃ সমস্যা ও সম্ভাবনা,* যোজনা পত্রিকা (মাসিক), এপ্রিল ২০১৭, পৃ. ৮-১০

তথা দুর্নীতিপরায়ণ রাজের সামনে কারখানা মালিকদের ভীত স্বতন্ত্র হয়ে থাকার ফলে শ্রমিকদের কল্যাণ যেমন বাঁধা পেয়েছিল তেমনই সামগ্রিক ভাবে দেশের শ্রম বাজারের পরিবেশকে নষ্ট করেছিল। তিনি আরোও মনে করেছিলেন যে, গ্রামীণ বিভাগে ব্যাপক বেকারত্বের কারণ তৈরি হয়েছিল কৃষিতে দুর্বল বিনিয়োগ এবং পশ্চাৎপদ প্রযুক্তির ফলে। সংগঠিত ক্ষেত্রের পাশাপাশি অসংগঠিত ক্ষেত্রেও কর্মসংস্থানের উপর নানা ধরনের বৈষম্য তৈরি হয়েছিল। অসাম্য ছাড়াও গ্রাম শহরের ব্যবধান এই পরিস্থিতিকে আরও বৃদ্ধি করেছিল যার ফলে অসংগঠিত কর্মসংস্থানে আদিবাসী শ্রমিকদের দারিদ্র্যতা, মরসুমি অভিবাসন, অর্থনৈতিক নিরাপত্তাহীনতা, শোষণ বৃদ্ধি পেয়েছিল। ১৯৫৮ থেকে ১৯৬০ সালে আদিবাসী শ্রমিকদের বেকার সংখ্যা বাংলায় ৩৪.৬৯% থেকে ৩৮.৫৩%, বিহারে ৩০.৫৫% থেকে ২৮.২১% এবং উড়িষ্যায় ৯.১০% থেকে ৭.৮৫% পৌছেছিল।[164] অন্যদিকে গ্রামীণ আদিবাসী মহিলারা যারা খনি ও কৃষিতে অংশগ্রহণ করেনি তারা মাছ চাষ, কুমোর, দড়ি, ঝুড়ি, মালা, ইট তৈরিতে ব্যস্ত থাকত।[165] খনি শ্রমশক্তির বাইরে শ্রমিকদের কর্মসংস্থান শ্রমের ঋতুগত ঘাটতি মেটাতে কৃষি ক্ষেত্রেও লক্ষ করা যেত বলে তথ্যের উল্লেখ পাওয়া যায়। অধিকাংশ সংগঠিত কর্মক্ষেত্রের মত সরকারের অনুমতি ছাড়া কর্মী ছাঁটাই করা যেত না তেমনটা নয় বরং মালিকদের ইচ্ছানুযায়ী তাদের কর্মসংস্থান নির্ধারণ করত। পশ্চিমবঙ্গ ও উড়িষ্যার কর্মক্ষেত্র নিবন্ধকারী আদিবাসীদের জন্য উন্মুক্ত ছিল না। উড়িষ্যা রাজ্যে ৩৪২ এর সংবিধানের আওতায় ১৯৫০ সালে ৪২ টি আদিবাসীকে 'উপজাতি' সম্প্রদায়কে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছিল কিন্তু তারা মধ্যে ১৭ টি আদিবাসী গোষ্ঠী ছোটনাগপুর মালভূমি সীমানার মধ্যে অন্তর্গত ছিল। ১৯৫০ সালের পর কর্ম সংস্থানে তালিকা লক্ষ করা যায়নি এই ১৭টি আদিবাসী গোষ্ঠীর।[166] ১৯৫৫-৫৬ সালের দিকে আদিবাসী শ্রমিকদের কাজের নিশ্চয়তা বিশেষ ভাবে তৈরি হয়নি। সাধারণত, আদিবাসী শ্রমিক নিয়োগে ছোট খনি ক্ষেত্রে মৌখিক চুক্তি হওয়ার কথা উল্লেখ করা যায়। সংযুক্ত কর্মীদের নিয়োগের

---

164. *West Bengal Labour Gazettee,* Department of Labour Government of West Bengal, July 1962, P. 27.

165. *Report on the Activities of the labour,* Labour Vol-1, Department Government of West Bengal, West Bengal Government, January to April, 1948, P. 13-15.

166. *Report of the Administration of Criminal Justice*, Cuttack, Government of Orissa, 1948, P. 6-10.

নিয়ম ও শর্তাবলী সমস্ত নির্বাচিত গ্রামে সর্বজনীন প্রয়োগ ধারণ করেনি।[167] খনি শিল্পাঞ্চলের ক্ষেত্রে অধিক টাকা ব্যায় করলেও প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী ছোটনাগপুর খনি অঞ্চলের অন্তর্গত পশ্চিমবঙ্গ জেলার খনি অর্থনীতিতে ৯ মাস পর্যন্ত মানুষের বেকার হয়ে থাকার কথাও উঠে এসেছিল। বিনিয়োগের এই বৃদ্ধিটি ১৯৬১ সালে ৮৮০ হাজার থেকে কর্মসংস্থান হ্রাসের সাথে জড়িত ছিল। এইভাবে শহর এবং গ্রামে ব্যাপক বেকারত্ব সংকীর্ণ বৈষম্যমূলক পার্থক্যের জন্য আদিবাসী শ্রমিকরা বিভ্রান্ত হয়ে চলেছিল।[168]

আদিবাসী শ্রমিকদের খনি ক্ষেত্রের সাথে যুক্ত হওয়ার নানা বাধ্য বাধকতার পাশপাশি ন্যায্য ও ন্যূনতম মজুরী প্রাপ্যতা নিয়ে যে সমস্যা দেখা গিয়েছিল তাতে একের পর এক আইন পাশ হলেও খনি কেন্দ্রে সাধারণ কর্মীদের জন্য সর্বনিম্ন বেতন প্রতি মাসে ৪৬ টাকা করে বরাদ্দ করা হয়েছিল। কয়লা খনি ভিন্ন খনি ক্ষেত্রে মজুরী নির্ধারণ মালিক পক্ষের হাতে থাকায় তা ঠিকমত প্রয়োগ করা হয়নি আদিবাসী শ্রমিকদের ক্ষেত্রে।

জর্জ রোজেন উল্লেখ করেন যে, অতীতে শিল্প খাতের প্রবৃদ্ধির হার জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারকে অতিক্রম করেনি। ১৯৬০ এর পরে শিল্প ক্ষেত্রে একটি দীর্ঘমেয়াদি সমস্যা দেখা দিয়েছিল। বেসরকারি অসংগঠিত শিল্পের সম্প্রসারনে উচ্চ বর্ণের মালিকদের প্রভাব বৃদ্ধি পেয়েছিল। স্বাধীনতা পরবর্তী ১৯৫৫ থেকে ১৯৬৫ সাল পর্যন্ত শ্রম সম্পর্কিত আলোচনায় খনি ব্যতীত অন্যান্য শিল্প ক্ষেত্রেও শ্রমিকদের মজুরী নিয়ে সমস্যার কথা উঠে এসেছিল যদিও তা।[169] খনি শ্রমিকদের উন্নয়নের কথা ভেবে খনি ক্ষেত্রগুলিকে আধুনিকীকরণ করার প্রয়াসের উপর জোর দেওয়া শুরু হয়েছিল। খনি মন্ত্রকদের আলোচনায় উঠে এসেছিল যে, উন্নত মানের খনিজ উত্তোলন করতে আধুনিক পদ্ধতির ব্যবহারের প্রয়োজন রয়েছে তাই খনি

---

167. *Report on Intensive type studies on Rural Labour in India,* Bankura (1968-69) Labour Bureau, West Bengal, Government of India Ministry of Labour, Pp. 41-76.

168. Ahmed. M (Ed), *District Census Handbook Kalahandi*, Vol-xii, 1951, Government of Orissa, Pp. 98-100.

169. Rosen. George. *Long –term Problems of Industrialization in India,* Economic and political weekly, 3 August, 1957, P. 1024

আধুনিকিকরনের জন্য পুঁজি বিনিয়োগ হয়েছিল যথেষ্ট। খনি ক্ষেত্রে কর্মরত সাধারণ শ্রমিকদের কাজ থেকে বরখাস্ত করার তথ্য উল্লেখিত হয়েছিল।[170]

এ প্রসঙ্গে মার্কসের কথায় সহমত পোষণ করা যায় যে, শ্রমিক শ্রেণি যত বৃদ্ধি পাবে ঠিক ততই বেকারত্ব বৃদ্ধির সাথে সাথে মজুরির হার ও পরিমাণ নির্ধারণের দায়িত্ব চলে যেতে থাকবে মালিকপক্ষের হাতে। জোশেফ শুম্পিটারের অর্থনৈতিক ও সমাজতাত্ত্বিক চিন্তাধারায় শুধুমাত্র মজুর শ্রেণির চিন্তাধারায় স্বাতন্ত্র্যতা লক্ষ করেছিলেন। খনি শ্রমের উন্নয়নের মধ্যে একটি দীর্ঘস্থায়ী মন্দাবস্থা লক্ষ করা যায় এবং জীবনধারণের জন্য ন্যূনতম মজুরী নিয়ে বৈষম্য ও স্বাধীনতা হরণের চেষ্টা করা হয়েছিল। ছোটনাগপুরের খনি অঞ্চলে সংযুক্ত শ্রমিক হিসাবে যারা কাজ করত তাদের চুক্তির মাধ্যমে মজুরী নিশ্চিত করা হয়েছিল। খনিতে নিয়োগকর্তারা অগ্রিম মজুরী আংশিক ভাবে প্রদান করত। ধনতান্ত্রিকতার প্রসারে দ্বিতীয় যে বৈশিষ্ট্যের কথা উঠে এসেছিল তা হল উন্নয়নের জন্য খনি মালিকরা ব্যক্তিগত সঞ্চয়কে গুরুত্ব দিয়েছিল।

এই ধারা অর্থনৈতিক উন্নয়নের একটি পর্যায়ে থাকলেও তা ছিল অর্থনীতির ক্ষেত্রে আবরণ মাত্র। এই ধারণার অন্তরালে উন্নয়নের মৌলিক শক্তিগুলি অর্থ সংরক্ষণের উপর জোর দিয়েছিল।[171] শ্রম নীতিগুলির মধ্যে শ্রমিকদের সামাজিক সুবিধা, তাঁদের কল্যাণের দিকটি নিয়ে আলোচনা হলেও বেতন বৃদ্ধি সেইভাবে হয়নি। অন্যদিকে শ্রমের বাজারগুলিকে বৃদ্ধি করে দক্ষ ও অদক্ষ শ্রম গড়ে তোলা হয়েছিল। কাজের নিরাপত্তার নামে রাষ্ট্রের যে কোনও ধরনের হস্তক্ষেপ আদতে শ্রমিকদের কর্ম সংস্থান ও বিকাশের পথকে বিপন্ন করে তুলেছিল। কাজের জন্য উৎসাহমূলক পরিবেশ খনি শ্রমিককে পর্যাপ্ত পরিমানে দেওয়া হয়নি। বেতন, বোনাস, পদন্নতির নীতিগুলিতে আদিবাসী অসংগঠিত খনি শ্রমিকদের আলোচনার অভাব লক্ষ করা যায়।

১৯৬০ সালের বাজেট অধিবেসনে অন্যান্য শিল্পাঞ্চলের শ্রমিকদের কথা অধিক প্রাধান্য পেয়েছিল। আদিবাসী শ্রমিকদের সাথে অন্যান্য খনি কর্মীদের মধ্যে ঐক্য তৈরি না হলে, ঐক্যহীন আদিবাসী শ্রমিকরা রাজনৈতিক ভাবে একত্রিত হতে পারেনি। আদিবাসী শ্রমিকদের চাহিদাকে স্থগিত করে রাখা হয়েছিল। রাজনৈতিক আঙ্গিনায় তারা নানাভাবে বিভ্রান্ত হয়েছিল। এছাড়াও রাজনৈতিকভাবে আদিবাসী শ্রমিকদের ঐক্য ও বলিষ্ঠ নেতৃত্ব নিয়ে ভাবনার প্রয়োজন

170. তদেব। পৃ. ১০২৪

171. রায়. হীরেন্দ্রনাথ, *ধনতন্ত্র বিশ্লেষণ,* কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা অ্যাকাডেমি, ২০ মে, ২০০০, পৃ. ১১৭

ছিল। ট্রেড ইউনিয়ানের পথে আরেকটি বাঁধা ছিল জয়প্রকাশ পন্থি হিন্দু মজদুর সভা। এই হিন্দু মজদুর সভা আদিবাসী শ্রমিকদের সুবিধা ও সংগ্রামের কথা বললেও আসলে তারা হিন্দুবর্ণের গোষ্ঠীর পোষণকারী ছিল। খনি মালিক সমিতিরা ট্রেড ইউনিয়ানের ঘন ঘন প্রতিরোধকে স্বীকৃতি দেয়নি বরং সেক্ষেত্রে এদের ধর্মঘট ব্যাপকতার রূপ ধারণ করেছিল। ছোটনাগপুর মালভূমিতে খনি মালিকদের বিরুদ্ধে আঞ্চলিক ও সাময়িক ধর্মঘট দেখা দিয়েছিল। যদিও অনেকে মনে করেন ট্রেড ইউনিয়ান আন্দোলনকে দলীয় স্বার্থে শ্রমিক স্বার্থের সাথে বিছিন্ন করে রাখা হয়েছিল।[172] পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন ইউনিয়ান পদে সদস্য সংখ্যা ছিল ভুয়ো তাই ট্রেড ইউনিয়ানের মধ্যে ঐক্য স্থাপন করার কথা উঠে এসেছিল।[173] রাজ্যগুলির সামাজিক, অর্থনৈতিক সংক্রান্ত উন্নয়ন প্রকল্পগুলি রূপায়নের জন্য রাজ্যগুলির হাতে পর্যাপ্ত রাজনৈতিক ও সাংবিধানিক ক্ষমতা দেওয়ার প্রয়োজন ছিল।[174] ট্রেড ইউনিয়ান গঠন যেমন হয়েছিল শ্রমিকদের দুঃখ, দুর্দশা দূর করতে ঠিক তেমনি ইউনিয়ানের নেতারা নিজের স্বার্থ চরিতার্থ করতে আদিবাসী শ্রমিকদের প্রতি অবহেলা প্রকাশ করার কথা বিভিন্ন পত্র পত্রিকা ও রাজনৈতিক নেতাদের মন্তব্যে সমালোচিত হয়েছিল। যদিও এর কারণ হিসাবে তাঁরা উল্লেখ করেন যে, শ্রমিক নেতারা মালিক পক্ষের কাছে নিজেদের বিক্রি করে দিয়েছিলেন এবং দাবী জানানোর জোর হারিয়ে ফেলেছিল। বোর্ডের সদস্য পদ থেকে শ্রমিকদের যথাযথ ও পর্যাপ্ত প্রতিনিধিত্ব থেকে আদিবাসী নেতৃত্বদের বঞ্চিত হয়েছিল। পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের লক্ষ্য ছিল পুঁজিবাদীদের স্বার্থ সিদ্ধি করা তাই শ্রমিকশ্রেণির নাগরিক সুরক্ষা ও অধিকার, জীবিকার অধিকারকে সুনিশ্চিত করার দাবিতে সংগ্রামগুলি যাতে শক্তিশালী না হয় তাঁর চেষ্টা করা হয়েছিল। আদিবাসী পরিযায়ী শ্রমিকদের ভোটাধিকার প্রয়োগের অধিকার, পরিযায়ী শ্রমিকদের নথিভুক্তিকরন এবং বিশেষ পরিচয়পত্র ছিল না। শিল্পপতিদের স্বার্থ সিদ্ধি করার জন্য অসংখ্য আইন, ধর্মঘট করার অধিকার আদিবাসী শ্রমিকদের বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল।

বাজার অর্থনীতির প্রসার ঘটলে শ্রমিকের সন্ধানে শ্রমিক সংগঠনগুলিও তাদের দায়িত্বে অবহেলা দেখা দিয়েছিল বলে মনে করেন একদল সমাজতাত্ত্বিকরা। ট্রেড ইউনিয়ানের নেতারা

---

172. ব্যানার্জি, সুবোধ (সম্পা.), *গণদাবী,* সোশ্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া, (বাংলা সাপ্তাহিক পত্রিকা), তৃতীয় বর্ষ ৬ সংখ্যা, কলকাতা, ১৬ই ডিসেম্বর ১৯৫০, পৃ. ২-৭

173. Sen. Sunil Kumar, *Working class movement in India 1885-1975,* Delhi, Oxford University Press, 1994, P. 125.

174. মিত্র. মুরারি, *পার্টির চিঠি, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি,* ১৯৭৫, পৃ. ৫-১০

তাদের রাজনৈতিক স্বার্থ হাসিল করার জন্য শ্রমিকদের উতবুদ্ধ করতে ক্ষুদে নেতারা শ্রমিকদের কাছে চাঁদা সংগ্রহের জন্য একত্রিত হওয়ার ও তথ্য উল্লেখিত হয়েছিল। প্রতি কর্মীকে মাসে ৪-৫ টাকা করে দিতে হয় না দিলে শ্রমিকদের উপর জবরদস্তি করা হত। তা নিয়ে একাধিক আদিবাসী সাঁওতাল শ্রমিকরা ধর্মঘট করার কথা জানা যায় ১৯৬০ সালে উড়িষ্যায় ও বাংলায়।[175] এ প্রসঙ্গে অপর্যাপ্ত শ্রম সংস্থা, শ্রমিকদের নিরক্ষরতা, অভিবাসন এবং শিল্প জীবনধারায় আদিবাসী শ্রমিকদের দুর্বল অবস্থার জন্য এক প্রকার দায়ী করা যায়। ট্রেড ইউনিয়ানের নেতাদের এই অবস্থা দেখে খনির আদিবাসী কর্মীরা 'সংগঠন' নামক অস্থায়ী প্রতিষ্ঠানের উপর ধীরে ধীরে আস্থা হারিয়ে ফেলতে শুরু করেছিল। কার্যত অন্যদিকে মালিকপক্ষের তরফ থেকে অবাধে শুরু হয়েছিল সাময়িক নিয়োগ ও চুক্তি ভিত্তিতে শ্রমিক নিয়োগ। খনি সংস্থায় স্থায়ী শ্রমিকের সংখ্যা হ্রাস পাওয়ার সাথে সাথে শ্রমিক সংগঠনগুলির ধর্মঘট বৃদ্ধি পেয়েছিল। স্বাধীনতা পরবর্তী ১০৫০ সাল থেকে নিবন্ধিত ট্রেড ইউনিয়ানের সংখ্যা ছোটনাগপুর মালভুমি এলাকায় ১৯৫২ তে ৪,৬০০ থেকে ১৯৫৬ সালের মার্চ মাসে ৭০০০ এ পৌছেছিল।[176] যদিও এই সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছিল ১৯৫৪ থেকে ১৯৬৪ সালের মধ্যে ম্রাদাজ, কানপুর, জামশেদপুর, পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য ক্ষেত্রে যেমন টেলিগ্রাফ, বন্দর বিভাগ, লৌহ-ইস্পাত, রেল, ব্যাঙ্ক ইত্যাদি বিভাগে। খনি ভিন্ন ট্রেড ইউনিয়ানের সংখ্যা এতটা বৃদ্ধি পেয়েছিল বলে খনি শ্রমিক সংগঠনগুলির ব্যর্থতা নিয়ে একাধিক সমালোচনা উঠে এসেছিল। ১৯৬১ সালের আদমসুমারিতে দেওয়া তথ্য অনুযায়ী জানা যায় যে, ট্রেড ইউনিয়ান সেই শিল্পগুলিতেই তীব্রতর হয়ে উঠেছিল যে অঞ্চলগুলিতে সংগঠিত কর্মচারী ছিল[177] তাই আদিবাসী শ্রমশক্তির একটা বড় অংশ অসংগঠিত থেকে গিয়েছিল।

খনি শ্রমিকদের জীবনযাত্রার মান উন্নত করতে ভিন্ন ভিন্ন শ্রম কোড ও প্রণীত সংবিধিবদ্ধ নিয়ম- এর অধীনে দেশের শ্রম বিষয়ক বার্ষিক প্রতিবেদন তৈরির নির্দেশ অবহেলা

---

175. *Annual Report on The working of the Indian Trade unions act 1960,* Labour employment & Housing department, Government of Orissa, Pp. 4-10.

176. *Trade Unions in India 1954-55 and 1955-56,* Labour Bureau, Ministry of Labour and Employment Government of India, Publication by Government of India, 1958, P. 164-166.

177. Sen. Sunil Kumar, *Working class movement in India 1885-1975,* Delhi, Oxford University Press, 1994, P. 127.

করা হয়েছিল।[178] এই ঘটনায় রাজনৈতিক অভিযানের দুর্বলতা প্রকাশ পেয়েছিল নিয়মিত বুলেটিন প্রকাশিত না হওয়ার মধ্য দিয়ে। এছাড়াও উড়িষ্যাতে ১৯৬৫ সালে ট্রেড ইউনিয়ানের সংখ্যা ১৭২ থেকে ১৯৯ এ পৌছালেও সদস্যসংখ্যা হ্রাস পেয়েছিল বার্ষিক রিটার্ন কর জমা না দেওয়ায় জন্য।[179] কংগ্রেস সরকারের যুগে ট্রেড ইউনিয়ানের ক্ষমতাকে হ্রাস করানোর তীব্র চেষ্টা করা হয়েছিল এবং এই লক্ষ্যে পৌছাতে পুঁজিপতি গোষ্ঠীর সাথে তৎকালীন সরকারের সাহায্যে খুব সহজেই ট্রেড ইউনিয়ানকে বৃহৎ লক্ষ্য থেকে ক্ষুদ্র লক্ষ্যে ঘুরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছিল। এই পরিস্থিতিতে ট্রেড ইউনিয়ানের পরবর্তী উদ্দেশ্যগুলির মধ্যে অ-সংগঠিত আদিবাসী শ্রমিকদের দাবির কথা ধীরে ধীরে কম গুরুত্ব পেয়েছিল। শ্রমিকদের সমান অধিকার দাবী করার মধ্য দিয়ে নিচু তলা থেকে গড়ে উঠা ট্রেড ইউনিয়ানের আন্দোলনকে রাষ্ট্রের পক্ষে বিপজ্জনক হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছিল বারংবার এবং ট্রেড ইউনিয়ানগুলিকে সমালোচনার শিকার হতে হয়েছিল।

ছোটনাগপুর মালভূমি খনি অঞ্চলের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি সমৃদ্ধির পথে অগ্রসর হলেও আদিবাসী শ্রমিকদের শ্রম কাঠামোয় সমস্যা জর্জরিত ছিল। স্বাধীনতা পরবর্তী খনি অঞ্চলে অসংগঠিত আদিবাসী শ্রমিকদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের রূপরেখা সম্পর্কে বলা যায় যে, এই অঞ্চলের খনি আদিবাসী শ্রমিকদের সুবিধাগুলিকে বাতিল করে শিল্পপতি এবং বড় ব্যবসায়ীরা অর্জিত মুনাফার একটি বড় অংশ রাষ্ট্রীয় অর্থনীতি প্রসারে ব্যবহৃত হয়েছিল। স্বাধীনতা-উত্তর কালের ভারত রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ভাবনা ছিল তৎকালীন কংগ্রেস দলের রাজনৈতিক ভাবনার সাথে মিশ্রিত। এই পর্যায়ে ঘোষিত নীতি ছিল সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী অথচ সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির প্রসারকে সেইভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। তৎকালীন সময়ে আধা পুঁজিবাদী ও আধা সমাজতান্ত্রিক একটি মিশ্র অর্থনীতির পরিবেশ তৈরি হয়েছিল। স্বাধীনতা অর্জনের পরে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে অর্থনৈতিক পরিবর্তনের সাথে যে উন্নয়ন লক্ষ করা যায় তা শুধু বিদেশি শাসনের ‘পুঁজিবাদী অর্থনীতি’ অনুসরনের মধ্য দিয়ে তৈরি হয়েছিল। তৎকালীন সরকারের অধীনে,

---

178. *Estimate Committee (1959-60) Eighty- Eight Report (Second Lok Sabha),* Ministry of Labour and Employment Part-ii, Lok Sabha Secretariat, New Delhi, April 1960, P. 15-17

179. *Annual Report and returns on the working of the Indian Trade Union Act, 1926 in the State of Orissa for the period from 1st april 1965 to 31 December 1965,* Labour, employment & Housing Department, P. 2.

কর্পোরেশন ট্যাক্স, আয়কর এবং শুল্ক দ্বারা ১৯৬০ সালে পশ্চিমবঙ্গ থেকে ৫,৫৪০ মিলিয়ন টাকা ও ১৯৬৫ সালে ১২,৪৮০ মিলিয়ন রুপি থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১৩,৮৩১ মিলিয়ন রুপি শিল্পের খাতে ব্যবহৃত হয়েছিল। পুঁজি সংস্থায় আন্তর্জাতিক বিনিয়োগ নিশ্চিত হয়েছিল অন্যান্য দেশের সাথে এবং তার সাথে নানা দেশের অর্থনীতিকে পুঁজির স্বার্থে গড়েপিঠে নেওয়ার কাজ শুরু হয়েছিল। ১৯৬৫ সালের পর থেকে খনিজ উত্তোলন কেন্দ্রগুলিতে অতিরিক্ত যন্ত্রাংশের ব্যবহার খনি শ্রমিকদের জীবনকে পুনরায় বেকারে পরিণত করেছিল। এই ঘটনাগুলি থেকে উপলব্ধি করা যায় যে, স্বাধীনতার পর থেকে পুঁজিপতি ও সরকারের সম্মিলিত শক্তি পুঁজিবাদী সভ্যতার বিকাশে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল।

দেশহিতকর যে সমস্ত প্রচেষ্টা করা হয়েছিল তা সমস্তই একমাত্র ধনি ও শিক্ষিত শ্রেণির মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। রাজনৈতিক অভিযান জোরদার করা এবং জনসাধারণের মন থেকে বিভ্রান্তি দূর করার জন্য শ্রম উন্নয়নে উন্নততর পদ্ধতি অবলম্বন প্রয়োজনীয় ছিল। দেশের উন্নতির জন্য বেশ কিছু সংগঠন বা সভার আয়োজন সম্পর্কে বীরভূম বার্তা নামে তৎকালীন পত্রিকার মন্তব্য ছিল “সভা সমিতি থেকে লম্বা চওড়া বক্তৃতায় দেশ উন্নত হয় না, দেশকে উন্নত করতে হলে আলস্য, বাকপটুতা, বিলাসবাসন ত্যাগ করে পল্লীর ঘরে ঘরে গমন করে দরিদ্র্য জাতির সাথে মনে প্রানে মিলে তাদের সুখ দুঃখের কাহিনী ও সমস্ত অভাব ও অভিযোগ শোনার প্রয়োজন আছে রাজনৈতিক নেতৃত্বদের”।[180] এছাড়াও শিক্ষিত যুবকগণকে অর্থহীন আন্দোলন ছেড়ে পল্লী সেবক সেজে গ্রামে গ্রামে প্রবেশ করে উন্নয়ন করার কথা উল্লেখিত হয়েছিল।

পর্যবেক্ষণ

এই অধ্যায়টি মূলত স্বাধীনতা পরবর্তী ১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৬৫ সাল পর্যন্ত এই অধ্যায় অধ্যায়ন বা গবেষণা করার কারণ হল স্বাধীনতা পরবর্তী নেহেরু যুগে যে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা প্রস্তাবিত হয়েছিল তাতে খনির মত অর্থনৈতিক শিল্পখাতে পরিবর্তন ছিল বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। স্বাধীনতার প্রাপ্তির সাথে সাথে প্রতিটি মানুষের মৌলিক অধিকারগুলো যেমন পরিবর্তিত হওয়ার কথা ছিল ঠিক তেমনি অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনায় উন্নয়নের কথা বলা হয়েছিল। রাজ্যের অর্থনৈতিক নিয়ম নীতির পরিবর্তনের সাথে

---

180. *বীরভুম বার্তা,* সাপ্তাহিক পত্রিকা, বর্ষ-১২, সংখ্যা-৪৭, সিউড়ি, বীরভূম, অগ্রহায়ন ১৩২৩ সাল।

কেন্দ্রীয় অর্থনীতির বিকাশে শিল্পের উন্নয়নের প্রসঙ্গ উঠে এসেছিল। উপরিক্ত আলোচনায় পর্যবেক্ষণ করা যায় স্বাধীনতার পরবর্তী ১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৬৫ সাল পর্যন্ত ছোটনাগপুরের খনি এলাকার আদিবাসী শ্রমিকদের নিয়ে সংগঠিত ট্রেড ইউনিয়ান গঠন ও আদিবাসী শ্রমিকদের পরিবর্তন। স্বাধীনতার পরবর্তীকালে ঘোষিত রাষ্ট্রীয় সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি থেকে রাষ্ট্র পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে রূপান্তরিত হয়েছিল যা খনির আদিবাসী শ্রমিকদের জীবনকে ধীরে ধীরে অনিশ্চিত হয়েছিল। ট্রেড ইউনিয়ান ছিল একমাত্র যারা আদিবাসী শ্রমিকদেরকে সামাজিক অসমতার মধ্য দিয়ে নিজেদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন করে তুলেছিল। শিল্প ও খনি শ্রমিকদের আশা ছিল পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় তাদের উন্নয়নে বিশেষ ভাবে গুরুত্ব দেওয়া হবে যদিও তা পুরোপুরি বাস্তবায়িত হয়নি। ট্রেড ইউনিয়ান গঠনের ফলে খনিতে শ্রমিকদের জন্য নিয়ম প্রবর্তন ও একাধিক সংগঠিত ধর্মঘটে আদিবাসী শ্রমিকদের শ্রেণি সচেতনতা বোধকে জাগ্রত করেছিল। স্বাধীনতা পূর্ব থেকে পরবর্তী পর্যন্ত খনিতে শ্রমিকদের জন্য বিভিন্ন আইন পুনঃপ্রবর্তিত হওয়ার পাশপাশি আদিবাসী ভিন্ন অন্যান্য সম্প্রদায়ের শ্রমিকদেরকে খনি কাজে যুক্ত হতে দেখা গিয়েছিল। ১৯৬৫ সালের ছোটনাগপুরের খনি অর্থনৈতিক উন্নয়নের মধ্যে আদিবাসী ও অ-আদিবাসী শ্রমিকদের মধ্যে শ্রম জনিত সামাজিক মর্যাদার পার্থক্য সূচিত হয়েছিল। পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক অবস্থার বিরুদ্ধে আদিবাসী শ্রেণির শ্রমিকের লড়াই ভিন্ন ধরনের ইতিহাস তৈরি করতে বাধ্য করেছিল। ট্রেড ইউনিয়ানের ক্রমাগত সহায়তা ও সংগ্রাম ছাড়া আদিবাসী শ্রমজীবী মানুষের পরিবর্তন যে একেবারেই সম্ভব ছিল না তা এই অধ্যায় পর্যবেক্ষণে লক্ষ করা যায়। ১৯৬৫ সালের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার পরবর্তী প্রভাব অনেকটা বিস্তারিত থাকায় গবেষণার সুবিধার্থে এই পর্যায়ে ১৯৬৫ সাল পর্যন্ত এই অধ্যায় আলোচিত হয়েছে।

উপসংহার

ছোটনাগপুর মালভূমির ক্ষেত্র জুড়ে পাথর, চুনাপাথর, ইউরেনিয়ামের খনি জুড়ে বিস্তৃত অংশগ্রহণ লক্ষ করা গিয়েছিল। অর্থনৈতিক অবস্থানের এই অবনমনের পরিপ্রেক্ষিতেই এই গবেষণা আলোচনা করা হয়েছে। পূর্ববর্তি গবেষণায় আলোচিত হয়েছে ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষের তথা ছোটনাগপুর মালভূমির অর্থনৈতিক ইতিহাসে আদিবাসী শ্রমিকদের অবদান। এই অবদান কয়লার মত খনিজ খনি ও খাদানে ভারতের মত গোটা দেশের অর্থনৈতিক ইতিহাসকে পরিবর্তিত করেছিল তা নিঃসন্দেহে বলা যায়। প্রাথমিক, গৌণ ও মৌখিক ঐতিহাসিক তথ্য সূচি বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে এটা প্রমানিত হয়েছিল ঔপনিবেশিক পর্যায়ে কৃষি থেকে স্বাধীনতা পরবর্তী ১৯৬৫ সাল পর্যন্ত খনি শিল্পে আদিবাসী গোষ্ঠীদের অংশগ্রহণ তাদের জীবনের সামাজিক থেকে অর্থনৈতিক ধারাকে পরিবর্তিত করেছিল। কৃষক থেকে শ্রমিকে পরিণত হওয়ার পদ্ধতিগুলি ছিল কৌশলে পরিপূর্ণ। কর্মক্ষেত্রে সঠিক ভাবে কাজ করার জন্য ও স্থায়ী বসবাস থেকে উচ্ছেদ তার জীবনশৈলীকে পরিবর্তন করেছিল। পূর্বে পাঁচটি অধ্যায় আলোচনার মধ্য দিয়ে যে বিশ্লেষণগুলি উঠে এসেছে তাতে সাধারনভাবে আদিবাসী শ্রমিকদের স্বাধীনতা থেকে অধিকারের প্রশ্নগুলি ঔপনিবেশিক থেকে স্থানীয় পুঁজিপতিদের কাছে বারংবার উপেক্ষিত হয়েছিল।

চিরস্থায়ী নামক একটি ভূমি বন্দোবস্তের মধ্য দিয়ে সম্পত্তির অধিকার, জমিদারদের ব্যক্তিগত অধিকারে পরিণত হয়েছিল। সম্পত্তির অধিকার ও আইনি অধিকার এক হয়ে কৃষির মত জীবিকা থেকে ছোটনাগপুরের আদিবাসী জনগোষ্ঠীর জীবনশৈলীকে পরিবর্তিত করেছিল। অতিরিক্ত রাজস্ব আদায়ের জন্য আদিবাসী কৃষকদের জোরপূর্বক কৃষি ক্ষেতের পেশায় আবদ্ধ করা হয়েছিল। অন্যদিকে ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ শাসকদের নিজস্ব প্রয়োজনে কৃষি ক্ষেতের সাথে সম্পর্ককে বিছিন্ন করে জমির সাথে সম্পর্কিত আদিবাসীদের চোর, ডাকাতে পরিণত করেছিল। ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ কোম্পানি ছোটনাগপুরের স্থানীয় জমিদারদের সহায়তায় জমি ও বাসস্থান থেকে উচ্ছেদ করে আদিবাসী জনগোষ্ঠীকে চেতনাহীন করে তুলেছিল। জমিদারের অত্যাধিক ক্ষমতা থাকার ফলে আদিবাসীরা দাসত্ব গ্রহণ করতে রাজি হয়েছিল। দাসত্ব পালন করা ব্যতীত তাদের কাছে ভিন্ন উপায় ছিল না। দাসত্ব, অত্যাচার, অবিচার, অন্যায়ের বিরুদ্ধে সরব হলে কৃষি ক্ষেত্রের মত জীবিকা থেকে সম্পূর্ণ ভাবে অপসরণ করে দেওয়া হয়েছিল। এককথায়

তাদের জীবিকাহীন করে, শ্রমিকে পরিণত করার প্রথম ধাপে পৌচ্ছে দিয়েছিল। আদিবাসীদের জীবন ও জীবিকার সাথে বেকারত্ব, মজুরীহীন জীবিকা, অত্যধিক কঠোর শ্রম দান এই শব্দগুলি তৎকালীন পরিস্থিতির সাথে পরিচিত হতে থাকে। উপরিক্ত গবেষণার বিশ্লেষণে আদিবাসী সম্প্রদায়ের অর্থনৈতিক দুরাবস্থার কথা জানা গেছে। এই দুরবস্থার জন্য ঔপনিবেশিক শক্তি থেকে হিন্দু জমিদারদের বিশেষভাবে দায়ী করা যায়। যে সমস্ত আদিবাসীরা শ্রমিক হওয়ার প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করতে পারেননি তাদের অবস্থা আরো শোচনীয় হয়েছিল। ক্ষেত থেকে সবচ্ছল আয় না হওয়া ও কৃষিতে আধুনিক কৌশল প্রয়োগ করার ফলে তাদের কৃষি জীবিকার প্রতি নির্ভরশীলতা হ্রাস পেয়েছিল। দুর্বল অর্থনৈতিক অবস্থা তাদের সামগ্রিক জীবনযাত্রার উপর গভীর ভাবে প্রভাব ফেলেছিল।

আদিবাসী কৃষকদের অধিকাংশ জনগোষ্ঠী যে শ্রমিকে পরিণত হয়েছিল তা ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ কোম্পানির হাত ধরে শুরু হলেও স্থানীয় পুঁজিপতি ও জাতীয়তাবাদী নেতাদের প্রশ্রয় কম ছিল না। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে জমিদার ও প্রজা শ্রেণির সম্পর্কের বিবর্তন থেকে মালিক ও শ্রমিক শ্রেণির সম্পর্কে উত্তরণ ঘটেছিল। জাতীয় অর্থনীতির মান বৃদ্ধিকে কেন্দ্র করে রাষ্ট্র একপ্রকার শোষণযন্ত্রে পরিণত হয়েছিল। কৃষি সমাজ অর্থনীতি থেকে পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে ও সমাজ ব্যবস্থার বিবর্তনে ঔপনিবেশিক শক্তির প্ররোচনায় রাষ্ট্রের স্বার্থপরতা কিভাবে কাজ করেছিল তা উদ্ঘাটিত হয়েছে এই অধ্যায়ে। পুঁজিবাদী অর্থনীতিকে ধরে রাখতে গিয়ে একের পর এক শোষণ ও অবিচার আদিবাসী শ্রমিক শ্রেণির জীবনযাত্রা ও জীবনবোধের অর্থকেই পরিবর্তন করে ফেলেছিল। শ্রমিক হিসাবে খনিতে যোগদানের পর থেকে ভাষা থেকে শুরু করে খাদ্য ও সংস্কৃতির প্রতিটি ক্ষেত্রে পরিবর্তন লক্ষ্য করা গিয়েছিল।

আদিবাসী জনগোষ্ঠীর মধ্যে মহিলা শ্রমিকদের শোষণের একটি বড় চিত্র বা ইতিহাস উদ্ঘাটিত হয়েছে। ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রব্যবস্থা যে কর্তৃত্ববাদী ব্যবস্থা ছিল তার প্রমাণ ছোটনাগপুরের মালভূমি অঞ্চলে আদিবাসী মহিলা শ্রমিকদের সামাজিক অবস্থানে ফুটে উঠেছিল। একই স্থানে ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় একসাথে বাস করলেও আদিবাসী মহিলা শ্রমিকদের সাথে সামাজিক সম্পর্ক ছিল শুধুমাত্র ভারী শ্রম ব্যবহারে লক্ষ করা যায়। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে আদিবাসী পুরুষ ও মহিলা উভয়েই স্বাধীন ছিল। কর্মক্ষেত্রে তাঁরা উভয়েই একসাথে কাজ করত। ঔপনিবেশিক যুগে কৃষি থেকে আন্দোলনে অংশগ্রহণ ও শিল্পে যোগদান সবটাই তাঁরা

পুরুষদের সাথে একই সারিতে কাজ করেছিল কিন্তু খনি শিল্পে মহিলাদের অংশগ্রহণ লিঙ্গ নির্বিশেষে শ্রম বিভাজন দেখা যায়। উৎপাদন ক্ষেত্রে শ্রেণি দ্বন্দ্ব থেকে লিঙ্গ বিভাজনে তারতম্য বহিঃপ্রকাশ হয়েছিল। সমাজে আদিবাসী মহিলাদের সাথে অন্যান্য মহিলাদের শ্রমের পার্থক্যকরণ করা হয়েছিল। মহিলাদের ক্ষেত্রে খনি কর্তৃপক্ষের মনোভাব ও ছিল অমানবিক ও সহানুভুতিহীন। শ্রমিক হওয়ার পদ্ধতিতে আদিবাসী পুরুষদের পাশাপাশি মহিলাদের অর্থাৎ সমস্ত আদিবাসী জনগোষ্ঠীকে শোষণের মূল কেন্দ্রে পরিণত করেছিল। সামাজিক উৎপাদনে আদিবাসী মহিলাদের সাথে খনির সম্পর্ক পরিবর্তিত হয়েছিল। মালিক ও ঔপনিবেশিক শক্তি তাদের কায়েমি স্বার্থকে বজায় রেখে দীর্ঘদিনের জন্য আদিবাসী মহিলাদের ভারবাহী কাজে পারদর্শীতার জন্য তাদের ভিন্ন পরিচিতি তৈরি হয়েছিল। কর্মঠ, ভারবাহী আদিবাসী মহিলাদের খনি ক্ষেত্রে অত্যাধিক যোগদান শ্রমের বাজার গঠনে সহায়তা করেছিল। আদিবাসী মহিলা শ্রমিকদেরকে চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক হিসাবে রেখে সস্তা শ্রমিকে পরিণত করার চেষ্টা করেছিল। পুঁজিবাদী অর্থনীতিকে দৃঢ় করার জন্য আদিবাসী মহিলা শ্রমিকদের শোষণের পথ ঔপনিবেশিক শক্তি উন্মোচিত করেছিল। যার বহিঃপ্রকাশ কম মজুরী থেকে সামাজিক জাত ব্যবস্থার বিভাজনে লক্ষ করা যায়। তা না হলে খনি অঞ্চলে তারা কষ্ট হবে জেনেও খনি ও খাদানের কাজে ভিড় করত। মহিলাদের খনি ক্ষেত্রে অংশগ্রহণের পশ্চাতে আদিবাসীদের অংশগ্রহণের কারণ কি কি ছিল তা পরিস্কার ভাবে একটি ধারণা এই অধ্যায়ে লক্ষ করা যায়। স্বাধীনতা পরবর্তী খনিতে মহিলাদের জন্য আইনগুলির প্রচার ও প্রয়োগের পার্থক্যে রাষ্ট্রের অবহেলা ছিল লক্ষ করার মত অর্থাৎ সার্বভৌম কর্তৃপক্ষের আদেশেই আইনে এইরুপ ধারণা লক্ষ করা গিয়েছিল। আদিবাসী মহিলাদের মধ্যে খনির নিয়ম-নীতি গুলি দীর্ঘদিন ধরে কার্যকরী না করার জন্য অস্থায়ী শ্রমের বিতর্কটি পরিস্ফুট হয়েছিল। সামাজিক অবহেলনের ফলে খনি ও খাদানের কাজে অংশগ্রহণের মাত্রা বৃদ্ধি যা আদিবাসী মহিলা শ্রম শক্তিকে এক দিক দিয়ে চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন করে তোলে অন্যদিকে শোষণযন্ত্রের অন্যতম উপাদান হিসাবে পরিচিত হয়েছিল।

সম্পত্তি নিয়ন্ত্রণের আপেক্ষিক ক্ষমতাই ছিল সামাজিক সম্পর্ক বিবর্তনের মূল নিয়ামক। তা না হলে খনির পাশপাশি পাথর খাদান চিত্রে আদিবাসীদের একই অর্থনৈতিক অবস্থার ঝলক লক্ষ করা যায়। পুঁজিবাদী সম্পর্ক টিকিয়ে রাখা ও অতিরিক্ত মুনফা আদায়ের জন্য ব্যক্তিগত অধিকার যে প্রয়োজন ছিল তা এই অধ্যায়ে প্রকাশিত হয়েছে। ব্যক্তিগত অধিকার

থেকে নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখার জন্য প্রয়োজনে পুঁজিপতিদের আইনি ব্যবস্থাকে অমান্য করার চিত্র ও পরিলক্ষিত হয়। দীর্ঘকালীন শোষণের ফলে আদিবাসী শ্রমিকদের কাছে স্বাধীনতা অর্থহীন হয়ে দাঁড়িয়েছিল। আপাত দৃষ্টিতে স্বাধীনতা থাকলেও দরিদ্র শ্রমিকের সেই স্বাধীনতা ছিল 'অভুক্ত থেকে মৃত্যুকে' ডেকে আনার স্বাধীনতা। দেশীয় অর্থনীতিকে উন্নত করতে শ্রমিকদের স্বাস্থ্যকে ভঙ্গুর করা দেশীয় অর্থনীতির বৈশিষ্ট্য হয়ে উঠেছিল। ভারী কাজ করার শক্তি তাদের মধ্যে ধীরে ধীরে লোপ পেয়েছিল। সিলিকোসিস, যক্ষ্মা, কান্সারের মত রোগ আদিবাসীদের জীবনে দীর্ঘস্থায়ী হয়ে উঠেছিল। বড় বড় রোগ তাদের স্বাস্থ্য ও অর্থনীতির বিকাশকে ব্যহত করে তুলেছিল অর্থাৎ খনি জীবন তাদের কাছে দুর্বিষহ হয়ে উঠেছিল। আদিবাসী শ্রমজীবীদের অসহায়তার সুযোগে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা স্বাধীনতা পরবর্তীকাল পর্যন্ত রাষ্ট্র ব্যবস্থা শোষণ কাঠামোকে বৈধতা প্রদান করেছিল তা ছোটনাগপুরের বীরভূমের পাথর খাদান ও ক্রাশারে লক্ষ করা যায়। দেশকে শিল্পোন্নত করতে গিয়ে নিজ দেশের কাঁচামালের উৎপাদনে শ্রমিক শ্রেণির অবাধ শ্রম যেমন ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিল ঠিক সেইরকম-ই খনি ও খাদান সংলগ্ন প্রাকৃতিক পরিবেশ দূষিত হয়েছিল। আদিবাসী জনগোষ্ঠীর দ্বারা রাষ্ট্রীয় নীতি বোঝার ক্ষমতা ছিল না। বাণিজ্যিকীকরণের এই প্রবণতা এবং জটিল অর্থের যোগসূত্র ব্রিটিশ বাণিজ্য কোম্পানি এবং বড় জমিদারদের দ্বারা খনিজ পণ্যগুলিকে বাজার অর্থনীতির ধাঁচে ফেলে ছোটনাগপুর মালভূমি অর্থাৎ বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার মূল্যবান খনিজ সম্পদ ও বনভূমি ধ্বংস হওয়া শুরু হয়েছিল। চাষযোগ্য জমি উর্বরতা হারিয়ে ফেলেছিল। পরিবেশ দূষণে তৎকালীন রাষ্ট্রের ভূমিকা যে অগ্রগণ্য ছিল তা নিঃসন্দেহে বলা যায়। স্থানীয় পুঁজিপতিরা অতিরিক্ত মুনফা উৎপাদন করার লক্ষ্যে শ্রমজীবী মানুষের স্বাস্থ্য ও প্রাকৃতিক পরিবেশের সৌন্দর্যকে বিঘ্নিত করেছিল। টেকসয় উন্নয়নের কথা শোষণকারীদের পরিকল্পনার মধ্যে পরিলক্ষিত হয়নি।

আদিবাসী কৃষক থেকে শ্রমিক শ্রেণির সংগ্রামের ইতিহাস ধীরে ধীরে সামাজিক ইতিহাসে স্থান করতে শুরু করেছিল তা এই গবেষণায় লক্ষ করা যায়। যে শ্রেণির ইতিহাস সমাজের মূল ইতিহাসে স্থান পায়নি সেই শ্রেণির সংগ্রামকে নিয়ে ঐতিহাসিক থেকে সমাজতাত্ত্বিক ও রাষ্ট্রীয় নেতাদের সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছিল। সমাজ ব্যবস্থার কাঠামো ও রাষ্ট্র ব্যবস্থার কাঠামোর মধ্যে পার্থক্য অনুভূত হয়েছে। খনিগুলির সাংগঠনিক পরিবর্তনগুলিকে এই গবেষণায় বিশ্লেষণ করে দীর্ঘ সময়ের জন্য আদিবাসীদের কর্মসংস্থানের উপর প্রভাব

ফেলেছিল। স্বাধীনতার পরবর্তীকালে গণতান্ত্রিক ভারতে শিল্পায়নের কর্মসূচির উপরে যথেষ্ট জোর ছিল, তা স্বত্বেও প্রাথমিক স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও সামাজিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা, পূর্ণ কর্ম সংস্থান সবার ক্ষেত্রে লক্ষ করা যায়নি। আদিবাসী শ্রমিকদের মধ্যে অনেকেই জীবন যাপনের ন্যূনতম চাহিদাটুকু মেটাতে পারত না। রাষ্ট্রের মাধ্যমে আয়ের হস্তান্তর অনিবার্যভাবে আমলাতান্ত্রিক হয়ে উঠেছিল। এই পরিস্থিতিতে আদিবাসী শ্রমিক শ্রেণির সংগ্রামে ট্রেড ইউনিয়ানের গুরুত্ব ছিল উল্লেখযোগ্য কারণ আদিবাসী কৃষক বিদ্রোহ সংগঠনে কৃষকদের যে সচেতনতা ছিল না তা নয়, বরং ট্রেড ইউনিয়ানের সহযোগিতায় আদিবাসী শ্রমিকরা নিজেদের অধিকার আদায়ের জন্য একটি নতুন দিশা খুঁজে পেয়েছিল। রাষ্ট্র ব্যবস্থার শোষণ কাঠামোর বিরুদ্ধে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য সামাজিক আন্দোলন করা যে প্রয়োজনীয় তা বিস্তর ভাবে প্রতিভাত হয়। পুঁজিবাদী রাষ্ট্রব্যবস্থার বিরুদ্ধে আদিবাসীদের বিরোধিতা করা যে দীর্ঘকালীন পদ্ধতি হয়ে উঠেছিল তা এই অধ্যায় আলোচনার মূল উদ্দেশ্য।

এই গবেষণায় প্রতিটি অধ্যায় বিশ্লেষণ করার মধ্য দিয়ে কিছু নতুন তথ্য উঠে এসেছে যা বর্তমান গবেষণা আদিবাসী শ্রমিকদের নিয়ে আলোচিত হলেও আদিবাসী সমাজ সম্পর্কিত প্রথাগত, ভ্রান্তিযুক্ত একপ্রকার ধারণা সাধারন মানুষের মনে তৈরি হয়েছে প্রথমত সেই ধারণাকে নির্মূল করার প্রয়োজনীতা রয়েছে। আদিবাসী, উপজাতি শব্দগুলি বারংবার ব্যবহার করার মধ্য দিয়ে তাদের জীবনধারাকে একে অন্যের থেকে ভিন্ন করে সীমারেখা টেনে দেওয়া হয়েছিল। এই গবেষণায় ক্ষেত্র সমীক্ষার কাজ করতে গিয়ে যে দিকগুলি সবচেয়ে অধিক বিস্ময়কর হয়ে উঠেছে তা হল আদিবাসী শ্রমিকদের জীবিকার পাশাপাশি পরিচয়হীন শ্রমিক শ্রেণি নামে সাধারণ মানুষের মনে ধারণা তৈরি হয়েছিল। ছোটনাগপুর মালভূমির বিভিন্ন প্রান্তে ভিন্ন ভিন্ন ধারণা তৈরি হয়ে আছে আদিবাসী সম্পর্কে। স্বাধীনতার এতগুলি বছর অতিক্রান্ত হবার পর আদিবাসীদের নিয়ে সাধারন মানুষদের 'অচ্ছ্যুত' মনোভাব প্রকাশিত হয়েছে। তাঁরা যে মূল সমাজের থেকে ভিন্ন হয়ে উঠেছিল তা বারংবার সাক্ষাৎকারের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়েছে। আদিবাসীদের উপর এই অবিচার যে শুধুমাত্র ছোটনাগপুর মালভূমিতে হয়ে চলেছিল তা নয় ভারতবর্ষের নানা প্রান্তে আদিবাসীদের উপর হয়ে চলা এই অত্যাচারের পরিমাণ যে তীব্রতর ছিল তার ইতিহাস নির্মম ভাবে লক্ষ করা গেছে। ঔপনিবেশিক প্রশাসকদের বিরুদ্ধে এই উপজাতি বিদ্রোহগুলিকে আইন- শৃঙ্খলার সমস্যা হিসাবে দেখা হয়েছিল, আদিবাসী

বিদ্রোহীদের উন্নয়ন প্রতিরোধকারী আদিম বর্বর হিসাবে চিত্রিত করা হয়েছিল। বারংবার তারা সমাজে আদিবাসী, উপজাতি, পিছিয়ে পড়া শ্রেণি, প্রান্তিক শ্রেণি বলে পরিচিত হয়েছে। এই পরিচিতি সমাজ থেকে রাজনীতি ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বিস্তর পার্থক্য তৈরি করে দিয়েছে। সরকারী সাহায্যের খাতায় 'পিছিয়ে পড়া জাতি' বলে পরিচিত হয়েছে সেই সামাজিক প্রচলিত ধারণাগুলিকে পরিবর্তন করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। খনিতে আদিবাসী মহিলাদের অংশগ্রহণ অধিক থাকার পর তাদেরকে নিয়ত 'কর্মঠ' আখ্যা দেওয়ার অভিপ্রায় সম্পর্কে সচেতন করবে কিন্তু উন্নয়নের পরিধি আদিবাসীদের ক্ষেত্রে অগ্রসর হতে দেওয়া হয়নি সেই সম্পর্কে সাধারণ মানুষের মনে ধারণাকে পরিস্ফুট করবে। ঔপনিবেশিক আমলে যেভাবে তাদের জীবনশৈলী ও অর্থনৈতিক অগ্রগতির মূলে কুঠারাঘাত করা হয়েছিল ঠিক সেইভাবেই একই পথে স্থানীয় পুঁজিপতিরা আদিবাসীদের নিচু ও অশিক্ষিত তকমা দিয়ে পুনরায় সমাজে প্রান্তিক গোষ্ঠী করে তুলেছিল। আদিবাসীদের সম্পর্কে উচ্চবর্ণের একটি প্রথাগত শ্রমপূর্ণ স্পষ্ট ধারণা তৈরি হয়েছিল তা অনেকটা পরিস্ফুট করার চেষ্টা করা হয়েছে এই গবেষণার মধ্য দিয়ে। উপজাতি সম্পর্কে অস্পষ্ট ধারণা নিয়ে গবেষণা করতে গিয়ে উপলব্দধি করা গেছে যে এই বিরোধিতা শুধুমাত্র উচ্চ বর্ণের উচ্চ মুনফা লাভের আশা ছিল না বরং উচ্চবর্ণের আধিপত্য ও ক্ষমতা প্রদর্শনের ফলাফল ছিল।

এ প্রসঙ্গে বলা যায় আদিবাসীদের ইতিহাস মানেই গল্পকথা ও মৌখিক ঐতিহ্য নয় বরং আদিবাসী শ্রমিক সম্পর্কিত ইতিহাস রচনায় শুধুমাত্র ঐতিহ্যের উপরে ভিত্তি করে যাচাই করা কঠিন। লোককাহিনী ও মৌখিক বক্তব্যের অন্তরালে সব সময় আদিবাসীদের ইতিহাসকে তৈরি করা যায় না। হাইমেন্ডরফের লেখায় তিনি উল্লেখ করেছেন যে, উপজাতির ইতিহাস তাদের উৎপত্তির পরিচয় দিয়েছিল। সমাজে তাদের স্বাতন্ত্র্যতার পরিচয় দিয়েছিল। তবুও তাদের ই সমাজে প্রান্তিক রুপে গণ্য হতে হয়েছিল। এক অর্থে মৌখিক ঐতিহ্যের পাশাপাশি বিজ্ঞানসম্মত ঐতিহাসিক গবেষণার পদ্ধতিতে আদিবাসীদের সাথে সামাজিক সম্পর্কগুলি বিশ্লেষিত হয়েছে। আদিবাসীদের উপর ঔপনিবেশিকদের ও স্থানীয় বাসিন্দাদের শোষণ কাহিনি ও প্রতিবাদ উল্লেখিত হয়েছে। সেই সম্পর্ক পরিবর্তিত হয়ে চলেছে খনি ক্ষেত্রের মত অর্থনৈতিক ক্ষেত্রগুলিতে যা গবেষণার মধ্য দিয়ে ক্রমাগত প্রকাশিত হয়ে উঠেছিল।

ক্ষেত্র সমীক্ষার ভিত্তিতে অধিকাংশ আদিবাসী শ্রমিকদের জীবিকা নিয়ে ক্ষোভ ও হতাশ হওয়ার আশঙ্কা লক্ষ্য করা যায়। তারা যে কাজের স্থানে অবহেলিত ও অপাংতেয় ছিল তা ও বহিঃপ্রকাশিত হয়। ঔপনিবেশিক শোষণের মত স্বাধীনতা পরবর্তী স্থানীয় পুঁজিপতিদের মধ্যে আদিবাসী শ্রমিক শোষণের প্রতিবিম্ব পরিলক্ষিত হয়েছে। তৎকালীন সময়ে আদিবাসীদের জোরপূর্বক খনির কাজের সাথে যুক্ত করা হয়েছিল কিন্তু পরবর্তীকালে যে চিত্র পরিলক্ষিত হয় তাতে কাজে যোগ দেওয়ার প্রতি জবরদস্তি ছিল না ঠিকই তবে আদিবাসীদের অন্য ক্ষেত্রে কাজ করার সুযোগ সীমিত হয়ে যাওয়ার পশ্চাতে অদক্ষতাকে একপ্রকার দায়ী হয়েছিল।

আদিবাসী সমাজ, সংস্কৃতি ও আন্দোলন নিয়ে এই গবেষণার পূর্বে বহু গবেষণা রচিত হয়েছে। পূর্বোক্ত গবেষণা পাঠ দ্বারা একটি সাধারন কথা বারংবার প্রমানিত হয়েছে যে, সামাজিক ভাবে আদিবাসী বা উপজাতিরা অন্যান্য গোষ্ঠীর তুলনায় কম অগ্রসর। সীমিত পরিসরে আবদ্ধ হয়ে থাকার ফলে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তাদের অংশগ্রহণের মাত্রা খুব কম। সাংস্কৃতিক ও শিক্ষা জগতে তাদের সংরক্ষণের অগ্রাধিকার নিয়ে যেভাবে প্রশ্ন উঠে এসেছিল তাতে এই পশ্চাৎপদতা থাকার কারণগুলি গবেষণার মধ্যে স্পষ্ট হয়ে উঠবে। এই গবেষণায় অর্থনৈতিক পরিবর্তনের সাথে সাথে আদিবাসীদের নিজস্ব সংস্কৃতি পরিবর্তিত হওয়ার প্রেক্ষাপট সাধারণ মানুষের মনে স্পষ্ট হবে। কর্মক্ষেত্র পরিবর্তনের সাথে সাথে তাদের নিজস্ব ভাষা, সংস্কৃতি পরিবর্তিত হয়ে বাংলা ও হিন্দি ভাষার ব্যবহার আদিবাসীদের স্বাতন্ত্র্যকে বিনষ্ট করেছিল। হিন্দি ভাষা তাদের ভাষাকে শুধু পরিবর্তিত করেনি বরং তাদের নিজস্ব সংস্কৃতির মধ্যে আশ্বাসকে শিক্ষাক্ষেত্রেও নষ্ট করে দিয়েছিল। আদিবাসীদের নিজস্ব সংস্কৃতি ও শিক্ষার মধ্যে হিন্দি, বাংলা ভাষা যেমন জনপ্রিয়তা পেয়েছিল ঠিক তেমনি খ্রিষ্টান ধর্মান্তকরনে বিশ্বাসী হয়ে উঠেছিল। এই তিন ভিন্ন ভিন্ন সংস্কৃতির মাঝে আদিবাসী ভাষা ও সংস্কৃতি বিলুপ্তির পথে অগ্রসর হয়েছিল। অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে 'আধিপত্য' শব্দটি তাদের নিজস্ব লিপির ব্যবহারকে হ্রাস করেছিল। এই প্রেক্ষিতে বলা যায় ঔপনিবেশিক শক্তি থেকে স্থানীয় পুঁজিপতিরা আদিবাসী শ্রমিকদের অর্থনৈতিক জীবনে শুধু নয় মন ও মানসিকতায় চিরতরে আদিবাসী জাতির নিজস্ব পরিচিতিকে বিলুপ্ত করে দিতে চেয়েছিল। তারা নিজেদের সেই সমাজ থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে পারেনি। তারা বহির্বিশ্বের সংস্কৃতিকে একপ্রকার বাধ্য হয়ে আপন করে ছিল। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে দুর্বল হওয়ার ফলে শিক্ষা ক্ষেত্রেও তাদের শিক্ষিত

হওয়ার পরিসংখ্যান কম লক্ষ করা গিয়েছিল। তাদের মধ্যে শিক্ষা পর্যাপ্ত পরিমানে না পৌছানোর ফলে শিশুকাল থেকেই তাদের মধ্যে শ্রমিক হওয়ার চাহিদাকে তৈরি হয়েছিল।

আদিবাসীদের জীবনযাপন পদ্ধতি, জীবিকার উৎস অনেকটা ছিল প্রকৃতি ভিত্তিক যা কোনো কৃত্রিমতা বর্জিত এবং সহজ। তারা প্রাকৃতিক জগতে শান্তিপ্রিয় মানুষ ছিল। তাদের জীবন প্রকৃতির নিয়মের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছিল। প্রাচীন সংস্কৃতি, পরিচয়, বিশুদ্ধতা এবং ধর্মের পাশাপাশি তাদের সাথে প্রাকৃতিক জগতের সম্পর্ককে ধ্বংস করেছিল। ছোটনাগপুর মালভূমির পুঁজিপতিরা শিল্প ও অর্থনৈতিক উন্নতিতে এক অসম প্রতিযোগিতায় যুক্ত হয়ে, অত্যাধিক লোভ আর দায়িত্বজ্ঞান হীনতা খনিজ অঞ্চলগুলিকে বিষাক্ত আবর্জনার স্তুপে পরিনত করেছিল। এই গবেষণার মাধ্যমে সেই পরিস্থিতির উপস্থাপনা এবং বিশ্লেষণের প্রচেষ্টা করা হয়েছে।

গ্রন্থপুঞ্জি ও সহায়ক তথ্যসমূহ

আকর তথ্য:

সরকারী নথি সমূহ:

- Ahmed. M (Ed), *District Census Handbook Kalahandi.* Vol-xii, 1951, Government of Orissa, 1952.
- Ambedkar. Dr. B, *Independent Labour Party: 19th July (1937) in Dalit History,* Bombay, Legislative Council, Retrieved 9 Nov 2018.
- *Annual report on the Administration of the Orissa maternity Benefit act.* Orissa, The State of Orissa for the year 1962. 1953.
- *A preliminary work on assessment of dust hazard in Indian mines.* Dhanbad, Central mining research station, Government of India, Nov 1961.
- *Accounts Respecting the Territorial Revenues and Disbursements,* Santal Paragana, India, 1830.
- *Annual Report of the Administration of the factories act,* Government of West Bengal, 1962.
- *Annual Report on The working of the Indian trade unions act, 1926 for the year 1965,* Labour employment & Housing department, Orissa, Government of Orissa.
- *Annual Report on the working of the Industrial employment act,* 1947 for the year of ending 1965, Cuttack, Government of Orissa. 1968.
- *Annual report on the working of the Trade Union act 1926,* Patna, Secretariat Press, 1954.
- *Annual Report on The working of the Indian trade unions act*. Labour employment & Housing department, Government of Orissa. 1960.
- *Annual Report and returns on the working of the Indian Trade Union Act*. 1926 in the State of Orissa for the period from 1st April 1965 to 31 December 1965, Labour, employment & Housing Department, 1965.
- *A study of Employment in coal- mining and manufacturing,* Raniganj, Industries in West Bengal, 1963-1965.
- Basu. R. N, *Government of West Bengal Labour Directorate Report on an enquiry into the living conditions of workers employed in the Factories at Ranigunj- Asansol,* Dhanbad, IAS Labour Commissioner, 1955, G.P.339.42 (5415) W52rds.

- *Bhagalpur District Gazetteers,* Government publication, The Bengal Secretariat book depot, Calcutta.
- *Census of India 1961,* Vol-iv, (Bihar) Superintendent of Census Operations.
- *Census of India 2011,* Primary Census Abstract, scheduled castes and scheduled tribes, office of the register general & Census commissioner, Government of India, 2013.
- Clow. A. G, *Indian Factory Legislation- a Historical Survey,* being Bulletin of Indian Industries and labour, no.37, Calcutta, 1926.
- *Coal mine Bonus scheme, 1948 and SISTER Schemes,* Ministry of Labour Employment and Rehabilitation, Delhi, publication Government of India, 1970.
- *Decision of the Labour Appellate Tribunal of India on Appeals Against the award of the all India Industrial Tribunal (colliery Disputes).* Ministry of Labour, Delhi, Government of India press, 1957.
- *Derived from the Monthly coal Bulletin (s).* Section iv, compiled by the Director General of Mines Safety in the Ministry of Labour, New Delhi, January- December 1955.
- *Directorate of small scale industries,* West Bengal, Government of west Bengal, 1956.
- Desai. Moraji R, *Speeches on Economic Development in India,* Delhi, Ministry of Finance Department of Economic Affairs Government of India, Nov- 1959.
- *Development needed of the Tribal People.* National council of educational research & training, 1971, G.P. 309.154 Sr38 d.
- Durga Das, Mazumdar. *West Bengal district Gazetters (Birbhum),* Calcutta, Published by The State editior Calcutta, Government of West Bengal, December 1975.
- *Economic Development in Different Regions in India,* New Delhi, Government of India Planning Commission, August, 1962.
- *Estimate Committee (1959-60) Eighty- Eight Report (second Lok Sabha),* Ministry of Labour and Employment Part-ii, New Delhi, Lok Sabha Secretariat, April 1960.
- *First Report of the Coal Dust Committee,* Simla, Government of India, 1924/23.

- *Final Report of Enquiry into the Condition of Agricultural Labourers in West Bengal,* 1946-47, Alipore, Government Printing West Bengal Government Press, 1953.
- *Government of West Bengal Labour Directorate Annual report on the working of the Indian trade Unions act,* Alipore, 1926 for the ending 31 st march 1954, West Bengal Governmental press, 1956.
- Government of West Bengal Department of Commerce and Labour, *The Bengal Maternity Benefit Rules 1940,* Alipore, West Bengal Press.
- Gurundy. Games, *Report of Inspections of Mines in India,* Bihar, west Bengal, Government of India, 1894, 1901, 1927.
- Hirtzel. A, *East India (Progress and Condition) Moral and Material Progress and Condition of India, MORAL AND MATERIAL PROGRESS AND CONDITION OF INDIA During the year 1921,* Delhi, Deputy under Secretary of State for India, 1946.
- Hunter. W. W, *A Statistical account of Bengal (Bhagalpur District and Santal Paraganas)* Vol-xiv, bihar, Government of India, 1877.
- Hunter. W. W, *The Imperial Gazetteer of India,* Vol-i, Delhi, Alpha Edition, 20 January 2020.
- *Inter Governmental Forum on mining, minerals, metals and sustainable development,* Canada, United state, 1950.
- *INTUC - Proceedings of the Inaugural Conference,* West Bengal, May, 1947.
- *Labour Matters / Unrest/ Santhal Activist in Birbhum,* Birbhum, west Bengal, 1946.
- *Legislature, Joint committee Report on the West Bengal mining settlement bill (1952), Calcutta,* Labour class Department, west Bengal, 1964.
- *List of other mines worked under the Indian Mines act, Nagpur,* Director Indian Bureau of Mines, 1923, 1960.
- *List of Mines other than coal mines worked under the Indian Mines act,* Delhi, 1901, in British India, 1915.
- List of non-coal mine in India worked under the mines act, 1952 , Calcutta, Government of Indian Press, 1956.
- Malley. L. s. s. O, *Bengal District Gazetteers Santal Paraganas,* New Delhi, Logos Press, 1984.

- Malley. L. S S. S. O*, Bengal District Gazetteers Santal Paraganas',* Vol-1, Calcutta, Bengal secretariat Book Depot, 1910.
- Malley, L.S.S. O, *Birbhum Gazetteers,* Calcutta, Bengal Secretariat Book Depot, 1933.
- *Ministry of Labour Report on the Activities of the Coal Mines labour Welfare Fund,* Delhi, Government of India, 1950-51.
- *Note on the working of the Indian trade unions act, 1926,* for the year 1937-38, New Delhi, Published by the manager of publications, Government of India Press, 1939.
- *Office of the Regional Labour Commissioner Sample Survey 1969.* Bhubaneswar, 1969.
- Prasad. S. D, *Census of India 1961,* Part ix, Vol-iv, Bihar, Director of Census Operations, 1967.
- *Proceedings of the committee 1956,* Volume-3, Delhi, Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry, 19 October 2014.
- Ray. B. *Census 1961 west Bengal Birbhum, Census of India 2011,* Published by The superintendent, Government printing, Calcutta, 1966.
- Representation of disadvantage Sections in West Bengal Panchayats, 1980, state Institute of Panchayats and Rural Development, Kolkata, Government of West Bengal, 2000.
- *Report on the British Empire killed 165 million Indians in 40 years: How colonialism inspired fascism.*
- *Report of the Survey and settlement operations,* Santal Paragana, (1898-1907), Calcutta, Bengal secretariat book depot, 1909.
- *Report of the List of mines other than coal mines worked under the Indians mines act, Bihar, Government of India,* 1923.
- *Report of Finance committee,* Delhi, *Government of India,* 1909.
- *Report of the Bihar Labour Enquiry Committee*, vol-1, Patna, Bihar, 1940.
- *Report of the Ground water pollution studies in India,* West Bengal, Government of India, May 1980.
- *Report on mine environment committee,* West Bengal, Government of India, 1935.
- Roychoudhuri. P. C, *Bihar District Gazetteers,* Patna, Bihar, Printed by the superintendent secretariat press, 1965.

- *Royal Commission report on Labour in India,* London, Majesty's Stationery office, June, 1931.
- *Report of the activities of Labour,* Vol-1, labour Department, Government of West Bengal, West Bengal Government, (January to April) 1948.
- *Report of the administration of criminal Justice*, Cuttack, Government of Orissa, 1948.
- *Report of the Bihar Labour Enquiry Committee,* vol-1, Patna, Bihar, 1940.
- *Report of the Bihar and Orissa Labour enquiry Committee,* 1961, Ministry of Labour and employment, 1963.
- *Report of the Central Wage Board for the Coal Mining Industry*, Vol-I, Ministry of Labour Employment and Rehabilitation. Government of India, 1956.
- *Report on the Coal mine Labour organization Magazin,* Simla, Government of India, 1928.
- *Report on the Department of Industries Bihar and Orissa state aid to Industry Rules,* Bihar, Government of India, 1928.
- *Report of Dust pollution from stone crushers*, Hariyana, Government of India, 1899.
- *Representation of disadvantage Sctions in West Bengal Panchayats, 1980, state Institute of Panchayats and Rural De-velopment,* Kolkata, Government of West Bengal, 2000.
- *Report of an enquiry into the living conditions of the workers employed in the Factory of stone industry*, Birbhum, Government of West Bengal, 1955.
- *Report of the Feudatory states of Bihar and Orissa (ruling chiefs and Leading Personages),* Calcutta, Government of India, Central Publication Branch, 1929.
- *Report of the Indian Factory Labour Commission*, Vol- 2, Delhi, British Government of India, 1909.
- *Report on Intensive type studies on Rural Labour in India,* Bankura, Government of India Ministry of Labour, 1968-1969.
- *Report of the Indian Factory Labour Commission,* vol. 2, London, British India Government, 1909.
- *Report on the List of non-coal mine in India worked under the mines act,* Delhi, Manager of Publication, 1952.

- *Report of the Labour enquiry commission Bengal,* Labour Enquary commision Bengal 1930-40, West Bengal Labour Department.
- *Report of Indian Mining Federation,* Calcutta, Government of West Bengal, 1960, 1969.
- Report of the minimum wages Committee for the stone breaking or stone crushing, Government of west Bengal, 1964.
- *Report of the (stone breaking or stone crushing committee appointed under Minimum Wages act, 1948),* Bombay, Governmental Central Press. 1951.
- *Report of the Tribal and Rural welfare work in Orissa in 1964,* Orissa, Tribal and Rural welfare department, 1970.
- *Report of unemployment and employment in West Bengal,* Kolkata, Government of west Bengal, 1972.
- *Report of the West Bengal Trade Union regulation 1957,* Alipore, Kolkata, 1960.
- Sen. S. K, *Copy of the speech delivered Joint Chief Controller, Imports & Exports, Calcutta & Chairman, Mica export promotion council at the meeting of mica Exporters & Mine Owners convened by the Fedaration of Mica Associations,* Bihar, Mica miners & Dealers Association and the mica Mica mining Association, Kodarma, Dist- Hazaribagh, Bihar, 23 Sept. 1960.
- *Showing the no of Employs and Deaths at coal, gold, mica and other mining,* Bihar, government of India, 1950.
- Sinha. S. P, *Paper relating to the Santal Hul, West Bengal district Gazetters (Birbhum),* Bihar tribal welfare research institute, Ranchi, Varma union press Ranchi, 1855-56.
- Singh. Dr B, *Environment pollution in mines and mining area,* Dhanbad, Government of India, 1986.
- *Small scale Industries Organization report for 1957-58/ 1958-59/ 1960-61,* New Delhi, Development commissioner Ministry of commerce and industry, Government of India, 1962.
- *Study of Sidero- silicosis problem in an Iron Ore mine,* Dhanbad, Central mining research station (council of scientific and Industrial research), July 1972.
- *Subsidized Housing Scheme for Industrial Worker Employers Projects,* Alipore, Government of West Bengal Housing Department, West Bengal Government press, 1960.

- *The Bihar and Orissa Waste Lands Manual (1918)*, Bihar, Published under the authority of the Board of Revenue Bihar and Orissa, 1918.
- *The Mica Mines Labour Welfare Fund act,* 1946, Bihar, Government of Bihar, 22 of 1946.
- *The west Bengal mining settlements (Health and Welfare bill, 1962-1964),* The report of joint committee, West Bengal, Government of Bengal, 1962.
- *The west Bengal mining settlements (Health and Welfare bill, 1964),* The report of joint committee, West Bengal, Government of Bengal, 30th July 1964.
- *Trade Unions in India 1954-55 and 1955-56,* West Bengal, Ministry of Labour and Employment Government of India, Publication by Government of India, 1958.
- *Tribal affairs conference, (Paper received connection with and speeches delivered at Tribal affairs conference in New Delhi 4th and 6th December),* New Delhi, Government of India, 1964.
- *Tribal and rural welfare work in Orissa,* (1950-51), Cuttack, Government of Orissa, 1952.
- *Unemployment among Women in West Bengal,* Government of west Bengal Labour Department, Calcutta, Directorate of National employment Service West Bengal, Nov 1928.
- *Unemployment among Women in West Bengal,* Alipore, Government of West Bengal, Government Printing West Bengal Government Press, Nov 1958.
- *West Bengal Labour Gazette,* Government of West Bengal, Department of Labour, July 1962,
- *West Bengal Labour Gazette, (1957),* Calcutta, Department of Labour, 1958.
- *West Bengal Labour Gazette,* Vol-1, no-3, Government of West Bengal, Department of Labour, June 1957.
- *West Bengal Labour Gazette,* Calcutta, Department of Labour, June 1867.

সহায়ক তথ্যসমূহ:

বাংলা গ্রন্থ:

- গুপ্ত. চন্দ্র সত্যেশ, *বীরভুমের খনিজ সম্পদ,* বীরভূম, টেকনিক্যাল আই বি এম প্রকাশিত, ১৮৮২।
- গুপ্ত. স্বাধীন, *সশস্ত্র আন্দোলনের ধারায় বীরভূম ষড়যন্ত্র মামলা (১৯৩৪) ও সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারা,* বীরভূম,
- গুপ্ত. রঞ্জন, *রাঢ়ের সমাজ ও অর্থনীতি ও গনবিদ্রোহ বীরভূম (১৭৪০-১৮৭১),* কলকাতা, সুবর্ণরেখা পাবলিকেশন, ২০০১।
- গুহ. রণজিৎ, *চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সূত্রপাত,* কলকাতা, তালপাতা প্রকাশনী, ২০১০।
- ঘোষ. বিনয়, *বাংলার নবজাগৃতি,* কলকাতা, ওরিয়েন্ট ব্ল্যাক সোয়ান প্রাইভেট লিমিটেড, প্রথম সংস্করণ ১৯৭৯।
- চক্রবর্তী. তাপস, *হুল এক সশস্ত্র প্রতিবাদ,* সাঁওতাল বিদ্রোহ সংখ্যা, কলকাতা, তথ্য সংস্কৃতি বিভাগ, ১৪০২ কলকাতা।
- চক্রবর্তী. নিস্তারন, *পশ্চিমবঙ্গের বেকারদের কর্ম সংস্থান,* কলকাতা, ১৯৫৬।
- চৌধুরী. বিনয় ভূষণ, রজতকান্ত রায়, রত্নলেখা, চিত্তব্রত পালিত, *বাংলার কৃষি সমাজের গড়ন,* ভল-২, কলকাতা, কে পি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানি ১৯৯৪।
- চৌধুরী, অরুন. *বীরভূম জেলার কমিউনিস্ট আন্দোলনের গঠন ও ব্যাক্তিত্ব,* কলকাতা, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি, ২০১৫।
- চন্দ্র. বিপান, *ভারতে অর্থনৈতিক জাতীয়তাবাদের উদ্ভব ও বিকাশ,* কলকাতা, কে পি বাগচি অ্যান্ড কোম্পানি, ১৯৯৮।
- ঠাকুর. সৌমেন্দ্রনাথ, *ভারতের শিল্পবিপ্লব রামমোহন ও দ্বারকানাথ,* কলকাতা, বৈতনিক, প্রথম সংস্করণ ১৯৬৪।
- দে. দেবশ্রী, *পূর্ব ভারতের আদিবাসী বৃত্তান্ত (১৯৪৭-২০১০),* কলকাতা, সেতু পাব্লিকশন, প্রথম সংস্করণ ২০১২।
- দে. পার্থ প্রতিম, *সিউড়ির ইতিবৃত্ত,* বীরভূম, গল্পসরণি প্রকাশন, এপ্রিল ২০১৫।
- দাস. অমল কুমার (সম্পা), *আদিবাসী সংগ্রামী মন ও সংগ্রামের দর্শন,* পশ্চিমবঙ্গ আদিবাসী আন্দোলন, কলকাতা, ১৯৭৭।

- দাসগুপ্ত. কল্যানি, *তেভাগার জেলায় মেয়েরা,* পশ্চিমবঙ্গ তেভাগা সংখ্যা ১৪০৪ বঙ্গাব্দ, বর্ষ ৩০।
- দাসগুপ্ত. সুধাংশু, *কমিউনিস্ট আন্দোলনের ইতিহাসের পাতা থেকে,* কলকাতা, এনবিএ প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ২০১৫।
- থাপার. রোমিলা, এ জি নুরানি, সদানন্দ মেনন, *প্রসঙ্গ জাতীয়তাবাদ,* কলকাতা, সেতু প্রকাশনী, প্রথম সংস্করণ ২০১৯।
- বাগদী. শ্যামচাঁদ, *রাম্পুরহাটের ইতিহাস,* বীরভূম, কাঞ্চীদেশ প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ ২০১৩।
- বন্দোপ্যাধ্যায়. অমৃতাভ, *পাশ্চাত্য রাস্টচিন্তার ইতিহাস,* কলকাতা, সুহৃদ পাবলিকেশন, প্রথম প্রকাশ ১৯৯৬।
- বন্দ্যোপাধ্যায়. অমর, *রাঙ্গামাটি ঝারখন্ড,* কলকাতা, নবজাতক প্রকাশন, প্রথম প্রকাশ ২০০০।
- বন্দ্যোপাধ্যায়, কল্যাণী, *নারী শ্রেনী ও বর্ণ (নিম্নবর্গের নারীদের আর্থসামাজিক অবস্থান)* কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, জানুয়ারী ২০০০।
- বন্দ্যোপাধ্যায়. কল্যাণী, *রাজনীতি ও নারীশক্তি ক্ষমতায়নের নব দিগন্ত,* কলকাতা, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, জুন ২০০৯।
- বর্মণ. সন্তোষ, *ধর্মের বলি দলিত সমাজ ও শ্রেনী প্রসঙ্গ,* কলকাতা, ম্যাট্রিক্স প্রাকাশনা জানুয়ারি ২০১৫।
- বসু রায়. সুনীল, *রানিগঞ্জের কয়লা শ্রমিক,* পশ্চিমবঙ্গ, বর্ধমান জেলা সংখ্যা, তথ্য সংস্কৃতি বিভাগ, ১৪০৩।
- বাস্কে. ধীরেন্দ্রনাথ, *সাঁওতাল গণসংগ্রামের ইতিহাস,* কলকাতা, পাল পাবলিশার্স, ফেব্রুয়ারি ১৯৬০।
- বড়ুয়া লাহিড়ী. সুপর্ণা, *বিহার নারী সমাজ সংগ্রাম,* র‍্যাডিক্যাল কলকাতা, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি, ২০০৮।
- ভট্টাচার্য, জ্যোতি, *শ্রমিকদের দর্শন,* কলকাতা, ন্যাশানাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, সেপ্টেম্বর ২০১৫।

- ভদ্র. গৌতম, *ইমান ও নিশান (বাংলার কৃষক চৈতন্যের এক অধ্যায় ১৮০০-১৮৫০),* কলকাতা, সুবর্ণরেখা পাবলিকেশন, ১৯৯৪।
- মুখোপাধ্যায়. অনিমা, *আঠেরো শতকের বাংলা পুঁথিতে ইতিহাস প্রসঙ্গ,* কলকাতা, সাহিত্যলোক পাবলিকেশন, প্রথম প্রকাশ ১৯৮৭ আগস্ট।
- মার্কস. কার্ল, *মজুরি দাম মুনফা মজুরি ও পুঁজি,* কলকাতা, ন্যাশানাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, প্রথম সংস্করণ- ১৯৫৪।
- কার্ল. মার্কস, *পুঁজি,* প্রথম খন্ড, কলকাতা, প্রগতি প্রকাশন।
- মিত্র. গৌরিহর (সম্পা.), মহিমানিরঞ্জন চক্রবর্তী, *বীরভূমের ইতিহাস,* কলকাতা, দেজ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০১৪।
- মিশ্র, গৌরহরি, *বীরভূমের ইতিহাস,* ২য় খণ্ড, সিউড়ি, রতন লাইব্রেরী, ১৯৩৬।
- রাণা. সন্তোষ, কুমার রাণা, *পশ্চিমবঙ্গে দলিত ও আদিবাসী,* কলকাতা, গাংচিল পাবলিকেশন, ২০১৮।
- রহমান. আশহাবুর, *বাংলাদেশের কৃষি কাঠামো কৃষক সমাজ ও উন্নয়ন,* ঢাকা, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, প্রথম প্রকাশ, জুলাই ১৯৮৬।
- রহমান. নীরা, *ঔপনিবেশিক পূর্ব ভারতে হিন্দু আদিবাসী সাংস্কৃতিক সম্পর্ক,* চতুরঙ্গ, বর্ষ ৫৫ সংখ্যা, কলকাতা, ৩ মাঘ ১৪০১।
- রায়, গুহ সিদ্ধার্থ, চট্টোপাধ্যায়, সুরঞ্জন. *আধুনিক ভারতের ইতিহাস,* কলকাতা, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯৬।
- রায়. তারাপদ, *সাঁওতাল বিদ্রোহের রোজনামচা,* কলকাতা, দেজ পাবলিশিং, চতুর্থ সংস্করণ জানুয়ারি ২০১৭ মাঘ ১৪২৩।
- রায়. হীরেন্দ্র নাথ, *ধনতন্ত্র বিশ্লেষণ,* কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা অ্যাকাডেমি, ২০ই মে ২০০০।
- লিয়নটিয়েভ. এ, *মারক্সীয় অর্থনীতি,* কলকাতা, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি, দ্বিতীয় পরিমার্জিত মুদ্রন, ১৯৭৯।
- চক্রবর্তী. মহিমানিরঞ্জন (সম্পা.), কমল চৌধুরী. শিব্রতন মিত্র, গৌরিহর মিত্র, *বীরভূমের ইতিহাস,* কলকাতা, দেজ পাবলিশিং, জানুয়ারি ২০১৪।

- বিশ্বাস. অনিল(সম্পা), *বাংলার কমিউনিস্ট আন্দোলনের দলিল ও প্রাসঙ্গিক তথ্য,* দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড, কলকাতা, ন্যাশানাল বুক এজেন্সি, ২০০৪।
- বসু. তপন কুমার(সম্পা), *বীরভূমের মুখ, (বীরভূমের ইতিহাস সংক্রান্ত একটি প্রবন্ধ সংকলন),* কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ২১ সে আগস্ট ২০১৬।
- সরকার. চিত্তরঞ্জন, *আদিবাসী সাঁওতাল সমাজে নারীদের অবস্থান,* কলকাতা, নারী ও প্রগতি।
- সিং. হরিকিশেন, পারুলেকর, গোদাবরী. অচ্যুতানন্দন, ভি এস. মিশ্র, বীরেশ. ভট্টাচার্য, অচিন্ত্য. *কৃষক আন্দোলনের সংগ্রামী অধ্যায়,* কলকাতা, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, প্রথম প্রকাশ ১৯৮৬।
- হান্টার. ডবলু ডবলু, *গ্রাম বাংলার ইতিকথা,* কলকাতা, সুবর্ণরেখা পাবলিকশন, প্রথম প্রকাশ ১৯৮৪।
- বন্দ্যোপাধ্যায়. সৌভিক(অনু), ইরফান হাবিব, *মধ্যযুগের ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাস,* কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, জানুয়ারি ২০০৪।
- বাগ. নিহাররঞ্জন(অনু), রডলি হিল্টন, *সামন্ততন্ত্র থেকে পুঁজিবাদে উত্তোরন,* কলকাতা, সেতু পাবলিকশন, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০১২।

ইংরেজি গ্রন্থ:

- Bagchi. Amiya, *The Evolution of International Business 1800-1945 Private investment 1900-1939,* vol-5, Roultledge, Taylor an Francis, first published 1972,
- Bagchi. Amiya Kumar, *Private Investment in India 1900-1939,* Vol-5, South Asian Studies, Cambridge University press, 3rd December, 2007.
- Bagchi. Amiya Kumar, *Colonialism and Indian Economy,* New Delhi Oxford University Press, First published 2010.
- Bardhan. B. A, *The unsolved Tribal Problem,* New Delhi, Communist Party of India, 1973.
- Barman. Rup Kumar, *Caste, Politics, Casteism and Dalit Discourse: The Scheduled Castes of West Bengal.* Kolkata, Abhijeet Publications, India: 2020.
- Banerjee. Saheli, *Labour in Mining Industry in Eastern India, unpublished research, 2017,* Kolkata, Rabindra Bharati University.

- Banerjee. Sukumar, *Impact of Industrialization on the Tribal population of Jhariya- Raniganj coal Field Areas,* Calcuuta, Anthropological survey of India, First Published in 1981, March.
- Bartra. Roger, Trends in ethnic Group Relations in Asia and Oceania, Unesco, United Nations Educational, 1979.
- Basu. D. B*, The Ruin of Indian Trade and Industries,* 3rd edition Calcutta, The Asiatic society Calcutta, 1935.
- Basu. P. R. Saha, *Social area analysis of urban slum dwellers a case study of Rampurhat town,* Birbhum district, IASSI QUART 26.
- Basu. Sunil Kumar, *Indebtedness among the Tribals of West Bengal,* special series No.16, Scheduled castes and Tribes welfare Department, West Bengal, Government of west Bengal, 1974.
- Basu. Piyali, Sukanta Das*, Population Growth, Socio Economy and quality of life in Birbhum district,* West Bengal, India, Septembar 25, 2011.
- Bates. Crispin, *Race, Caste and Tribe in Central India: The early origins of Indian Anthropometry,* Edinburgh, Centre for South Asian Studies, School of Social & Political Studies, 1994.
- Bates. Crispin, Marina Carter, *Tribal and Indentured Migrants in Colonial India: Modes of recruitment and forms of incorporation,* Edinburgh, Oxford University Press, January 1993.
- Baviskar. Amrita, *In the Belly of the River: Tribal Conflicts over development in the Narmada Valley,* 2nd edition, Delhi, Oxford University Press, 2nd edition, 1st December, 2004.
- Baviskar. Amita, *Who speaks for the victims of Development, The problem of Authenticity and representation,* Delhi, 1997.
- Bhattacharya. Satyabrata, *Saumendranath Tagore and the present movements of Birbhum.* Birbhum, Viswa Bharati, May 2016.
- Bhutani. H. D*, The economic story of Modern India, Delhi, Publication Division Ministry of Information and Broadcasting* Government of India, February 1973.
- Breman. Jan, *Outcast Labour in Asia,* Delhi, Oxford University Press, First Edition 2010.
- Breman. Jan, *Peasants, migrants and paupers: Rural labour circulation and capitalist production in west India,* Delhi, Oxford University Press, 1985.

- Buchanan. H. D, *The Development of Capitalist Enterprise in India,* New York, The Macmillan Company, 1934.
- Byomkesh. *The story of the Kishan agrarian Labour in Bengal (1885-1952), Calcutta,* 1st Published Nov 2003.
- Carter. Bates, Marina, *Tribal and Indentured Migrants in Colonial India: Modes of recruitment and forms of incorporation,* NewYork, University of Edinburgh, January 1993.
- Chakrabarty. Dipesh, *Rethinking Working- class History: Bengal 1880-1940,* Calcutta, Oxford University, 1989.
- Chattopadhyaya. Haraprasad, *Internal Migration in India (A case study of Bengal),* Calcutta, K.P. Bagchi & company, First Published- 1987.
- Chatterjee. Partha, *Nationalist Thought and the colonial world: A Derivative discourse.* London, Zed books, 1986.
- Chaudhuri. Binay Bhushan (Ed.), *Economic History of India from Eighteenth to Twentieth Century (Vol. VIII, Part- 3),* New Delhi, Centre for studies in Civilizations, 2005.
- Clow. A G, *Indian Factory Legislation- a Historical Survey,* No.37, Calcutta, *being Bulletin of Indian Industries and labour,* 1926.
- Cornduff. H.W.C, *The Chotonagpur Landlord and Tenant Procedure act with notes,* Calcutta, Bengal Secretariat press, 1905.
- Coyajee. J. C, *Current Economic Problems of India,* Calcutta, Bengal Government press, 1933.
- Dagmar F. Curjel, *Womens Labour in Bengal Industries,* Calcutta, Published by order of the Government of India, 1923.
- Damodaran. Vinita, *Colonial constructions of tribe in India: the case of Chotonagpur,* England, University of Sussex, 2006.
- Das. A, B Adhikary, *Black stone Quarrying- A Resource process to be examined,* West Bengal, Viswa Bharati press, 2001.
- Das. Bela, *Economic and ecological implication of Pakur Basalt Quarries,* Unpublished Reasearch paper Department of Geography, University of Burdwan,1993.
- Das. Gupta Ranajit, *Labour and Working class in Eastern India,* New Delhi, K.P. Bagchi & Company, 1994.
- Dasgupta. Chirashree, *State and capital in Independent India: From dirigisme, To Neoliberalism,* School of Oriental and African studies, University of London, 2017.

- De. Debasree, *Gandhi and Adivasis, tribal movement in Eastern India (1914-1948),* London, Routledge Publication, 1st edition 2022.
- Dhagamwar. Vasudha, *Role and Image of law in India: The Tribal Experience,* Calcutta, Sage Publishing India, 2006.
- Durkheim. Emile, *The Division of Labour in Society,* London, Routledge Publication, 1897.
- Dutta. Chandra Romesh, *The Economic History of India,* First Edition Delhi, Division Publication, First Edition October 1960.
- Dutta. R P, *The Agrarian crisis in India before Independence: Towards its solution,* Delhi, Gambol book's publication, 2009.
- Dutta. Kuntala Lahiri (Ed), *The Coal Nation History, Ecologies and politics of coal in India,* Australian National University, Ashgate Publishing house, 2014.
- Ghandhi. Rajmohan, *India after 1947: Reflections & Recollections,* Aleph Book Company, India, 2022.
- Ghosh. Suniti Kumar, *The Indian Big Bourgeoisie,* Calcutta, Subarnarekha Publication, 1985.
- Gedam. Yeshart, *Tribal women in Dynamics*, Calcutta, Dattsons publishers, 1st September 2014.
- Guha. Ranajit, *Elementary Aspects of Peasant Insurgency in colonial India*, Delhi, Oxford University Press, August 1999.
- Guha. Ramchandra, India after Gandhi: The History of the World's Largest Democracy, New Delhi, Picador India, 19th July 2017.
- Gupta Das Kumar. Pranab, *Impact of Industrialization on a tribe in South Bihar*, Calcutta, Anthropological Survey of India, 1978.
- Hans. Asha, *Tribal Women, a 'Gendered Utopia?' Women in the Agriculture Sector,* Delhi, South Asian Publishers, 4 June 2000.
- Heredia. C. Rudolf, *Taking sides Reservation Quotas and Minority Rights in India,* Delhi, Penguin books limited, 15 October, 2012.
- Highland. Chris, *Ancoutahan: John Muir among natives peoples,* Published by Sierra Club, 2014.
- Hilson. Gravin M(Ed), *The Socio economic Impacts of artisanal and small- scale Mining in Developing countries,* Netherlands, A. A. Balkema Publishers, 2005.
- Hunter. W. W, *A statistical account of Bengal,* Vol- 17, London, Trubner & co, 1877.

- Hunter. W. W, *The Annals of Rural Bengal,* Delhi, Gyan Publishing House, 1st January 2019.
- Hunter, W.W, *The Indian Empire: Its History, People and Products.* London, Trubner and co., 1882.
- Jha. Shankar Jata, *Early Revolutionary Movement in Bihar*, K.P. Jayaswal Research Institute Patna, September 1977.
- Joshi. Chitra, *Lost Worlds: Indian Labour and its Forgotten Histories,* Delhi, Permanent Black, January 2003.
- Maithreyi, Krishnaraj, Kanchi, Aruna. *Women Farmers of India,* New Delhi, National book Trust, India: 1st January 2011.
- Kaji. Rahim, Debasish Sarkar, *Tribal Movements in India,Agriculture Technology, Products and Market of Birbhum,* Information and Cultural department, Birbhum, Government of West Bengal, 1996.
- Kamal. K. Misra (Ed), G. Jaya Prakasan. *Tribal Movements in India,* Delhi, Manohar Publication, First Published 1983.
- King. B. Blair, *Partner in Empire,* Calcutta, Firma KLM Private Limited, 1981.
- Kochuchira. John, *Political History of Santal Paragana: From 1765-1872,* New Delhi, Inter- India, 2000.
- Kothari. Rajni, *Caste in Indian Politics*, Delhi, Orient Longman Limited, Published June 1970.
- Kripalani. Krishna, *Dwakanath Tagore A forgotten Pioneer: A life,* New Delhi, National Book trust India, 1902.
- Mazumdar. Datta Nabendu, *The Santal a study in cultural change,* Calcutta, Department of Anthropology Government of India, Published by government of Indian press, 1956.
- Naoroji. Dadabhai, *Poverty and Un- British Rule in India*, Publication Division, Delhi, Ministry of Information and Broadcasting Government of India, First Published in 1901.
- Nite. Kumar Dhiraj, *Faminist Movement and social Mobility: The Indian Colliers (Jharia) 1895-1970,* Indian Historical Review 41, New Delhi, Sage Publication.
- Orkney. M. Jean, *Legislation and the Indigenous Dai*, Jamwi, Routledge Publication, 31, 1943.
- Patterson. Orlando, *Freedom in the making of Western Culture,* United States of America, 1992.

- Pati. Biswamoy (Ed), *Adivasis in Colonial India Survival, Resistance and Negotiation,* Indian Council of Historical Research, Delhi, Orient Blackswan, 2011.
- Pillai. P. P, *Economic Condition of India*, London, Routledge publication, 1925.
- Prakash. Gyan, *Bonded Histories: Genealogies of Labour Servitude in Colonial India,* Cambridge, Cambridge University Press, 1990.
- Rajsekhar. S. N. V, *Land Transfer and alienation in Tribal economy*, Unpublished Thesis, University of Hydrabad, 1994.
- Rana. P (Ed), Behal and Marcel Van Der Linden, *Indias Labouring Poor Historical studies c. 1600-c. 2000,* Chembridge, Chembridge University Press, 2007.
- Read. Margaret, *The Indian Peasant Uprooted: a study of the Human Machine.* London, Longmans green, 1931.
- Risley. Herbert Hope, *The Tribes and Castes of Bengal: Ethnographic Glossary (151-1911),* vol-2, Calcutta, Bengal Secretariat Press, 1892.
- Roll. Eric, *A History of Economic thought,* revised edition, London, Faber and Faber L. t. D, 1947.
- Rosenberg. David, *African mine labour in southern Rhodesia (1900-1933),* London, Pluto press, 1976.
- Roychouwdhury. Rakhi, *Gender and Labour in India (The Kamins of Eastern Coalmines 1900-1940),* Calcutta, Minerva Associates Publications PVT. LTD, First Published 1996.
- Roy. S. N, *Migrant women workers, Bihar tribal welfare research institute, Ranchi,* Varmes Union Press.
- Sen. Samita, *Women and Labour In Late colonial India,* Cambridge, Cambridge University Press, First Published 1999.
- Sen. Sukomal, *Working class of India: History of Emergence and movement, 1830-1970,* Columbia, South Asia books, 1977.
- Sen. Sunil Kumar, *Working class movement in India 1885-1975,* Delhi, Oxford University Press, 1994.
- Sen. Suchibrata, *The Santals crisis of Identity and Integration,* Calcutta, Ratna Prakashan, First Publication 1997.
- Singh. Lal Hira, *Problems and Policies of the British in India,* 1885-98, Bombey, Hassell Street Press, 1963.

- Sinha. N. K, *Economic History of Bengal, 1793-1848,* V.2. Calcutta, Cambridge University Press, 1970.
- Smith. Adam, *Women in Mining: can a mining law unlock potential of women.* IWIM, May 2017.
- Sullivan. Dylan, Jason Hickle, *Capitalism and extreme Poverty: a global analysis of real wages, Human height, and mortality since the long 16th century,* Australia, Macquarie University, 6th July 2022.
- Talib. Mohammad, *Writing labour Stone quarry workers in Delhi,* Delhi, Oxford University Press, 2010.
- Weiner. Myron, *Sons of the soil (Migration and Ethnic conflict in India),* Princeton, Princeton University Press, 1978.
- Weldegiorgis. Fitsum, Lynda Lawson, Hannelore Verbrugge, *Women in Artisanal and Small-Scale Mining: Challenges and opportunities for greater participation, Delhi,* Published by the International Institute for Sustainable Development, Minerals and Sustainable Development (IGF), April 2018.

ইংরেজি জার্নাল

- Athar. Shakeeb, *Condition of women coal mine workers in Bihar till 1947,* vol. 73, Delhi, *Proceeding of the Indian History Congress,* 2012.
- Banerjee. Prathama. *'Writing the Adibasi: some Historiographical notes, 53, 1,* Delhi, *The Indian Economic and social History Review,* Delhi, 2016.
- Dutta. Lahiri Kuntala, *Roles and status of women in Extractive Industries in India: Making a place for a gender sensitive mining development,* Vol. 37, No-4, Delhi, December 2007.
- Hartmann. Heidi, *Capitalism, Patriarchy and job segregation by sex, Women and the workplace: The implications of Occupational Segregation,* Vol.1, No-3, 1976.
- Jha. Jagadish Chandra, The Bhumij Revolt, Delhi, The Journal of Asian studies, 1967.
- Joshi. Chitra, *Histories of Indian Labour: Predicaments and Possibilities,* Vol 6, Issue 2, History Compass, 2008.
- Mondal. Priyabrata, Suvankar Paul, Abhijit Das, Impacts of Stone crushing work on the Tribal Labourers of Birbhum District, West Bengal-

A Socio- cultural Anthropological study, Vol- 27, Issue-2, series 5, Delhi, Journal of Humanities and Social Science, february-2022.

- Nite, Kumar Dhiraj. Women mine workers and family- oriented Labour: Indian collieries (Jharia), 1895-1948, Delhi, *Journal of Archive India Institute,* January 2015, vol-2.
- Pal. Swades, Indrajit Mandal, *Impacts of stone mining and crushing on stream characters and vegetation health of Dwarka river basin of Jharkhand and West Bengal,* 10 (1-2), 11-21 Eastern India, *Journal of Environmental Geography*.
- Sarkar. Suvobrata, *Bengali Entrepreneurs and western Technology in the Nineteenth Century: a social perspective,* 48.3, Delhi, *Indian journal of History of Science,* 2013.
- Sekh. Nurmahammad, Samina Nasrin, *An Observation on Birbhum Adibasi Gaonta Movement and its failure in protecting the Santal Womens Honour*, Vol-7, Issue 5, Delhi, IRJMST, 2006.
- Simeon. Dilip, *Work and resistance in the Jharia coalfield,* Vol 33, Issue 1-2, Delhi, *Contribution to Indian Sociology,* 1999.
- Simeon. Dilip, Coal and Colonialism: Production Relations in an Indian coalfield, International Review of Social History 41 Cambridge University Press.
- Sreenivas. Mytheli, *Conjugality and Capital: Gender, Families, and Property under colonial Law in India.* 63, no-4, Cambridge, The journal of Asian studies 63, no-4, November 2004.
- Tucker. D. M. Morgan, *Effects of silica exposure among workers. Applied occupational and environmental hygiene* 10(12), Delhi, DOI 10.1080/1047322X. 1995.10389099.

ইংরেজি পত্র-পত্রিকা:

- *Bengal Magazine (*Monthly), Calcutta, 1880-1930.
- *Calcutta Review,* (Monthly), Pakur, 1856.
- *Economic and Political Weekly,* (Monthly), *India,* 1945-1965.
- *Friends of India,* (weekly), Serampore Press, Calcutta, 1859- 1875.
- *Hindoo Patriot,* (weekly), Calcutta, 1850-1856.
- *The Bihar Herald,* (Monthly), Bihar, 1839-1899.
- *Times of India,* (Daily), kolkata, India, 1900- 1923.

বাংলা পত্র-পত্রিকা:

- *অমৃত বাজার পত্রিকা,* (প্রাত্যহিক), পশ্চিমবঙ্গ, ১৯৩০-১৯৫০।
- *পরিচয়,* পত্রিকা, কলকাতা, ১৪০৬।
- *কালান্তর,* পত্রিকা, (মাসিক পত্রিকা) বিশেষ সংখ্যা, পশ্চিমবঙ্গ, ২৮ জুন, ১৯৫৪।
- *দৈনিক সমাচার চন্দ্রিকা, (দৈনিক), কলকাতা, ১৮৯১, ১৬ই আশ্বিন।*
- *দুর্নীতির রাজনৈতিক অর্থনৈতিক পত্রিকা,* (মাসিক পত্রিকা), পশ্চিমবঙ্গ, এনবিএ প্রাইভেট লিমিটেড, ২০১২।
- *পশ্চিমবঙ্গ,* (মাসিক পত্রিকা), পশ্চিমবঙ্গ, তথ্য সংস্কৃতি বিভাগ, ১৯৬৩- ১৯৬৫।
- *প্রস্তাব ও সংগঠন পত্রিকা,* (মাসিক), কলকাতা, সিপিআইএম প্রকাশনা, ১৯৭৬।
- *বাংলার কথা,* (দৈনিক পত্রিকা), পশ্চিমবঙ্গ, ১৭ই অগ্রহায়ন, ১৩৩৫, (৩রা ডিসেম্বর, ১৯২৮)।
- *বীরভূম বার্তা,* (সাপ্তাহিক পত্রিকা), বীরভূম, ১৯৩০-১৯৬০।
- *মজদুর,* (মাসিক পত্রিকা), সিআইটিইউ পাবলিকেশন, পশ্চিমবঙ্গ, ১৯৫৮-১৯৬০।
- *পার্টি চিঠি,* পশ্চিমবঙ্গ, ১৯৮৪ কৃষক ফ্রন্ট।
- *যোজনা,* (মাসিক পত্রিকা), কলকাতা, এপ্রিল ২০১২-২০১৭।
- *লোকজনবাদ,* (মাসিক পত্রিকা), বিহার, ১৯৪০- ১৯৪৮।
- *শ্রমজীবী ভাষা,* (মাসিক পত্রিকা), পশ্চিমবঙ্গ, ১৯১৫- ১৯১৭।
- *শ্রমজীবী মহিলা পত্রিকা,* (মাসিক পত্রিকা), সিআইটিইউ পাবলিকেশন, কলকাতা, ১৯৬২-১৯৬৫।
- *সাম্যবাদী,* (মাসিক পত্রিকা), উড়িষ্যা, ১৯৫৫-১৯৫৮।
- *সমীক্ষণ,* বিজ্ঞান মনস্ক মুখপত্র, (বার্ষিক পত্রিকা), পশ্চিমবঙ্গ, ২০১৩
- *সংবাদ প্রভাকর,* (প্র্যাতাহিক পত্র), পশ্চিমবঙ্গ, ১৮৯০-১৯৩০।
- *স্বাধীনতা,* (সাপ্তাহিক পত্রিকা), দাসগুপ্ত. সুধাংশু(সম্পা), বীরভূম, পশ্চিমবঙ্গ, ১৯৪৫-১৯৪৭।
- *শ্রমিক আন্দোলন পত্রিকা,* (মাসিক পত্রিকা), রায়. মনোরঞ্জন(সম্পা), সিআইটিইউ, কলকাতা, ১৯৭৪।

- *দেশহিতৈষী,* (সাপ্তাহিক পত্রিকা), মৈত্র. মোহিত(সম্পা), সি আই টি ইউ পাবলিকেশন, প্রথম সংখ্যা, ১৯৬৩-১৯৬৫।
- *গণদাবী,* সোশইয়ালিস্ট ইউনিটি সেন্টারের বাংলা মুখপত্র, (মাসিক পত্রিকা), ব্যানার্জী. সুবোধ (সম্পা, পশ্চিমবঙ্গ, ১৯৫১ - ১৯৬৫।
- *অনিক,* (মাসিক পত্রিকা) চক্রবর্তী. দীপঙ্কর(সম্পা), কলকাতা, ২০১৩।

অন্তঃজাল

- https://images.app.google/Uvn4afvHxrDcJUKT9. Dated on 12/03/2023.
- https://images.app.google/NSiK2eUy99UcJ3Dv6. Dated on 12/03/2021
- https://images.app.google/Uvn4afvHxrDcJUKT9. Dated on, 14/05/2023.

সাক্ষাৎকার সমূহ:

- বুধু টুডু (৫০), পাথর খাদান শ্রমিক, সিউড়ি, দুপুর ২:৩০ ২৩/০৫/২০১৯
- মানিক সোরেন, (৪৬), পাথর খাদান শ্রমিক, বারোমাসিয়া, সকাল ৯:৪৫, বীরভূম, ১২/১২/২০২১।
- ইন্দ্রজিৎ দত্ত, (৫৬), পাথর খাদান ও ক্রাসার মালিক, দুপুর ৩;৩০ বীরভূম, ২০১৮।
- গোকুল মন্ডল (৬৫), পাথর খাদান ও ক্রাসার মালিক, নলহাটি, দুপুর ২;৩০, ১২/০৫/২০১৮।
- মালিনী বেসরা, (৩৬), পাথর খাদান শ্রমিক, পাকুড়, বিকেল ৪:০০, ২০/০৬/২০১৯।
- টিকু হেমব্রম, (৬৬), পাথর খাদান শ্রমিক, রামপুরহাট, বিকেল ৫;৫০, ২০/০৩/২০১৯।
- ইন্দ্রজিৎ দত্ত, (৩৯), পাথর খাদান শ্রমিক, বাহাদুরপুর, বিকেল ৫;৫০, ১৬/০৫/২০২১।
- রমেশ সোরেন, (৫৫), পাথর খাদান শ্রমিক, বাহাদুরপুর, দুপুর ২;৩০, ২৩/০২/২০১৯।
- বিপুল ঘোষ, (৪৬), পাথর খাদান ও ক্রাসার মালিক, নলহাটি, সকাল ১১.০০, ১২/১২/২০১৯।

- শুভাশিস মণ্ডল, (৬৭), পাথর খাদান ও ক্রাসার মালিক, রামপুরহাট, সকাল ৯.০০, ৬/১২/ ২০২০।
- বীরেন চক্রবর্তী, (৫৮), পাথর খাদান ম্যানেজার, দুমকা, দুপুর ২:৩০, ৬/১০/ ২০১৯।
- রবি দাস, (৪৫), পাথর খাদান শ্রমিক, পাকুড়, দুপুর ১:০০ টা, ২০/১২/ ২০১৮।

পরিশিষ্ট

পাথর ক্রাশিং মেশিন ও আদিবাসী শ্রমিকদের কিছু চিত্র

পাথর ক্রাশিং মেশিন বা ক্রাশার [চিত্র সংগ্রাহক: গবেষক]

পাথর খাদান বা খনন কেন্দ্র [চিত্র সংগ্রাহক: গবেষক]

খাদান থেকে পাথর উত্তোলনের পরবর্তী অবস্থা

পাথর খাদান: বাহাদুরপুর বীরভূম

[চিত্র সংগ্রাহক: গবেষক]

পাথর খাদান: বাহাদুরপুর বীরভূম [চিত্র সংগ্রাহক: গবেষক]

কর্মরত পাথর খাদান ও ক্রাশারের শ্রমিক

[চিত্র সংগ্রাহক: গবেষক]

কর্মরত পাথর খাদান ও ক্রাশারের শ্রমিক

[চিত্র সংগ্রাহক: গবেষক]

সাক্ষাৎকারে মালিনী বেসরা ও মানিক সোরেন

[চিত্র সংগ্রাহক: গবেষক]

পাথর ক্রাশারে কর্মরত সিলিকোসিস রোগে আক্রান্ত শ্রমিক

[চিত্র সংগ্রাহক: গবেষক]